



আচার্য শ্রীতুলসী, বর্তমান আচার্য

জন শেতাখর স্তোত্রপত্র সংঘ



জ্ঞান তাপস যুবাচার্য মহাপ্রভু

মূল পুস্তকের লেখক

মনের জয়ই জয়

তুলসী অধ্যাত্ম বীডম প্রকাশন

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

মনের জয়ই জয়

মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ : চম্পালাল অঞ্চালিয়া

প্রাপ্তিস্থান :

প্রভা প্রকাশন

৪ নবীন বুক্স সেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চম্পালাল অঞ্চালিয়া ॥ ২ বাজা উডমার্ট স্ট্রিট ॥ কলকাতা-৭০০০০১ ॥

এবং কলকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে

MANER JOY-YI JOI by Yuvacharya Mahaprajna
Translated in Bengali from Hindi original
by Champalal Anchalia

Price Rs 25 00 only

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠমলজী অঞ্চালিয়ার পরিবারের সদস্যবৃন্দের
আর্থিক আনুকূল্যে এই সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

মূল্য : ২৫ টাকা

প্রচ্ছদ : চিত্ত দাস

তুলসী অধ্যাস্ত্র নীডম, জৈন বিশ্ব ভারতী, লাডনু (রাজস্থান)-এর
পক্ষে শ্রীচম্পালাল অঞ্চালিয়ার কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং অ্যান্ড
অ্যালায়েড সার্ভিস, ৮৬৬৮ বি, রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড,
কলকাতা-৭০০০১৩ থেকে বণেন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ধর্ম-দর্শনে যিনি ছিলেন সমধিক অনুপ্রাণিত
আমার সেই পবনাবাহ্য প্রবাত পিতৃদেবকে—
জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যিনি
আমার প্রথম পথপ্রদর্শক ।

ভূমিকা

মনেব প্রথম বীতিমত জট পাকিয়ে আছে। এই সমস্যা বহু হাজ্জাব বছর ধরে রয়েছে, ভবিষ্যতে আবও কত বছর পর্যন্ত তা থাকবে বলা মুশকিল। মনকে ধাঁবা বুঝেছেন এবং মনকে ধাঁবা দেখেছেন, তাঁদের ভ্রম শেষ হয়েছে। মনকে ধাঁবা বুঝতে পাবেন নি, মনকে দেখতে পান নি, তাঁরা মনকে জয় কবাব প্রসঙ্গেই সমস্যাগ্রস্ত রয়েছেন। জয়েব ভাবা হল লড়াইয়েব ভাবা। লড়াইয়ে হাব বা জিৎ—দুয়েবই সম্ভাবনা থাকে। মনেব সঙ্গে যিনি লড়াইয়ে নেমেছেন তিনি যেমন জিততে পাবেন, ঠিক তেমনি হাবতেও পাবেন। একেবারে নিশ্চিতভাবে কেউ কখনই বলতে পাবেন না, যিনি মনেব সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন, তিনি জয়লাভ কববেনই। মনকে যিনি উপেক্ষা কবেন, যিনি তাকে দেখেন, তিনি ভটস্থ হন, মধ্যস্থ হন। উপেক্ষাব কথা কত বড় হব, কেউ তাকে সহিতে পারে না। মনকেও তিনি সহিতে পাবেন না এবং কোন লড়াই ছাড়াই তিনি নিজে নিজেই পরাজিত হন।

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যুদ্ধেব একটা নিজস্ব ভাষা আছে, বোদ্ধাবও তেমনি নিজস্ব একটি ভাষা আছে। যুদ্ধ কেবল সমর-প্রাক্ষণেই হয় না, কেবল অস্ত্র ছাবাই সে লড়াই হয় না, লড়াই নিজের ভেতরে হতে পারে, এবং অস্ত্র ছাড়াই যুদ্ধ কবা যায়। মহাবীর এজন্তাই বলেছেন—‘নিজে নিজের সাথে লড়াই কব। অস্ত্রেব সঙ্গে লড়ে কি হবে? ‘জুজাবিহং খলু দুঃসহং’—যুদ্ধেব অবসব দুর্লভ, তাকে খুঁজো না।’

অথাত্বেৰ ঘোষণা হল—

ওহে বীৰ !

এই বিজ্ঞাতীয় তত্ত্বগুলিব সঙ্গ লড়,

নকল লড়াই কৰে কি হবে ?

যুদ্ধেৰ যে সামগ্ৰী পাওযা গেছে,

তা কৰে বাৰ বাৰ পাওযা যাবে ?

ওটাই হল সৰ্বাত্মক যুদ্ধেৰ মণ্ডকা ।

সামনেই ঘৰ বয়েছে,

যিনি সৰ্বস্ব-ভ্যাগী, তিনি এই ঘৰেই থাকেন

ওটাই হল সাম্য ।

আমি এই অট্টালিকাৰ শিখৰ থেকে

বিজ্ঞাতীয় তত্ত্বগুলিকে অন্ত দিকে ছুঁড়ে দিযেছি

দ্বিতীয় শিখৰ তো এমন নেই,

যেখান থেকে ওপুলাকে এপাবে ছুঁড়ে দিতে পাৰি ।

শ্ৰাস্ত হবো না ।

থেমো না ।

থামিষে দিও না ।

নত হযো না ।

সামনেৰ দিকে এগিষে যাও ।

দ্বিগুণ শক্তিব সঙ্গ

সামনেৰ দিকে এগিষে যাও ।

বিজ্ঞেৰ এই মন্ত্ৰকে যিনি বুঝতে পাবেন নি, তাঁৰ কাছে মন চিবকাল অজ্ঞেয়ই থাকে, অজ্ঞেয়ই থেকে যায় । মনেৰ বিজ্ঞ-বহন্ত যিনি বুঝতে পাবেন না তিনি মানসিক সমস্ৰাবণ সমাধান কবতে পাবেন না । একটি দৰ্ভিবই হু প্ৰাস্তে ধৰে দুটি মানুষ টানটানি কৰে, ফলে যখন দৰ্ভি ছিঁড়ে যায়, তখন দুজনেই পড়ে যায় । একজন টানে, আৰু দ্বিতীয়জন তা ছেড়ে দেব । যে টানে সে

পড়ে যায়, কিন্তু অপবজন দাঁড়িয়েই থাকে। প্রেক্ষাকে যিনি জানেন, দড়িকে যিনি ছেড়ে দিতে বা চিলে করতে জানেন, তিনিই বিজয়ী হন। এই সোজা কথাটিকে বুঝাব জগাই বইটি পড়ুন, নিজে দেখুন এবং অনুভব করুন। যদি কথাগুলিকে বোঝা যায়, তাহলে জট-পাকানো প্রশ্নটির সহজেই সমাধান হবে।

আচার্যশ্রী তুলসী হলেন আমার প্রেবণা-শ্রোত এবং জ্যোতিষন্ত। তাঁর আশীর্বাদ এবং সাঙ্গিধ্য, দুই-ই আমি পেয়েছি। তাঁরই উৎসাহ এবং প্রেবণায় সাধনা-শিবিরে ব্যবস্থাদি চলুক।

যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

আশীৰ্চন

দেশনোক গ্রামেৰ স্বৰ্গীয় জেঠমলজী অঞ্চালিষাৰ পৰিবার বৰাবৰই জৈনধৰ্ম এবং তেৰাপন্থ দৰ্শন-সংস্কাৰে অনুপ্রাণিত পৰিবার ছিল। ব্যবসায়িক কাৰণে বাংলাৰ প্ৰবাসী হওয়ায় ধৰ্মসংজ্ঞেৰ সঙ্গত এই পৰিবাৰেৰ সম্পৰ্ক অনেকটা চিড় ধৰে আসছিল। লাড়ু-নিবাসী প্ৰযাত মোহন-লালজী খটেড় (আমাৰ সংসাৰ-পক্ষীয় জ্যেষ্ঠ ভ্ৰাতা) এই সময়ে সিৰাজগঞ্জে (অধুনা বাংলাদেশ) থাকতেন। ওখানেই জেঠমলজীৰ সঙ্গত ঔৰ সম্পৰ্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পৰ্কই ঔদেব আৰাৰ আমাৰ কাছে আসাৰ প্ৰেক্ষা বোগায়। ঔৰা এলেন, আৰ এমন ভাবেই এলেন যে আগেৰ চেয়ে বেশি অধ্যাত্মধৰ্মী হলেন। ঔৰ গোটা পৰিবাৰেৰ মध्येই এই কাৰণে সংস্কাৰ পল্লবিত হল এবং ধৰ্মবিষয়ে একটা শ্ৰদ্ধা ঔদেব মध्ये পুষ্ট হতে লাগল।

জেঠমলজীৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ চম্পালালজী একাধাৰে শিক্ষিত, কৰ্মঠ এবং মিতভাষী। বাংলাদেশেই ঔৰ শিক্ষা-দীক্ষা হওয়ায় একদিবোঁ যেমন উনি বাঙালীই হৰে গেছেন, তেমনি বাংলা ভাষাৰ ওপৰেও ঔৰ বেশ অধিকাৰ জন্মেছে। ঔৰ সঙ্গত সম্পৰ্ক স্থাপনেৰ সুযোগ বিশেষ হয় নি, তাই উনি আমাদেব কাছে অপৰিচিতই বয়ে গিৰেছিলেন এতদিন।

আমাদেব বাণাবাস চাতুৰ্মাসেৰ সময় কলকাতায় এক বিশেষ সংবাদ পেয়ে চম্পালালজী বাণাবাসে এসে পৌঁছিলেন। এখানে আসাৰ পৰেই ঔৰ শ্ৰদ্ধা, কচি এবং নিষ্ঠা বদলে গেল। আমি ওঁকে দেখলাম, ঔৰ যোগ্যতা লক্ষ্য কবলাম এবং আমাদেব কাজে ওঁকে নেব বলে ঠিক কবলাম।

ঔৰ সাহিত্যধৰ্মী কচি এবং বাংলাভাষাৰ দক্ষতা দেখে আমিই ওঁকে আমাদেব সাহিত্যগুলি বাংলায় অনুবাদ কৰাব নিৰ্দেশ দিলাম। এই

নির্দেশ উনি প্রসন্নভাবে মেনে নিয়ে বললেন, 'আমি নিজে তো অনুবাদ কববই, অন্যকেও এ কাজে লাগাব।'

সর্বপ্রথম ছুটি বই উনি নিলেন—'মন কে জিতে জিত' এবং 'আভামণ্ডল'। উভয় পুস্তকই যুবচার্যজীব বচনা। এগুলি যোগ-সম্পর্কিত, প্রেক্ষাধ্যান-বিষয়ক এবং বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি-আকর্ষণকারী। পুরো মনোযোগ এবং নিষ্ঠা নিয়ে উনি কাজ শুরু কবলেন এবং কাজটিকে একেবারে শেষ করে তবেই বিশ্রাম নিলেন। অনুবাদটি কেমন হয়েছে, তার বিচার পণ্ডিতবা কববেন। তবে, আমি বর্তমানে দেখেছি, তাতে অনুবাদ খুবই ভালো লেগেছে।

বাংলার মানুষবা যোগ-রসিক, স্মৃতিপূর্ণ সাহিত্যের সমর্থদার এবং অধ্যয়নপ্রিয়। ওঁদের কাছে এই লেখা পৌছক, জীবনের প্রতি সঠিক এবং নতুন দৃষ্টি দিতে সক্ষম হোন ওঁবা।

শ্রীঅঞ্চালিয়া নিজ কর্তব্য নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন কবেছেন। এ পাথে উত্তরোত্তর ওঁব কুশলতাব বিকাশ হোক, এই কামনাই কবি।

৬ জুন, ১৯৮৪

জৈন বিশ্ব ভাবতী

লাডহু

আচার্য তুলসী

আশীর্বাণী

মনেব সমস্তাব সমাধানের জন্ত এক গভীর প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সমাধানের উপায় বাঙালী জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টাও খুব জরুরী। শ্রীচম্পালাল অক্সালিয়া এক ঠাব-সহযোগীবা নিষ্ঠাব সঙ্গে কাজ কবেছেন। বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকের সামনে ওঁবা মানসিক সমস্তাব সমাধানের সূত্র তুলে ধবেছেন। এটা খুবই মহত্বের কাজ। এই বই থেকে আধ্যাত্মিক চেতনাব জাগরণ, সর্বোপরি মনেব সমস্তাব সমাধানের সূত্র মিলবে। কল্যাণকারী এই প্রচেষ্টাব জন্ত মঙ্গলভাবনা বইল।

২ জুন, ১৯৮৪

জৈন বিশ্ব ভাবতী

লাড়মু

স্বাচার্য মহাপ্রজ্ঞ

•

1

1

অনুবাদকের ভূমিকা

আজ থেকে প্রায় বছর পঁচিশ আগে আচার্যশ্রী তুলসী এবং যুবাচার্য মহাপ্রসন্ন কলকাতায় এসেছিলেন। বাংলাব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীশুনীদেব সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং এই ভাব-বিনিময়-পর্বেই তাঁরা স্থির কবে ফেলেছিলেন, তাঁদের স্বলিখিত জৈন দর্শন ও ধ্যানবিষয়ক কিছু বই বাংলায় ভাষান্তবিত করাবেন, যাতে তাঁদের ভাবধারা বাংলাদেশেও প্রচারের সুযোগ পায় এবং বাংলাব জ্ঞানীশুনী ও বিদ্বজ্জন উভয়েই উপকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাক্ষপবিক ভাব-বিনিময়ের কাজটিও সম্পূর্ণ হয়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁদের সেই বাসনা অপূর্ণ ছিল। গত বছর নিতান্তই আকস্মিকভাবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে এবং আচার্যশ্রী তুলসী আমাকে গ্রন্থগুলিব বঙ্গানুবাদের কাজে অগ্রণী হতে বলেন।

আচার্যশ্রী তুলসীর নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে যেদিন তাঁর কাছে ‘মন কে জিতে জিত’ বইটি বাংলায় ভাষান্তবিত করার প্রতিশ্রুতি দিলাম এবং আমার জগদাত্রী জননীও যখন প্রসন্নচিত্তে সেই প্রতিশ্রুতিকে অবিলম্বে কার্যকর করার আদেশ দিলেন, তখন ভাবতেই পাবি নি, কি বিবটি বিষয় আমার জ্ঞান অপেক্ষা কবে আছে। নিতান্তই সহজ এবং সাধারণ মনে কবে বা শুরু করেছিলাম, কাজে নেমে দেখি, তা কপান্তবিত করার পথে এত বাধা যে হিমালয়ের উচ্চতা অতিক্রমের বাধাও যেন তাব কাছে তুচ্ছ। প্রসঙ্গত বলি, হিন্দি ভাষাব সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পবিচিতি থাকলেও আমি বাংলাব ছেলে—আচাবে-আচরণে, কথাবার্তায় ষোল আনা বাঙালী এবং তাব চেয়েও বড় কথা, আমার সম্পূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষাও পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলাব। তাই ঠিক বাঙালীব মতই হিন্দি

ভাষা আমার কাছে গ্রীক ভাষার সমতুল হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থায় পড়ে স্পষ্টই অনুভব করলাম, মা এক আচার্যজীকে কথা দিবে কি সাংঘাতিক বিপদেই না পড়েছি। আমি প্রকৃত অর্থেই আদার ব্যাপারী, আমার সব কাজকর্মের লোহা এবং ইনজিনিয়ারিং নিয়ে, অনুবাদ-রূপ জাহাজের খবর নিতে যাওয়াব কোন প্রয়োজনই যে ছিল না, তখন তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পাবলাম। কিন্তু, জিদ চাপল, নেপোলিওনের আশু বাক্যকে মনে পড়ল—‘অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্খদের অভিধানেই পাওয়া যায়’—এবং দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লাম অনুবাদ শেষ করার কাজে।

‘মনেব জয়ই জয়’ অনুবাদ করতে আমার সময় লেগেছে প্রায় পনেরো মাস। অসঙ্কোচে বলি, বাব বাব ছাঁবার আমি আত্মসন্তু এটি লিখেছি, কেননা প্রতিবাহই অনুবাদ করার পর অনুবাদের ক্রটি আমার কানকে পীড়া দিচ্ছে। অবশেষে মুদ্রিত হবকে অনুবাদের চেহারা কেমন হল, তা বিচারের ভার বইল বিদ্বজ্জনের ওপরে—আমার শুধু এটুকুই সাধনা যে, অপবিসীম নির্ভাভাবে কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা আমি করেছি। আমার মা এক আচার্যজী উভয়েই সেই নির্ভা আনমনে প্রেরণা যুগিয়েছেন, নেপথ্যে এই ছুটি মানুষকে আমি প্রণতি জানাই।

যুবাচার্যজীর অসংখ্য বইয়ের মধ্যে এই বইটিকেই অনুবাদকার্যের জন্য বেছে নিয়েছিলাম কেন, সেটিও এক প্রশ্ন। আজকের বস্তুতাত্ত্বিক পৃথিবীতে মনের সমস্তাই সবচেয়ে বড় সমস্যা, আমরা প্রত্যেকেই নানা মানসিক সমস্যাভাবে জর্জরিত। ‘মনেব জয়ই জয়’ আগাগোড়া মনের সমস্যা নিয়েই চর্চা করেছে এবং কিভাবে তা অতিক্রম করা যায় সে ব্যাপারে বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিবেছে। এহেন কঠিন বিষয়কে যুবাচার্যজী এমন সহজ, সবল ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছেন যে তা আমার মনকে আকর্ষণ করেছে। আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষায় এই ধরনের বই খুব বেশি নেই। তাই এ বই পড়ে বাঙালী পাঠক যে বীতিমত উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানসিক সমস্যা-পীড়িত এই পৃথিবীতে মনের সমস্যাকে অতিক্রম করার যেসব পদ্ধতির কথা যুবাচার্যজী বলেছেন, আজকের দিনেও তার প্রয়োগ অসম্ভব নয়।

এই প্রয়োগকাৰ্য সম্পন্ন কৰে দেশেৰ মানুহ লাভবান হ'তে পাবেন বনেই আমাৰ বিশ্বাস। তুলসী অধ্যায় নীডম-কে ধন্যবাদ, দেশেৰ ও দেশেৰ কল্যাণার্থে তাঁৰা এই বইগুলি বিভিন্ন ভাষাৰ ৰূপান্তৰণেৰ কাজে ত্ৰুতী হযেছেন। প্ৰাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যে চাৰটি বইযেৰ বাংলা সংস্কৰণ এঁৰা প্ৰকাশ কবলেন, সেগুলিৰ সাফল্য এলে পববৰ্তী গ্ৰন্থগুলিকে ভাষান্তৰিতকৰণেৰ কাজ এঁদেৰ পক্ষে সহজ হ'বে। তাই তাঁদেৰ হযে বইগুলিৰ বহুল প্ৰচাবেৰ জন্ত বাংলাৰ জ্ঞানী-শুণী, সাধাৰণ-অসাধাৰণ প্ৰতিটি মানুহেৰ কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা কৰছি।

এ বইযেৰ অনুবাদ সম্বন্ধে একটা কথা শূধী পাঠক-পাঠিকাকে বলে নেওয়া ভাল। সুবাচাৰ্যজী বইটি পাণ্ডুলিপিৰ আকাৰে লেখেন নি, এটি তাঁৰ বিভিন্ন শিবিৰে দেওয়া বক্তৃতাত সঙ্কলন। টেপ-ৰেকৰ্ড কৰা বক্তৃতাকে পববৰ্তীকালে বইযেৰ আকাৰে লিপিবদ্ধ কৰা হযেছে। বলা এবং লেখাৰ ভাৰা সৰ্বদা এক হ'ব না। তাই মাঝে মাঝে লেখাৰ মধ্যে পুনৰাবৃতি এসে গিযেছে। আমবা অবশ্য সতৰ্কতাৰ সঙ্গে পুনৰাবৃত্তিকে ৰখাসম্ভব বাদ দেবাৰ চেষ্টা কৰেছি। তবু, তাকে যে সৰ্বদা পৰিহাৰ কৰতে পৰেছি তা নহ। তবে এতে এই মূল্যবান বইযেৰ ৰসাস্বাদনে কোন বিলম্ব ঘটবে বলে মনে হ'ব না।

আব একটি কথা। যে প্ৰেক্ষা-ধ্যান নিয়ে এই বইয়ে আলোচনা কৰা হযেছে, সে সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জ্ঞানতে চান বা প্ৰেক্ষা-ধ্যান অভ্যাস কৰতে চান, তাহলে এই গ্ৰন্থেৰ লেখক বা প্ৰকাশকেৰ সঙ্গে যোগাযোগ কৰতে পাবেন।

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনেৰ পালা। সৰ্বপ্ৰথম ধন্যবাদ জ্ঞানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েৰ ভাষাতত্ত্ব ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগেৰ অধ্যাপক ড. সত্যবজ্ঞন বন্দ্যোপাধ্যায়কে, শত ব্যস্ততাৰ মাঝেও যিনি বইটিৰ মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিযেছেন। অধ্যাপক শুকুমাৰ চক্ৰবৰ্তী এ বইযেৰ পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া সমশোধন কৰে দিযে অপৰিসীম স্বৰ্ণপাশে আমাকে আবদ্ধ কৰেছেন। পাণ্ডুলিপি বচনাৰ ব্যাপাবে

শ্রীবংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রুবোধ কুমার বায়, শ্রীগীতী শ্রামলী চক্রবর্তী
এবং শ্রীগৌরগোপাল সাহা নানা ভাবে আমাকে সাহায্য কবেছেন।
শ্রীবর্গেন গুপ্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যে বইটির মুদ্রণকার্য সম্পন্ন কবেছেন,
বেশির ভাগ প্রস্তুতি দেখে দিয়েছেন এবং অনুবাদেও নানা ভাবে সাহায্য
কবেছেন। এঁদের সকলের কাছেই ব্যক্তিগতভাবে ঋণী বইলাম।

স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৪

২ বাম্পা উডমান্ট স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০১

বিনীত

চম্পালাল অধিকারী

সূচীপত্ৰ

১।	দেখা ও ভাবা	১
২।	শব্দৰ সাধনা	১৬
৩।	শব্দ সাধনা	৩২
৭।	মনেৰ পটুতা বিধান	৭১
৫।	না কবাব মূল্য	৫৬
৬।	মৌনতাৰ মূল্য	৭০
৭।	চিন্তাশূন্যতাৰ মূল্য	৮৭
৮।	শব্দৰ পৰিচয়	১০৫
৯।	প্ৰেমা প্ৰয়োগ	১১৮
১০।	অন্তপ্ৰেমা	১৩১
১১।	কপাস্থৰণেৰ প্ৰক্ৰিয়া	১৪৬
১২।	স্থলৰ পৰা গৃহ	১৬০
১৩।	অধ্যাত্মেৰ বহুস্তৰৰ সন্ধান	১৭৬
১৪।	অধ্যাত্ম এক ব্যৱহাৰ	১৯২
১৫।	শব্দৰ এক তাৰ বিশিষ্ট কেন্দ্ৰ	২০৪
১৬।	শব্দৰ বোধেৰ অপেক্ষা	২১৭
১৭।	প্ৰাণ এক তাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ	২২৬
১৮।	আহাৰ : অনাহাৰ	২৩২
১৯।	ভাবনা	২৪০

২০।	অধ্যাত্মিক সাধনা	২৪৮
২১।	ইন্দ্রিয়-সংযম	২৫১
২২।	অপ্রমাদ	২৬৬
২৩।	জ্ঞান এবং সংবেদন	২৮১
২৪।	জপ এবং মৌনতা	২৮৫
২৫।	একাগ্রতা	৩৩৩
২৬।	সাধনাব তিন পদ্ধতি	৩১১
২৭।	নিৰ্বিচাৰ ধ্যান	৩১৯
২৮।	চেতনাব দিক পৰিবৰ্তন	৩৩৩
	জিজ্ঞাসা	৩৪৫

মনের জয়ই জয়

সরদারশহর শিবির

(১০ অক্টোবর, ১৯৭৬ থেকে ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৬)

দেখা ও ভাবা

এই সংসাবে আমবা দুই বকম তত্ত্ব দেখতে পাই। তাদের একটি অভেদ, অপৰাট ভেদ। যখন আমবা অভেদকে দেখি তখন মনে কোন বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু যখন ভেদকে দেখি তখন মনে বিকল্প বা সন্দেহ উৎপন্ন হয়। এবকম হয় কেন? এই পার্থক্য কেন, এই ভিন্নতাই বা কেন? এই বকম এক ঘটনা স্মৃতির অতীতে ঘটেছিল।

একবার পার্শ্বনাথ পবম্পবাব পটুখব কুমাব অ্রমণ কেশী তাঁব অ্রমণ পবিবাবসহ শ্রাবস্তী নগবে আসেন এবং তিন্দুক উজ্ঞানে অবস্থান করেন। সেই সময়ে ভগবান মহাবীবব শিষ্য গণধব গৌতমও তাঁব অ্রমণ সহ ঐ নগবীতে আসেন এবং কোষ্ঠক উজ্ঞানে অবস্থান করেন। উভযেব অ্রমণদল পবম্পবকে দেখাব সুযোগ পান। কিন্তু পবম্পাবেব মধ্যে বেশভূষা ও আচৰণেব পার্থক্য লক্ষ্য কবে তাঁদেব মনে সংশয় জাগে। তাঁবা জানতেন যে তীৰ্থকব পার্শ্ব চতুৰ্থাম ধৰ্মেব প্রকপনা কবেছিলেন এবং মুনিদেব জন্ত চাব মহাব্রত বিধান কৰেছিলেন। আব মহাবীব অ্রমণদেব জন্ত পাঁচ মহাব্রতের নির্দেশ দিযেছিলেন। চাব মহাব্রত আব পাঁচমহাব্রত দুই বিধানেব মধ্যে এই প্রভেদ কেন? পার্শ্বনাথেব অ্রমণদেব পবিধেয বস্ত্র সব বকম বঙেব ছিল। মহাবীবেব অ্রমণদেব বস্ত্র কেবল সাদা বঙেব

ছিল। আচৰণেৰ পাৰ্থক্যও ছিল। কিন্তু কেন? দুই সম্প্ৰদায়েৰে শ্ৰমণদেব মনে সন্দেহ জাগল। আচাৰ্য কেশী ও গণধৰ গৌতম সে কথা জানতে পাৰলেন। তাঁৰা অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞানী ছিলেন। তাঁৰা দুজনে এক স্থানে মিলিত হলেন। তাঁদেৰ শ্ৰমণবাও সঙ্গ ছিলেন। কুমাৰ শ্ৰমণ কেশী গণধৰ গৌতমকে জিজ্ঞাসা কবলেন : আমাদেৰ লক্ষ্য এক ও অভিন্ন, আমবা একই উপলক্ষি লাভেৰ ক্ষমতা সচেষ্ট। তবুও তীৰ্থকব পাৰ্থনাথ চাব মহাত্মেৰ এক তীৰ্থকব মহাবীৰ পাঁচ মহাত্মেৰ বিধান কি কবে দিলেন? এই প্ৰশ্নেৰ কেন? বেশভূষাতে পাৰ্থক্য কেন? চৰ্যাতেই বা পাৰ্থক্য কেন? একই লক্ষ্য অভিযুখে চলা সত্ত্বেও এই পাৰ্থক্য থাকায় শ্ৰমণদেব মনে সন্দেহ উপস্থিত হযেছে। এব সমাধান কি? আপনি আগুপ্ৰজ্ঞ, এব সমাধান ককন।

গৌতম সমস্যাৰ সমাধান কবলেন। তাঁৰ বক্তব্যেৰ প্ৰথম চৰণেই তিনি বা বললেন তা খুবই মহত্বপূৰ্ণ। তিনি বললেন—“পন্না সমবিক্ষয়ে ধম্মং তত্ত্বং তত্ত্ববিনিচ্ছিন্নং”—ধৰ্মেৰ পবন অৰ্থকে জানতে হলে, তাকে নিশ্চয় কবে জানতে হলে, প্ৰজ্ঞাৰ দ্বাৰা তাৰ সমীক্ষা কব। প্ৰজ্ঞাৰ দ্বাৰা দেখ তাৰ ভেতৰে কি আছে। তাৰ বাইবেৰ কপকে দেখো না। ‘পন্না সমবিক্ষয়ে’—প্ৰজ্ঞাৰ দ্বাৰা গভীৰে অবতৰণ কবে দেখ, তাৰ অতল গভীৰে পোঁছে তবেই তুমি জানতে পাববে পবন ধৰ্ম আসলে কি। এই বেশভূষাৰ পাৰ্থক্য, চাব-পাঁচ মহাত্মেৰ ভিন্নতা—সংখ্যাৰ এই পৰিবৰ্তন প্ৰকৃত প্ৰস্তাবে ধৰ্ম পদবাচ্য নব। এগুলি থেকে ধৰ্ম মিলবে না। প্ৰজ্ঞাৰ দ্বাৰা গভীৰে অবতৰণ কবে দেখ। সেখানেই ধৰ্মকে দেখতে পাবে। তাতে কোন ভিন্নতা বোধ কববে না। সবই একই বস্তু বলে প্ৰতীত হব। আজকে আমবা যে বিবাবে আলোচনা কবাছি সেই প্ৰেক্ষা ধ্যান কি? প্ৰেক্ষা ধ্যান হল গভীৰে অবতৰণ কবে দেখা। বতৰ্জ্ঞ গভীৰে অবতৰণ কবা না বায় ততৰ্জ্ঞ সত্যকে দেখা সম্ভব হব না। আমবা সত্যকে জানতে চাই। সত্যকে দেখা-জানার দুটি মাধ্যম আছে—একটি বিচাব, অপবটি দৰ্শন অৰ্থাৎ দেখা। আমবা বিচাবেৰ সঙ্গ বিশেষ পৰিচিত,

কিন্তু দৰ্শনেৰ পৰিচয় এখনও আমবা পাইনি। বিচাবেৰ ভূমি নিচেই
থেকে বায়, কিন্তু দৰ্শনেৰ ভূমি তাৰ অনেক ওপৰে ওঠে। দৰ্শনেৰ যে
শক্তি আছে বিচাবে তা নেই। দৰ্শন যেখানে যেতে পাবে বিচাব সেখানে
পৌছতে পাবে না। বিচাবেৰ বিস্তাৰ খুবই সীমিত, দৰ্শন স্নদুৰপ্ৰসাৰী।
যেখানে দৰ্শন হয় সেখানে বিচাব সমাপ্ত হয়।

বিচাবেৰ সমাপ্তি ঘটানোৰ সবচেয়ে প্ৰকৃষ্ট উপায় দৰ্শন। যখন আপনি
দৰ্শনেৰ ভূমিকাতে প্ৰবেশ কৰেন, দেখতে আবস্ত কৰেন, তখন বিচাব
আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে বায়। আপনি হয়ত বহুবাৰ ভেবেছেন বিচাবেৰ
পাশ বিভাবে ছিল কবা যাবে, বিচাবেৰ প্ৰবাহ বিভাবে বন্ধ কবা যাবে।
এই যে একেৰ পৰ এক বিচাব মনেৰ মধ্যে উঠেই চলেছে তা বিভাবে
বন্ধ কবা যাবে। কিন্তু কেবল এই ধবনেৰ ভাবনাৰ দ্বাৰা বিচাব বোধ
কবা যাবে না। বিচাব বন্ধ কবা সম্ভব দৰ্শনেৰ দ্বাৰা, যথাযথভাবে
দেখাৰ দ্বাৰা। আপনি দেখাৰ অভ্যাস ককন। আপনি যেমনি দৰ্শন
কবতে আবস্ত কৰবেন, দেখতে গুৰু কৰবেন, তখনই বিচাব বন্ধ হয়ে
যাবে। ছুই কাল এক সঙ্গ চলবে না। হয় দৰ্শন চলবে, নযতো বিচাব
চলবে। দৰ্শন যদি হয় বিচাব বন্ধ হবে, বিচাব যদি চলতে থাকে দৰ্শন
হবে না। তাৰা পবম্পব বিপৰীত পথেৰ পথিক। একসঙ্গে তাৰেব
ছুটিকে নিয়ে চলতে পাববেন না। আপনাৰ অভিকচিমত ছুটিকে ধকন,
থাকবে সেই একটিই, হয় দৰ্শন না হয় বিচাব। সাধনাৰ দৃষ্টিতে ‘দেখা’
খুবই মূল্যবান। সত্যকে জানাৰ, সত্যকে দেখাৰ সবচেয়ে বড় উপায়
দৰ্শন।

প্ৰশ্ন হতে পাবে—কি দেখব ? কেমন কবে দেখব ? কেন দেখব ? এই
তিনটি প্ৰশ্নই স্বাভাবিক।

কি দেখব, এই প্ৰথম প্ৰশ্ন। উত্তৰ হচ্ছে, যা কিছু সামনে আসে তাই
দেখুন। কি দেখতে হবে সে বিষয়ে কেউ নিষম বেঁধে দিতে পাবে না।
কেউ বলতে পাবে না, এগুলি দেখ, ওগুলি দেখ না। যেখানে দেখাই
উদ্দেশ্য সেখানে কি দেখতে হবে আৰ কি দেখা চলবে না, এ নিয়ে কোন

প্রশ্নই হতে পারে না। যে কোন বস্তুকেই দেখা যেতে পারে।

আকাবকে দেখুন। সেটাই সবচেয়ে সহজ দর্শন। যে কোন আকাব সামনে এলেই আমবা তা দেখতে শুরু কবি। যে কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হলেই আমবা তাব বাহ্য রূপ দেখতে আবিস্কৃত কবি। প্রত্যেক আকৃতিব ছুটি রূপ আছে—একটি বাইবেব রূপ, অপবটি ভেতবেব রূপ। একটি বাহ্য, অপবটি আন্তরিক। এমন কোন বস্তু নেই যাব বাইবেব রূপ আছে, কিন্তু ভেতবেব কোন রূপ নেই। আবাব অন্তবেব রূপ আছে, কিন্তু বাহ্য কোনও রূপ নেই এমন কোন বস্তুও নেই। দুই রূপই থাকে। যেখানে বস থাকে সেখানে ছোবডাও দেখি, বসও দেখি। আমবা উভয়কেই দেখে থাকি। বাইবেব এবং ভেতবেব দুই রূপকেই আমবা দেখি। প্রথমে বাইবেবটি দেখি, পবে ভেতবেবটি দেখি। প্রথমে স্থূল রূপকে দেখি, পবে সূক্ষ্ম রূপকে দেখি।

প্রথম দর্শনে যা আমাদের চোখেব সামনে আসে তা হল স্থূল রূপ। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে যতটা দেখা যায় তাই সব নয়, ভেতবেও অনেক কিছু থাকে, তাই আপনি সূক্ষ্মকেও দেখুন। আমাব হাতে একটা পেন্সিল আছে, আপনি এব স্থূল রূপকেই কেবল দেখছেন। আপনি পেন্সিলটিকে গভীরভাবে দেখতে থাকুন, এক মিনিট দুই মিনিট পাঁচ মিনিট ধবে দেখুন। দেখতে দেখতে আপনাব সামনে এব স্থূল রূপ নাশ পেতে থাকবে এবং এব ভেতবেব রূপ, এব সূক্ষ্ম রূপ, প্রকাশ হতে থাকবে। আপনি দেখছেন আব দেখছেন আব দেখছেন, আব এই ভাবে গভীরে অবতরণ কবেছেন। এক বস্তুর কত যে নতুন নতুন রূপ ভেসে উঠবে তা দেখে আপনি বিস্ময়বিমূঢ় হবে যাবেন।

আজকে আমবা পেন্সিলেব আকাব দেখলাম, তাব আকৃতিকে লক্ষ্য কবে একাগ্র হবে গেলাম। প্রথমে ওব একটি রূপই দেখলাম, কেবল তাব স্থূল আকাবটিই দেখলাম। দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত কবে ওব বড় যে কি তা দেখলাম এবং তৃতীয়বারে ওব গায়ে যে ক্ষুদ্র অক্ষরগুলি লেখা আছে তাও দেখলাম। এসব প্রথম বাবেই দেখা সম্ভব হয় নি। পেন্সিল একটি

সামান্য বস্তু, কিন্তু তাও নিজেব মধ্যে অনন্ত পর্যায় সংগ্রহ কবে বেখেছে। একবার দেখলেই ঐ অনন্ত পর্যায় আমাদের সামনে প্রকট হবে না। কিন্তু আমবা যতই গভীরে অবতরণ কবে যতই সূক্ষ্মতার সঙ্গে দেখতে থাকব ততই ঐ সমস্ত পর্যায় আমাদের দৃষ্টিগথে ক্রমশঃ একের পব এক উদঘাটিত হতে থাকবে। এমনও সম্ভব যে, যদি আমবা ঐ পেন্সিল গাঁচ-দশ দিন ধবে দেখতে থাকি তবে সেটি আব পেন্সিলই থাকবে না, আমাদের কাছে সেটি অন্য কিছু হবে যাবে। তখন পেন্সিলই হবে দাঁড়াবে সত্য উদঘাটনের একটি মাধ্যম।

আমবা আকাব দেখব—তাৰ বাইবেবটাও দেখব, ভেতবটাও দেখব। স্থূল-সূক্ষ্ম দুটি কপই দেখব। দেখতেই থাকব আব দেখতেই থাকব, আব ক্রমশঃ গভীরে অবতরণ কবে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আব গভীরে নেমে দেখা। আমবা যত বেশি সম্ভব গভীরে অবতরণ কবে দেখতে থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আব গভীরে নেমে দেখা। আমবা যত বেশি গভীরভাবে দেখতে থাকব তত এমন সব নতুন নতুন পর্যায় উদঘাটিত হতে থাকবে যা প্রথম দর্শনকালে কল্পনাই কবা যায়নি।

যেমন ভাবে পেন্সিলকে দেখা হল তেমন ভাবেই স্বাসকে দেখা দবকাব। কেবল বাইবেব বস্তু যে আমাদের কাছে দেখাব যোগ্য তা নয, আমাদের আশেপাশেই দেখাব যোগ্য অনেক কিছু আছে। স্বাসকে দেখ, স্বাসেব কল্পনাকে দেখ। স্বাস যে বিন্দুকে ছুঁষে আছে তাকেও দেখ। স্বাস কত দূব পর্যন্ত যায়, কোথায় মোড ফেবে, কোথা থেকে ফিবে আসে এব কোথায় ঐ স্বাস প্রস্থাসে পবিত হয—এ সব দেখ। স্বাসেব তীব্রতাকে দেখ, স্বাস কতটা স্থূল তা দেখ, স্বাস কতটা ছোট তাও দেখ। স্বাস কি অধিক পবমাণু-সম্বলিত, না অল্প পবমাণু-সম্বলিত অবস্থায় আছে ? স্বাস কতটা দীর্ঘ ? ওব দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য কব। স্বাসেব গতিকে লক্ষ্য কব। একই স্বাসেব বিভিন্ন কপকে দেখতে থাক।

শবীবকে দেখ। শবীবেব আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু তা এক অতি বৃহৎ ভাণ্ডাব। শবীবেব যন্ত্রপাতি এত বিপুল যে তাঁব সঙ্গে তুলনায় পৃথিবীব

অতি বড় কাবখানাগুলিও ছোট বলে মনে হবে। এই ক্ষুদ্র শরীবে এত বেশি সংখ্যক যন্ত্র আছে, আর তাদের নির্মাণকৌশল এতই আশ্চর্যজনক যে, কোন মানুষ যদি ঐ সব যন্ত্র নির্মাণ করতে চেষ্টা করে, তবে আজ সর্ব বিষয়ে বিকশিত বিজ্ঞানের যুগেও সে সফল হতে পাবে না। মানুষের এই ক্ষুদ্রাকৃতি মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে, যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। কোন মানুষই তা নির্মাণ করতে সমর্থ হবে না। কোন মানুষেবই এমন ক্ষমতা আর যোগ্যতা নেই যে সে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করতে পাবে।

নিজের কাছেই যখন দেখাব এত বস্তু পড়ে আছে তখন বাইবে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা কি? আপনি মস্তিষ্কেব এক একটি প্রকোষ্ঠকে দেখতে শুরু করেন। মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে। কোনটি স্মৃতির প্রকোষ্ঠ, কোনটি অনুভূতির প্রকোষ্ঠ। কোনটি ক্রোধের প্রকোষ্ঠ, কোনটি ক্রমাব প্রকোষ্ঠ। কোনটি অভিমানের প্রকোষ্ঠ, কোনটি মায়াব প্রকোষ্ঠ। যত বকম আবেগ, যত বকম বৃত্তি, যত বকম বাসনা আছে—তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। সেগুলি দেখুন। আজ্ঞাচক্রকে দেখুন, নাসাগ্রকে দেখুন, নাভিমণ্ডলকে দেখুন। এই বকম আবও অনেক স্থান আছে। আপনি সবই দেখতে থাকুন। অনেক বহুস্তর উদ্ঘাটিত হতে থাকবে।

দেখা কেবল দেখা নয়, তাব একটা পৰিণামও আছে। শরীবেব কোন এক স্থানকে দেখাব অর্থ হল, মনকে সেখানে কেন্দ্রিত করা। যখনই আপনি আজ্ঞাচক্রকে দেখবেন তখনই মন সহজেই একাগ্র হবে যাবে। কারণ ঐ স্থানের এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যে মন যখনই সেখানে পৌঁছবে তখনই সেখানে আটকে থাকবে। ঐ স্থানই মনকে ধরে রাখবে। আমাদের শরীবেব অভ্যস্তবে এত অসংখ্য নাড়ী আছে, এত বৃহৎ নাড়ী-সংস্থান আছে যে, আমরা সেগুলি দেখে শেষ করতে পাব না।

আমাদের শরীবেব মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে। যোগেব প্রাচীন আচার্যবা ঐগুলিকে ‘চক্র’ বলে অভিহিত করেছেন। আধুনিক শরীব বিজ্ঞানীবা

ঐগুলিকে 'গ্ল্যাণ্ডস' বোলেছেন। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ পদ্ধতিব 'জুডো'-তে ঐগুলিকে 'ক্যুসোস' বলে। এটা আশ্চৰ্যজনক ব্যাপার যে, যোগেব আচার্যবা চক্রগুলিব যে যে স্থান ও আকাৰ বৰ্ণনা কৰেছেন, আধুনিক শব্দৰ বিজ্ঞানীবা গ্ল্যাণ্ডগুলিব যে যে স্থান ও আকাৰ স্বীকাৰ কৰেছেন, এক জুডো পদ্ধতিতে ক্যুসোসেব যে যে স্থান ও আকাৰ বলা হাৰেছে—তা তিন ক্ষেত্রেই সমান। বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

ক্রমিক সংখ্যা	জুডো ক্যুসোস	গ্ল্যাণ্ডস	যোগচক্র
১	টেণ্ডো	পিনিয়ল গ্ল্যাণ্ড	সহস্রাৱ চক্র
২	উত্তো	পিটুইটাৰি গ্ল্যাণ্ড	আজ্ঞা চক্র
৩	হিচ্	থাইবৰেড গ্ল্যাণ্ড	বিশুদ্ধি চক্র
৪	ক্যোটোট্‌নু	থাইমাস গ্ল্যাণ্ড	অনাহত চক্র
৫	সুইগেট্‌নু	সোলাৰ প্লেব্‌সাস	অগ্নিপুৰ চক্ৰ
৬	মাইণ্ডো	অ্যাড্ৰিনাল গ্ল্যাণ্ড	স্বাধিষ্ঠান চক্ৰ
৭	সুৰগিনে	পেলভিক প্লেব্‌সাস	মূলাধাৰ চক্ৰ

একেব পৰ এক গ্ল্যাণ্ড বা ক্যুসোস বা চক্ৰকে দেখতে থাকুন। ঐ সবেব স্থান স্পষ্টৰূপে প্ৰতিভাষিত হ'তে আবশ্য কৰবে। এদেব দেখাব পৰিণাম সুমহৎ হ'য়ে থাকে।

আমাদেব সামনে দেখাব মত বহু বস্তু আছে। সূতৰাং আমবা কি দেখব এই প্ৰশ্ন নিবৰ্ধক। দেখাব ক্ষম্ত আমাদেব এই শব্দবিই পৰ্যাপ্ত। তা ছাড়া জগৎ অতি প্ৰকাণ্ড। এত প্ৰকাণ্ড যে দেখাব যোগ্য বস্তুব অভাব কোন দিনই হ'বে না। দেখাব পক্ষে কোন বস্তুই অযোগ্য নহ। যে বস্তুকে আমবা সবচেয়ে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বলে মনে কৰি তাৰ দৰ্শনেও আমাদেব সত্যাব দৰ্শন হ'তে পাৰে। কোন বস্তু ততক্ষণই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে যতক্ষণ আমাদেব দৃষ্টিকোণ অন্ত বৰম থাকে। যখন আমাদেব দৃষ্টিকোণ সত্যকে দেখাব উপযুক্ত হয় তখন কোন বস্তুই তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বা মন্দ থাকে না। তখন ভাল-মন্দেব ভেদ সমাপ্ত হ'য়ে যায়।

কেবল যথার্থকে দেখবাব, সত্যকে দেখবাব কথাই শেষে থেকে যায়।

আমাদেব প্ৰথম প্ৰশ্ন ছিল—কি দেখব ? এ সম্বন্ধে আমি কিছুটা আলোচনা ক'বলাম মাত্ৰ।

এখন দ্বিতীয় প্ৰশ্ন—কেমন কৰে দেখব ? এটি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। দেখা যতটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ চেৰেও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন—কেমন কৰে দেখব। এব সোজা উত্তৰ হ'বে, চোখ দিয়ে দেখ। এ উত্তৰ ঠিকই যে আমবা চোখ দিয়ে দেখি। কিন্তু কেবল চোখ দিয়ে দেখাই যথেষ্ট নয়। চোখ দিয়ে দেখাৰ আগে যে সব অপবিহাৰ্য শৰ্ত আছে সেগুলি বুঝতে হ'বে। প্ৰথম শৰ্ত হল, অনাসক্তভাবে দেখতে হ'বে। নিৰ্লিপ্ত হ'য়ে দেখতে হ'বে। বাগ-দেব শূন্য চিন্তা নিয়ে দেখতে হ'বে। যদি আসক্তি এসে যায়, ঠিক দেখাই হ'বে না। চোখ দেখবে বাটে, কিন্তু যথার্থ দেখবে না—নজবে অস্ত্ৰ কিছু এসে যাবে।

বসিক লোকৰ কাছে তাৰ জীৱ গোল মুখাবয়ব চাঁদেৰ মত সুন্দৰ মনে হয়। আৰাব কিন্তু স্মৃধাৰ্ত লোকৰ কাছে তাৰ জীৱ গোল মুখ কটিব মত মনে হতে পাৰে। কাৰণ দেখাৰ সঙ্গে একজন কামাসক্তি জুড়ে দিয়েছে, অন্য জন জুড়ে দিয়েছে পদাৰ্থাসক্তি। নতুবা জীৱ মুখ কি কৰে চাঁদেৰ মত হ'বে, কি কৰেই বা কটিব মত হ'বে ?

নাটকেৰ এক দৃশ্য কল্পনা কৰা যায়—এক স্মৃধাৰ্ত ব্যক্তি চাঁদ দেখছে, পূৰ্ণিমাৰ চাঁদ দেখছে, তাৰ চোখেৰ সামনে গোল গোল কটি ভেসে বেড়াছে।

আমবা চোখ দিয়ে দেখছি, কিন্তু যথার্থ বস্তু দেখাই দিছে না। বস্তুৰ সঙ্গে আমাব যে আসক্তি জুড়ে দিচ্ছি তাই আমি দেখতে পাছি। বহু সময়ে সুন্দৰ অসুন্দৰ হ'য়ে দেখা দেয়। আৰাব অসুন্দৰও সুন্দৰ দেখা দেয়। যাৰ সঙ্গে আসক্তি জুড়ে দেওযা হ'য়েছে তা অসুন্দৰ হ'লেও সুন্দৰ প্ৰতীত হ'বে। যাৰ সঙ্গে ঘৃণা বা তিবন্ধাবেৰ ভাব জুড়ে দেওযা হ'য়েছে তা সুন্দৰ হ'লেও অসুন্দৰ বলে প্ৰতীত হ'বে। বেচাবা চোখ কোথায যথার্থ বস্তু দেখতে পাৰে ? চোখেৰ ওপৰে যে আসক্তিৰ, বাগ-দেবেৰ,

প্রিয়তা-অপ্রিয়তাব আবরণ পড়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই আবরণ দূর না হয়—আসক্তি ও বাগ-দ্বেষ মিটে না যায়, প্রিয়তা ও অপ্রিয়তাব বোধ নষ্ট না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত চোখ যথার্থভাবে দেখতে পারে না। যাব যা প্রকৃত রূপ তাকে সেই রূপে দেখতে সমর্থ হবে না। কোন লোক যথার্থই ভাল, কিন্তু আমি তাকে মন্দ দেখছি, মন্দ বলে মনে কবছি। আবার কোন লোক যথার্থই মন্দ। কিন্তু আমি তাকে ভাল দেখছি, ভাল বলে মনে কবছি। কারণ ভাল বা মন্দ মনে কবাব সঙ্গে অল্প এক ভাবনা কাজ কবছে। এ কারণেই অনাসক্ত হয়ে দেখুন। নিরপেক্ষ ভাবে দেখুন, তবেই কেবল যথার্থভাবে দেখতে পাবেন। যা ঘটতি হচ্ছে ঠিক তাই দেখুন। তাব সঙ্গে কোন বকমের চিন্তা বা ভাবনা জুড়ে দেবেন না। বস্তুকে অনাসক্ত ভাবে দেখা, বাগ-দ্বেষ-বহিত চিন্তে দেখা, নিরপেক্ষ ভাবে যা যে বকম তাকে ঠিক সেই ভাবে দেখা—এই হল আমাদের দেখাব প্রকার।

যখন অনাসক্ত চেতনা জাগ্রত হয়ে যায় তখন যে কোন মাধ্যমকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। চোখ এক মাধ্যম। স্থূল বিষয়, যা চোখেব মাধ্যমে দৃশ্য হয়, তা আমরা চোখ দিবে দেখব। যা মনের দ্বারা দেখাব যোগ্য তা আমরা চোখ বন্ধ কবে মনের দ্বারাই দেখব। যদি চোখ খুলে বেখেই দেখতে চান তো সেই ভাবেই দেখুন। ভেতবকে দেখুন। এই দেখাকে বলে ‘অনিমেব দর্শন’। কোনও বস্তুকে অপলক দৃষ্টিতে দেখুন। চোখ খোলা আছে, খোলাই থাকুক। পলক যেন না পড়ে। এই হল ‘অনিমেব দর্শন’। অর্থাৎ অপলক দৃষ্টিতে দেখা। তত্ত্ব ও হঠযোগে একে ‘ট্রাটক’ বলা হয়েছে। ট্রাটকের অর্থ হল, অপলক দৃষ্টিতে এক বিন্দুকে দেখা। নিবস্তব দেখা।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—কেন দেখব? চেতনাব মূল স্বভাবই হল দেখা। চিন্তা কবা বুদ্ধিব কাজ। বুদ্ধি চেতনাব একটি বশি মাত্র। আব বিচাব তাব আলোক। দেখা অখণ্ড চেতনাব কাজ। চেতনা যখন অনাবৃত হয় তখন কেবল দর্শন হয় চিন্তন, আব হয় না। দেখাই আমাদের স্বভাব।

সেজ্ঞা কেন দেখব এ প্রশ্নই হয় না। নিজেৰ স্বভাবৰ সঙ্গ আমাদেব পৰিচয় কম, তাই এই প্রশ্ন স্বাভাবিকও নহ। যতই গভীৰ ও স্থিৰ ভাবে আমবা দেখতে শিখব ততই আমাদেব একাগ্ৰতা বাডবে ও সমাধিৰ পুষ্টি সাধন হবে। সমাধি লাভ কৰাৰ সবচেয়ে সৰল উপায় হল দেখা। কোন এক বিন্দু বা লক্ষ্যৰ ওপৰ মনকে স্থিৰ কৰন আৰ নিবন্তৰ দেখতে থাকুন। কিছুক্ষণ পৰেই নিৰ্বিচাৰতা এস যাৰে এক সমাধিৰ অনুভব হতে থাকবে। নিবন্তৰ দেখাৰ কাল যতই বাডবে ততই সমাধিৰ পুষ্টি সাধন হবে।

একাগ্ৰতা ও নিৰ্বিচাৰতা লাভেৰ বত প্ৰকাৰ সাধন আছে, যথা—মন্ত্ৰ,জপ, শ্বাস-নিৰোধ, ঐকান্তিক বিচাৰ, অবলম্বন প্ৰভৃতি—তাদেব কোনটাই স্বাভাবিক নহ। কাৰণ প্ৰত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষ বিকল্প বা প্ৰয়ন্তেৰ প্ৰয়োজন হয়। দেখা কিন্তু স্বাভাবিক। তাৰ জন্ম কোন কল্পনা, বিচাৰ বা বিকল্পেৰ সহায়তা নেপাৰ আৱশ্যক হয় না। মনকে নিযোজিত কৰালেই চলে, তাতেই সহজে স্বভাব উদ্ধৃত হয় আৰ লুকায়িত শক্তি প্ৰকট হতে থাকে। স্বভাবেৰ অনুভূত চৈতন্তেৰ সাক্ষাৎকাৰ, শূন্যৰ মध्ये গুপ্তভাবে অবস্থিত সূক্ষ্মেৰ প্ৰতীকিকৰণ, আনন্দ ও শক্তিব অনুভব—এ সব নিবন্তৰ দৰ্শনেৰ দ্বাৰাই পাওযা যেতে পাৰে। স্তুতবাং দেখাৰ অৰ্থ নিবতিশয় গভীৰ ও জটিলতাপূৰ্ণ নহ, এৰ ছবাহ মীমাংসা-সাপেক্ষও নহ।

দৰ্শন (দেখা) সম্বন্ধে যে তিনিটি প্ৰশ্ন উঠেছিল : কি দেখব ? কেন দেখব ? কেমন কৰে দেখব ? সেগুলিৰ সংক্ষিপ্ত আলোচনা কৰা হল। এখন দ্বিতীয় প্ৰসঙ্গ হল, চিন্তন। চিন্তা কৰা, বিচাৰ কৰা, ভাবা। চিন্তনও সত্যকে উপলব্ধি কৰাৰ এক প্ৰকৃষ্ট সাধন। চিন্তন বা বিচাবেৰ সাৰ্থকতা আছে। বিচাৰ তখনই ব্যৰ্থ হয় যখন তা একাটি বিষয়েৰ ওপৰ কেন্দ্ৰিত হয় না। কেউ যদি কেবল বিচাৰই কৰতে থাকে তৰে বিচাৰ অসাৰ্থক হবে। একজন সমবাদাৰ মানুহ ও পাগলেৰ মध्ये প্ৰভেদটা কোথায় ? তাদেব মध्ये সত্যিই খুব বেশি পাৰ্থক্য নেই। যে ব্যক্তি

নিজেৰ ইচ্ছামত নিজেৰ বিচাৰশক্তিৰ ওপৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখতে পাবে সে সমঝদাৰ, আৰু যে তা পাবে না সে পাগল। সমঝদাৰ ব্যক্তি বিচাৰ কৰে, পাগলও বিচাৰ কৰে। এমন মনে কৰবেন না যে, পাগল চিন্তা বা বিচাৰ কৰতে পাবে না। পাগলও চিন্তা কৰে, বিচাৰ কৰে। কিন্তু যে বিচাৰ তাৰ মনে এসে যায়, তাকে আৰু সে ছাড়তে পাবে না। ঐ বিচাৰ যেন তাকে আঁকড়ে ধৰে। ফলে তাৰ মনে সতত ঐ একই বিচাৰ চলে। যাকে বিচাৰ আঁকড়ে ধৰে, যে বিচাৰ ছাড়তে পাবে না, তাকে পাগল বলে। আৰু যে বিচাৰকে ছাড়তে পাবে, তাকে ইচ্ছামত বদলাতে পাবে, সে সমঝদাৰ। ছুজনেৰ মध्ये এই সামান্য পার্থক্য, যেন একটি ক্ষুদ্র বেধা দিয়ে ছুজনেৰ মध्ये ব্যবধান কৰা হয়েছে।

কোন এক বিষয়ে চিন্তা কৰতে কৰতে যখন ইচ্ছা তখন সেই বিষয় ত্যাগ কৰে অল্প এক বিষয়ে চলে যাওয়াৰ ক্ষমতাৰ খুবই উপযোগিতা আছে। আমবা বিচাৰেৰ দ্বাৰা সত্যকে বুঝতে পাৰি, জানতে পাৰি। এই বিচাৰ ধ্যানেৰ দ্বাৰা অনেক মহত্বপূৰ্ণ তথ্যৰ অনুসন্ধান কৰা হয়েছে। এক প্রাচীন পদ্ধতি আছে, যা যোগেৰ প্রায় সব শাখাতেই পাওয়া যায়। আচার্য শিষ্যকে এক সমস্যা দিয়ে বললেন, এব সমাধান খোঁজ কৰ। কোন বহুতে সমাধানেৰ খোঁজ পাওয়া যাবে না, বস্তুতঃ বহু থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না। আচার্য উপদেশ দিলেন, সমস্যাটি নিয়ে বিচাৰ কৰ, চিন্তা কৰ। একদিন, দুদিন, দশদিন—যতদিন না সমাধান পাওয়া যায় ততদিন বিচাৰ কৰতে থাক, চিন্তা কৰতে থাক। এই প্রক্রিয়াৰ দ্বাৰা অনেক দুৰেৰ ব্যাপাবেৰ খোঁজখবৰ পাওয়া গেছে, অতীতেৰ ঘটনাবলীৰ সন্ধান মিলেছে, আৰু ভবিষ্যতে ঘটতে চলেছে এমন ঘটনা জানা গেছে।

এক পাথৰেৰ টুকৰো হাতে এল। অনুসন্ধান কৰলে জানা যাবে এটা কোন উপাদানে গঠিত। তখন হয়ত জানতে হবে, কোন কোন অবস্থাৰ মধ্য দিয়ে এই পাথৰ এতদিন টিকে আছে। পাথৰ নিয়ে বিচাৰ চলল। পৰিশেষে এমন এক অবস্থা এল যখন পাথৰ অব্যক্তৰূপে তাৰ সমস্ত

ইতিহাস জানিয়ে দিল।

কোন এক শব্দের অর্থ আমাকে জানতে হবে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় আসবে যখন শব্দ নিজেই তার অর্থ প্রকাশ করবে।

মহর্ষি চবক আয়ুৰ্বেদের প্রাচীন আচার্য। তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন। সেখানে বিভিন্ন গাছপালাব সামনে বসে বললেন—‘তুমি আমাকে বল তোমার উপযোগিতা কি? কোন বোগেব চিকিৎসায় তুমি কাজে লাগ? তোমার পৰিণামই বা কি হতে পারে। বল, নিজের কথাব নিজের কাহিনী আমাকে শোনাও।’ এই বলে তিনি তন্ময় হয়ে গেলেন, একাগ্রচিন্তে সমস্তাৰ চিন্তা করতে লাগলেন। একাগ্রতা যখন চৰম বিন্দুতে পৌঁছল, তখন গাছপালা তাদের শ্রেষ্ঠ গুণ ধর্ম বর্ণনা করতে লাগল এবং চবক তা জানতে পাবলেন। এ ঘটনা সত্য। গাছ অবশ্য কথা বলে না। কিন্তু ঐ সমস্তাৰ নিষে নিবন্তব চিন্তা কৰাৰ বলে মন এত গভীৰে প্ৰবেশ কৰে যে সূক্ষ্ম পৰ্যায়ৰ সঙ্গৈ তাৰ সাক্ষাৎকাৰ হয়। তখন আপনা থেকেই শ্রেষ্ঠ পৰ্যায়গুলি উদ্ঘাটিত হয়। এই হল বিচাৰেব প্ৰেক্ষিমা, সত্যকে জানাৰ বিশেষ উপযোগী প্ৰেক্ষিমা। এই প্ৰেক্ষিমা দ্বাৰা আজও অনেক বহুস্তেৰ উদ্ঘাটন কৰা যায়। জৈন পৰিভাৰাৰ একে ‘ধৰ্ম্য ধ্যান’ বলা হয়।

তুই প্ৰকাৰ ধ্যানকে শুভ মনে কৰা হয়—এক ধৰ্ম্য ধ্যান, অপৰ গুৰু ধ্যান। গুৰু ধ্যানেৰ অৰ্থ—আত্মাকে দেখা। এই ধ্যানে আত্ম-সাক্ষাৎকাৰ হয়। ধৰ্ম্য ধ্যানেৰ অৰ্থ হল বস্তুৰ স্বভাব। এখানে ধৰ্ম নেই, ধৰ্ম্য আছে। ধৰ্ম-অধৰ্ম শব্দ দুটি এখানে ব্যবহাৰবোগ্য নহ। এই শব্দ দুটি আচাবেব সঙ্গৈ, আচৰণেৰ সঙ্গৈ, সম্বন্ধযুক্ত, ধৰ্ম্য শব্দেৰ সঙ্গৈ এদেব সম্বন্ধ নেই। ধৰ্ম্য শব্দেৰ অৰ্থ বস্তু স্বভাব। বস্তুৰ স্বভাব বিচাৰ দ্বাৰা, অনুসন্ধানেৰ দ্বাৰা, চিন্তন দ্বাৰা জানা—এই হল ধৰ্ম্য ধ্যানেৰ প্ৰেক্ষিমা। এব দ্বাৰা বস্তুৰ গুণ-ধৰ্ম জানা যায়। কোন বস্তুৰ কি গুণ, কি দোষ তা জানা যায়। বস্তুৰ অভ্যন্তৰীণ স্বৰূপ, সূক্ষ্ম স্বৰূপ জানা যায়। এই হল

বিচাৰ ধ্যান বা চিন্তন ধ্যান। এব তাৎপৰ্য হল বিচাৰ প্ৰধান ধ্যান, চিন্তন প্ৰধান ধ্যান। আমি স্বীকাৰ কৰি না যে চিন্তনেৰ দ্বাৰা বা বিচাবেৰ দ্বাৰা ধ্যান হয় না ; বিচাৰ কৰাও ধ্যান, চিন্তা কৰাও ধ্যান। তবে বিচাৰ তখনই ধ্যানে পৰিণত হয় যখন তা এক দিকেই গড়িয়ে প্ৰবাহিত হয়, চাবদিকে ছড়িয়ে পড়ে না বা বিক্ষিপ্ত হয় না। একদিকে যাওয়া জলধাৰায় পৰিণত হয়। এই ধাৰাই চাই। ধ্যানেৰ ধাৰা চলবে। ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত জলেৰ বিন্দুতে জলধাৰা হয় না। সেই বৰষুণ ছড়িয়ে পড়া বিচাৰ দ্বাৰা ধ্যান হয় না। বিচাৰ যখন কেন্দ্ৰিত হয়, এক দিকে প্ৰবাহিত হয়, তখন তা ধ্যান পদবাচ্য হয়।

বিচাৰও ধ্যান, নিৰ্বিচাৰও ধ্যান। উভয় প্ৰকাৰ ধ্যানেৰ নিজ নিজ মহত্ব আছে। একদিকে প্ৰবাহিত বিচাৰই ধ্যান, তাকে বলে বিচাৰ ধ্যান। দৰ্শনেৰ ভূমিতে হয় নিৰ্বিচাৰ ধ্যান। এখানে বিচাৰ হয় না, কেবল দৰ্শনই হয়। একথা মানা যায় না যে নিৰ্বিচাৰ ধ্যানে কিছুই ঘটে না। কিছুই না ঘটাতো মুছৰ্হাব অবস্থা, ধ্যানেৰ অবস্থা নহয়। ধ্যানেৰ কোন না কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা বিষয় থাকে। এক প্ৰশ্ন হতে পাবে যে, যখন আমবা একদিকে চিন্তাকে প্ৰযুক্ত কৰি তখন ধ্যান হয় না। যখন আমবা একভাবে দেখি তখন ধ্যান হয়। উভয় হল, একদিকে চিন্তা কৰা বিচাৰ-ধ্যান, আৰু দেখা নিৰ্বিচাৰ-ধ্যান ; উভয়ই ধ্যান।

প্ৰেক্ষা ধ্যানে দুয়েৰ উপযোগিতা আছে। প্ৰেক্ষাৰ অৰ্থ নিৰ্বিচাৰ ধ্যান, দেখাৰ ধ্যান। প্ৰেক্ষা ধ্যানেৰ প্ৰথম অঙ্গ হল দেখা। এই অবস্থায় আমবা কেবল দেখি, কোন বিচাৰ কৰি না। শৰীৰকে দেখি, কিন্তু বিচাৰ কৰি না। শৰীৰেৰ ভেতৰে যা কিছু ঘটে চলেছে তা লক্ষ্য কৰি। কোথায চঞ্চলতা হচ্ছে ? কোথা থেকে শব্দ আসছে ? কোথায কোন অবয়ব সক্ৰিয় আছে ? এই সবই আমবা দেখি, কেবল দেখি, কোন চিন্তা বা বিচাৰ কৰি না। আমাদেৰ শৰীৰেৰ ভেতৰে সৰ্বদা নানা প্ৰকাৰ ক্ৰিয়া হবে চলেছে, অনেক প্ৰকাৰ শব্দ উদ্ভিত হচ্ছে। আমবা এই সব ক্ৰিয়াৰ কথা জানি না, এই সব শব্দ শুনি না। কাৰণ বাইৰে এত শব্দ নিষত

উঠছে যে ভেতবেব স্মৃঙ্গ শব্দ শোনাব অবসবই আমাদেব হয না । এই সব শব্দ আপনি ধ্যানেব দ্বাবা শুনুন, সতিই শোনা যাবে । আমাদেব হুংপিও ধুক ধুক কবছে, সে শব্দ আপনি শুনতে পাবেন । বস্ত্বেব প্রবাহ নিবন্তব বয়ে যাচ্ছে, তাব শব্দও আপনি শুনতে পাবেন । এজন্য অবশ্য আপনাকে স্মৃঙ্গতাব মধ্যে যেতে হবে । পূৰ্ণ একাগ্ৰতা আনতে হবে । তবেই আপনি ঐ সব স্মৃঙ্গ শব্দ শুনতে পাবেন । প্রেক্ষা ধ্যানেব অৰ্থ কেবল দেখা, চিন্তা কবা বা বিচাব কবা নয ।

প্রেক্ষা ধ্যানেব দ্বিতীয় অঙ্গ—অনুপ্রেক্ষা । অনুপ্রেক্ষাব-অৰ্থ, ধ্যানে আমবা যা কিছু দেখি তাব পৰিণাম সম্বন্ধে বিচাব কবা । ‘অনু’ শব্দটিব অৰ্থ—যা পবে ঘটে । ধ্যানে যা দেখি, প্রেক্ষায় বা দেখি, তাকে পবে প্রেক্ষা কবা, তাব পৰিণাম সম্বন্ধে বিচাব কবা—এই হল অনুপ্রেক্ষা । ‘অনু’—অৰ্থাৎ পবে, ‘প্রেক্ষা’—অৰ্থাৎ বিচাব কবা । আমবা দেখি শবীবেব কোন অংশে স্পন্দন হচ্ছে । পবমাণু আসছে যাচ্ছে, পবমাণুব উপচয হচ্ছে, আবাব অপচযও হচ্ছে । পবমাণুব জন্ম হচ্ছে, বাডছে । আমবা এ সমস্ত দেখি । তাব পবে চিন্তা কবি, এ সবেব পৰিণাম কি হবে ? আমবা অনিত্যকে অনুপ্রেক্ষা কবি, কাৰণ পবমাণুব এই যে স্পন্দন আব যাতাযাত তা নিত্য হতে পাবে না । ঐ সমস্ত যখন অনিত্য উপলব্ধ হয তখন আমবা উপলব্ধি কবি শবীব অনিত্য । শবীব অনিত্য, এ তথ্য জানাব আধাব কি ? জানাব আধাব—প্রেক্ষা । যখন আমবা প্রেক্ষাব দ্বাবা দেখি শবীবে স্পন্দন, কম্পন, গতি, পবমাণুব যাতাযাত, পবমাণুব অপচয আছে, তখন বুঝি এ সবেব অৰ্থ, শবীব অনিত্যধৰ্মা । এই অনিত্যতা অনুভব কবা, বিচাব কবা, চিন্তা কবা—এবই নাম অনুপ্রেক্ষা ।

প্রেক্ষা আব অনুপ্রেক্ষা এক সঙ্গ চলবে । আমবা প্রেক্ষা কবব, অনুপ্রেক্ষাও কবব । প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা কোনটাই নিবন্তব চলতে পাবে না । আমবা কখনও প্রেক্ষা কবব, আবাব কখনও অনুপ্রেক্ষা কবব । প্রথমে প্রেক্ষা, তাবপবে অনুপ্রেক্ষা । প্রথমে দেখা, তাবপবে যা দেখলাম

তাব সম্বন্ধে বিচার কৰা। বিচাৰেৰ ব'লে যা সাব নিৰ্দ্ধৰ পাণ্ডা যাবে
তা জীবনে কাক্কে লাগাতে হবে।

ধ্যানেৰ দুটি দিক—প্ৰেক্ষা ও অনুপ্ৰেক্ষা। আমবা দেখব আৰ চিন্তা
কবব। উভয় প্ৰকাৰে ধ্যানকে অবলম্বন কৰে আমবা সত্যকে অনুভব
কবব, যথার্থকে জ্ঞানব আৰ নিৰপেক্ষভাবে বস্তুকে দেখাব অভ্যাস কবব।
তবেই আমবা প্ৰেক্ষাধ্যানে সকলতা লাভ কবতে পাবব। প্ৰেক্ষাধ্যানেৰ
প্ৰযোজন এই যে, এব দ্বাবা আমবা গভীৰে অবতৰণ কৰে দেখাব ও
সম্যক প্ৰকাৰে চিন্তা কবাব অভ্যাস কবতে পাবি এবং পৰিশেষে সত্যেৰ
সাক্ষাৎ লাভ কৰে কৃতার্থ হতে পাবি।

শরীর সাধনা

প্রথমে ‘পাণ্ডয়ার হাউস’ তৈরি করা হয়, পরে তা থেকে তার টানা হয়। তখন সেই তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় আর বাল্বের মাধ্যমে প্রকট হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বাল্বের সঙ্গে সংযোগ না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রকট হতে পারে না। আমরা কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহের ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিত করি না, বরং যার মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয় তার ওপরও পূর্ণ মনোযোগ আবোপ করি।

আমাদের শরীর হচ্ছে সবকম শক্তির অভিব্যক্তির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। আমরা যদি শক্তির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রিত করি আর সেই শক্তির অভিব্যক্তির মাধ্যমেও ওপর মনোযোগ না দিই, তবে তা হবে সবচেয়ে সাংঘাতিক ভুল। শরীরই মাধ্যম, সুতরাং তাকে উপেক্ষা করা মারাত্মক ভুল।

প্রথমেই আমাদের মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে, যেসব শক্তি প্রকট হবে সেগুলি ধারণ করার সামর্থ্য আমাদের শরীরের আছে কিনা। তার সে ক্ষমতা আছে কিনা। শরীর যদি সশক্ত না হয়, সক্ষম না হয়, তবে কোন শক্তিই তাতে অবতরণ করবে না বা অভিব্যক্ত হতে পারবে না। কারণ দুর্বল শরীরে কোন শক্তির অভিব্যক্তি সম্ভবপর নয়। আমাদের

শরীরে যতগুলি শক্তিকেন্দ্র আছে সেগুলিকে আগে স্পষ্ট কবতে পাবলে তবেই শরীরে বিশেষ কোন শক্তির অবতরণ সম্ভব হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি পবামর্শ দিই যে, আমরা যেন আমাদের শরীরের প্রতি উদাসীন না হই বা ঘৃণার ভাব পোষণ না করি। বরং আমরা যেন শরীরকে ভালবাসতে শিখি। কারণ শরীরই আমাদের সব বকম সফলতার মাধ্যম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমও বটে। সবার আগে আমাদের শরীরকে বুঝতে হবে আর শরীরে যেসব শক্তি কেন্দ্র, যেসব চৈতন্য-কেন্দ্র অবস্থিত আছে সেগুলিকে বুঝতে হবে।

শরীর কি? সাধারণভাবে বলতে গেলে, বস্ত্র, মাংস ও নোংরা জিনিসের পিণ্ডমাত্র। এতে আছে হাড়, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি। এগুলি বড়ই বীভৎস, দেখলেই মন ঘৃণায় ভরে ওঠে। আমাদের সামনে শরীর বীভৎস রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৈবাগ্যেব দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাব বীভৎসতা দেখতে যত্ন কবে থাকি। এই দৃষ্টিকোণ ভুল নয়। এ কথা সত্য যে শরীর যথার্থই বীভৎস, এতে সাব পদার্থ কিছু নেই। যে সাতটি ধাতুতে শরীর গঠিত তাব সব কটিই নষ্ট। শরীর যে বীভৎস, বিকৃত ও খাবাপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তো দেখার এক কোণ মাত্র, অগ্নি অগ্নি কোণ থেকেও দেখতে হবে। কোন বস্তুকে কেবল এক কোণ থেকে দেখলে যথেষ্ট হবে না। যদি আমরা কেবল এক কোণ থেকেই দেখি তবে আমরা একাঙ্গী হয়ে যাব এক আমাদের দৃষ্টিকোণ অসম্যক হবে। আমাদের দৃষ্টিকোণ তখনই সম্যক হয় যখন আমরা একই বস্তুকে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হই। যখন আমরা অনেক কোণ থেকে দেখি তখনই হয় প্রকৃত দর্শন। অগ্নিখায় কেবল দেখাই হয়। সে দেখা খণ্ডিত দৃষ্টি মাত্র, বলে প্রমাদদৃষ্ট।

শরীরকে দেখার অগ্নি দৃষ্টিকোণও আছে। তা এই যে, আমাদের পক্ষে শরীর যতটা সাবভূত ততটা অগ্নি কোন মূর্ত বস্তুই নয়। একমাত্র এই শরীরই পবমান্ন বা চৈতন্য বা শক্তির অভিব্যক্তিকে প্রকট কবতে সক্ষম। সমর্থ শরীর না থাকলে কেউ কেবলজ্ঞানী হতে পারে না।

কেবলজ্ঞান আত্মার শক্তি. আত্মার নিবাবণ অবস্থা। এই অবস্থায় জ্ঞানের সমস্ত আবরণ দূৰ হয়. আৰ পূৰ্ণ চেতনাব উদয় হয়। কিন্তু এই জ্ঞান প্ৰকট হওঁৱাৰ একটা শৰ্ত আছে। যে কোন শৰীৰ কেবলজ্ঞানেৰ অবতৰণ সত্তা কবত পাববে না। একান্ত শৰ্ত এই যে, যে শৰীৰ বহু-বৰঙ-নাৰাচেৰ মত স্কলট সংগঠনযুক্ত একমাত্ৰ সেই শৰীৰই কেবলজ্ঞানেৰ অবতৰণেৰ খাদ্য সত্তা কবত পাববে। এই বসন্ত শৰীৰ-ধাৰী ব্যক্তিই কেবলী হ'ত পাবে. অন্য কেউ নহ। বহু-বৰঙ-নাৰাচ হল দৰাচেৰে শক্তিশালী শৰীৰ সংৰচনা। এককম শৰীৰে অস্থিৰ বাঁধন খুব মজবুত হয়। এককম শৰীৰসম্পন্ন ব্যক্তিই কেবলজ্ঞানী হ'ত পাবে। সাধাৰণ কোন মানুহেৰ পক্ষে তা সম্ভব নহ।

আপনি ভাবত পাবেন, এ কেনন শৰ্ত ? শৰীৰেৰ সাক্ষে কেন এমন শৰ্ত ? কেবলজ্ঞান প্ৰাপ্তিৰ অৰ্থ তো চেতনাব অত্যাশ্ৰয়, বিশুদ্ধ চেতনাব অবতৰণ, চেতনাব পূৰ্ণ বিকাশ। তা আত্ম-নিৰ্গলতা থেকে পাওয়া যায়, সম্পূৰ্ণৰূপে বাগ-জ্ঞানেৰ বিলয় হলে তা মেলে। তবে এয় সাক্ষে শৰীৰ-সংযুত শৰ্ত কেন ? এই প্ৰতিবন্ধ কেন. যে ব্যক্তিৰ শৰীৰ-সংৰচনা বহু-বৰঙ-নাৰাচেৰ মত স্কলট, সে ব্যক্তিই শুধু কেবলী হ'ত পাবে, অন্যে নহ।

এককম তৰ্ক হ'ত পাবে কট, কিন্তু আমি বলি এমন শৰ্ত খুবই মহতপূৰ্ণ।

মনে কবন, একটা ছোট মঞ্চ তৈৰি কৰা চায়েছে। তাৰ ওপৰ মঞ্চ জন বসত পাবে। ঐটুকু মাত্ৰ তাৰ জনতা। এখন যদি পঞ্চাশজন তাৰ ওপৰ বসাব চেষ্টা কৰে, তৰে মঞ্চটি ভেঙে যাবে। কাৰণ পঞ্চাশ জনেৰ ভাৰ বহন কৰাৰ শক্তি তাৰ নহে। পাতলা কাপড়ৰ ওপৰ বেশি ভাৰি জিনিৰ বেলে দিলে কাপড় কেটে যাবে। বহুটা ভাৰ বহন কৰাৰ জনতা যাব আছে সে কেবল তহটা ভাৰই বহন কবত পাবে।

শৰীৰেৰ সংহনন. শৰীৰেৰ সংৰচনা যদি দুৰ্বল হয়. যদি স্নায়ু-সংস্থান, কমজোৰ হয় এক তা সৰেও যদি কেবল্যেৰ মত বিঘাট শক্তি সেই

শৰীৰে অবতৰণ কৰে তৰে সেই শৰীৰ ফেটে যাবে। কৈবল্যৰ কথা দূৰে থাকুক, ছোট কোন শক্তিৰ অবতৰণও সেই শৰীৰ সহ্য কৰতে পাববে না। তা একেবাবেই বিকল হ'ব পাৰে।

মস্তিষ্কে সহস্ৰাব নামে এক চক্ৰ আছে, তা এক প্ৰসিদ্ধ শক্তি-কেন্দ্ৰ। কোন দুৰ্বল ব্যক্তি এই শক্তি-কেন্দ্ৰৰ ওপৰ ধ্যান কৰল। তাৰ ফল কি হল? ধ্যানৰ দ্বাৰা এই চক্ৰ সক্ৰিয় হ'লে উঠল এক সক্ৰিয়তাৰ ফলে উষ্ণতা উৎপন্ন হল, তাপ আৰু শক্তি উৎপন্ন হল। সেই তাপ এত তীব্ৰ হ'ব যে দুৰ্বল শৰীৰ তা সহ্য কৰতে পাবে না, ধাৰণ কৰতে পাবে না। ফলে সেই দুৰ্বল ব্যক্তি পাগল হ'লে যেতে পাৰে।

সাধাৰণত বলা হ'ব পাৰে, সহস্ৰাব চক্ৰৰ ওপৰ ধ্যান কৰ, মনকে সেখানে একাগ্ৰ কৰ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে বাখতে হ'ব যে ঠিক কোন অবস্থায় এই কেন্দ্ৰৰ ওপৰ ধ্যান কৰা উচিত হ'বে। যদি আমবা আগে আজ্ঞাচক্ৰৰ সাধনা সম্পূৰ্ণ না কৰি, আজ্ঞাচক্ৰৰ ওপৰ ধ্যানকে কেন্দ্ৰিত কৰাৰ ক্ষমতা বিকশিত না কৰি, অথচ সোজা সহস্ৰাব চক্ৰৰ ওপৰ ধ্যান কৰাৰ চেষ্টা কৰতে থাকি, তৰে অনৰ্থ ঘটতে পাৰে। সেম্বন্ধে লাভেৰ বদলে লোকসানই হ'তে পাৰে। সহস্ৰাব চক্ৰে ধ্যান কৰাৰ এই যে প্ৰযত্ন, তা সাৰ্থক হ'বে না, কাৰণ সেখানকাৰ তীব্ৰ তাপ সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা আমাদেৰ শৰীৰে গড়ে গুঠেনি। অনেক ধ্যান-সাধক পাগল হ'লে যান। সেটা কিন্তু ধ্যানৰ দোষ নয়, সাধকেৰই দোষ। কাৰণ সাধক জানে না, কখন কোন অবস্থায় কোন স্থানে ধ্যান কৰা উচিত, আগে কোন শক্তিৰ বিকাশ কৰা দৰকাৰ এক পাবেই বা কোন শক্তিৰ কৰা উচিত। যেখানে এই জ্ঞান থাকে না সেখানে উত্তেজনা বাড়ে, উত্তাপ বাড়ে এক ফলে লাভেৰ বদলে লোকসানই হয়।

আমাদেৰ একথা বুঝতে হ'বে যে, শৰীৰেৰ বিভিন্ন শক্তিৰ বিকাশেৰ একটা নিৰ্দিষ্ট ক্ৰম আছে। শৰীৰ সাধনা কৰতে হলে এই শক্তিগুলিৰ ক্ৰমিক বিকাশ কৰতে হ'বে। শৰীৰ সাধনাৰ প্ৰথম ধাপই হল, ঠিকমত বসতে শেখা। এটি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। এই আধাৰেৰ ওপৰেই

আসনেৰ বিকাশ ঘটেছে। বসাব হাজ্জাব হাজ্জাব প্ৰকাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, কেবল দুই-এক প্ৰকাৰ নহ। বসা একটা সামান্য কাজ বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে এত মনোযোগ দেওৱাৰ বাবণ কি ? বসাব এত প্ৰকাৰভেদেৰ সাৰ্থকতা কি ? আসনেৰ বিশেষ বিকাশেৰ প্ৰতি এত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ আবশ্যিকতা কি ?

বসা সামান্য কাজ, মানুহ যেনমভাবে চায় তেনমভাবে বসতে পাৰে। কিন্তু যখন শৰীৰেৰ সাধনা কৰা হয় এবং শৰীৰেৰ মध्ये বিশিষ্ট শক্তিৰ অবতৰণ সম্ভব কৰাৰ জন্তু প্ৰয়ত্ন কৰা হয়, তখন বসাব প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰতেই হ'ব। কিভাবে বসতে হ'ব তা বুঝতে হ'ব।

এমনভাবে সোজা হৈ বস, বাতে মেকদণ্ডেৰ হাড় যেন সোজা অবস্থাতেই থাকে এবং গ্ৰীবদেশও যেন সোজা থাকে। পিছনেৰ সম্পূৰ্ণ অংশ অৰ্থাৎ শুষুমাৰ অগ্ৰভাগ থেকে মুলাধাৰ পৰ্যন্ত সমস্ত অংশই, যেন সোজা থাকে। এভাবে বসাব সাধনা কৰতে হয়। সাধাৰণত মানুহ সোজা হৈ বসে না, হয় সামনেৰ দিকে বুকু বসে, নহ পেছনেৰ দিকে বুকু বসে, আৰাৰ কখন পাশে হেলে বসে। কোন ক্ষেত্ৰেই সে ঠিক সোজা হৈ বসে না। সাধনাৰ দিক থেকে সোজা হৈ বসাব খুবই প্ৰয়োজন আছে। সোজা হৈ বসাব উদ্দেশ্য হল, আমাৰ প্ৰাণধাৰাৰ পথে যেন কোন বাধা বা অববোধ সৃষ্ট না হয়। প্ৰাণধাৰাৰ সৰ্বাধিক প্ৰবাহ চলে পৃষ্ঠবজ্জুহ শুষুমা নাড়িৰ ভেতৰ দিহে। মেকদণ্ডেৰ হাড় অনেকটা ফাঁপা। ওৰ ভেতৰে শুষুমা নালী আছে। ওটা মধ্য নালী, ওৰ ভেতৰ দিহে প্ৰাণেৰ প্ৰবাহ চলে। যদি বাঁকা হৈ বসি, প্ৰাণেৰ প্ৰবাহে বাধা উৎপন্ন হয়। আমি শক্ত হৈ বসলে বা এপাশে-ওপাশে হেলে বসলেও প্ৰাণপ্ৰবাহেৰ বাধা হয়। ঠিক সোজা হৈ বসলে এই বাধা উৎপন্ন হয় না। সেজন্য বলা হয় যে, সোজা হৈ বস। মেকদণ্ডেৰ হাডেৰ বা শুষুমা নালীৰ গুৰুত্ব কেবল সাধনাৰ দৃষ্টিতেই নহ, স্বাস্থ্যেৰ দৃষ্টিতেও এদেৰ বিশেষ মূল্য আছে। আয়ুৰ্বেদেৰ আচাৰ্যবা লিখে গিবেছেন, ভোজন কৰতে সোজা হৈ বস, বেকে বস না। কথা বলাৰ সময়ে বাঁকা

হয়ে বস না, হাঁচবাব সময় বাঁকা হবে না। শৰীবেব যে কাজই কব, লক্ষ্য বেখ, মেকদণ্ডে বেন সোজা থাকে, যেন না বাঁকে।

সুঘুন্নাৰ সুস্থতাই আমাদেব স্বাস্থ্যেব মূল আধাৰ। মেকদণ্ডেব হাড যদি সুস্থ থাকে ও সঠিক অবস্থায় থাকে, তবে আমাদেব সম্পূৰ্ণ সুস্থ থাকাব বিষয়ে কোন গোলযোগ হবে না। আব তা যদি সুস্থ না থাকে, তবে তাৰ প্ৰভাৱ সমস্ত শৰীবেব ওপৰই বৰ্তাবে। এখন চিকিৎসাজগতে এই তথ্য স্বীকৃত হযেছে যে, মেকদণ্ডেব হাডেব বিকৃতিব কাৰণেই ব্যাধিব উৎপত্তি হয়। এজন্য কোন ব্যাধিবই আলাদাভাবে চিকিৎসা কবাব দৰকাৰ হয় না, কেবল মেকদণ্ডেব হাডেব চিকিৎসা কবলেই সেই ব্যাধিব উপশম হয়। এটা চিকিৎসাৰ এক পদ্ধতি।

আমাব হাঁটুতে ব্যথা হওযায় একজন চিকিৎসক দেখাই। তিনি ‘আকুপাচাৰ’ পদ্ধতিতে চিকিৎসা আৰম্ভ কবেন। তিনি বললেন— ‘মেকদণ্ডেব হাডে কিছু গোলযোগ ঘটেছে, তাই হাঁটুতে ব্যথা হযেছে।’ এ কেমন সন্দেহ। ব্যথা হযেছে হাঁটুতে, আব সন্দেহ মেকদণ্ডেব হাডেব সন্দেহ। পেটেব ব্যথা, মাথাৰ ব্যথা, কোমবেব ব্যথা, শৰীবেব যে কোন স্থানেব ব্যথা, সব কিছুবই কাৰণ মেকদণ্ডেব হাডেব কোন না কোন গোলযোগ। তাৰ চিকিৎসা কবলেই ব্যথা সেবে যাবে, শৰীৰ নিৰামল্য হবে। মেকদণ্ডেব হাড আমাদেব শৰীবেব ও স্বাস্থ্যেব মূল কেন্দ্ৰ। সাধনাৰ দৃষ্টিতেও তা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। যে সাধক সুঘুন্নাৰে ঠিকমত বুৰতে সমৰ্থ হযেছেন তিনি সাধনাৰ শীৰ্ষবিন্দুতে আবোহণ কবাব যোগ্যতা লাভ কৰেছেন। আব যিনি সুঘুন্নাৰে ঠিকমত বুৰতে পাবেননি তিনি সাধনা কৰতে চেষ্টা কবলেও তাঁৰ সে চেষ্টা সফল হবে না।

আমাদেব শৰীৰে অনেক চৈতন্য-কেন্দ্ৰ আছে, যেখানে চৈতন্য বিকশিত হয়, প্ৰকট হয়। এই কেন্দ্ৰগুলিব মাধ্যমেই বিশেষ বিশেষ শক্তিৰ অবতৰণ হয়। এই সব কেন্দ্ৰেব সাধনা কৰতে হবে। বিকশিত কৰতে হবে। যতদিন আমবা সেগুলিকে বিকশিত কৰতে না পাবি ততদিন প্ৰকৃতপক্ষে তাদেব কোন উপযোগিতা হবে না। এই

প্ৰসঙ্গে এক গল্প বলছি, যাতে আলোচ্য তথ্য স্পষ্ট হ'ব ফুটে উঠবে।

এক ভাই তাব বোনেৰ বাডি গিয়েছে। আহাবেৰ সময় হ'য়েছে। না জানি বোনেৰ মনে কোন ভাবেৰ উদয় হল—সে এক খালা গম এনে ভাইয়েৰ সামনে বেখে দিল। ভাই তো আব প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা কৰাছিল না যে কাঁচা গমই খাবে। বোনেৰ দেওয়া গমেৰ খালা দেখে ভাই বলল—‘বোন। এ কি ? এ কি কৰে খাওয়া বায ?’ বোন বলল—‘কেন,আমি তো মূল বস্তুই খেতে দিবেছি। সব খাজাই তো গম থেকে তৈবি হয়, তাই ওটাই মূল খাজ। আমি ভাবলাম, ভাই আমাব ঘেবে এসেছে, তাকে মূল বস্তুই খাওয়াব।’ ভাই সে কথা শুনল, তাবপৰ না খেৰে উঠে পড়ল। বেচাবা খাবেই বা কি ?

এবপৰ কয়েক মাস গেল। ভাইয়েৰ কাছে বোনেৰ মেয়েৰ বিয়েৰ সংবাদ এল। বোনেৰ বাডিতে ভাই এক পুটলি পাঠাল। ভাইয়েৰ বাডি থেকে কিছু এসেছে দেখে বোন খুশি হল। কিন্তু সে পুটলি খুলে দেখল তাব ভিতৰে তুলা—কেবল তুলা—আছে। বোন এব অৰ্থ কিছুই বুঝতে পাবল না। সে আশা কৰেছিল খুব ভাল কাপড় এসেছে। অথচ এসেছে কেবল তুলা। কিছুদিন পৰে ভাই বোনেৰ বাডি এল। বোন জিজ্ঞাসা কৰল—‘এ কেমন তাগাসা ? বিয়েতে তুলাৰ কি দৰকাৰ ? পাঠাবে কাপড়-চোপড়, আব পাঠালে শুধু তুলা। এ কেমন কাজ ?’ ভাই বলল—‘বোন। আমি তো মূল জিনিসই পাঠিবেছি। সব বকম কাপড় তো এই তুলা থেকেই তৈবি হয়। আমি ভাবলাম, কাপড়চোপড় কি পাঠাব। বোনেৰ বাডিতে বিয়ে হ'ছে, সেখানে কাপড়ৰ মূল বস্তুই পাঠাই। তাই তুলা পাঠলাম। সব বকম কাপড়ৰ মূলই হল তুলা।’

সব আহাৰ্য বস্তুই গম থেকে প্ৰস্তুত হয় আব সব কাপড়ই তুলা থেকে তৈবি হয়। একথা ঠিকই ব'টে, কিন্তু এব দ্বাৰা পুৰো বিষয় বলা হয় না, তাব একদিক মাত্ৰ বলা হয়। আমিও স্বীকাৰ কৰি যে, গম থেকেই সব ভোগ্য দ্ৰব্য তৈবি হয় আব তুলা থেকেই সব কাপড় তৈবি হয়। কিন্তু কেবল গম দিবে পেট ভৰে না আর কেবল তুলা দিবে লজ্জা

নিৰাবণ হয় না বা শৈত্য ও আতপ থেকে বন্ধা পাওয়া যায় না। গম দিয়ে খাও বানাতে হয়, তবেই ক্ষুধিবৃত্তি হয়। তুলা দিয়ে কাপড় বুনতে হয়, তবেই লজ্জা নিৰাবণ কৰা সম্ভৱ হয়, আৰু শৈত্য ও আতপ থেকে বন্ধা পাওয়া সম্ভৱ হয়। পেট কেবল তখনই ভৰবে যখন গম থেকে কটি বানিয়ে খাওয়া হবে। শৈত্য ও আতপ থেকে কেবল তখনই ত্ৰাণ পাওয়া সম্ভৱ হবে যখন তুলা থেকে কাপড় বুনো নেওয়া হবে।

শৰীৰ মূল বস্তু, শৰীৰ কাঁচা মাল। এব থেকে আমবা যা চাই তাই বানাতে পাৰি, প্ৰাপ্ত হতে পাৰি। এই শৰীৰেৰ মध्ये আমাদেব সৰল প্ৰকাৰ শক্তিৰ কেন্দ্ৰ, চৈতন্যেৰ কেন্দ্ৰ বিদ্যমান আছে। সেখান থেকে আমবা বৰ্তমানকে দেখতে পাৰি, অতীতকে দেখতে পাৰি এবং ভৱিষ্যতকেও দেখতে পাৰি। শক্তিবিশেষেৰ অবতৰণ হলে আমবা নিজেৰ হাড়কে বজ্জেৰ মত কঠিন কৰে গড়তে পাৰি, নিজেৰ বুকেৰ ওপৰ মোটৰগাড়ি বা হাতিকে তুলে নিতে পাৰি।

এমন অনেক লোক আছে বাবা এই প্ৰকাৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে। তাবা বুকেৰ ওপৰ দিয়ে ট্ৰাক চালিয়ে নিৰে যোতে দেখ। অথচ তাদেৰ হাড় ভাঙ্গে না, শৰীৰেৰ সামান্য ক্ষতিও হয় না। এ কি কৰে সম্ভৱ হয়? সম্ভৱ হয় এই কাৰণে যে, তাবা প্ৰাণকে সাধনাৰ দ্বাৰা শক্তিশালী কৰেছে। তাই তাদেৰ শৰীৰেৰ কিছুই বিকল হয় না। এটাই নিয়ম। কিন্তু কাঁচা মাল দিয়ে, কেবল শৰীৰ দিয়ে, এমন কিছু কৰা সম্ভৱ নহয়। কাঁচা গম দিয়ে পেট ভৰে না, কেবল তুলা দিয়ে শৈত্য ও আতপেৰ প্ৰতিবোধ হয় না। পেট ভৰানোৰ জন্তু, দেহ আচ্ছাদনেৰ জন্তু, অজ্ঞ অনেক প্ৰস্তুতিৰ আবশ্যকতা থাকে। এ কথা শৰীৰ সম্বন্ধেও প্ৰযোজ্য। শৰীৰেৰ সাধনা কৰাৰ আবশ্যকতা আছে। তাৰ শক্তি ও চৈতন্যকেন্দ্ৰ-গুলিকে বিকশিত কৰে নেওয়াৰ আবশ্যকতা আছে। পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰ আবশ্যকতা আছে। তাই সাধনাৰ দৃষ্টিতে শৰীৰেৰ সাধনা অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়।

শৰীৰেৰ সাধনা কৰতে হবে। শৰীৰেৰ প্ৰত্যেক অৱয়বেৰ শক্তি

আব চৈতন্ত্বেৰ অবতৰণ ঘটানোব, অভিযুক্ত কৰানোব যে যে ক্ষমতা আছে, সেই সব ক্ষমতা কেন্দ্ৰকে আমবা এমন সমৰ্থ কৰে গড়ে তুলব যে প্ৰবল শক্তিৰ অবতৰণ, বিশাল চৈতন্ত্বেৰ অভিযুক্তি সম্ভব হ'ব, আব আমবা তাৰ উপযোগ কৰতে সক্ষম হ'ব।

শৰীৰ সাধনাৰ এক উপায় হল—আসন। আপনাবা শুনে থাকবেন ভগবান মহাবীৰ বোল দিন বোল বাত একভাবে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেন। সোজা দাঁড়িয়ে থাকাও এক প্ৰকাৰ আসন। মহাবীৰ যদি কখন 'উকড়ু' আসনে বসতেন তো সাবাবাত সেই আসনে বসে থাকতেন। এই আসনে পায়ৰ পাতা মাটিৰ ওপৰ থাকে, কিন্তু গোড়ালি থাকে কিছুটা উচু। তিনি পায়ৰ পাতাৰ ওপৰ ভৰ বেখে সাবা বাত সাবা দিন বসে থাকতেন। জৈন, বৌদ্ধ আব বৈদিক পৰম্পৰাৰ হাজাৰ হাজাৰ সাধু ও সন্ন্যাসী হয়েছেন। তাঁবা শৰীৰেৰ সাধনাৰ জগু বিভিন্ন প্ৰকাৰ আসনেৰ সাহায্য নিয়েছেন। কোন সাধক এত দীৰ্ঘ সময় একই আসনে বসে থাকেন—একথা অস্বাভাবিক ও প্ৰকৃতিবিকদ্ধ বলে মনে হতে পাৰে। এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পাৰে বটে, কিন্তু আসলে এটা তা নয়। আপনাকে কেউ যদি বলে, সাবা বাত না শুবে 'উকড়ু' আসনে বসে বাত কাটান, তাহলে আপনি নিশ্চয় ভাববেন—এ কি ? এ তো অস্বাভাবিক কথা। কিন্তু ধীবা শৰীৰেৰ সাধনা কৰেছেন তাঁদেৰ কাছে এ সব প্ৰকৃতিবিকদ্ধ নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

কাষোৎসৰ্গ কৰা অস্বাভাবিক ব্যাপাৰ বলে মনে হতে পাৰে। তৰ্ক উঠতে পাৰে যে, শৰীৰকে নড়াচড়া কৰতে না দিয়ে কি কৰে একভাবে বসে থকা যেতে পাৰে ? এ অসম্ভব। আপনাবা জানতে পাবেন যে, ভগবান ঋষভেৰ পুত্ৰ বাহুবলী বাব মাস ধৰে কাষোৎসৰ্গেৰ মুদ্ৰাৰ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইভাবে পুৰো এক বছৰ গত হয়েছিল। তাঁৰ চাবপাশে ঘাস গজিয়ে গিয়েছিল। লতাপাতা তাঁৰ শৰীৰকে ঘিৰে ফেলেছিল। পাখিবা তাঁৰ শৰীৰেৰ ওপৰ বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্থিৰ ও অচঞ্চল ভাবে সোজা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ কি সম্ভব যে কোন ব্যক্তি এক বছৰ

থবে, পুৰো বাব মাস থবে, সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে সমৰ্থ হয়েছিলেন ? কোন বকম নড়াচড়া কৰেন নি ? অসম্ভবই মনে হয় । সবাই এ বকম কবতে পাৰে না । কিন্তু যে ব্যক্তি আপন শক্তিকে জাগ্ৰত কৰাব জন্তু, আপন শক্তিকে কেন্দ্ৰগুণিকৈ বিকশিত ও প্ৰকট কৰাব জন্তু, শৰীৰেৰ সাধনা কৰেছেন সে ব্যক্তি ঐকপ কবতে পাবেন । এমন অবস্থা যে হতে পাৰে তা অস্বীকাৰ কৰা যায় না । তবে আমি স্বীকাৰ কৰি যে, এই অবস্থাকে সম্ভব কৰে তুলতে যে প্ৰযত্নেৰ দৰকাৰ তা আমবা কবত সমৰ্থ হই নি ।

প্ৰথম কথাই হল, আসনেৰ অভ্যাস কৰা । আসন বলতে দাঁড়িয়ে থাকা, শোয়া, বসা—সবই বোঝায় । শৰীৰেৰ সাধনাৰ জন্তু আসনেৰ সাধন খুবই আবশ্যক । আসনেৰ সাধনাৰ অৰ্থ হল, সুপ্ত শক্তি কেন্দ্ৰগুণিকৈ জাগ্ৰত কৰা, সক্ৰিয় কৰা ও গতিশীল কৰা । আসন শৰীৰসাধনাৰ একমাত্ৰ অঙ্গ নহ, আৰ এক অঙ্গ হল—শ্বাস ।

শ্বাস শৰীৰ থেকৈ আলাদা কিছু নহ, শৰীৰেৰই এক ভাগ । শ্বাসেৰ সাধনাৰ অৰ্থ, শৰীৰেৰ সাধনা আৰ শৰীৰেৰ সাধনাৰ অৰ্থই শ্বাসেৰ সাধনা ।

দ্বিতীয় প্ৰশ্ন এই যে, শ্বাস কি ভাবে গ্ৰহণ কৰব ? হাজাৰ বকমেৰ আসন যেমন উদ্ভাবিত হয়েছে, তেমনই শক্তি জাগৰণেৰ দিকে লক্ষ্য বেখে শ্বাস নেওযাৰ হাজাৰ প্ৰকাৰেৰ পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে । আজ আমি সব বকম পদ্ধতি প্ৰয়োগেৰ কথা বলব না, তাৰেৰ সামান্য কয়টিৰ প্ৰয়োগেৰ কথা বলব ।

প্ৰেক্ষা ধানে আমবা দীৰ্ঘশ্বাস, সমবৃদ্ধি শ্বাস ও সহজ শ্বাস—এই তিনি বকম পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰে থাকি । অবশ্য এই তিনি প্ৰকাৰই সব নহ । শ্বাসেৰ প্ৰয়োগ অনেক আসনেৰ সঙ্গতই বিকশিত হয়েছে । কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা শ্বাসকে কল্প কৰে বসে থাকতে পাৰে । কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা থবে ভক্তিকা প্ৰাণায়াম কৰতে পাৰে । দ্ৰুত শ্বাস নিয়ে শৰীৰকে প্ৰকম্পিত কৰতে পাৰে । আবার কোন ব্যক্তি সূক্ষ্ম শ্বাস দ্বাৰা শৰীৰকে নিম্পন্দ কৰে রাখতে পাৰে । এ সবই উৎকৃষ্ট প্ৰক্ৰিয়া । তবে

এগুলিৰ দ্বাৰা যে বিকাশ হয় তা আংশিক বিকাশ নহ। এই বিকাশেৰে
 চন্দ্ৰ প্ৰবৃত্ত কৰাব পেছনে এই দৃষ্টি থাকে যে, এৰ দ্বাৰা শক্তিকেন্দ্ৰগুলিকে
 মজবুত ও দৃঢ় কৰে গড়া বাবে। কোন লৌহকাৰ বা স্বৰ্ণকাৰ হাপবেৰ
 সামনে লোহা বা সোনা বেখে তাকে আগুনে তাপ দেব। তাৰা এ কাজ
 বৃথা কৰে না। তাৰেৰ উদ্দেশ্য, তাৰা তাপদিয়ে লোহা বা সোনাকে এমন
 নবম অৱস্থায় আনবে যে তাৰা তাৰেৰ ইচ্ছানত আকাৰ ঐ লোহা বা
 সোনাকে দিতে পাবৰে। সোনাকে এই উদ্দেশ্যে গালিয়ে ফেলা হয় যে,
 যে আকাৰে ইচ্ছা সেই আকাৰে তা গড়ে নেওৰা বাবে। তেমনই
 প্ৰাণায়াম হল, স্বাসেৰ উদ্ভাপে শক্তিকেন্দ্ৰগুলিকে টোলে দেওৰাব এক
 প্ৰক্ৰিয়া। এমন বহু প্ৰক্ৰিয়া আছে বাতে আনবা শক্তিকেন্দ্ৰগুলিকে
 এত উত্তমৰূপে বিকশিত কৰতে পাৰি যে তাৰেৰ মধ্যে অতি উচ্চস্তৰেৰ
 শক্তিৰ অবতৰণ বটা সম্ভব হতে পাৰে। আনাদেৰ সমস্ত স্নায়ু-সংস্থান,
 নাড়ী-সংস্থান প্ৰভৃতি, বা শক্তিকে ধাৰণেৰ স্বেচ্ছা কাজ কৰে, তা সবই
 এই প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বিকশিত ও শক্তিশালী হয়।

তৃতীয় প্ৰশ্ন হল, শবীৰন্ত চক্ৰগুলিৰ বিকাশ। এই চক্ৰগুলি হল
 জ্ঞানকেন্দ্ৰ, শক্তিকেন্দ্ৰ। শবীৰ বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় এণ্ডি, যোগেৰ
 ভাষায় তাকে বলা হয় চক্ৰ।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, আনাদেৰ মস্তিষ্কেৰ পশ্চাৎ অংশে দুটি
 এণ্ডি আছে। এৰা খুবই ছোট এক পৰম্পৰেৰ সঙ্গ জড়িত। এই
 দুটি এণ্ডিৰ মধ্যে বিশেষ একটিকে বিকশিত কৰাব বল হবে এই যে,
 সেটি বিকশিত হওৰাব সঙ্গ সঙ্গ আপনাৰ মন আনন্দ ভবে যাবে।
 আপনাৰ সংবেদন নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু ঘটুক না কেন, আপনাৰ
 মনে কোন সংবেদন হবে না, কোন পীড়া বা ব্যথা হবে না। এক
 অখণ্ড আনন্দ নিবন্তৰ বৰ্তমান থাকবে।

কিন্তু এই এণ্ডিৰ সঙ্গ জড়িত অপৰ এণ্ডিটি যদি জাগ্ৰত হবে যাব,
 বিকশিত হয়ে যাব, তবে আপনাৰ মন সৰ্বদা দুখে ভবা থাকবে, আব
 সে দুখেৰ শেষে কখনও হবে না। ভাল-মন্দ বাই ঘটুক, দুখে নিবন্তৰ

বর্তমান থাকবে। দুঃখের পাব আপনি পাবেন না।

দুটি গ্রন্থি জড়িত হয়েই আছে, অথচ তাদের একটি আনন্দের, অন্নাটি দুঃখের। একটি বিকশিত হলে আনন্দের সাগরে হিলোল ওঠে, অন্নাটি বিকশিত হলে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। গ্রন্থিদুটি এমনভাবে জড়িত যে তাদের বিশেষ একটিকে জাগ্রত করার প্রক্রিয়ায় বিপদ এই যে, আনন্দের গ্রন্থিকে জাগ্রত করতে গিয়ে সামান্য ভুলের ফলে দুঃখের গ্রন্থি জাগরণ ঘটলে সাধক দুঃখের কূপে নিপতিত হবেন। আনন্দের গ্রন্থিকে জাগাতে গিয়ে দুঃখের গ্রন্থিকে জাগিয়ে তোলা যে কত বড় বিপদ, তা বলনা কবাও কঠিন।

সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, শক্তি—এ সবই কেবল আমাদের গ্রন্থি, জ্ঞানতত্ত্ব আর শরীর তত্ত্বসমূহের আধারেই প্রকট হতে পারে। এগুলি সাবা শরীরে বিস্তৃত। এমন অবস্থায় আমবা কি কবে শরীরকে উপেক্ষা করতে পারি? শরীরকে তৈরি না কবে আমবা কেবল ভাবনার বলে আগে এগোতে পারব না। এটা খুবই আবশ্যক যে, আমবা যেমন ভাবনাকে শুদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করি, তেমনই যেন শরীরের শক্তিকে বিকশিত করার জন্য প্রয়াস করি। শরীরে যে সব সূপ্ত জ্ঞানতত্ত্ব আছে, জ্ঞানতত্ত্ব গুলি আছে—সেগুলিকে বিকশিত ও প্রস্তুতিত করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। যতদিন সেগুলি প্রস্তুতিত না হবে ও তাদের বিশিষ্ট শক্তিকে ধারণ করার ক্ষমতা বিকশিত না হবে, ততদিন বিশিষ্ট শক্তি ও আনন্দের অবতরণের জন্য চেষ্টা করলেও তা সফল হবে না। শরীর বিজ্ঞান বলে যে, আমাদের গ্রন্থিগুলির স্রাব ও হর্মোন উপযুক্ত মাত্রায় নির্গত না হলে কোন বিশেষ প্রক্রিয়াই কার্যকর হয় না। স্বাস্থ্যের দিকে থেকেও ওই এক কথা, যতক্ষণ কোন বিশেষ হর্মোনের অভাব থাকবে ততক্ষণ শরীর ঠিক চলাবে না।

‘খাইবযেড’ একটি গ্রন্থি। যদি এ গ্রন্থির স্রাব ঠিক না হয়, উপযুক্ত মাত্রায় না হয়, তবে আপনার মন হতাশায় ভবে যাবে, আর হীন ভাবনা আপনার মনে উদ্ভব হবে। এমন ক্ষেত্রে শরীর যদি শিশুর হয়

তবে তাব বিকাশ বন্ধ হযে যাবে, শৰীৰেব বাড ও হ্ৰাস প্ৰভৃতিব মত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাপাব এই গ্ৰন্থিব শ্ৰাবেব ওপব নিৰ্ভৰ কৰে। কেউ খিটখিটে স্বভাবেব হয, কাবও স্বভাব হয প্ৰসন্ন। এটা আপনি কেবল ব্যক্তিগত কৰ্মকল বলে মনে কৰবেন না। কৰ্মেব কল হতে পাবে বটে, কিন্তু কৰ্মেব ফল কোন মাধ্যমে প্ৰকট হৰে, সে সম্বন্ধেও আপনাকে চিন্তা কৰতে হৰে। আমাদেব সবচেযে বড় ভুল এই যে, আমবা মেনে নিযেছি প্ৰত্যেক কাৰ্য ক্ৰিয়া বা কৰ্মেব আধাবেব ওপবই ঘটে বা ভাবনাব আধাবেব ওপবই ঘটে। অথবা অন্য কোন নিমিত্ত আমবা মেনে নিযেছি। কিন্তু একথা আমবা ভুলে গিযেছি যে, এব পেছনে শৰীৰেবও হাত আছে, বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগ আছে। আমবা তো শৰীৰকে উপেক্ষা কৰে বসে আছি। আব শৰীৰকে উপেক্ষা কৰাই আমবা বৈবাগ্য বলে মনে কৰেছি। একেই আমবা শৰীৰেব প্ৰতি বিবক্তি বলে বুঝেছি। আমবা মনে কৰেছি, শৰীৰে এমন কি পদাৰ্থ আছে যে তাব প্ৰতি আমবা মনো-যোগ দেব। শৰীৰেব প্ৰতি মনোযোগ দেওবাব কোন আবশ্যকতাই নেই।

এই দৃষ্টিকোণ সম্পূৰ্ণ ভুল। আমাদেব চিন্তা-ভাবনাব সাথে, আমাদেব প্ৰসন্নতাৰ সাথে, আমাদেব শক্তিৰ বিকাশেব সাথে শৰীৰেব নিবিড সম্বন্ধ আছে, এ কথা কখনও ভুললে চলবে না। আমবা এখন যদি সাধনাব চৰ্চা কৰতে ও বিশেষ প্ৰকাৰ শক্তিকে নিজেব মধ্যে অভিযাক্ত কৰতে চাই, তবে সবাব আগে মনোযোগ দিযে এই কথা ভাবতে হৰে আমবা কতটা শৰীৰেব সাধনা কৰেছি, শৰীৰকে আমবা কতদূৰ উপযুক্ত কৰে নিযেছি। কোন চিত্ৰকবই উপযুক্ত ভিত্তি ছাড়া চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰতে পাবে না। সুন্দৰ চিত্ৰ অঙ্কিত হৰে অথচ ভিত্তিতে আছে গোমৰেব লেপ, সেক্ষেত্ৰে সুন্দৰ চিত্ৰ অঙ্কিত হৰে কি কৰে ? সুন্দৰ চিত্ৰেব জন্য উপযুক্ত উপকৰণ ও উপযুক্ত অবস্থা চাই। এগুলি যদি মেলে তবেই সুন্দৰ চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা সম্ভব হয।

অনুকপ ভাবে বলতে হয, আমবা যেন মূল বস্তুকে না ভুলি। শৰীৰেব সাধনা কৰতে হৰে, তাব বিশিষ্ট কেন্দ্ৰগুলিকে জানতে হৰে,

বিকশিত কৰতে হবে এবং সেগুলিকে শক্তিশালী কৰতে হবে। এ সবই অত্যন্ত জৰুৰী কাজ।

মনোবিজ্ঞানে একটি শব্দ প্ৰচলিত আছে—মনোদৈহিক। এব অৰ্থ, শৰীৰও মনোব সঙ্গੇ সম্বন্ধযুক্ত। আমবা শৰীৰ ও মনকে সব বকমে গৃথক কৰতে পাৰি না। কাৰণ বাস্তবিকপক্ষে মন শৰীৰেব এক অংশ। শৰীৰেব সমস্ত ক্ৰিয়া মস্তিষ্কেব দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয়, আৰাব মস্তিষ্ক শৰীৰেবই এক অংশ।

শৰীৰেব তিনিটি প্ৰধান ভাগ—মস্তিষ্ক, হৃদ ও পা। মস্তিষ্ক শৰীৰেব মুখ্য ভাগ। মন শৰীৰেব এক ভাগ, বচন শৰীৰেব এক ভাগ আৰ স্বাসও শৰীৰেব এক ভাগ। এ সমস্তই শৰীৰেব মাধ্যমে প্ৰবৰ্ত্ত হয়। সিদ্ধান্তেব ভাষাব এমন বলা যায় যে, মনোব জন্তু অণু গ্ৰহণ শৰীৰই কৰে, বচনেব জন্তু অণু গ্ৰহণ শৰীৰই কৰে এবং স্বাসেব জন্তু অণু গ্ৰহণও শৰীৰই কৰে। ওদেব জন্তু যে কাঁচামাল দৰকাৰ হয় তা সবই শৰীৰ যোগান দেয়। বাকি সব কিছু পৰে তৈৰি হয়।

মন কাকে বলা হয়? মনোব গঠনযোগ্য যে সব অণু শৰীৰ গ্ৰহণ কৰে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্ৰিয়াব নামই মন।

বচন কাকে বলা হয়? বচনেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শৰীৰ গ্ৰহণ কৰে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্ৰিয়াব নামই বচন।

স্বাস কাকে বলা হয়? স্বাসেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শৰীৰ গ্ৰহণ কৰে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্ৰিয়াব নামই স্বাস।

এই ভাবে দেখা যায়, শৰীৰই সৰ্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্ৰ। শৰীৰ সম্বন্ধে দুটি বিষয়েব প্ৰতি আমাদেব মনোযোগ দিতে হবে। প্ৰথমটি হল, শক্তিব বৃদ্ধি ব্যয় আমাদেব বন্ধ কৰতে হবে। দ্বিতীয়টি হল, আমাদেব প্ৰাণশক্তি সঞ্চয় কৰতে হবে।

আমবা জেনে অথবা না জেনে বহু শক্তি ব্যয় কৰে বসি। শক্তিব ব্যয় শৰীৰ কৰে, মস্তিষ্ক কৰে, স্বেচালিত নাড়ী-সংস্থানও কৰে। এই তিনিটিব দ্বাৰাই শক্তি ব্যয়িত হয়।

সাধনাব ক্ষেত্রে কাযোৎসর্গেব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান আছে। কাযোৎসর্গ কৰাব বিধান বাব বাব দেওয়া হযেছে। কিন্তু কেন? এব একমাত্র উদ্দেশ্য হল, শক্তিব যে অযথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ কৰা। বলা হযেছে, মৌন অবলম্বন কৰ। কেন? এই জ্ঞান যে, কথা বলাব দ্বাৰা যে শক্তি খৰচ হয় তা বাঁচান যায়। বলা হযেছে, মনকে কেন্দ্ৰিত কৰ, চঞ্চলতা স্তব্ধ কৰ। কেন? এই জ্ঞান যে, মস্তিষ্কেব যে শক্তি অনর্থক খৰচ হয় তা বাঁচান যায়।

এ সবই উৎকৃষ্ট ক্ৰিয়া। কাৰণ এদেব দ্বাৰা শৰীৰেব শক্তিকে বন্ধা কৰা যায় এবং শক্তিব বৃথা অপচয় বন্ধ কৰে তা প্ৰকৃত উদ্দেশ্যে ব্যয় কৰা যায়। যে শক্তিব বৃথা ব্যয় হচ্ছে তা বন্ধ কৰে শক্তিব ভাণ্ডাৰ সুবক্ষিত রাখা যায়, আৰ বিশিষ্ট চেতনাব অবতৰণেব জ্ঞান শক্তিব উপযোগ কৰা যায়।

দ্বিতীয়া কথা হল, শক্তিব সঞ্চয়—প্ৰাণশক্তিব সঞ্চয়। প্ৰাণধাৰা আমাদেব শক্তিব সবচেয়ে বড় স্ৰোত। প্ৰাণধাৰাব দ্বাৰাই শক্তিব প্ৰাপ্তি হয়। আমাদেব শক্তিব কেন্দ্ৰ হল মূলাধাৰ চক্ৰ, আৰ সেখানে অবস্থিত ব্ৰহ্মপ্ৰস্থি। সেখানে প্ৰাণ উৎপন্ন হয়। মূলাধাৰেব তাপেই প্ৰাণেব উৎপত্তি। নাভিচক্ৰে থেকে স্বাৰিষ্ঠান চক্ৰেব নিচ পৰ্যন্ত দেহেব যে ভাগ, সেখানকাৰ তাপে প্ৰাণতত্ত্ব প্ৰকাশিত হয়। এই প্ৰাণই আমাদেব জীবনী-শক্তি আৰ প্ৰাণশক্তি। তা আমাদেব জীবনকে সঞ্চালিত কৰে। এই শক্তিকে উৎপন্ন কৰা যায়।

এক প্ৰয়োগেব কথা আমি আপনাদেব বলছি। আমি নিজে অনেকবাব এই প্ৰয়োগ কৰে দেখেছি। চলতে চলতে যখন শ্ৰান্ত হযে পড়েছি এবং বোধ কৰেছি সমস্ত শৰীৰ যেন শিথিল হযে গিয়েছে, পা যেন আৰ চলছে না, তখন এই প্ৰয়োগ কৰেছি এবং কিছুক্ষণেব মধ্যেই তাৰ ফল পেৰেছি। মনে হযেছে শৰীৰে নতুন বল এসেছে, আৰ সব শ্ৰান্তি মিটে গিয়েছে। বসে থাকতে থাকতে যখন শিথিলতা অনুভব কৰেছি তখন দশ-বিশ বাব এই প্ৰয়োগেব পুনৰাবৃত্তি কৰেছি, আৰ

তৎক্ষণাৎ শিথিলতা মিটে গিয়েছে, সজীবতাব অনুভূতি এসেছে। এটা প্রাণশক্তিকে উৎপন্ন কৰাৰ প্ৰায়োগ। এই প্ৰায়োগ হল—মূলবন্ধ মুদ্ৰা। আপনি আপনাৰ গুহ্যদেশকে সঞ্চুচি কৰুন। দশ-বিশ মিনিট ঐ মুদ্ৰায় অবস্থান কৰুন। আপনাৰ তখন মনে হবে, নতুন শক্তিব সঞ্চাৰ হতে আবদ্ধ হৈছে, নতুন সামৰ্থ্য আসছে। কাৰণ, প্ৰাণ উৎপন্ন হওঁবাৰ যে কেন্দ্ৰ আছে, সেই কেন্দ্ৰেৰ ওপৰ আপনি সংযম কৰেছেন, তাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰেছেন, তাৰে ‘জেনাৰেটৰ’ বানিয়েছেন। এই হল শক্তিব সঞ্চয়।

শক্তি উৎপন্ন কৰতে বাইবেৰ কিছুৰ সাহায্যও নেওবা যেতে পাৰে। শূৰ্য প্ৰাণশক্তিব, জীবনীশক্তিব সবচেয়ে বড় কেন্দ্ৰ, সবচেয়ে বড় ভাণ্ডাৰ এবং অক্ষয় ভাণ্ডাৰ। আমবা শূৰ্যেৰ সাহায্যে প্ৰাণশক্তিকে আকৰ্ষণ কৰতে পাৰি। প্ৰাতঃকালে শূৰ্যোদয়েৰ সময় শূৰ্যেৰ সামনে দাঁড়িয়ে আমবা সঙ্কল্প কৰব—প্ৰাণশক্তিব সংগ্ৰহ হ'ছে, সঞ্চয় হ'ছে, মস্তিষ্কমাৰ্গে প্ৰাণশক্তিব অবতৰণ হ'ছে। দশ-বিশ মিনিট মনে মনে এই সঙ্কল্পকে আলোড়ন কৰে আমবা ধ্যানস্থ মুদ্ৰায় দাঁড়িয়ে থাকব। তখন আমাদেব মনে হবে যে, নতুন শক্তিব ও ক্ষুৰ্তিৰ সঞ্চাৰ শুরু হৈছে।

আমি শৰীৰ-সাধনাৰ বিষয় ও উপায় সম্বন্ধে কিছু বেথাপাত কবলাম। এটি দিগদৰ্শন মাত্ৰ। তবে যদি আমবা এ সব কথা ঠিকমত বুঝতে পাৰি তো শৰীৰকে আমবা এমনভাবে তৈৰি কৰতে পাৰব যে, আমবাই অতি বৃহৎ শক্তিকে শৰীৰে অবতৰণ কৰাৰ জন্তু, প্ৰকট ও অভিব্যক্ত হওঁবাৰ জন্তু আহ্বান কৰতে সমৰ্থ হব।

৩

শরীর সাধনা

ধ্যানের সঙ্গে ধ্যেযেব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ধ্যেয অনেক প্রকারেব, ধ্যানও অনেক। সকলেব পক্ষে একই ধ্যেয অনুকূল হয় না। বিভিন্ন ব্যক্তিব পক্ষে বিভিন্ন ধ্যেয অনুকূল হতে পারে। একেব পক্ষে বা অনুকূল তা অপবেব পক্ষে অনুকূল নাও হতে পারে। সহজ স্বাসেব ওপব ধ্যান কবা কাবও পক্ষে সবল ও অনুকূল হয়। কেউ আবাব সহজ স্বাসকে ধবতে পারে না, অথচ অনুলোম ও বিলোমকে সহজেই ধবতে পারে এক তাব ওপবেই তাব মন জমে যায়। কেউ আবাব দীর্ঘ স্বাসকে অনায়াসে ধবতে পারে। অতি সম্প্রতি এক সাধক বলেছেন যে, সমবৃদ্ধি স্বাসেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত হয়। কিন্তু সহজ স্বাসকে আয়ত্ত কবা যায় না। স্মৃতিবাং দেখা যাচ্ছে, এটা আবশ্যক নয় যে, সব সাধকেব পক্ষে ধ্যেয একই প্রকার হবে। কাবণ, মানুষ যন্ত্র নয় বা যান্ত্রিকও নয়। প্রত্যেকেব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা আছে, ভিন্ন ভিন্ন কচি আছে। তাই সকলেব ধ্যেয যে একই হবে এমন মনে কবা উচিত নয়। যেমন প্রেক্ষা ধ্যেয, তেমনি অনুপ্রেক্ষাও ধ্যেয। আজ আমি কেবল শব্দাত্মক ধ্যানেব আলোচনা কবব। এই ধ্যানকে পদস্থ ধ্যানও বলা হয়।

চাব প্রকাৰ ধ্যানৰ কথা বলা হৈছে—পিণ্ডস্থ, পদস্থ, কপস্থ আৰু কপাতীত। এদেৰ মध्ये দ্বিতীয় ধ্যান হল—পদস্থ। এটি শব্দ-ধ্যান, শব্দেৰ সাধনা। কথা না বলা, মৌন থাকা এক ব্যাপাৰ, আৰু কথা বলা আৰু এক ব্যাপাৰ। আমবা কেবল মৌন থাকব, কথা বলব না, এ সম্ভব নহয়, আৰু কেবল কথা বলেই যাব, এও সম্ভব নহয়। জীৱনে বলা ও না বলাৰ সামঞ্জস্য বিধান কৰা দৰকাৰ। না বলাৰ বিষয় নিয়ে আলোচনা কৰাৰ আগে আমি বলতে চাই যে, আমাদেৰ শব্দ-সাধনা কৰতে হবে। আমাদেৰ শব্দেৰ মহত্ব বুঝতে হবে, তৎসংক্রান্ত সমস্ত প্রক্ৰিয়াও জানতে হবে। এব অৰ্থ হল, পদস্থ ধ্যান কৰা বা পদকে ধ্যেয় কৰা এব তাৰ আধাবেই চিন্তেৰ একাগ্ৰতাকে স্থাপিত কৰা।

পদেৰ বিশেষ মহত্ব আছে। আমবা যখন কোন পদ উচ্চাৰণ কৰি তখন কেবল পদই নিৰ্গত হয় না বা কেবল শব্দ নিৰ্গত হয় না, সেই সঙ্গে আমাদেৰ ভাবনা, আমাদেৰ সঙ্কল্প, আমাদেৰ মনেৰ শক্তিও বাহিৰে আসে, আৰু সব কিছুৰ সঙ্গে স্বাসেবও যোগ হয়। শব্দীৰ, স্বাস, বায়ু, ধ্বনি, সঙ্কল্প-শক্তি, মানসিক শক্তি—এই সব কিছুৰ যখন যোগ হয় তখন কোন শব্দ আমাদেৰ ঐতিপোচৰ হয়। কোন ব্যক্তি যখন কথা বলে তখন সেই বলাৰ পেছনে কেবল শব্দই থাকে না, বিশিষ্ট প্রকাৰেৰ শক্তিও থাকে, আৰু বক্তাৰ নিশ্চয় অনুসাৰে সেই শক্তি প্রকট হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবেৰা অমৰকংকায় গেলেন। সেখানকাৰ ৰাজা পদ্মনাভ দ্রৌপদীকে অপহৰণ কৰেছিলেন। পদ্মনাভ সংবাদ পেয়ে নিজৰ সেনাকে সজ্জিত কৰে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবেৰ বললেন—‘যাও, যুদ্ধ কৰ।’ পাণ্ডবেৰা যুদ্ধ কৰতে গেলেন। তাঁৰা অত্যন্ত পৰাক্ৰান্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। পদ্মনাভ সামনে এলেন। পাণ্ডবেৰা বললেন—‘আজ এমন ভীষণ যুদ্ধ হবে যে সে যুদ্ধে হয় আমবা থাকব আৰু না হয় পদ্মনাভ থাকবে। তু পক্ষেৰ এক পক্ষ মাত্ৰ থাকবে।’ এই কথাৰ মনেৰ যে সঙ্কল্প ছিল, ভাবনা ছিল, তা প্রকট হয়ে গেল। যুদ্ধ হল। পৰিস্থিতি এমন হল যে, পদ্মনাভ স্থিৰ থাকলেন

আব পাণ্ডবদেব পলায়ন কবতে হল। এব কাৰণ, পাণ্ডবদেব সঙ্কল্প
শিথিল ছিল। তাঁদেব সঙ্কল্প সূত্র ছিল—‘অমহে বা পউমনাভে বা’
হয় আমবা থাকব, নব পদ্বনাভ থাকবে। পদ্বনাভ থাকলেন, আব
‘তাঁবা পালিয়ে গেলেন।

ক্রীকৃষ্ণ সব দেখলেন। তিনি এগিয়ে এসে বললেন, ‘সঙ্কল্পেব ভাষা
আমি বলছি। ‘অমহে, ন পউমনাভে’—আমবা থাকব, পদ্বনাভ থাকবে
না। আবাব যুদ্ধ হল। পদ্বনাভ যুদ্ধ হেবে পালিয়ে গেলেন।

আমাদেব মুখ থেকে কেবল শব্দ নির্গত হয় না, তাব সঙ্গে সঙ্গে
আমাদেব অন্তঃকরণেব শক্তি, সঙ্কল্পেব শক্তিও নির্গত হয়। আমাদেব
যেমন নিশ্চয়, যেমন ভাবনা, আব ঐ নিশ্চয় ও ভাবনােব যেমন বল—তা
সবই শব্দেব সঙ্গে প্রকট হয়। আমবা শব্দেব শক্তিকে বুঝতে পাছি,
আব এও জানতে পাছি যে শব্দেব সঙ্গে আবও কিছু জড়িত থাকে।

আমবা অর্হমেব ধ্বনি কবি, অর্হম্ উচ্চারণ কবি। প্রেক্ষাধ্যান
আবস্ত হয় অর্হম্ ধ্বনিব দ্বাৰা। প্রত্যেক কাজ আবস্ত হয় অর্হম্ ধ্বনি
দিবে বিস্তৃত কেন? আমবা বখন ধ্যান করতে বসেছি, তবে ধ্বনি কেন?
ধ্যানে তো মৌন থাকাই উচিত, কিন্তু অর্হম্ ধ্বনি কেন? অমুপ্রেক্ষা
কেন? শব্দেব প্রয়োগ কেন?

আমবা শব্দ প্রয়োগ ছাড়তে পাৰি না। শব্দেব শক্তি অতি বিপুল।
মস্ত্বেব শক্তিব সঙ্গে লোকে পৰিচিত। সেটি কোন্ শক্তি? ও তো
শব্দেবই শক্তি। ঐ শক্তি আজ বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে, বিশ্লেষিত
হচ্ছে। আমাদেব শব্দেব দুটি মুখ্য ভাগ আছে—একটি মস্তিষ্ক,
আব অপৰটি শব্দেব বাকি সমস্ত অংশ। এই দুই ভাগেই বিদ্যাৎ
উৎপন্ন হচ্ছে। শব্দেব মধ্যে বক্তেব গতি আছে, সংক্ৰমণ আছে।
প্রত্যেক ধমনীেব ভেতবে, প্রত্যেক স্নায়ুেব ভেতবে বক্তেব প্রবাহ চলছে।
হৃৎপিণ্ড নিজের কাজ কৰছে, যকৃৎ নিজের কাজ কৰছে, পাচন-তন্ত্রও
নিজের কাজ করে চলছে। প্রত্যেক অবয়বই আপন আপন কাজে
ব্যাপ্ত আছে। ফলে সংঘর্ষণ সৃষ্ট হচ্ছে, আব সংঘর্ষণ থেকে বিদ্যাৎ

উৎপন্ন হচ্ছে। একে 'দার্শনিক' বিদ্যুৎ বলা যায়, কারণ সংঘর্ষণ থেকে তা সঞ্চারিত হয়। আর এক প্রকার বিদ্যুৎ আমাদের মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয়, একে 'ধাবাবাহিক' বিদ্যুৎ বলা যায়। এ বিদ্যুৎ নিবস্তব উৎপন্ন হয়েই চলেছে। আমাদের শরীরে এই দুই প্রকার বিদ্যুৎ আছে—দার্শনিক বিদ্যুৎ আর ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ। দুটিতেই বিপুল শক্তি আছে। বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে, তাব ধাক্কা শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে। শব্দের সঙ্গে দুই প্রকার বিদ্যুৎ যুক্ত হয়। শরীরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুৎ ও মস্তিষ্কের চুম্বকীয় বা ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ—উভয়ই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে শব্দ শক্তিশালী হয়, শব্দকে কেন্দ্র করে শক্তি উৎপন্ন হয়।

আমরা যখন কথা বলি, তখন শব্দের সঙ্গে বিদ্যুৎ নির্গত হয়। এক ব্যক্তির কথা অপন ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাব কারণ, শব্দের সঙ্গে যে বিদ্যুৎ নির্গত হয় সেই বিদ্যুৎ প্রভাবশালী। আমাদের শরীরে বিদ্যুৎ নির্গমনের কয়েকটি প্রধান স্থান আছে, যথা—হাতের আঙ্গুল, পায়ের আঙ্গুল, চোখ আর ধ্বনি। এই সব স্থান দিয়ে শরীরের বিদ্যুৎ বহির্গমন করে। শব্দের সঙ্গে বিদ্যুতের সংযোগ হয়, আর ঐ সংযোগ শব্দকে শক্তিশালী করে তোলে। বলে শব্দ প্রভাব উৎপাদন করে। শব্দের তবঙ্গ, প্রকম্পন বাইরে নির্গত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

সাধারণ ভাষায় এই যা বলছি তাব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। আমি যেভাবে কথা বলছি সেভাবে যদি বাব বছর নিবস্তব বলতে থাকি তবে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ নির্গত হবে তা দিয়ে একবার দাড়ি কামানোর উপযুক্ত জল গরম করে নেওয়া যাবে। এই পরিমাণ অবশ্য খুবই সামান্য, কিন্তু যখন মুখ-নিঃসৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্কল্পের শক্তি যুক্ত হয় তখন তাতে তীব্রতা আসে, আর তাব গতিও হয় তীব্র। সঙ্কল্প শব্দকে এতই তীব্র গতিসম্পন্ন করে যে, শব্দ এক সেকেন্ডে এক কোটি মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। আলোব গতি প্রতি সেকেন্ডে এক লাখ ছিয়াশি হাজার মাইল। কিন্তু সঙ্কল্প-শক্তির সঙ্গে নির্গত শব্দ এমন বিশিষ্ট প্রকার গতি-সম্পন্ন হয় যে, তা এক সেকেন্ডে এক কোটি মাইল যেতে পারে।

বর্তমানে এ ব্যাপারে বহু প্ৰকাৰ অন্তৰ্দ্বন্দ্ব চলাছে। বিজ্ঞানের অনেক বিকাশ হয়েছে। আজ ‘সুপারসোনিক’ বিমান আকাশে বুক ভেদ কৰে উড়ে চলেছে। তাৰ গতি শব্দৰ গতিৰ চেয়েও অধিক। হীৰা কাটাৰ জন্তু এমন যন্তু নিৰ্মিত হয়েছে, যা এক সেকেন্ডে বিশ হাজাৰ ‘ফুট’ নী আঘাত কৰতে পাৰে। ঐ যন্তু শূন্য ধ্বনিৰ দ্বাৰা চালিত হয়।

আমাদেৰ পদস্থ ধ্যানৰ শক্তি বুঝতে হবে। পদ এক মাধ্যম। শব্দ এক মাধ্যম। আমবা অৰ্থমেৰ জপ কৰি, অৰ্থমেৰ ধ্বনি কৰি। অৰ্থমেৰ ধ্বনি কেবল শব্দ নহ। ধ্যেয় সৰ্বদা গুপ্ত থাকে, আমাদেৰ সামনে আসে না। ধ্যেয় যদি প্ৰকট হয়, ধ্যেয়কে যদি প্ৰকটিত কৰা যায়, তবে আৰ ধ্যানৰ কোন আৱশ্যকতা থাকে না। কাৰণ ধ্যেয় তুল কপেই আমাদেৰ সামনে বিৰাজ কৰে। সৰ্বদাই অনিচ্ছাকে সিদ্ধ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হয়। তৰ্বশাস্ত্ৰে সাধ্যৰ লক্ষণ কৰা হয়েছে—‘অনিচ্ছা সাধ্যম্’—যা অনিচ্ছা, তাই সাধ্য। যদি সিদ্ধ বস্তু হয়, তবে তাকে সাধ্য কৰা চলে না, কাৰণ সিদ্ধকে সাধন কৰা পণ্ডিত্যম মাত্ৰ। সাধ্য সেই বস্তুকেই কৰা যায় যা সিদ্ধ নহ, যাকে সাধা হয়নি, যাৰ সাধনা কৰতে হবে। যদি অৰ্থম্ আমাদেৰ সামনে প্ৰকট হয়, সিদ্ধ হয়, তবে তাকে ধ্যেয় বলে নেওয়ার কোনই আৱশ্যকতা থাকে না। আমবা অৰ্থমকে ধ্যেয় কৰেছি এই জন্তু যে, তা আমাদেৰ কাছে প্ৰকট নহ, সিদ্ধ নহ। আমবা তাকে প্ৰকট কৰতে, সিদ্ধ কৰতে, চেষ্টা কৰি।

আমবা অৰ্থমকে ধ্যেয় কৰে নিযেছি। অৰ্থমকে ধ্যেয় কৰাৰ দুটি উপায় আছে— আকাৰ ও শব্দ। আমবা ধ্যেয়ৰ কোন প্ৰতিকৃতি কৰি বা মূৰ্তি বানাই, অৰ্থাৎ কোন আকাৰে তাকে গড়ে নিই এবং বলনা কৰি যে, এটিই অৰ্থম্।

দ্বিতীয় উপায় হল শব্দ। আমবা অৰ্থমকে ধ্যেয় কৰি, আৰ শব্দকে কৰি ধ্যানৰ মাধ্যম। আমবা অৰ্থমকে জপ কৰি, ধ্বনি কৰি। আমবা অৰ্থমেৰ ধ্বনিকে কেবল উচ্চাৰণ কৰি না, কিন্তু ঐ উচ্চাৰণৰ পেছনে আমাদেৰ যে ধ্যেয় অৰ্থম গুপ্ত আছেন তাঁৰ সঙ্গে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি।

শব্দকে মাধ্যম করে, অর্হম্ শব্দ যাব প্রতিনিধিত্ব করে, অর্হভেব সেই স্থিতি পর্যন্ত আমবা পৌঁছতে চাই। আমবা সেই স্থিতি পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, যা অর্হম্ শব্দের বাচ্য। তাই হল অর্হভেব স্থিতি।

একটি বাচ্য, অপবাটি বাচক। শব্দ বাচক, তাব অর্থ বাচ্য। অর্হম্ বাচক, আব তাব যা অর্থ তা বাচ্য। অর্হম্ শব্দের অর্থ হল, অর্হভেব স্থিতি। আমবা বাচকের দ্বাৰা বাচ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। সাধন দ্বাৰা সাধ্য পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। আমবা শব্দের ধ্বনিব সঙ্গে নিজের ভাবনা জুড়ে দিয়ে নিজের ভেতরে অর্হভেব যে স্বরূপ লুকায়িত আছে তাকে প্রকট করতে চাই।

অর্হমেব এই প্রকৃষ্ট ভাবনা যদি আমাদের বোধগম্য হয় তবে অর্হমেব ধ্বনিব প্রকৃত অর্থ আমবা বুঝতে পাবব, আব এই ভাবনা যদি বোধগম্য না হয় তবে অর্হমেব ধ্বনি আমাদের কাছে এক প্রথাগত শব্দ কাপেই থেকে যাবে।

মস্ত্ৰেব পদের নির্বাচন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে করতে হয়। সর্ব প্রথম দৃষ্টিকোণ হল, স্বাসেব সঙ্গে মস্ত্ৰ পদের সম্বন্ধ। আমবা যেন একথা ভুলে না যাই যে, আমাদের সাধনাব সমস্ত প্রক্রিয়াব মধ্যে স্বাস সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ সাধন। আমবা স্বাসকে যেন বিস্মৃত না হই, তাব শুক্ল যেন ভুলে না যাই। প্রত্যেক বস্তুব সঙ্গে স্বাসেব যোগ কৰা প্রয়োজন।

মস্ত্ৰেব নির্বাচন এমন হবে, যাতে এক নিঃস্বাসেই সম্পূর্ণ মস্ত্ৰ বটন কৰা যায়। মস্ত্ৰেব সঙ্গে স্বাসেব লয় যুক্ত কৰা চাই। স্বাসেব সঙ্গে মস্ত্ৰেব সম্বন্ধ স্থাপন কৰা চাই। অর্হম্ একটি মস্ত্ৰ শব্দ। এব উচ্চারণ সহজেই আনন্দের সঙ্গে এক স্বাসেই কৰা যায়। তাতে কোন অসুবিধেই নেই। দীর্ঘ উচ্চারণ কৰলেও এই শব্দ একই স্বাসে সমাপ্ত হবে।

তবে নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাৰেব হতে পাবে। মস্ত্ৰ বড়ও হতে পাবে। যেমন—গমো অবহংতাং, গমো সিদ্ধাং, গমো আযবিষাং,

গমো উৰজঝায়ণ, গমো লোএ সব সাছণ । এই মন্ত্ৰে পাঁচ পদ আছে ।
 পাঁচ পদেব এই পুৰো মন্ত্ৰটি একই শ্বাসেব উচ্চাৰণ কৰা খুবই কঠিন
 কাজ । সে স্ত্ৰে এক উপায় আছে । মন্ত্ৰ যদি বড় হয় তৰে তাকে
 ভাগ কৰে নেওষা যায় । এক এক ভাগ এক এক শ্বাসে উচ্চাৰণ কৰা
 যায় । ‘গমো অবহংতাণ’—এই ভাগেব উচ্চাৰণ এক শ্বাসে সহজেই
 কৰা যায় । ‘গমো সিদ্ধাণ’—এই ভাগেব উচ্চাৰণ দ্বিতীয় শ্বাসে কৰা
 যায় । এই ভাবে পাঁচটি পদ পাঁচটি শ্বাসে উচ্চাৰণ কৰা সম্ভব হয় ।
 পাঁচ শ্বাসে পুৰো মন্ত্ৰেব জপ কৰা যায় । শ্বাসেব কথা এখানেই পৰ্যাপ্ত
 নয় । শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্ৰ-পদেব লববদ্ধতা হওবা আবশ্যক ।

সঙ্গীতজ্ঞ বাস্তবস্ত্ৰেব সঙ্গে গান গায় । বাস্ত্ৰেব সঙ্গে তাৰ গানেব
 লয়েই একতা হয় । সেই বকম, শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্ৰ পদেব একতা হওবা
 দৰকাৰ । শ্বাসেব সঙ্গে যখন মন্ত্ৰ পদেব লয় যুক্ত হয় তখন সহজেই
 একাগ্ৰতা আসে । তখন শ্বাস ও মন্ত্ৰ পদেব উচ্চাৰণেব মধ্যে কোন
 অসঙ্গতি থাকে না । উভয়েব সম্পূৰ্ণ মিল হয়, বলে তন্ময়তা এসে যায় ।
 শ্বাসেব প্ৰকম্পন আৰু ধ্বনিব প্ৰকম্পন—তুটি একসঙ্গে যুক্ত হয়ে
 যায় ।

আমবা সবাই এক প্ৰকম্পনেব জীৱন বাপন কৰি । যদি এমন
 কোন ক্যামেবা বা আয়না থাকত যাব সামনে দাঁড়িয়ে আমবা দেখতে
 পাবতাম, তৰে দেখাব ক্ষমতা থাকলে আমবা দেখতাম যে বাইবেব
 সব কিছু কেবল স্থল ও বস্তুত তুচ্ছ । শূন্যৰূপে দেখতে গেলে সমস্ত
 শবীৰ অণুব প্ৰকম্পন মাত্ৰ । প্ৰবল বৰ্ষা আবস্ত হয়েছে । জোৰে
 জল নিচে গড়িয়ে পড়ছে । জলে একটি ব্দব্দ উঠল, আৰু যেটে
 পড়ল । দ্বিতীয় ব্দব্দ উঠল, আৰু কেটে পড়ল । আৰাব তৃতীয়
 ব্দব্দ উঠল ও যেটে পড়ল । এই ক্ৰমই চলাতে লাগল । প্ৰবল বৰ্ষায়
 ব্দব্দেব নাচন লেগে যায় । আমাদেব শবীৰেও এই বকম নাচ চলাছে ।
 পৰমাণু আসছে, আৰাব যাচ্ছে, সৰ্বাটিত হচ্ছে, আৰাব বিৰাটিত হচ্ছে ।
 তবজ্জৰ পৰ তবজ উঠছে । সাৰা শবীৰ যেন তবজ প্ৰবাহেব প্ৰকম্পনেব

এক পুনিন্দা। তবে ভাগ্য ভাল এই অবস্থা দেখতে প্ৰাণ্ণ্যৰ উপায় আমাদেব নৈহ। তাই আমবা মনে কবি যে, শবীৰ একটা স্ক্ৰুট, নিবেট বস্তু। কিন্তু নিবেট হব কি কবে? বিজ্ঞান শ্বীকাৰ কবে যে আমাদেব সমস্ত দৃশ্য জগৎ, যাকে আমবা জ্ঞানিও চিনি, তাকে যদি কেটেকুটে একত্ৰ সংহত কবি, তবে তা আয়তনে একটা খেলাব বলৰ মত হব। সাৰা জগৎ একটা বল যতটা বড়, মাত্ৰ ততটা বড় হব। কেবল আপনাৰা বা আমবা নহি, সব পাহাড়, নদীনালা, সব ঘৰবাড়ি, সমস্ত বালুকণা সব কিছু কেটেকুটে এক কবে নিলে, সেই পুঞ্জিত বস্তুৰ পৰিমাণ হব একটা বলৰ যে পৰিমাণ, কেবল তাই। নিবেট বস্তু খুবই কম আছে। কেবল প্ৰকল্পন, প্ৰকল্পন আৰু প্ৰকল্পন। শবীৰকে নিবেট বস্তু বলে মনে হছে, কিন্তু ভেতৰে যান, ভেতৰে গেলেই দেখবেন সবই কাঁপা, কেবল কাঁপা। ওপৰে চামড়া দিবে ঢাকা, তাই ভেতৰ দেখাই যায় না। একটা মানুষকে কেটেকুটে একত্ৰিত কৰে নিলে বোধহয় তা একটা পৰমাণুৰ সমানও হব না। শবীৰেব তবঙ্গ, স্বাসেব তবঙ্গ, বিচাবেব তবঙ্গ, ধ্বনিব তবঙ্গ—আমবা কেবল তবঙ্গেৰ ছাৰা বেষ্টিত আছি। দৰ্শনেব ভাষায় বলতে হয়, আমবা পৰ্বায়েব ছাৰা বেষ্টিত আছি। পৰ্বায়েব পৰ পৰ্বায। দ্ৰব্য কোথায়? আত্মা দ্ৰব্য, তাকে তো দেখা যায় না। অণুও দ্ৰব্য, কিন্তু তা অতি সূক্ষ্ম। সবই পৰ্বায়েব আবৰ্ত। তবঙ্গেব পৰ তবঙ্গ। পৰ্বায়েব পৰ পৰ্বায। প্ৰকল্পনেব পৰ প্ৰকল্পন। প্ৰকল্পনেব মধ্য দিযে আমাদেব জীবনধাৰা চলেছে।

আমবা ঠিকভাবে প্ৰকল্পনেব উপযোগ কৰব, তাৰ শক্তিৰ উপযোগ কৰব। ধ্বনিব তবঙ্গেব উপযোগ কৰতে আমবা শিখব। ধ্বনিব তবঙ্গ থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ঠিকভাবে নিৰ্বোজিত কৰব। যখন ধ্বনি তবঙ্গ মনেব তবঙ্গেব সঙ্গে যুক্ত হয়, সঙ্কল্লেব তবঙ্গেব সঙ্গে যুক্ত হয়, আৰু স্বাসেব তবঙ্গেব সঙ্গেও যুক্ত হয়, তখন অতি বড় শক্তি উৎপন্ন হয়।

শব্দেব কল্পন তাৰ চৰন সীমাহে পৌছে 'ঙ্গ' কিৰণ-এক্স-ৰে-ক্সেপে পৰিণত হয়। তখন তাৰ গতি প্ৰতি সেকেন্ডে এক কোটি মাইল হয়

যায। সংকল্পের কাম্পন তাতে আবণ শক্তি নিযোজন কৰে। একজন
যোগেৰ মৰ্মজ্ঞ আচাৰ্য বলেছেন, যাৰ দৃঢ় নিশ্চয়ে কোন ছেদ নেই, সে কি
না কবতে সমৰ্থ? তাৰ পক্ষে কিছুই দুৰ্দ্ধব নয়। শব্দেৰ সিদ্ধি আস্থা
থেকে হয়। আস্থাহীন শব্দ শক্তিহীন হুযে যায। শব্দেৰ সাধনাৰ
অৰ্থই হল আস্থা ও শব্দেৰ ময্যে ব্যবধান লোপ কৰা। আব অৰ্থ হল,
ধ্বনিকে আস্থাৰ কবচ পৰিবে দেওবা।

মনের পটুতা বিধান

আমাদের চেতনার অনেক স্তর আছে। তাদের মধ্যে সর্বাধিক স্থূল স্তর হল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম, মন অপেক্ষা বুদ্ধি সূক্ষ্ম, আর বুদ্ধি অপেক্ষা অধ্যবসায় সূক্ষ্ম। এই বক্রম অসংখ্য স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরের নামকরণ করা সম্ভব নয়। চেতনার অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে আমরা ভ্রমসব হচ্ছি, অনেক স্তরের মধ্য দিয়েই আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছে।

ইন্দ্রিয়গুলি খুবই স্থূল, তাই তাবা আমাদের কাছে স্পষ্ট। মনের চেতনা সূক্ষ্ম, তাই মনকে বোঝা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমরা ধ্যান কবি, আমাদের ধ্যানের সহস্র মনের সঙ্গে। ধ্যানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের কোন সৌজানুষ্ঠি সম্বন্ধ নেই। ধ্যানের প্রথম সহস্রই মনের সঙ্গে। ধ্যান এক প্রকার মানসিক ক্রিয়া। বাস্তবিক পক্ষে ধ্যান খুব বিপজ্জনক। ধ্যান খুব সহজ কাজ নয়, এর থেকে অনেক বিপদ হতে পারে। যা লাভজনক হয়, তা বিপজ্জনকও হয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই যার থেকে কেবল লাভই হয় কখনও কোন বিপদ হয় না। বরং লাভের সম্ভাবনা যত অধিক হয় বিপদের সম্ভাবনাও তত অধিক হয়। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ধ্যান থেকে আমরা যেমন অনেক

কিছু লাভ কৰতে পাবি, তেমনই ধ্যান থেকে আমাদেব অনেক বৰম
 বিপদও হতে পাবে। যদি আমবা ঠিক প্ৰক্ৰিয়া না বুঝে ধ্যান কৰতে
 যাই তৰে অনেক ক্ৰেশেব মধ্যে পড়তে পাবি। ধ্যানেব দ্বাৰা এক বিশেষ
 প্ৰকাৰ তাপেব সৃষ্টি হয়। কেউ যদি সে, তাপ সহ কৰতে না পাবে
 তৰে সে পাগল হয়ে যেতে পাবে। সেজ্ঞা ভালভাবে বুঝে শুঝে, বিচাৰ
 বিবেচনা কৰে ধ্যান কৰা উচিত। ধ্যানেব ক্ষেত্ৰে খুব ধীৰ গতিতে
 অগ্ৰসৰ হওয়াই উচিত। এটা সম্ভব নষ যে, প্ৰথম দিন ধ্যান কৰতে
 বসেই এক ঘণ্টা ধৰে ধ্যান কৰতে পাবব। এক ঘণ্টা ধ্যান কৰাব
 অভ্যাস কৰতে দীৰ্ঘ সময় লাগে। প্ৰথম দিন যদি দু মিনিট ধ্যান হয়
 তৰে বিৰাট সফলতা লাভ হয়েছে মনে কৰতে হবে। দু মিনিট ধ্যান
 সামান্য কথা নষ। যদি কোন ব্যক্তি দু মিনিট কেন্দ্ৰিত থাকতে
 পাবে, একাগ্ৰ থাকতে পাবে, স্থিৰ থাকতে পাবে, তৰে বুঝতে হবে তাৰ
 সাফল্য এসেছে, তাৰ উপলব্ধি হয়েছ। এমন লোক খুবই কম মেলে
 যে এক বৎসৰেব চেষ্টায় দু মিনিট ধৰে এক বিষয়ে একনাগাড়ে একাগ্ৰ
 থাকতে পাবে। কাৰণ ঐ সময়েব মধ্যেই তাৰ মন বিচলিত হয়ে যেতে
 পাবে। দু মিনিট কাল মনে কোন ব্যবধান আসবে না, কোন বিকল্প
 উদয় হবে না—এ বড় কম কথা নষ।

আমাদেব মনে নিবন্তৰ বিকল্প উদয় হচ্ছে, ব্যবধান এসে যাচ্ছে।
 আমবা কোন এক বিচাৰ নিয়ে বসলাম। সেই বিষয়েব ওপৰ একাগ্ৰ
 হওয়াৰ চেষ্টা কৰা মাত্ৰই মনে বিভিন্ন বিকল্প আৰ ব্যবধান উৎপন্ন হতে
 থাকে। মন যখন চঞ্চল অবস্থায় থাকে তখন কত যে ব্যবধান
 হতে পাবে তা কল্পনা কৰাই যায় না। একাগ্ৰ হলে পাবে বোঝা যায় যে
 বিকল্পেব প্ৰবাহ কত দ্ৰুত চলছে আৰ একাগ্ৰতায় কত ব্যবধান উৎপন্ন
 কৰছে। ধ্যান খুবই বিপজ্জনক। প্ৰথম ক্ষণেই বা প্ৰথম দিনেই
 বা শিষ্ণ-শিবাবেব প্ৰথম আয়োজনেই ধ্যান সিদ্ধ হয়ে যাবে—এটা
 কোন কথাই নষ। এটা স্পষ্ট মনে বাখতে হবে এখন যে অভ্যাস চলছে
 তা কেবল অবধানেব অভ্যাস।

যোগেৰ ভাষাৰ মনেৰ তিন অবস্থা আছে—অবধান, একাগ্ৰতা বা ধাৰণা, আৰু ধ্যান। মনোবিজ্ঞানেও অনুকূপ বিচাৰ আছে। তাতেও তিন অবস্থাৰ কথা বলা হৈছে, যথা—অ্যাটেন্শন, কনসেন্‌ট্ৰেশন আৰু মেডিটেশন। অবধান, কেন্দ্ৰীকৰণ আৰু ধ্যান। মনেৰ এই তিন অবস্থা। সমস্ত মানসিক ক্ৰিয়া এই তিন অবস্থাৰ মध्येই ঘটে।

মনেৰ প্ৰথম অবস্থা—অবধান, অ্যাটেন্‌শন। এটা মনেৰ ক্ৰিয়া, যে ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আমবা মনকে কোন বস্তুৰ প্ৰতি ব্যাপ্ত, লগ্ন কৰি। যে মন সৰ্বদা ঘূৰে বেডায়, তাকে এক বস্তুৰ প্ৰতি ব্যাপ্ত কৰা, মনকে সচেতন কৰা—চৈতন্যবান কৰা—এই হল অবধানৰ অবস্থা। এই অবস্থায় পদাৰ্থেৰ সঙ্গ মনেৰ সপ্তক স্থাপিত হয়। একেই অবধান বলে। আমবা বলি—সাবধান হুমে যাও। এব অৰ্থ হল—এক কাৰ্যেৰ প্ৰতি একচিত্ত হুমে যাও। যা কবতে হুবে কেবল তাৰ ওপৰ চিন্তকে লগ্ন কৰ।

অবধান যেমন বাহু বস্তুৰ ওপৰ হয়, তেমনই সময় সময় নিজেৰ মূল স্বৰূপেৰ প্ৰতিও হয়। যখন মৌলিক স্বৰূপেৰ প্ৰতি অবধান হয়, তখন সেই স্থিতিতে প্ৰজ্ঞাৰ উদয় হয়। আৰু বাহু বস্তুৰ প্ৰতি অবধান হয় না। মনেৰ অবধান তখন নিজেৰ প্ৰতিই চালিত হয়। নিজেৰ প্ৰতি মনেৰ অবধান এক বিশেষ প্ৰকাৰ স্থিতিৰ লক্ষণ। এই স্থিতিতে প্ৰজ্ঞাৰ উদয় হয়, আন্তৰিক চেতনা প্ৰকট হয়।

মনেৰ দ্বিতীয় অবস্থা—কনসেন্‌ট্ৰেশন, যা যোগেৰ ভাষাৰ একাগ্ৰতা বা ধাৰণা। এটা অবধানৰ পৰেৰ অবস্থা। এই অবস্থাৰ আমবা যে বিষয়ে অবধানকে ব্যাপ্ত কৰেছি, পদাৰ্থেৰ সঙ্গ মনেৰ সপ্তক স্থাপিত কৰেছি, সেই বিষয়েই কেন্দ্ৰিত হুমে যাই। যে মন চাবদিকে ঘূৰে বেডাছে, অনেক বস্তুৰ প্ৰতি ধাৰিত হুমে, তাকে অন্ত সব বস্তু থেকে হটিমে এনে একই বস্তুতে কেন্দ্ৰিত কৰা—এই হল কনসেন্‌ট্ৰেশন, একাগ্ৰতা বা ধাৰণা। এই মনেৰ ধাৰণাবস্থা। ধ্যানৰ আগে ধাৰণা কবতে হয়। শবীৰেৰ কোন অংশ বা কোন বস্তুতে মনকে স্থাপিত কৰে নেযো, মনকে আৰোপিত কৰে নেযো—এই হল ধাৰণা।

পতঞ্জলি ধাৰণাৰ এই পৰিভাষা কৰেছেন—‘দেশবন্ধঃ চিন্তস্ত ধাৰণা’ চিন্তকে কোন প্ৰদেশে বেঁধে দেওবা, কোন বস্তুৰ সঙ্গ চিন্তেৰ সম্বন্ধ স্থাপিত কৰা যাতে চিন্ত তাতেই বাঁধা থাকবে, অন্তৰ কোথাও যাবে না, এই হল ধাৰণাৰ অবস্থা।

মনেৰ তৃতীয় অবস্থা—মেডিটেশ্বন, ধ্যান। অবধানেৰ পৰ ধাৰণা, আৰ ধাৰণাৰ পৰ ধ্যান। কেন্দ্ৰীকৃত মনেৰ যে সঘন অবস্থা, তাই হল ধ্যান, ধ্যানে মন স্থিৰ হ'বৈ যায়, একেবাবে জমে যায়। দীৰ্ঘ সময় ধৰে মন যখন জমে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয় ধ্যানাবস্থা। এই হল মেডিটেশ্বন, ধ্যান।

আমবা তিন অবস্থা সম্বন্ধেই বিচাৰ কৰলাম। ধ্যান হল তৃতীয় অবস্থা।

সৰ্বপ্ৰথমে অবধানেৰ অভ্যাস কৰতে হ'বৈ। মনেৰ এমন স্থিতি আনতে হ'বৈ যাতে অবধান কৰা সম্ভব হয়। মন অত্যন্ত গতিশীল তবু। মনেৰ কাজই হল গতিৰ ওপৰ থকা। বাস্তবে কিন্তু এটাই মনেৰ স্বভাব নহয়। আমবা একেবাবে বিপৰীত দিকে যেতে চাই। শ্ৰোতেৰ সঙ্গ চলা খুব স্বাভাৱিক। প্ৰত্যেকেই শ্ৰোতেৰ সঙ্গ চলতে পাবে। নৌকাও শ্ৰোতেৰ সঙ্গ চলে। শ্ৰোতেৰ প্ৰতিকূলে চলা কঠিন কাজ। যে শ্ৰোতেৰ প্ৰতিকূলে চলতে সক্ষম হয় সেই সাধক, সাধনা তাকেই সাজে। ভগবান মহাবীৰ বলেছেন—

‘অনুসোযপটিষ্ঠএ বহুজ্ঞপন্নি পডিসোযলঙ্কলকেশ্বৰং।

পডিসোযমেব অপ্পা দাযবেৱা হোউকামেৱ ॥’

সমস্ত সংসাৰ শ্ৰোতেৰ পিছেই চলে। সাৰা সমাজ, সকল জনতা শ্ৰোতেৰ পিছে চলে—প্ৰবাহেৰ সঙ্গ সঙ্গ চলছে। একপ স্থিতিতে প্ৰতিশ্ৰোতে চলা খুবই কঠিন কাজ। তিনি আগে খুবই মহত্বপূৰ্ণ কথা বলেছেন—‘অনুসোও সংসাও, পণ্ডিসোও উত্তাবো’—অনুশ্ৰোত অৰ্থাৎ শ্ৰোতেৰ পিছনে চলা—তাবই নাম সংসাৰ। শ্ৰোতেৰ পেছনে চলাই হল চঞ্চলতা। শ্ৰোতেৰ সঙ্গ সঙ্গ চলা—তাকেই বলে অশান্তি,

তাকেই বলে ছুঃখ। শ্রোতব প্ৰতিকূলে চলা—তাকেই বলে শাস্তি।
 তাকেই বলে স্থিৰতা, তাকেই বলে উদ্ভবণ, পাব পেয়ে যাওয়া। যে
 শ্রোতব প্ৰতিকূলে চলাব ক্ষমতা বাখে সে বাস্তবিকই পাব পেয়ে যায়।
 ধ্যানব ক্ৰিয়া প্ৰতিশ্রোতব ক্ৰিয়া, শ্রোতব প্ৰতিকূলে চলাব ক্ৰিয়া। যে
 মন চঞ্চল ও গতিশীল তাকে কেন্দ্ৰিত কৰা, অবহিত কৰা, স্থিৰ কৰা—
 এ সবই বিপৰীত ক্ৰিয়া অৰ্থাৎ মনেব যে স্বভাব নয সেই স্বভাবেই মনকে
 টেনে স্থাপিত কৰা। এব থেকেই বোঝা যায়, ধ্যান কত কঠিন ক্ৰিয়া।
 এ কথা মনে কৰবেন না যে, ধ্যান খুবই সহজ ও সবল ক্ৰিয়া। আমি
 ধ্যানকে বিভীষিকা ৰূপে দেখাতে চেষ্টা কৰেছি। হয়ত কিছু লোক
 এতে ভয় পেয়ে যাবে। তাৰা ভাবে ধ্যানেব সাধনা যদি এত কঠোৰ
 হয় তবে তাৰা ধ্যান কৰতে বসবে কেন ? আমি চাই না যে বস্তুস্থিতি
 বি—প্ৰকৃত অবস্থা কি, তা আপনাৰা বুঝবেন না। আপনাদেব মনে
 ভয় হতে পাবে বলে আমি সত্যকে গোপন কৰব—একথা আমি মানি
 না। এবকম ভ্ৰান্তি আমি পছন্দ কৰি না। আমি চাই না যে
 আপনাৰা ভ্ৰান্তি নিয়ে থাকুন। যে জিনিব যে বকম তাকে ঠিক সে
 বকমই বুঝতে হবে। ধ্যানেব সাধনা বাস্তবিকই কঠিন। আমবা যদি
 ধ্যানকে সহজ মনে কৰে চলি তবে আমবা ভ্ৰমে পতিত হব, আব হয়ত
 আমবা ধ্যানেব স্থিতি পৰ্যন্ত পৌছতেই পাবব না। এ বকন আশ্চ-আন
 ভ্ৰান্তি বাঞ্ছনীয় নয। আমবা ধ্যান কৰছি মুচ্ছৰ্ণকে ভাদ্ৰান জন্ম,
 প্ৰেমাৎকে ধ্বংস কৰাব জন্ম। সে স্থলে যদি ধ্যানেব দ্বাৰা নতুন মুচ্ছৰ্ণ
 বা নতুন ভ্ৰান্তি জন্ম নেয তবে খুবই অনিষ্ট হবে। আমবা অসহ্যাবে
 দুৰ কৰাব জন্ম ধ্যান কৰছি, অথচ ধ্যানেব ফলে নতুন অসহ্যাবে সৃষ্টি হল
 এ কখনই বাঞ্ছনীয় পৰিস্থিতি হতে পাবে না। সেক্ষত্ৰা যথার্থবাদী ও দৃষ্টি-
 বাদী হয়ে, বাস্তবিক অবস্থা বুঝে, আমাদেব ধ্যানেব মাৰ্গে প্ৰবেশ কৰতে
 হবে। আমাদেব মানতে হবে ধ্যান এক দীৰ্ঘস্থায়ী সাধনা, এক সুদীৰ্ঘ
 প্ৰক্ৰিয়া। অল্প সময়েব মধ্যেই ধ্যানকে সিদ্ধ কৰাব হত আমবা যেন
 ভবা না কৰি। ধ্যানকে সিদ্ধ কৰাব জন্ম যে প্ৰস্তুতিব প্ৰয়োজন হয়

আলোচনা। আমি ‘কাকে সাধনা কবব ?’—এই বিষয়ের অন্তৰ্গত কৰেছি। সম্পূৰ্ণ তৈৰি না হয়, অন্তৰ্বে সাধন প্ৰযোজন তা সমাপ্ত না কৰে, আমবা যদি ধ্যানক সিদ্ধ কৰতে চাই, তৰে লাভেৰ বদলে ক্ষতিৰ সম্ভাবনাই অধিক হৰে।

যে ব্যক্তি মন্ত্ৰেৰ সাধনা কৰছে সে যদি কৰচেৰ ক্ৰিয়া না কৰে, তৰে তাৰ ভীষণ বিপদ হতে পাৰে। সৰ্বপ্ৰথমেই তাকে আত্মবন্ধাৰ কৰচ বানিয়ে নিতে হয়। একত্ৰই বিভিন্ন মন্ত্ৰেৰ দীক্ষাৰ সঙ্গ্ৰে বিভিন্ন কৰচেৰ ব্যৱস্থা কৰা হযেছে। কৰচ তৈৰি কৰাৰ উদ্দেশ্য হল, নিজেৰ জন্তু বজ্জসম দৃঢ় পঞ্জৰ নিৰ্মাণ কৰা। কৰচ প্ৰস্তুত কৰে নেওথাৰ পৰে বাইবেৰ কোন শক্তি কৰচধাৰীকে আঘাত কৰতে পাৰে না। শৰীৰেৰ প্ৰত্যেক অবয়বেৰ জন্তু পৃথক পৃথক কৰচেৰ ব্যৱস্থা আছে। মাথা থেকে পায়ৰেৰ অঙ্গুষ্ঠ পৰ্যন্ত প্ৰত্যেক অবয়বেই কৰচ পৰিয়ে দিয়ে সুবক্ষিত কৰা যায়।

প্ৰাচীনকালে সৈনিক কৰচ ধাৰণ কৰে যুদ্ধস্থলে আসত। লোহা বা অন্তৰ্ধাতু দিয়ে তৈৰি কৰচ এত মজবুত হত যে তববাৰি বা বৰ্ষাৰ আঘাত তা ভেদ কৰতে পাবত না। কৰচ পৰিধান কৰে যোদ্ধা সুবক্ষিত হত, বাইবেৰ আঘাত থেকে মুক্ত থাকত।

অনুকৰণ ভাবে, মন্ত্ৰেৰ সাধক মন্ত্ৰেৰ সাধনা আবস্ত কৰাৰ আগে কৰচ তৈৰি কৰে তা ধাৰণ কৰে, যাতে বাইবেৰ কোন শক্তি তাকে আঘাত কৰতে না পাৰে বা তাৰ কোন অনিষ্ট কৰতে না পাৰে।

প্ৰস্তুতি সকলকেই কৰতে হয়। পূৰ্ব প্ৰস্তুতি ছাড়া কোন কাজ কৰা সম্ভৱ হয় না। ধ্যানেৰ জন্তুও পূৰ্ব প্ৰস্তুতিৰ প্ৰযোজন আছে। এই প্ৰস্তুতিৰ অঙ্গ হিসাবে শৰীৰেৰ সাধনা খুবই দৰকাৰী। আৰ মানসিক প্ৰস্তুতিৰ জন্তু সৰ্বাঙ্গে অবধানৰ অভ্যাস কৰা আবশ্যক।

সেজন্তু আজ আমি ধ্যানেৰ আলোচনা কৰাৰ আগে মনকে পঢ়ি, কুশলী ও প্ৰশিক্ষিত কৰাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰছি। মনকে এই প্ৰকাৰে প্ৰশিক্ষিত কৰতে হৰে যে, মনেৰ ক্ষমতা বিকশিত হৰে আৰ

খ্যানেৰ স্থিতি পৰ্যন্ত পৌছে যাওযাৰ যোগ্যতা সম্পাদিত হ'বে। অবধান
 দ্বাৰা যোগ্যতাৰ সম্পাদন হয়। মনকে পঢ়ু না কৰে—মনেৰ পঢ়ুতা
 বিধান না কৰে—খ্যানেৰ ভূমি পৰ্যন্ত পৌছান সম্ভব হয় না। সেজন্ত
 মনকে কুশলী ও দক্ষ কৰা বিশেষ প্ৰয়োজন। মনকে পঢ়ু কৰাৰ জন্ত
 অনেক বকম অভ্যাস বিধান কৰা হয়। আসনেৰ অভ্যাস এই জন্ত
 কৰান হয় যে, এব দ্বাৰা শৰীৰে পঢ়ুতা আসে। আসনেৰ দ্বাৰা আমাদেৰ
 মেৰুদণ্ডেৰ হাড় এমন নমনীয় হয় যে, আমবা ইচ্ছামত শৰীৰকে বাঁকাতে
 বা ঘোৰাতে পাৰি। যাৰ মেৰুদণ্ডেৰ হাড় নমনীয় নহ সে শৰীৰ বাঁকাতে
 পাবে না, তাৰ শৰীৰ অনড হয়। যেমন শাৰীৰিক সাধনাৰ উদ্দেশ্যে
 মেৰুদণ্ডেৰ হাড় নমনীয় বাখাৰ জন্ত আসনেৰ অভ্যাস কৰা আবশ্যক,
 তেমনই মানসিক সাধনাৰ উদ্দেশ্যে অবধানৰ বিবিধ প্ৰযোগ কৰাও
 আবশ্যক।

মনেৰ সম্বন্ধ বাহ্য বিষয়েৰ সঙ্গ। মনকে আমবা শিক্ষিত কৰতে
 চাই। মনেৰ প্ৰশিক্ষণেৰ একটা ক্ৰম আছে। নন্দীশূত্ৰে এই ক্ৰম
 স্পষ্টভাৱে প্ৰতিপাদিত হৈছে।

প্ৰথম ক্ৰম-যুগল হল—অল্পগ্ৰাহী, বহুগ্ৰাহী। মনকে আমি এক
 কাজে লাগালাম, যাৰ একবিন্দু মাত্ৰই মন ধৰতে পাবে, মন অল্পই ধৰতে
 পাবে আৰ অল্পকালই কোন বস্তুকে ধৰে বাখতে পাবে। এই হল অল্প-
 গ্ৰাহী। বহুগ্ৰাহীৰ অৰ্থ—বহুকে ধৰা, বড বস্তুকে ধৰা, আৰ দীৰ্ঘকাল
 ধৰে বাখা।

আমবা প্ৰেক্ষা কৰি। শৰীৰেৰ প্ৰেক্ষা কৰি, শ্বাসেৰ প্ৰেক্ষা কৰি।
 উপদেশ দেওযা হয়, নাসাগ্ৰে যাতায়াতকাৰী শ্বাসকে দেখ। শ্বাসেৰ
 আগম দেখ, নিৰ্গমও দেখ। যে শ্বাস ভিতৰে আসছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য
 বাখ। যে শ্বাস বাহিৰে যাচ্ছে, তাকেও লক্ষ্য কৰ। নাসাগ্ৰ বিন্দুতে
 কেবল শ্বাসকে দেখ। মনকে নাসাগ্ৰেৰ ওপৰ কেন্দ্ৰিত কৰ, অবহিত
 কৰ। মনেৰ অবধানকে নাসাগ্ৰেৰ ওপৰ স্থাপিত কৰে যাতায়াতকাৰী
 শ্বাসকে দেখ। দবজাৰ দাঁড়িয়ে গ্ৰহবী সৰ্বদা দৃষ্টি বাখে, কে ভেতৰে

আসছে আব কে বাইবে যাচ্ছে। যখন কেউ ভেতবে আসে বা বাইবে যায়, তখন গ্ৰহণী সতৰ্ক হয়ে দেখে। সেই বকমভাবে নাসাগ্ৰ থেকে যে শ্বাস আসছে-যাচ্ছে, তাকে দেখতে হয়। এই শ্বাস বাইবে গেল, এই শ্বাস ভেতবে এল—এই গতাগতি দেখ, ধ্যানকে কেন্দ্ৰিত কব। এই হল অল্পেব প্ৰেক্ষা, অল্পেব অবধান। এই হল অল্পগ্ৰাহী।

বহুগ্ৰাহী অৰ্থাৎ বহুৰ প্ৰেক্ষা। উপদেশ দেওয়া হয়, মনকে শ্বাসেব সঙ্গে ভেতবে নিয়ে যাও, প্ৰশ্বাসেব সঙ্গে মনকে বাইবে নিয়ে এস। এটা বহুৰ অবধান—বহুগ্ৰাহী। অল্পগ্ৰাহীৰ ক্ষেত্ৰে আমাদেব পথ ছিল অল্প, এখন আমাদেব পথ হল দীৰ্ঘ। অল্পগ্ৰাহীৰ ক্ষেত্ৰে মনকে কেবল নাসাগ্ৰে স্থিৰ বাধা হয়েছিল, এখন মনকে শ্বাস-প্ৰশ্বাসেব পূৰ্বো পথেবই অবধান কৰতে হয়। পথ দীৰ্ঘ হয়ে যায়, ফলে যাত্ৰাও দীৰ্ঘ হয়। যেখানে নাভিৰ আশপাশ থেকে শ্বাস উঠছে সেখানেই শ্বাসেব সাথে মনকে জুড়ে দিতে হয় আব তাকে শ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে ভেতবে নিয়ে যেতে হয়। যেখানে গিৰে শ্বাসযন্ত্ৰ সমাপ্ত হয় আব শ্বাস ফুসফুসে প্ৰবেশ কৰে, সেখান পৰ্যন্ত মনকে নিয়ে যেতে হয়। একেবাবে ডায়াফ্ৰাম পৰ্যন্ত মনকে নিয়ে যেতে হয়। যেখানে শ্বাসেব সীমা সে পৰ্যন্ত শ্বাসকে টেনে নিতে হয়। এই হল বহুৰ অবধান, বহুৰ গ্ৰহণ, বহুৰ প্ৰেক্ষা। তুতবাং অভ্যাসেব এই দুটি ক্ৰম আছে—

১। অল্পেব গ্ৰহণ—অল্পকে দেখাব অভ্যাস।

২। বহুৰ গ্ৰহণ—বহুকে দেখাব অভ্যাস।

প্ৰথমটিৰ ক্ষেত্ৰে আমবা একটি ক্ষুদ্ৰ বিন্দুকে দেখি, দ্বিতীয়টিৰ ক্ষেত্ৰে আমাদেব পথ দীৰ্ঘ হয়ে যায়, অবগাহনেব মার্গও দীৰ্ঘ হয়ে যায়।

অভ্যাসেব দ্বিতীয় ক্ৰম-মুগল হল—

একবিধগ্ৰাহী।

বহুবিধগ্ৰাহী।

এক প্ৰকাৰ বস্তুকে দেখা আব বহু প্ৰকাৰ বস্তুকে দেখা। উপদেশ দেওয়া হয়েছে, নাসাগ্ৰে যে প্ৰকম্পন হচ্ছে তা দেখ, অথবা নাসাগ্ৰেব

ওপৰ স্বাসেব স্পৰ্শ অনুভব কৰ। এও এক প্ৰকাৰেৰে অবধান।

বেমৰ জলে প্ৰকম্পন হয়, উৰ্মিমালা ওঠে, তেমনই শব্দবোৰে প্ৰকম্পিত হয়। কেবল প্ৰকম্পন আৰু প্ৰকম্পন। উৰ্মি আৰু উৰ্মি। স্থিৰতা বলে কোন পদাৰ্থই নেই। এই পৰিস্থিতিতে উপদেশ দেওৱা হৈছে, নাসাগ্ৰে যে প্ৰকম্পন হয় তা দেখ। এও এক প্ৰকাৰেৰে গ্ৰহণ, এক প্ৰকাৰেৰে অবধান। এতে মনকে এক স্থানেৰে ওপৰে অবহিত কৰে দেওৱা হৈছে। একে বলে, একবিধগ্ৰাহী।

বহুবিধগ্ৰাহীৰ অৰ্থ হল—এক সঙ্গ আনেক বস্তুকে দেখা। মনেৰে পটুতা আৰু বেডে যায়। একসঙ্গে আনেক বস্তুকে কেবল দেখা 'নয়', মন তাদেৰে গ্ৰহণ কৰতেও সমৰ্থ হয়।

যে অবধান কৰে, সে মনকে পটু কৰাব প্ৰশিক্ষণও নেয। তাৰ অভ্যাস এত তীব্ৰ হয়, বলে তাৰ পটুতা এত বিকশিত হয়, সে একই সঙ্গে আনেক বস্তুকে ধৰতে পাবে। উপাধ্যায় বশোবিজয়জী শ্ৰেষ্ঠ অবধানকাৰী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্ৰতিভাশালী তাৰ্কিক বিদ্বান ছিলেন। তিনি অবধান কৰতে লাগলেন। একশ পিডলেৰ বাটি তাঁৰ সামনে বাধা হল। এক ব্যক্তি এক এক কৰে সবগুলি বাটি বাজাতে লাগল। প্ৰত্যেক বাটিৰ ধ্বনিই অবধানকাৰী অবধান কৰলেন। তাঁৰ মন ধ্বনিৰ সূক্ষ্মতা সন্মুখে অবহিত হল। একশ বাটিৰ ধ্বনিই এই ভাবে গৃহীত হল। তাৰপৰে পৰীক্ষাৰ সময় এল। পৰিদৰ্শ থেকে এক ব্যক্তি এল। সে একটা বাটি বাজাল, আৰু তাৰ সংখ্যা জিজ্ঞাসা কৰল। অবধানকাৰী বলে দিলেন ঐ ধ্বনি অমুক সংখ্যাৰ বাটিৰ ধ্বনি। এই ভাবে আৰু আনেক প্ৰশ্নকৰ্তা এল, বাটিৰ সংখ্যা জিজ্ঞাসা কৰল। অবধানকাৰী প্ৰত্যেক পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হলেন।

এ ধ্বনি পটুতাৰ জ্ঞান। একই বকমেৰে বাটিগুলিৰ ধ্বনি শ্ৰাৱণ এক বকমেৰেই হয়। কিন্তু অবধানকাৰী ধ্বনিগুলিৰ মध्ये সূক্ষ্ম পাৰ্থক্য ধৰতে পাবেন। তিনি আগৰ শ্ৰবণেন্দ্ৰিয়ৰে পটুতা এতই বিকশিত কৰেহেন যে ধ্বনিৰ অতি সূক্ষ্ম পাৰ্থক্যও তাঁৰ জ্ঞানগোচৰ হয়।

আমাদের সঙ্গেই কিছু অবধানকাৰী ‘সন্তুস্কান’ নামক অবধান কৰে থাকেন। এটা এক সঙ্গ অনেক বিষয় গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতাৰ পৰিচায়ক। একজন এক কথা বলল, আৰু একজন সেইক্ষেত্ৰেই আৰু এক কথা বলল। অবধানকাৰীৰ পেছনে তাৰ দুই হাতে দুটি ভিন্ন বস্তু স্পৰ্শ কৰা হ'ল। তিনি জন সামনে দাঁড়িয়ে তিনিটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দেখাল। এইভাবে সাত ব্যক্তি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ৰিয়া কৰল। সমস্তটাই একই ক্ষণে কৰা হ'ল। অবধানকাৰী ঐ সাতটি ক্ৰিয়াকেই একই ক্ষণে গ্ৰহণ কৰে নেয়। এমনি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্ৰিয়ৰ ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্য একই সঙ্গ ধৰতে পাৰা, আৰু সেগুলি যথাযথ বলতে পাৰা বহুবিধগ্ৰাহীৰ এক প্ৰকৃষ্ট উদাহৰণ। অবধানৰ একপ কুশলতা থেকৈ, পটুতাৰ একপ অভ্যাস থেকৈ, এক সঙ্গ অনেক বস্তুকে ধৰতে পাৰাৰ ক্ষমতা এসে যায়।

এই চাবটি বিকল্প হল—অল্পে গ্ৰহণ, বহু গ্ৰহণ, একবিধে গ্ৰহণ ও বহুবিধে গ্ৰহণ। এ মানসিক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ৰম। এই ক্ৰম অনুসৰণ কৰে মনকে প্ৰশিক্ষিত কৰা যায়। মনেৰে কি প্ৰবল শক্তি আছে আপনি কল্পনা কৰুন। আপোনাৰ একে বাত বা আশ্চৰ্য ব্যাপাৰ বলে মনে কৰিবেন না। মনেৰে এই প্ৰবল শক্তি সকলোই মध्येই আছে। আপোনাৰে মध्ये আছে, আমাৰ মध्ये আছে, প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মध्ये আছে। প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ মন সকল শক্তিৰ আধাৰ হ'ব আছে। এই মাত্ৰ পাৰ্থক্য যে, কিছু ব্যক্তি অভ্যাস দ্বাৰা মনেৰে পটুতা বিধান কৰেছে, মনকে বিকশিত কৰেছে। আৰু কিছু ব্যক্তি সেৱকম কোন প্ৰযত্ন কৰেনি, ফলে তাদেৰ মন বিকশিত হয়নি। পাৰ্থক্য কেবল প্ৰয়াত্নেৰে, কেবল অভ্যাসেৰে। আমাৰ যদি প্ৰযত্ন কৰি তবে আমাৰও মনেৰে পটুতা সাধন কৰতে পাৰি, আৰু তা হ'লে বহুবিধ গ্ৰহণ আমাদেৰ পক্ষেও সহজ হ'ব যাবৈ।

আমাদেৰ অনেক সাধু-সাধৱী অবধানৰে প্ৰয়োগ কৰে থাকেন। সাধাৰণ লোকেৰে আছে এটা আশ্চৰ্যজনক ক্ষমতা বলে মনে হয়। তাৰা মনে কৰে এটা চমৎকাৰী দৈৱী শক্তিৰ নিদৰ্শন। কিন্তু এতে চমৎকাৰিতা

কিছু নেই। এটা কোন দৈবী শক্তি বা বিজ্ঞা নয়। বাইবেৰ কোন শক্তিই নয়। এটা কেবল মনৰ প্ৰশিক্ষণ, মনৰ শক্তি। এই আধাবেই সব প্ৰযোগ ঘটে। একে চমৎকাৰ বলে মনে হতে পাৰে, কিন্তু আসলে এটা মনৰেই পটুতা, তাৰ অতিবিক্ত কিছু নয়।

তৃতীয় চৰণ হল—ক্ষিপ্ৰগ্ৰাহী, চিৰগ্ৰাহী। এবাও একটি যুগল।

মনকে এমন অভ্যাস কৰান হ'ব যে তা বাহ্য পদাৰ্থ তৎক্ষণাৎ গ্ৰহণ কৰতে পাৰে। অৰ্থাৎ একবাৰ মাত্ৰ দৃষ্টিপাত কৰে সব কিছু গ্ৰহণ কৰে নিতে পাৰে। তৎক্ষণাৎ গ্ৰহণ কৰতে পাৰে। কেউ একটি ঘৰ এক মুহূৰ্ত্ত দেখল, তাৰপৰে চোখ বুল্লে ঘৰে বা কিছু আছে সব বলে দিল। ভিতৰে বড় সাদা, সামনে কাল বঙেৰে বোৰ্ড, এতগুলি লেখাৰ তক্তা আছে, তাতে লাল, কাল, নীল অক্ষৰ আছে, এতগুলি দৰজা-জানালা আছে। মোটেৰ ওপৰে ঘৰেৰে পুরো বিবৰণ দিবে দিল। একেই বলে, ক্ষিপ্ৰ-গ্ৰহণ। এককালেই সব কিছু গ্ৰহণ কৰা, সব কিছু ধৰে নেওচা।

আমবা মনৰ ক্ষমতাৰ সঙ্গে পৰিচিত নই। মনৰ প্ৰচুব ক্ষমতা আছে। আমবা খুবই কম জানি। অল্প কিছু জানতে পাবলেই আমবা আশ্চৰ্য্যস্থিত হই। যদি আমবা মনৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা জানতে পাবি, বিকশিত কৰে নিতে পাবি, তবে কি না কি হতে পাৰে বোকা কঠিন। আজ মনৰ কিছু ক্ষমতাকে বিকশিত কৰে মানুষ ভগবান বনে যায়, সাবা ছুনিয়া তাকে ভগবান বলে মেনেও নেয়। ঠিক আছে। ভগবান হ'বে যাওঁবা কিছু খাবাপ কথা নয়। নিজেৰ অস্থৰে নিজেৰ যে ভগবান আছেন তাঁকে প্ৰকট কৰা খুবই ভাল কথা। তবে ছুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ভগবান বলে স্বীকাৰ কৰে। মনৰ সামান্য কিছু ক্ষমতাৰ প্ৰকাশ সামনে ঘটল, অমনি ভগবান বলে মেনে নিল। মনৰ পূৰ্ণ ক্ষমতা যদি জানতে পাবি, যদি সেই ক্ষমতাকে সাধনা কৰে অভিব্যক্ত কৰতে পাবি, তবে না জানি কত বড় ভগবান হ'বে যাব।

অন্তপক্ষে বিকল্প হল—চিৰগ্ৰাহী। চিৰগ্ৰাহী কোন কিছু তৎক্ষণাৎ ধৰতে পাৰে না, কিন্তু ধীৰে ধীৰে দীৰ্ঘ সময়ে তা ধৰে ও গ্ৰহণ কৰে।

চতুৰ্থ চৰণ হল—অনিঃসৃতগ্ৰাহী, নিঃসৃতগ্ৰাহী। এও এক ক্ৰমযুগল।

এই অনিঃসৃতগ্ৰাহী এক বিচিত্ৰ ক্ষমতা। এটা মনেৰে এমন অভ্যাস, এমন অবধান, যে তা আমবা কল্পনাই কবতে পাৰি না। এই বিষয় স্পষ্ট কবাব জন্তু আমি এক কাহিনী বলছি :

এক শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰকৰ বাজ্ঞনভাষ গেলেন। সেখানে দৈবযোগে তিনি বাণীৰ পায়েৰে একটা আত্মল দেখতে গেলেন। প্ৰাচীনকালে বাণীৰা ‘অশ্বৰূপ্পাশ্বা বাজ্ঞদাবা’ হ’তেন, সূৰ্য্যও তাঁদেৰে দেখতে পেত না। এখনকাৰ দিনে অশ্ববকন—এখন তো সব কিছুই অনাৱত। বা হোক, চিত্ৰকৰ বাণীৰ পায়েৰে আত্মল দেখে নিলেন। তাবপৰে তিনি বাণীৰ এক পূৰ্ণ প্ৰতিবুতি আঁকলেন। তিনি সেই চিত্ৰ বাজ্ঞাব কাছে আনলেন। বাজ্ঞা দেখলেন—মহাবাণীৰ চিত্ৰ। তিনি স্তম্ভিত হ’ব গেলেন। তাবপৰে ভাল কৰে চিত্ৰটি দেখলেন। যেখানে বাণীৰ দেহে তিল আছে বা জট আছে, চিত্ৰেও ঠিক সেখানে তিল বা জট আছে। বাণীৰ দেহেৰে প্ৰত্যেকটি চিহ্ন চিত্ৰিত বাণীৰ দেহেও আছে। চিত্ৰকৰ ভেবেছিলেন চিত্ৰটি দেখে বাজ্ঞা প্ৰসন্ন হ’বেন এক যথেষ্ট পুৰস্কাৰ দেবেন। কিন্তু ফল হল বিপৰীত। বাজ্ঞা মনে ক’বলেন বাণীৰ সঙ্গে চিত্ৰকৰেৰে গুপ্ত সন্ধি আছে, নতুবা এমন চিত্ৰ সে কি ক’ব আঁকল। বাজ্ঞা সন্দিক্হ হলেন, তাঁৰ মনে ভ্ৰান্ত ধাৰণা জন্মাল। তিনি চিত্ৰকৰ ও বাণী উভয়েৰে যুত্ৰাদণ্ডেৰে আদেশ দিলেন।

মন্ত্ৰীৰ হল ভূৰ্ভাবনা। দেশেৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰকৰ, যাঁকে পাণ্ডবা দেশ বা বাট্টেৰে সৌভাগ্য—তাঁৰ যুত্ৰাদণ্ড। এ যে মহা অনৰ্থ। মন্ত্ৰী বাজ্ঞাব কাছে গিয়ে বললেন—‘মহাবাজ্ঞ। আপনি এ কি ক’বছেন? এমন কুশলী চিত্ৰকৰকে বধ ক’ববেন, তাঁকে যুত্ৰাদণ্ড দেবেন?’ বাজ্ঞা উত্তৰ দিলেন—‘তুমি ঠিক জান না। এ লোক ভ্ৰষ্ট, ভ্ৰুশ্চবিদ্ৰ, আৰোগ্য।’ মন্ত্ৰী বললেন—‘সত্যিই কিন্তু এমন নৰ, মহাবাজ্ঞ।’ বাজ্ঞা বললেন—‘কি নিৰ্বোধেৰে বত কথা বলছ? শৰীৰেৰে কোথায় কোন চিহ্ন আছে তা

শৰীৰ না দেখে কি কৰে জানা যায় ?’ তখন মন্ত্ৰী বললেন—‘মহাবাজ । এই চিত্ৰকৰেৰে অদ্ভুত শক্তি আছে । সে দেখেৰে যে কোন অবয়ব দেখে সম্পূৰ্ণ চিত্ৰ বানাতে পাৰে, এই বৰ্ম চিত্ৰই বানাতে পাৰে ।’

বাজা পৰীক্ষা কৰে দেখলেন । চিত্ৰকৰ পৰীক্ষাৰ উত্তীৰ্ণ হলেন ।
বাজা তাৰ মৃত্যুদণ্ড বদ কৰলেন ।

এই হল অনিঃসৃতগ্ৰাহী । কোন বস্তুৰ অল্প কিছুকে আশ্ৰয় কৰে গোটা বস্তুটিই বিপ্ৰেৰণ কৰে দেওয়া ।

আব এক ঘটনাৰ কথা বলি ।

বোমেৰ বাদশাহ ভাৰতৰ বাজাৰ কাছে কিছু সুবমা পাঠালেন এবং জানালেন যে ঐ সুবমা অতিশয় মূল্যবান ও শক্তিশালী । ঐ সুবমা অন্ধত দূৰ কৰে—অন্ধেৰ চোখে লাগালে সে দৃষ্টিশক্তি বিৰে পায় । আসলে বাদশাহ পৰীক্ষা কৰতে চেৰেছিলেন ভাৰতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আছে কিনা । বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি না থাকে তৰে সে দেশ সহজেই জয় কৰে নেওয়া যাবে ।

দূত সুবমা নিয়ে ভাৰত এল । বাজাৰ কাছে এসে বাদশাহেৰ সব কথা বলল । বাজা ভাবলেন, সুবমাৰ পৰিমাণ তো খুবই অল্প, এ কাকে দেওয়া যাবে ? নগৰে তো অনেক অন্ধ লোকই আছে । যেটুকু সুবমা আছে তাতে কেবল একজোড়া চোখেৰ দৃষ্টি বিৰতে পাৰে । বাজাৰ তখন নিজেৰ বৃদ্ধ প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ কথা মনে হল । এই মন্ত্ৰী অতিশয় বুদ্ধিমান ও দূৰদৰ্শী ছিলেন । তিনি অন্ধ হয়ে যাওঁৰাৰ বাজকাৰ্য্য থেকে নিবৃত্ত হয়ে ঘৰেই সময় কাটাচ্ছিলেন । বাজা তাঁকেই ডেকে পাঠালেন । প্ৰধান মন্ত্ৰী এলেন । বাজা তাঁকে বললেন, ‘এই সুবমা নিন, চোখে লাগান, আঁৰাৰ দেখতে পাবেন । সুবমা কিন্তু এত অল্প যে তা একবাৰই দু চোখে লাগানো যেতে পাৰে । একথা মনে বাখবেন ।’

প্ৰধান মন্ত্ৰী সুবমাৰ কৌটো নিলেন । তুলিতে সুবমা ভৰে এক চোখে লাগালেন । অল্পক্ষণেৰ মধ্যেই সেই চোখেৰ জ্যোতি বিৰে এল । এক চোখে দেখতে পেলেন । তখন তিনি আব এক তুলি ভৰে সুবমা নিলেন,

কিন্তু তা চোখে না লাগিয়ে জিহ্বাব ওপৰ বেখে দিলেন। বাজ্জা বললেন, 'আবে, এ কি কবলেন ? আপনি তো কানা হয়ে থাকবেন, কেবল এক চোখে দেখতে পাবেন। লোকে আপনাকে কানা বলবে। ছিলেন অন্ধ, এবাব হলেন কানা।'

প্ৰধান মন্ত্ৰী বললেন—'বাজ্জন্। আমি কানা হব না। স্বয়ং চক্ষুদ্বান হয়ে হাজ্জাব হাজ্জাব লোকের দৃষ্টি ফিবিষে দেব।'

প্ৰধান মন্ত্ৰী যে সুবমা জিহ্বাতে লাগিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ কবে ফেললেন। বস্তুটি যে কি জানতে পাবলেন। আৰ দেখতে দেখতে সুবমাব পূবো 'ফমু'লা' লিখে বাজ্জাকে দিলেন। প্ৰধান মন্ত্ৰী বললেন, 'বাজ্জন্। এই সুবমাব সব উপাদানই আমি জানতে পোবেছি। এখন আমি এই সুবমা প্ৰস্তুত কবে হাজ্জাব হাজ্জাব চক্ষুহীনকে চক্ষুদ্বান কবব। যদি আমি সুবমাব দ্বিতীয় তুলি আমাব আৰ এক চোখে লাগাতাম তবে আমাব দুই চোখই দেখতে পেত, কিন্তু তাতে কেবল আমাব একলাবই লাভ হত। এখন আমি আমাব এক চোখেৰ সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ চোখেৰ জ্যোতি ফিবিষে আনতে পাবব।'

মন্ত্ৰী যবে গিবে সুবমা প্ৰস্তুত কবলেন। বোম থেকে আগত দূতকে এক কোঁটা সুবমা দিবে বললেন, 'ঘবে ফিবে যাও। তোমাব বাদশাহকে বল, এই বকম সুবমা তিনি যত চান আমাদেব দেশ থেকে চেয়ে নিতে পাবেন।'

দূত বোমে ফিবে বাদশাহকে সব কথা বলল। বাদশাহ বুঝলেন, যে দেশে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস কবে সে দেশ আক্ৰমণ কবলে পবাজয় অবশ্যস্তুবাবী।

এই হল অনিশ্চিত গ্ৰহণ। এটি অদ্ভুত শক্তি। কোন বস্তুৰ অল্প কিছু অংশকে আশ্ৰয় কবে সম্পূৰ্ণ বস্তুটি বিশ্লেষণ কবে দেওয়া।

এসব কল্পিত কাহিনী নয, কেবল কল্পনা বিলাস নয। এ সব মনৈব বিচিত্ৰ ক্ষমতাগুলিৰ প্ৰকাশ।

আমি মনৈব অবধানৈব কিছু কিছু প্ৰয়োগ, মনৈব প্ৰশিক্ষণেব কোন

কোন প্রশ্নালী, আলোচনা কবলাম। এব থেকেই আমবা বুঝতে পাবব যে, মনের ক্ষমতা অভ্যাসেব দ্বাৰা, সঞ্চনা দ্বাৰা বিকশিত কৰা যায়, আব মনকে পটু কৰে গড়ে নেওয়া যায়। এ সবই অবধাবণেব বিববণ, ধ্যানেব বিববণ নয। অবধাবণেব দ্বাৰাই যখন মনকে এতটা পটু কৰা যায় তখন ধ্যানেব দ্বাৰা মনের ক্ষমতা কতদূৰ বিকশিত হতে পাৰে তা নিজেবই বোধগমা। আপনাবা তা কল্পনা কৰে নিতে পাৰেন—আমাব বুঝিষে দেওয়াব আবশ্যকতা নেই।

অতএব আমাদেব সৰ্বাংগে অবধানেব অভ্যাস কৰতে হবে। মনকে কোথায় নিযোজিত কৰতে হবে, কেমন কৰে নিযোজিত কৰতে হবে এই সব তথ্য আমাদেব ঠিক বুঝে নিতে হবে. বাস্তব আমাদেব চেতনায় ধ্যান কৰাব যোগ্যতা এ ক্ষমতা আবিৰ্ভূত হয়। অবধাবণেব পৰে সংকেত্মানে মনের ধাবণাব কথা বুঝতে হবে। যখন এই দুইটি ঠিক বুঝতে পাবব, তখন তৃতীয় চৰণ, আমাদেব চেতনায় ধ্যান কৰাব ক্ষমতা জাগৃত হবে।

না করার মূল্য

একটি লোক একটি বাগানে ঢুকে দেখল অনেক লম্বা লম্বা গাছ আছে। সে বাগানের মালিকে বলল, ‘গাছগুলি বড়ই লম্বা হয়েছে।’ মালি বলল, ‘বাবুজী, ‘গাছেব লম্বা হওয়া ছাড়া আর কোন কাজ আছে।’

সবাব আগে কাজেব কথাই আমাদের চিন্তায় আসে। গাছ পর্যন্ত নিষ্কর্মা নয়। কোন পদার্থই কাজ ছাড়া থাকে না। বস্তুব লক্ষণই হল অর্থক্রিয়াকাবিত্ত। সেই বস্তুই সত্য, যা নিজেব কাজ কবতে থাকে, কিছু না কিছু কবতে থাকে। যা কিছু কবে না তা সৎ নয়, অর্থাৎ তাব কোনও অস্তিত্ব নেই, তা পদার্থ নয়। পদার্থেব অর্থই হল ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীলতা পদার্থেব সঙ্গে গুণপ্রোত্তভাবে জড়িত।

আমবা একথা জানি এক মানি যে, প্রত্যেক লোকেবই কিছু না কিছু কবা উচিত। পদার্থেবও কিছু না কিছু কবতে হয়। চেতন বা অচেতন উভয়েব মধ্যেই কিছু না কিছু কাজ হতে থাকে। যে লোক কিছু কবে তাকে উত্তোগী, কর্মঠ, কর্মী পুঙ্খ বলে মানতে হবে একথা আমবা গ্রাহ্য কবেছি। যে লোক কিছু কবে না তাকে অলস, বেকাৰ, প্রমাদগ্রস্থ এক অকর্মণ্য বলে আমবা মনে কবি। মানুষেব কোনও না কোনও কাজে নিবত থাক। উচিত, এই কথাব ওপরে আমবা বিশেষ

জোব দিই। যে কিছু কবে সে ‘আমি কিছু কবছি’ ভেবে আনন্দ পাব, আবার কখনও কখনও গৰ্বও অনুভব কবে। যে কিছু কবে না সে ‘আমি কিছু কবি না’ এই ভেবে হীনমন্যতা অনুভব কবে। অন্য লোকেও তাকে উপহাস কবে বলে—ও নিৰ্দ্ধৰ্মা, কিছুই কৰে না।

নিৰ্দ্ধৰ্মা লোকেৰ এই ছুনিষাব কোনও স্থান নেই। সৰ্বদাই কোনও না কোনও কাজে ব্যাপ্ত থাকি উচিত। বৰ্তমান কালৰ অৰ্থশাস্ত্ৰও বলাছে, নিৰ্দ্ধৰ্মা হ'লে খেৰো না। ব্যবসা বা অন্য যে কাজ পাও তাই কব, আৰ যদি কোন কাজ না মেলে তৰে গৰ্ভ খোঁড়, বোঁজাও, আৰাব গৰ্ভ খোঁড়, আৰাব গৰ্ভ ভব, তবুও কৰ্মহীন হ'লে খেৰো না। কোনও একটা কাজ কবতে থাক। এই ভাবে কাজ কৰাব ওপৰে আমবা এতটো জোব দিই যে নৈৰ্দ্ধৰ্মেৰ মূল্য আমাদেৰ দৃষ্টি খেকে একেবাবে লোপ পেৰে গিৰেছে। নিষ্ক্ৰিয়তাৰও তাৎপৰ্য আছে, একথা আজকাল আমবা আৰ স্বীকাৰ কৰি না। বৰ্তমান যুগ এত প্ৰবৃত্তিবহুল যে নিবৃত্তিৰ কথা আমাদেৰ বোধগম্য হয় না। নিবৃত্তিৰ এত নিন্দা কৰা হ'লেছে যে তাৰ যে কোনও মূল্য আছে একথা আমবা স্বীকাৰ কবতে চাই না। তাকে আমবা মূল্যহীন বানিষে দিৰেছি।

প্ৰবৃত্তিৰ ঘৰ্ষণ খেকে শুল্ক উৎপন্ন হতে থাকে। প্ৰবৃত্তি সংঘাত সৃষ্টি কৰে, সংঘাত উৎপাদন কৰে। প্ৰবৃত্তিকে একাধিকাৰ দেওঘাই বৰ্তমান কালৰ সব সংঘৰ্ষেৰ সবচেৰে বড় কাৰণ। বৰ্তমান কালৰ অশান্তিৰ মূল কাৰণ শুধু ত্ৰিষাকে মূল্য দেওঘা, অত্ৰিষাব মূল্য অনুভব না কৰা। নৈৰ্দ্ধৰ্মেৰ যে একটা বাস্তব মূল্য আছে এ কথা অস্বীকাৰ কৰা। এটাই আজকাল সবচেৰে বড় সমস্যা হ'লেছে।

আমি আজ কিছু জেপ্টাপাৰ্টা কথা বলব। এই প্ৰবৃত্তিবহুল যুগে আমাবও হয়ত প্ৰবৃত্তিৰ সমৰ্থন কৰা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা কবব না। প্ৰবৃত্তিৰ বিৰুদ্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। শ্ৰোতাদেব হয়ত সে সব কথা ভাল লাগবে না। কিন্তু সত্য গোপন কৰাও উচিত নয়। সত্য চিহ্নস্তন, অমোঘ। কাৰণ সত্যকে অস্বীকাৰ কৰলে তা খেকে নানা

প্ৰকাৰ সমস্ৰ্ভাৰ উদ্ভব হয় একৰ তা মানুহকে আক্ৰমণ কৰে। যদি প্ৰবৃত্তিৰ মথ্যে ভাবসাম্য স্থাপন কৰে নিবৃত্তিৰ বথার্থ মূল্য নিকপণ কৰা যায় তা হলে হয়ত নানা সমস্ৰ্ভাৰ আপনা থেকে সমাধান হয়ে যাবে।

নিবৃত্তিৰ মূল্য প্ৰবৃত্তিৰ চেয়ে কম নয়। অক্ৰিয়া ক্ৰিয়াৰ চেয়ে কম মূল্যবান নয়। যদি এই কথাৰ অর্থ বোধগম্য হয় তাহলে কৰ্মও খুব অর্থপূৰ্ণ হতে পাৰে। কৰ্মেৰ সাথে সাথে দুটি দোষ আসে। সেগুলি কমে যেতে পাৰে। গীতাতে সুন্দৰ একটি কথা বলা হয়েছে—‘প্ৰত্যেক প্ৰবৃত্তিৰ সাথে দোষ জড়িত আছে। এমন কোনও প্ৰবৃত্তি নেই যাব সঙ্গে কোনও দোষ সংশ্লিষ্ট নয়। যেমন ইন্ধন দ্বাৰা প্ৰজ্জ্বলিত অগ্নিৰ সাথে ধূমেৰ উপস্থিতি অনিবার্হ তেননি প্ৰবৃত্তিৰ সাথে দোষেৰ সহাবস্থান অনিবার্হ। ‘সৰ্ববস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিবিবাবৃত্তা।’ অগ্নি যেমন ধূমেৰ দ্বাৰা আবৃত সেই বকম সমস্ত আবস্ত দোষেৰ দ্বাৰা আবৃত। এই অন্তৰ্ভব বাস্তবিক, তা সত্য পৰ্বস্ত পৌছেছে। প্ৰবৃত্তিৰ যখন নিবৃত্তিৰ সঙ্গে সঙ্গতি হয় তখন প্ৰবৃত্তিৰ সহগামী দোষসমূহেৰ সমাপ্তি ঘটতে পাৰে। প্ৰবৃত্তি বেন নিবৃত্তিৰ সাথে সাথে চলে। অন্তৰ্ধায় প্ৰবৃত্তিৰ দোষ অত্যন্ত বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে মানুহেৰ সৰ্বনাশেৰ কাৰণ হয়। এই জন্ত আমবা যেন নিবৃত্তিৰ মূল্য বুঝি, অক্ৰিয়াৰ মহত্ব হৃদযক্ষম কৰি এক নৈৰ্ধৰ্মেৰ মহত্বপূৰ্ণ পৰিণাম অনুভব কৰি।

প্ৰবৃত্তিৰ সবচেয়ে বড় সাধন যন্ত্ৰ হল এই শৰীৰ। শুকতে আমি শৰীৰেৰ প্ৰবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কৰেছি। আজ আমি কিছু বিপৰীত আলোচনা কৰব। আমি প্ৰবৃত্তিৰ থেকে মুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰতে চাই।

আপনি কাযোৎসৰ্গ ককন। কাযাকে বিসৰ্জন ককন। শৰীৰকে ত্যাগ ককন। জীবিভাবস্থায় নিজেৰে মৃতবৎ অনুভব ককন। শৰীৰকে সম্পূৰ্ণ নিক্ষেপ, নিশ্চেষ্ট এক প্ৰবৃত্তিশূন্য ককন। একেই বলে বায়ুগুপ্তি বা কাযোৎসৰ্গ। শৰীৰকে উৎসৰ্গ কৰা, কাযাকে ত্যাগ কৰা, এ বড়ই কঠিন কাজ। মৃত্যুৰ পাৰে প্ৰত্যেক মানুহই শৰীৰ ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু

জীবিত অবস্থায় শরীরকে ত্যাগ করা বড়ই কঠিন সাধনা। কাষাকে ত্যাগের কথায় মহামুনি গৌতমের মনেও একটি প্রশ্ন জাগল। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কাষাশুন্তযাত্রা গং ভন্তে। জীবৈ কিং জগয়ই ? ভগবন্। কাষশুন্তি কা পবিণাম ক্য হৈ।’

কাষশুন্তিতে জীবৈ কি লাভ হয় ? কাষশুন্তিব পবিণাম কি ? তাব উত্তরে ভগবান বললেন ‘কাষাশুন্তযাত্রা গং সব্বং জগয়ই।’ কাষশুন্তি ছাড়া সব্বং হয়। দুটি কথা আছে— আশ্রব এবং সব্বং। যাব ছাড়া দোষ আমাদের ভেতর প্রবেশ করে তাকে আশ্রব বলা হয়। আমাদের ভেতরে কোন দোষ নেই। আমাদের আত্মাতেও কোনও দোষ নেই। ঘব পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন। তাব ভেতরে কোনও মলিনতা বা আবিলতা নেই। দবজা এবং জানালা দিয়ে ময়লা ও ধুলো ভেতরে আসতে থাকে। যেখানে এতটুকু কাঁক আছে সেখান দিয়ে ধুলো ভেতরে ঢুকতে থাকে। ঝড় আসে। তাকে বোধ করা সম্ভব হয় না। কেউ কখনও ঝড়ের গতিবোধ করতে পারে না। এমন কোনও উপায় নেই যাব ছাড়া ঝড়-তুফানের দুর্বার প্রবাহকে অচল করে দেওয়া যায়। কোনই উপায় নেই। কেউ কোনও দিন ঝড়-তুফানের গতিবোধ করতে পারে নি। কিন্তু এমন ব্যবস্থা বা উপায় আছে যাব ছাড়া ধুলোর ঘবেব ভেতরে প্রবেশ করা বন্ধ করা যায়। যদি আমরা দবজা-জানালা সব বন্ধ করে দিই তবে ধুলো ঘবেব ভেতরে আসতে পারবে না, বাইবেই থেকে যাবে। আমাদের চেতনায় কোনও আবিলতা নেই। চেতনা শুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ। কিন্তু যেমন প্রত্যেক ঘবেবই দবজা জানালা আছে সেই বকম চেতনাবও প্রবেশপথ আছে, দবজা জানালা আছে। তাকে আমরা আশ্রব বলব। আশ্রব কথাটির অর্থ ছিদ্র। সেই ছিদ্রপথে বাইবে থেকে তত্ত্ব আসে, আব তাতে আমাদের চেতনা ভবগূষ হয়ে যায়। এই সব তত্ত্ব বিজ্ঞাতীয়, আগন্তুক। বা বিজ্ঞাতীয় তা প্রায়শই সঙ্কট সৃষ্টি করে, নানা প্রকাব সমস্যা সৃষ্টি করে। বা স্বাভাবিক, আপনা আপনি ঘটে, তা থেকে বিপ্লব উদ্ভব হয় না। বিজ্ঞাতীয় বস্তুতে সর্বদাই বিপ্লব আশঙ্কা থাকে।

তাকে অস্বীকাৰ কৰা সম্ভৱ নহয়। আমাদেৱ এমন ব্যৱস্থা কৰতে হ'বে যাতে আশ্ৰৱ না থাকে। চেতনাৰ দৰজা জানালা যেন খোলা না থাকে, কোনও ছিদ্ৰ যেন খোলা না থাকে। সব প্ৰৱেশপথ যেন বন্ধ হ'য়ে যায়, সুবক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় 'গুপ্' ধাতুৰ অৰ্থ 'বন্ধণ'। 'গুপ্ত' কথাটিৰ অৰ্থ হ'বে 'সুবক্ষিত'। কাষগুপ্তিৰ অৰ্থ, শৰীৰকে সুবক্ষিত কৰা। আমবা শৰীৰকে এমনভাবে সুবক্ষিত কৰব যাতে ভেতৰে কোনও আগন্তুক বস্তু কোনও অবকাশ বা শূণ্যস্থান না পায়। বাইবেৰ কোনও কিছু ভেতৰে আসতে না পাবে। কেবল আমবা থাকব, আমাদেৱ চেতনা থাকবে, এ ছাড়া ভেতৰে আৰ কিছু থাকবে না। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ নাম 'সংবৰ'। ভগবান মহাবীৰ বলেছেন, 'মে কাষগুপ্তি কৰতে পাবে সে সংবৰ উৎপন্ন কৰে, আশ্ৰবেৰ পথ বন্ধ কৰে। যে সংবৰ উৎপাদন কৰে সে নিজেই সংবৰ হ'য়ে যায়।'

তিনি এক বিৰাট মহত্বপূৰ্ণ কথা বলেছেন, বাইবে থেকে যা কিছু নেওয়া হয় তা নেওয়াৰ একমাত্ৰ উপায় আমাদেৱ শৰীৰ। মানসিক, বাচনিক বা স্বাসংক্ৰান্ত যে কোন পৰমাণু আমাদেৱ ভেতৰে প্ৰবিষ্ট হোক না কেন তাদেৱ সৰাৰ জন্তু একটিমাত্ৰ আশ্ৰৱ বা প্ৰৱেশ পথ আছে—সেটি আমাদেৱ শৰীৰ। শৰীৰে যদি চঞ্চলতা না থাকে, প্ৰৱৃতি না থাকে, সক্ৰিয়তা না থাকে, তৰে শৰীৰেৰ ভেতৰে কোনও কিছুই প্ৰৱেশ কৰতে পাবে না। যে সমস্ত পৰমাণু শৰীৰেৰ ভেতৰে প্ৰবিষ্ট হয় সেগুলি শুধু শৰীৰেৰ চঞ্চলতাৰ ফলেই প্ৰবিষ্ট হতে পাবে। শৰীৰেৰ চঞ্চলতা নিঃশেষিত কৰা, তাৰ সমাপ্তি ঘটানোৰ নামই কাষগুপ্তি। শৰীৰে এমন স্থৈৰ্য আনতে হ'বে যাতে দেহ নিজেই ধ্যানে পৰিণত হয়। আপনাবা ভাববেন না যে কেবল মনেই ধ্যান হয়। অনেক যোগাচাৰ্য, অনেক বিদ্বান লোক কেবল মানসিক ক্ৰিয়াকে ধ্যান মনে কৰেন। কিন্তু জৈন আচাৰ্যদেৱ মত অন্য বকম। তাঁৰা তিন প্ৰকাৰ ধ্যানেৰ কথা বলেছেন— কাৰিক ধ্যান, বাচনিক ধ্যান ও মানসিক ধ্যান। যেমন স্থিৰ মন ধ্যানে পৰিণত হয় তেমন স্থিৰ দেহও ধ্যান

হতে পাবে। শবীবের স্থিবীকৰ্ণও ধ্যান।

ধ্যানেৰ আক্ষৰিক অৰ্থ—চিন্তা কৰা। ‘ধ্য’ ধাতুৰ মৌলিক অৰ্থ চিন্তা কৰা। এই ধাতু থেকে ‘ধ্যান’ শব্দটি নিস্পন্ন হযেছে। এটি শাব্দিক সংজ্ঞা মাত্ৰ। শব্দেৰ অৰ্থেৰ বিস্তাৰ হয়। সঙ্কোচন হয়। শব্দেৰ অৰ্থেৰ যখন বিস্তাৰ হয় তখন শব্দ মূল অৰ্থেৰ সঙ্গ্ৰে বাঁধা থাকে না। ‘ধ্যান’ এই শব্দও তাৰ মূল ‘চিন্তা কৰা’ এই অৰ্থেৰ সঙ্গ্ৰে আবদ্ধ থাকে না। তাৰ অৰ্থ প্ৰসাৰ লাভ কৰেছে। এব অৰ্থ হযেছে স্থিবী-কৰণ বা স্থিব কৰা। ধ্যানেৰ অৰ্থ—শবীবকে স্থিব কৰা, বচনকে স্থিব কৰা, মনকে স্থিব কৰা। মন স্থিব হলে মানসিক ধ্যান হয়। বচন স্থিব হলে বাচনিক ধ্যান হয়। শবীব স্থিব হলে কাষিক ধ্যান হয়। কাষিক ধ্যান সব ধ্যানেৰ মূল। বতঙ্গণ কাষিক ধ্যান না হয় ততঙ্গণ বাচনিক বা মানসিক ধ্যান সম্ভব হয় না। শবীবের স্থিবতা ছাড়া স্বাসেৰ স্থিবতা হয় না, স্বাসেৰ স্থিবতা না হলে মনেৰ স্থিবতা আনা সম্ভব নয। মনকে স্থিব কৰতে হলে স্বাসেৰ স্থিবতা আনতে হবে, আব স্বাসকে স্থিব কৰতে হলে কাষাব স্থিবতা আনতে হবে। সেই জন্ম বলা যেতে পাবে ধ্যানেৰ আধাবভূত তত্বসমূহেৰ মধ্যে সবচেয়ে বড তত্ব কাষাব স্থিবতা, অৰ্থাৎ কাষোৎসৰ্গ বা কাষগুপ্তি।

মানসিক ধ্যান পৰ্যন্ত পৌছনো অত্যন্ত কঠিন কাজ, কাষিক ধ্যান পৰ্যন্ত পৌছনো অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধকেৰ পক্ষে সাধনাৰ প্ৰাবস্তিক পথ কাষিক স্থিবতা বা শিথিলীকৰণ অভ্যাস কৰা। যে লোক কাষিক স্থিবতা অভ্যাস কৰেছে সে মানসিক স্থিবতা পৰ্যন্ত পৌছবাৰ ক্ষমতা প্ৰাপ্ত হযেছে। যে শবীবের স্থিবতা সাধন কৰতে পাবে না সে মানসিক ধ্যান পৰ্যন্ত যেতেই পাবে না। সবাৰ আগে শবীবের স্থিতি আনা প্ৰযোজন। তা কৰতে পাবলে মস্তিষ্ক অস্থিবতা থেকে মুক্ত থাকবে, তাৰ কোনও বন্ধম উদ্ভেজনা থাকবে না। জ্ঞানবাহী স্নায়ু সম্পূৰ্ণ স্থিব হয়ে যাবে, তাতে আব উদ্ভেজনা থাকবে না। মাংসপেশীসমূহ শিথিল হয়ে যাবে, ঢিলে হয়ে যাবে। দৃঢ় মাংসপেশী অববোধ সৃষ্টি কৰে, সেইজন্ম তাদেৰ

শিথিল ক'বা অত্যন্ত আবশ্যক। মেকদণ্ডেব হাড শিথিল হও'বা প্ৰযোজন বাতে তাব ভেতৰে কোনও উত্তেজনা না আসে। শবীববেব প্ৰত্যেক অবযব যেন উত্তেজনা থেকে মুক্ত থাকে, কোনও বকম বক্ততা বা স্কোড না থাকে। এই হল প্ৰাৰম্ভিক সাধনা। সবাব আগে আমাদেব এমন নিপুণতা লাভ কবতে হবে যে আমবা ইচ্ছা কবলেই আমাদেব শবীবকে শিথিল কবতে পাৰি। সাধাবণ সাধকেব পক্ষে এই প্ৰক্ৰিয়া অত্যন্ত উপযোগী। আমি স্বীকাৰ কৰছি যে কিছু লোকেব মানসিক ধ্যানেব ভূমিকা পৰ্যন্ত পৌছাবাৰ ক্ষমতা আসতে পাৰে। সবাই ঐ ভূমিকা পৰ্যন্ত পৌছতে পাৰে না। যদি কেউ এই ভূমিকা পৰ্যন্ত যেতে পাৰে তৰে সেটা তাব পক্ষে অত্যন্ত আনন্দেব বিষয়। কিন্তু কাজটা বড়ই কঠিন। শাৰীৰিক স্থিৰতা, কাৰিক ধ্যান, কাৰ্যোৎসৰ্গ বা কাৰ্যশুষ্ঠি সকলেব পক্ষেই সম্ভব হতে পাৰে। যদি এই ভূমি প্ৰাপ্ত হও'বা যায তৰে জীবন সকল হৰে।

কেউ কেউ মনে কৰেন, অবধানেব ভূমিকা যদি বা পাও'বা যায, ধ্যানেব ভূমিকা অনেক দূৰে। আমি বলতে চাই যে অভ্যাস কবতে কবতে আমবা যদি অবধানেব ভূমি পৰ্যন্ত পৌছতে পাৰি তৰে তা কি ধ্যানেব ভূমিব দিকেই এগোনো নয়? এ কি কম কথা? মনেব যে অবধান চাবদিকে এলোমেলোভাবে ঘূৰে বেড়ায তাকে যদি এক বিষয়েব ওপৰে কেন্দ্ৰিত কবতে আমবা সফলকাম হই তৰে সেটা খুব সামান্য উপলব্ধি বলে মনে কৰবেন না। ভাবনা পৰ্যন্ত পৌছতে পাৰা আবও বড় কথা। আমি বলতে চাই আপনাবা হয়তো অবধানেব ভূমিকাতেও পৌছবেন না, ভাবনা পৰ্যন্তও পৌছবেন না। কিন্তু আপনাবা যদি কাৰ্যোৎসৰ্গেব ভূমিকা পৰ্যন্ত পৌছতে পাবেন, যদি কাৰিক স্থিৰতা এবং শিথিলীকৰণেব স্থিতি পৰ্যন্ত আসতে পাবেন তৰে আপনি ধ্যান সাধনাব দিকে আগ্ৰহ হুছেন, সেই দিকেই এগিয়ে বাছেন।

আজকালকাৰ সবচেয়ে বড় সমস্যা—শাৰীৰিক উত্তেজনা। বৰ্তমান যুগ অতিবিক্ত সন্ধ্ৰিয়তা এবং দৌড়ৰ্যাপেব যুগ। শক্তিক্ষয়েব তথা

জীবনীশক্তিৰ অপব্যয়েৰে সবচেয়ে বড় কাৰণ অতিবিক্ত সক্রিয়তা। অতিবিক্ত সক্রিয়তাৰ বলে স্বাস্থ্যৰ অত্যধিক তীব্রতা এসে যায় এবং তাৰ ফলে অনেক শক্তিৰ অপচয় হয়। শৰীৰ স্থিৰ কৰা এবং দীৰ্ঘ স্বাস্থ্য নেওচা এই দুটি কৌশল যদি আজকালকাৰ লোকে শিখে নেৰ তাহলে তাৰা অনেক কঠিন সঙ্কট থেকে বাঁচতে পাবে। বৰ্তমান প্ৰবৃত্তিবহুল যুগেৰে পক্ষে কাৰ্যোৎসৰ্গ ২। কাৰ্যগুপ্তি মহোষধেৰে কাজ কৰতে পাবে। এব দ্বাৰা লোকে বহু কঠিন সঙ্কট থেকে আত্মৰক্ষা কৰতে পাবে। প্ৰবৃত্তিবহুলতা এবং অতিব্যস্ততাৰ বলে মানুহৰ অনেক বৰম মানসিক বিকৃতি ও শাৰীৰিক ব্যাধিতে আক্ৰান্ত হচ্ছে। ঐ সব বোগ থেকে বাঁচাব একমাত্র উপায় শৰীৰকে স্থিৰ কৰা, শিথিল কৰা। এ মন্ত বড় উপলব্ধি। শাস্ত স্বাস্থ্য এবং শাস্ত শৰীৰ, সাধনাৰ দুটি মহত্বপূৰ্ণ উপায়। এই কথাৰে খুবই মহত্ব ভৱ বলে স্বীকাৰ কৰতেই হবে। শাৰীৰিক মূল্যেৰ দিক থেকে আমি এই তত্ত্বেৰ আলোচনা কৰলাম। এব আধ্যাত্মিক মূল্যও কম নহ।

সুত্ৰকৃতাত্ম সূত্ৰে একটি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে—কে কৰ্মেৰ দ্বন্দ্ব কৰতে পাবে ? আমাদেৰে সঞ্চিত সংস্কাৰ কি কৰে নিঃশেষে দ্বন্দ্ব পেতে পাবে ? এই প্ৰশ্নেৰ উত্তৰে বলা হৈছে—

ন কস্মিণা কস্ম খক্বেতিবালা

অকস্মিণা কস্ম খক্বেতি ধীৰা।

অৰ্থাৎ কৰ্মেৰ দ্বাৰা কৰ্মদ্বন্দ্ব হয় না। জ্ঞানীগণ অকৰ্মেৰ দ্বাৰা কৰ্ম দ্বন্দ্ব কৰেন।

অজ্ঞানী লোক মনে কৰে তাৰা প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিৰ দ্বন্দ্ব কৰবে, সংস্কাৰ দ্বাৰা সংস্কাৰ নষ্ট কৰবে। তাৰা ভ্ৰান্ত, অজ্ঞান, তমসচ্ছন্ন। তাৰা সত্যকে জানে, কিন্তু বাস্তবিকতাকে জানে না। প্ৰবৃত্তি দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিকে নিঃশেষ কৰা যায় না, সংস্কাৰ দ্বাৰা সংস্কাৰেৰ সমাপ্তি ঘটানো যায় না। মাৰে মাৰেই প্ৰবৃত্তিৰ পুনৰাবৃত্তি হয়। প্ৰবৃত্তি অনেক সময়েই গোপন থেকে যায়। প্ৰত্যেক প্ৰবৃত্তি সংস্কাৰ চালনা কৰে। ঐ

সংস্কার অথ প্রবৃত্তিৰ আশ্রয় নেওকাৰ প্ৰবোচনা দেয়। আমবা অপৰ
 প্ৰবৃত্তিকে আশ্ৰয় কৰলে সেই প্ৰবৃত্তি তাৰ সংস্কাৰ চালনা কৰে। সেই
 সংস্কাৰ তৃতীয় প্ৰবৃত্তিৰ প্ৰেৰণা দেয়। এই বকম চক্ৰাকাৰে প্ৰবৃত্তি ও
 সংস্কাৰ চলতে থাকে। তাৰ কোনও শেষ নেই। প্ৰবৃত্তি দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিৰ
 চক্ৰবাহু ভেদ কৰা যায় না। এই প্ৰবৃত্তিৰ পালা অন্তহীন ভাবে প্ৰলম্বিত
 শৃঙ্খল। কেউ তাকে অতিক্ৰম কৰতে পাৰে না, তাৰ শেষৰ নাগাল
 পায় না। তাহলে এই প্ৰশ্ন দাঁড়াই যে, এই প্ৰবৃত্তিৰ পালাকে কি ভাবে
 ভেঙ্গে দেওয়া যায়। এই সব সংস্কাৰেৰে কি কৰে সমাপ্তি ঘটানো
 যায়? যে সব সংস্কাৰ আনাদেব প্ৰবৃত্তিৰ সঙ্গে সংলগ্ন কৰে বেখেছি,
 একেৰ পৰ এক যে সব সংস্কাৰ নিৰ্মিত হৈছে, আৰু স' বহু বিভিন্ন
 প্ৰবৃত্তিৰ প্ৰেৰণাদাতা, তাদেব কি কৰে নিৰ্মূল কৰা সহ্য হ'তে পাৰে?
 তাৰ উত্তৰে বলা হৈছে, 'অকস্মাৎ কস্ম খবেন্তি ধীবা।' যে জ্ঞানী, যাৰ
 সত্যেৰ বোধ হৈছে, অন্ধকাৰ ভেদ কৰে যে আলোতে পৌছেছে, যাৰ
 বাস্তবিকতাৰ বোধ এসেছে, সে জানে অকৰ্মেৰ দ্বাৰা কৰ্মকে গাঁও কৰা
 যায়। অকৰ্ম অৰ্থাৎ নিবৃত্তি দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিৰ সমাপ্তি ঘটানো যায়।

প্ৰবৃত্তিৰ অবসান হলে পুৰানো সংস্কাৰ জেগে থাকলেও তাৰ বৃদ্ধি বা
 পুনৰাবৃত্তি হয় না, ফলে সংস্কাৰ শিথিল হৈয়ে যায়। আৰাৰ জাগলে
 যদি তাৰ পুনৰাচৰণ না হয় তৰে তা আৰুও শিথিল হৈয়ে যায়। সংস্কাৰ
 মাথা উঠু কৰলে যদি তাৰ পুনৰাবৃত্তি না ঘটে তৰে তাৰ বিলোপ হয়,
 বিনাশ হয়।

অতিথি এসেছে। তাৰ সংস্কাৰ কৰা হৈছে। সে যদি আৰাৰ
 আসে এবং সে যদি আৰাৰ আতিথ্য পায় তে সে আৰাৰ আসবে।
 সে মনে কৰবে—এ তো বেশ ভাল ব্যাপাৰ, আতিথ্যও মিলছে, পৰিচৰ্যাও
 মিলছে। সে আসতেই থাকবে।

অতিথি এল। সে সংস্কাৰ পেল না। সে উপবাসে বহিল। যদি
 সে নিৰ্লজ্জ বেহায়া হয় তৰে দ্বিতীয়বাৰ আসবে। আৰাৰ উপেক্ষা পেল
 আৰ তৃতীয়বাৰ আসবে না। সে ভাবে—যেখানে শুধু তিবস্কাৰ পাওয়া

যায সেখানে কেন যাব ? সে আব যায না ।

এই হল প্রবৃত্তিৰ বাঁতি । সংস্কাৰ জেগে উঠলে তাৰ যদি থাকাৰ জাযগা মেলে তবে তা জমতে আবন্ত কৰবে । সে আব তখন অতিথি থাকতে চায না, পৰিবাবেব সদস্ত হতে চায । তখন তাকে সেধান থেকে সবিয়ে দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপাব হযে পড়ে । যে সংস্কাৰ এসেছে তাৰ যদি থাকাৰ জাযগা না মেলে, যদি সে শুধু উপেক্ষা পায, তবে তাৰ আব পুনৰাবৃত্তি হয় না । তিবস্কৃত হলে সংস্কাৰ ধীবে ধীবে ক্ষীণ হয়ে যায় । একবাৰ তিবস্কাৰ কটু বলে অনুভূত হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বাৰও যদি একই অনুভূতি হয় তবে সেই সংস্কাৰ আব আসতে পাবে না, তা ক্ষীণ হয়ে যাবে, বিনাশপ্রাপ্ত হবে । এ বকম হতে হতে অবশেষে সংস্কাৰ শেষ হয়ে যাবে । সে আব পৰিবাবেব সভ্য হতে পাবে না, আবাব অতিথিৰ ভূমিকা নিবেও ঘৰে প্রবেশ কৰতে পাবে না ।

এই জন্তাই বলা হয়েছে—‘অকস্মণা কস্ম খবেন্তি ধীবা ।’ যে লোক গম্ভীৰ, যাৰ ধৃতি ও ধৈৰ্য আছে, যে ঘটনাকাণ্ডে ভীত হয় না, বিচলিত হয় না, যা ঘটে তা জানে, দেখে, কিন্তু বিচলিত হয় না, সে অকৰ্ম দ্বাৰা, অপ্ৰবৃত্তি দ্বাৰা কৰ্মকে ক্ষীণ কৰে । সে সংস্কাৰকে নিঃশেষ কৰে, বিলীন কৰে ।

অকৰ্ম দ্বাৰা কৰ্মকে ক্ষীণ কৰাব, নিবৃত্তি দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিকে ক্ষীণ কৰাব, তথা নিবৃত্তি দ্বাৰা প্ৰবৃত্তিৰ দোষসমূহ ক্ষীণ কৰাব তব্ব আজকাল আমাদেব কাজে গৌণ এক অনেক দুবেব ব্যাপাব হযে দাঁড়িয়েছে । আজকাল একটা বব উঠেছে, ‘কব’, ‘কব’, আবও ‘কব’ । তাৰ পৰিণাম হিসেবে আজকালকাৰ লোক শাবীৰিক ক্ৰান্তি, স্নাবৰিক শ্ৰান্তি এক মানসিক অবসাদে পীড়িত হচ্ছে । এই সমস্ত অবসাদ বা ক্ৰান্তি থেকে বিবক্তি, চিন্তাবিক্ষেপ, অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি, আবুলতা, ব্যাবুলতা, লোভ প্ৰভৃতি নানা প্ৰকাৰ দোষ সমুদ্ভূত হয় । তাৰ পৰিণাম কোথাও লড়াই, কোথাও যুদ্ধ, কোথাও সংঘৰ্ষ, কোথাও বিবোধ, কোথাও বা বিবাদ । সবাইকে এ সব অপ্ৰিয় পৰিণাম ভোগ কৰতে হচ্ছে । এত দুঃখ, এত

ব্ৰহ্ম সত্ত্বও কেন আমবা এই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা কৰি না ?

উদ্যোগপতিবা এক বাজনীতিব নেতাবা বাব বার প্ৰগতিব কথা বলে বলে ব্ৰাহ্মি বোধ কৰেন না। তাঁবা সদা সৰ্বদা প্ৰগতিব কথা বলে চলেছেন। প্ৰগতিব জন্তই প্ৰবৃদ্ধি অনিবাৰ্হ। ভৌতিক প্ৰগতি বা পদাৰ্থতাত্ত্বিক প্ৰগতিব জন্ত প্ৰযোজন বিবানবিহীন কঠোব পবিত্ৰম, আব নিববচ্ছিন্ন প্ৰবৃদ্ধি। প্ৰগতিব জন্তই প্ৰবৃদ্ধি অনিবাৰ্হ হয়েছে। এ কথা সত্য, কিন্তু এব পবিণামেব কথা যেন আমবা ভাবি। পবিণাম বিবেচনা কবলে আমবা জানতে পাবব যে নিবন্ধুশ ঔদ্যোগিক এক ভৌতিক প্ৰগতি নান্মশকে অন্ত আব এক দিকে ঠেলে দিচ্ছে। নান্মব শুধু এলোমেলো ভাবে ঘূৰে মবে। পবিণাম স্মৰকব হয় না। নান্মব নিজেই প্ৰবৃদ্ধিব গ্ৰাস হয়ে পড়েছে, প্ৰবৃদ্ধিব শিকাৰে পবিণত হয়েছে। আধুনিক বাজনীতিব নেতাবা এক উদ্যোগপতিবা যদি আপন আপন স্বাৰ্থকে গৌণ কবতে পাবে এক এই তথ্য বুঝতে পাবে যে প্ৰবৃদ্ধিকে সীমাবদ্ধ কবা এক সঙ্গ সঙ্গ নিবৃদ্ধিব যে মূল্যায়ন কবা উচিত, আমি স্বীকাৰ কৰি যে তাহলে নান্মবেব চেতনা ঠিক দিকে প্ৰবাহিত হতে থাকবে, স্মৃদ্ধ থাকবে এক সত্ত্যব দিকে বিকশিত হবে।

আজকালকাৰ সংঘৰ্ষ চেতনা ও পদাৰ্থেব সংঘৰ্ষ। বৰ্তমান কালে পদাৰ্থই প্ৰধান হয়ে পড়েছে। পদাৰ্থেব আববণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে বাচ্ছে। কিন্তু তা না হয়ে চেতনায বিকশিত হওয়া এক পদাৰ্থেব চেতনায অন্তগামী হওয়া উচিত। যদি তা নাও হয় তবে অস্তুত তাদেব একটা ভাবসাম্য নিয়ে আসা অত্যন্ত প্ৰযোজন। কিন্তু আজকাল সব বিপন্নীত ঘটনা ঘটছে। সমস্ত বিশ্ব আজ তাব দুঃখময পবিণাম ভোগ কবছে।

এই জন্ত আমাদেব কাবজন্তিব মূল্য বোকা প্ৰযোজন। তাব মূল্য অতি মহৎ। সাধনায ও মূল্য অনেক মহৎ।

লোকে শিবিবে আসে দশ, বিশ কিংবা খুব বেশি হলে ত্ৰিশ দিনেব জন্ত। তাবা মনে কবে তাবা নিঃসৰ্মা হয়ে বসে আছে। কোনও কাজ

কবতে হচ্ছে না। বিনা কাজে সময় কেটে যাচ্ছে। শিবির আলস্য শিক্ষা দিচ্ছে, এই বকম অনুভব হয়। যে বহু কাজ করত অভ্যস্ত এবং প্রবৃত্তিতে অতিশয় বিশ্বাসী, তার মনে হবে শিবিরে নিত্যন্ত কর্মহীন তার দিন কাটছে। এত অলস লোকের সমাজ তৈরি হবে। আমি বুঝি, ঐ চিন্তা বথার্থ নয়। ঐ বকম চিন্তা করা উচিত নয়। আমরা তো প্রবৃত্তিময় জীবন যাপন করছি। কিছু আনন্দের প্রয়োজন নিবৃত্তি কি তা বোকা, নিবৃত্তির মূল্য নিকণ কবা এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্য একটা ভারসাম্য স্থাপন করা। এই অভিমুখে যদি আমাদের গতি হয় তবে শিবিরেব মস্ত বড় সার্থকতা হবে। যদি শিবিরে অকর্মের বাস্তবিক অভ্যাস হয়ে থাকে এবং তার বথার্থতার মূল্য আমরা বুঝতে পেরে থাকি তবে আমি মনে করব শিবিরেব বিরাট সার্থকতা লাভ হয়েছে, ব্যর্থতাব অনুভূতি আসবে না। অকর্মের ক্ষণই আমাদের জীবনের বিকাশ হয়। যে লোক সশ সর্বদা ব্যস্ত থাকে তাব পক্ষে এই জ্ঞান যথেষ্ট উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। যদিও শারীরিক দৃষ্টিতে প্রবৃত্তি এই ব্যবস্থা যে, লোকে দিনের বেলায় জেগে থাকবে এবং রাত্রে ঘুমাবে, যতটা কাজ কববে ততটা বিশ্রাম কববে, লোকে এই নিয়মও লঙ্ঘন করছে। যে সময়টা নিদ্রার জগু নির্দিষ্ট সেটাও তারা কেড়ে নিচ্ছে। আগেকার দিনে বাবা এই নিয়ম লঙ্ঘন কবত তাকে নিশাচব বলত। নিশাচবের অর্থ ব্রাহ্মস। তারা বাত্রিকালে পরিত্রমণ কবে। আন্তকালকাব মানুষ সেই নিশাচবে পরিণত হয়েছে। তাবা বাতে খাওয়াশাওয়া কবে, বাতে কাজ কবে, বাতে যাতায়াত কবে। জীবনব্যতীর ধাবা একেবাবে উলটে গিয়েছে। কিছু শারীরিক এবং স্নায়বিক ব্যবস্থাব তথা আপেক্ষিক বিশ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিবৃত্তিজাত প্রবৃত্তিব পবিপ্ৰেক্ষিত বিচাব কবলে আমবা এ কথা অস্বীকাব কবতে পাবব না যে প্রবৃত্তিব সঙ্গে নিবৃত্তিব কর্মের সঙ্গে অকর্মের সামঞ্জস্য হওয়া প্রয়োজন। কর্মের পবিমাণ এত হওয়া উচিত নয় যে তাতে অকর্ম লোপ পোয়ে বাবে। কর্মের শেষ এত গুচ্ছাব না হয় যে তাতে মানবচেতনা একেবাবে

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আচাবান্দ্র শূত্রে বলা হয়েছে—‘অবাস্তে জানাই।’
 যে অবর্ণা সেই জানবে, দেখবে। আপনাবা হরত পড়েছেন যে
 বৈজ্ঞানিকদের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধিগুলি তাঁদের নিশ্চিত এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে
 অবস্থানের সময়ে হয়। খুব কম লোকের কাজ করতে করতে মহত্বপূর্ণ
 উপলব্ধি হয়েছে। যে লোকের ইনটুইশন অর্থাৎ আন্তরিক বোধ তথা
 আন্তরিক শক্তি বিকশিত হয়েছে, কোনও মহৎ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে,
 তাব সেই উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে চিন্তাশূন্য এবং নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান-
 কালে। নিষ্ক্রিয়তা নিজেই একটি মহৎ উপলব্ধি। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ, বাইবে
 কর্তৃহীনতা আব ভেতবে সক্রিয়তা। নিষ্ক্রিয়তার অর্থ আলস্য নয়।
 কোন লোক বাইবে সক্রিয় এবং ভেতবে নিষ্ক্রিয় হতে পারে। আবার,
 অন্য কোনও লোক বাইবে নিষ্ক্রিয় এবং ভেতবে সক্রিয় হতে পারে।
 যাবা চেতনাব জগতে সক্রিয় কিন্তু বাইবের জগতে নিষ্ক্রিয়, তাদের
 আনন্দ অলস মনে কবে থাকি। এটা আনন্দের নস্তু বড় ভুল। যে
 লোক বাইবেও নিষ্ক্রিয় ভেতবেও নিষ্ক্রিয়, সেই লোকই প্রকৃতপক্ষে
 আলস্যপরাযণ। সে লোক মুচ্ছাগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, প্রমাদগ্রস্ত। সেই
 ব্যক্তি অবর্ণ্য, আলস্যপরাযণ। কিন্তু যে ব্যক্তি বাইবে নিষ্ক্রিয় থেকে
 থেকে অন্তরে চেতনাব প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, যাব ভেতবে আশ্রয়
 নিবন্তব জ্বলছে, চেতনাব বহিঃশিখা যাব ভেতবে দেদীপ্যমান, সে ব্যক্তি
 অবর্ণ্য এবং অলস নয়। পবন্ত সে লোক সক্রিয়, সে এক অতি মহৎ
 শক্তিকে জ্বালিয়ে তুলতে ব্যস্ত। পদার্থজগতেও ঐ শক্তির উপযোগিতা
 অনেক।

গীতায় বলা হয়েছে—

বর্ণ্যবর্ণ যঃ পশ্চোং অবর্ণ্যি চ বর্ণ যঃ।

স বুদ্ধিমান নন্তব্যোবু স যুক্ত বৃৎস বর্ণবৃৎ ॥

যে বর্ণের ভেতবে অবর্ণ দেখে এক অবর্ণের ভেতবে বর্ণ দেখে, সে
 যোগী। পুঙ্কব, সে-ই সম্পূর্ণ বর্ণ করতে সমর্থ।

আনন্দ অবর্ণের ভেতবে বর্ণ দেখান তত্ত্ব ভুলে গিয়েছি। অবর্ণের

অন্তৰে মহৎ কৰ্ম হ'বৈ থাকে। অকৰ্ম থেকৈ সম্ভূত কৰ্ম বাস্তৱে অনেক বেশি নিৰ্দোষ কৰ্ম। কৰ্ম থেকৈ উদ্ভূত কৰ্ম সমূহ দোষ থাকে। অকৰ্মেই এই মহত্ব আমবা বুঝতে পাৰি। কাষাশুপ্তি, কাষা শিথিলীকৰণ, কাষাবিসৰ্জন—এ সব যেন আমবা বুঝতে চেষ্টা কৰি। আজ্ঞা আমি বিধিৰ আলোচনা কৰব না। বিধি প্ৰয়োগেৰ দ্বাৰা বোঝানো হ'ছে। প্ৰয়োগেৰ দ্বাৰা মাথা থেকৈ পা পৰ্যন্ত কিভাবে সমস্ত শৰীৰ স্থিৰ কৰা যায় সে বিষয়ে চৰ্চা কৰা যায়। শৰীৰ এতটো স্থিৰ কৰা সম্ভব যে তাতে চপলতা থাকবে না, প্ৰকম্পন থাকবে না, সমস্ত শৰীৰ স্থিৰতা লাভ কৰবে। স্থিৰতাৰ জন্ত যদি একবাব মানসিক উত্তেজনা উৎপন্ন কৰা প্ৰয়োজন হয় তৰে তাই কৰন। এতে শিথিলীকৰণ অনেক তাড়াতাড়ি সম্ভব হ'ব।

আপনি মাটিৰ ওপৰে শুয়ে পা ছড়িয়ে দিন, হাত ওপৰ দিকে তুলুন, যতই পাবেন হাত পাবৈ দিকে টান কৰন। একবাব এইভাবে শৰীৰ টান কৰনে পাৱলে পৰম স্থিৰতা অনুভূত হ'ব। শৰীৰেৰ টান অবস্থা শিথিল কৰে দিন, শৰীৰ সম্পূৰ্ণ শিথিল হ'বৈ যাবে। শিথিলীকৰণেৰ এই এক প্ৰক্ৰিয়া।

শিথিলীকৰণেৰ অন্ত একটি প্ৰক্ৰিয়া আছে। পা থেকৈ মাথা পৰ্যন্ত প্ৰতিটি অঙ্গে সঙ্কল্প কৰন যে, সে অঙ্গ শিথিল হ'ক। আৰাব মাথা থেকৈ পা পৰ্যন্ত এই সঙ্কল্পেৰ পুনৰাবৃত্তি কৰন। শৰীৰ শিথিল হ'বৈ যাবে। কেবলমাত্ৰ গুলেই শৰীৰ শিথিল হ'ব না। সঙ্কল্প কৰতে হ'বে, শৰীৰকে প্ৰেৰণা দিতে হ'বে। এই হল শিথিলীকৰণেৰ দ্বিতীয় বিধি বা প্ৰক্ৰিয়া।

সাধনাৰ দৃষ্টিকোণ থেকৈ শিথিলীকৰণেৰ প্ৰক্ৰিয়া বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয়। এব মূল্য অনেক। আমি চাই প্ৰত্যেক সাধক সে মূল্য অনুভব কৰন।

৬

মৌনতার মূল্য

কথা বলার সঙ্গে আমাদের পবিচয় আছে। কথা বলার কি মূল্য তা আমরা ভালভাবেই জানি। আমাদের সমস্ত ব্যবহার, অর্থাৎ পব্দ্দাবের মধ্যে আদান-প্রদান, কথার মাধ্যমেই চলে। কিন্তু কথা না বলারও একটি নিজস্ব মূল্য আছে। ভাষণের যতটা মূল্য, অ-ভাষণের মূল্য ততটাই, বরং সম্ভবস্থলে বাক-সংযমেব মূল্য বেশি। ঐ মূল্য আমাদের বুঝতে হবে। যে প্রাণী বিকশিত হয়ে ওঠে তার কথা বলার ওপরে নির্ভর কবতে হয় না। দেবতাদের পর্যাণ্ডি পঞ্চবিধ। তার মধ্যে ভাষাপর্যাণ্ডি এক মনপর্যাণ্ডি নামে দু বকম হলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। সাধাবণ মানুষের, সাধাবণ প্রাণীর পর্যাণ্ডি ছয়, কিন্তু দেবতাদের পর্যাণ্ডি পাঁচ। একথা স্বীকার করা হয় যে চক্রবর্তীদের পর্যাণ্ডি পাঁচ। যে মনের দ্বারা নিজের কথা বলে তার কথা বলার প্রয়োজন হয় না। যখন আমরা আমাদের কথা মনের দ্বারা বলতে পারি না তখন এবং সেই ক্ষণ্ত আমাদের কথা বলার দরকার পড়ে। যখন আমরা মন দ্বারা ভাষণ বুঝতে পারি না তখন আমাদের কথা বলে আলাপ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি মনের দ্বারা ভাষণ সম্ভব হয় তখন ভাষা ব্যর্থ বা নিবর্থক হয়ে যায়। তার আব কোনও সার্থকতা থাকে না। তখন

ভাষণেৰ ওপৰে নিৰ্ভৰ কৰতে হয় না। মানুহ যেমন যেমন জ্ঞানেৰ ভূমিৰ দিকে অগ্ৰসৰ হ'বে তেমন তেমন ভাষণেৰ ওপৰে নিৰ্ভৰ কৰে যাবে। তবুও এবকম প্ৰশ্ন ওঠে, তীৰ্থঙ্কৰ কথা বলেন কেন? কেবল জ্ঞানী কেন কথা বলেন? তাঁৰা যখন কৃতকৃত্য হয়েছেন, যখন তাঁদেৰ সমস্ত কাৰ্য সম্পন্ন হ'য়ে গিয়েছে, যখন তাঁদেৰ সব কিছুতে সিদ্ধি হয়েছ, তখন তাঁদেৰ কথা বলাৰ প্ৰযোজন কি? কেন তাঁৰা কথা বলেন? কেন বাক্যালাপ কৰেন, কেন ধৰ্মবিষয়ে ভাষণ দেন, কেন উপদেশ-কথা বলেন? তাঁদেৰ তো কথা বলাৰ, উপদেশ দেবাৰ কোনও প্ৰযোজন নেই। প্ৰাচীন ব্যাখ্যাকাৰবা এই প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দিতে গিয়ে বলেছেন তীৰ্থঙ্কৰ তথা কেবলী কৃতকৃত্য। তাঁদেৰ কথা বলাৰ কোনও প্ৰযোজন নেই। কিন্তু তীৰ্থঙ্কৰ শাস্ত্ৰবিহিত বৰ্মেৰ উদযম্বকপ, সেই জন্তু তাঁৰা কথা বলেন। তাঁৰা নিজস্ব ভঙ্গিতে যথার্থ চিন্তা কৰেছেন আৰু সমাধানেৰ এই ভাষা প্ৰস্তুত কৰেছেন। এব অন্ত বকম সমাধানও হতে পাৰে। সে হল এই—জ্ঞানী লোকেৰও অজ্ঞানী লোকেৰ জন্তু কথা বলাৰ প্ৰযোজন হ'ব। যখন কোনও লোকেৰ পৰম জ্ঞানেৰ উপলব্ধি হয় তখন তিনি পৰম-জ্ঞানীতে পৰিণত হন। তাঁদেৰ মনে এক বৰুণা জাগে যে তাঁৰা বা জেনেছেন, বা দেখেছেন, বা অনুভব কৰেছেন তা অন্তেৰও লাভ হোক। তাঁদেৰ মনে পৰম বৰুণা, পৰম অনুকম্পা, পৰম সৌহাৰ্দ্য আৰু মৈত্ৰীৰ ভাবনা জাগে। ঐ ভাব থেকে যাৰা পৰম বসেৰ আশ্বাদ পায় নি, পৰম জ্ঞান প্ৰাপ্ত হ'ব নি তাদেৰ তাঁৰা এমন কিছু বলতে চান বা তাৰা জানে না। তাঁৰা এক ইশাৰা কৰতে চান, এক ইঙ্গিত কৰতে চান, আৰু কিছু দিতে চান। তাঁৰা কৰুণাপৰবশ হয়ে বাণী দিয়ে থাকেন। যদি দুই কেবলজ্ঞানী মিলিত হন তাঁদেৰ কথা বলাৰ প্ৰযোজন হ'ব না। তাঁদেৰ মध्ये বাক্যেৰ বিনিময় হ'ব না। তাঁদেৰ আত্মাৰ সঙ্গে আত্মাৰ আলাপ হ'ব। সেখানে ভাষা নিবৰ্ধক, তাৰ কোনও উপযোগিতা নেই। দুই বিশিষ্ট জ্ঞানীৰ সাক্ষাৎ হলে তাঁদেৰ বাক্যবিনিময়েৰ কোনও প্ৰযোজন হ'ব না। যদি একজন জ্ঞানী

এবং আব একজন অজ্ঞানী হ'ব তবে কথা বলাব কিছুটা প্রয়োজন হ'ব। দুই জ্ঞানী মিলন হলে কথাবার্তা প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কথা বলবেন না। ইনিও মুক, উনিও মুক। দুজনে বোবার মত একে অন্বেষ দিকে চেয়ে থাকেন, কেউ কথা বলেন না।

এক ঘটনা ঘটেছিল। কবীদ বহু শিষ্যসহ পদযাত্রা করেন। যখন তিনি কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যবা তাঁকে বলল, খুব সুন্দর সুযোগ মিলেছে। পাশেই কবীরের আশ্রম। সেখানে চলুন এবং দুদিন বিশ্রাম করুন। বিশ্রামও হবে এবং দুই জ্ঞানী পুরুষের মধ্যে আলাপও হবে। আমবা জানাব, বিশেষতঃ শোনাব, স্নযোগ পাব। শিষ্যবা কবীদকে অনুবোধ করল। কবীদও অনুবোধ বক্ষা করতে সম্মত হলেন।

এদিকে কবীরের শিষ্যবা সংবাদ পেল যে কবীদ কাশীর পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর সাথে শিষ্যবাও আছে। তাদের মনেও ভাবনা জাগল। তা'বা কবীরকে বলল, 'কবীদ এই দিক দিয়ে যাচ্ছেন। আমবা তাঁকে এখানে আটকাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হবে। দুই জ্ঞানী লোকের সাক্ষাৎ হবে। কবীর এবং কবীদ পব্ধের সাথে মিলিত হবেন। দুজনে জ্ঞানী পুরুষ। খুব জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা হবে। আমাদের শোনাব এবং জানাব স্নযোগ মিলবে। খুব ভাল হবে।' কবীর বললেন, 'খুব ভাল কথা।' কবীর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চললেন। কবীদও আসছিলেন। তাঁদের দেখা হতে দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন। কবীর কবীদকে থাকতে বললেন। কবীদ তাঁর অনুবোধ মেনে নিলেন। তাঁরা দুজনে এলেন। আশ্রমে বইলেন। আশ্রম কবীরের। সেখানে কবীর এবং কবীদ দুজনেই বইলেন। তাঁদের শিষ্যবাও ছিল। দুজনেই শিষ্যবা খুব উৎকণ্ঠিত বোধ করছিলেন। এক দিকে কবীদ এবং তাঁর শিষ্যবা বসেছিলেন। আব একদিকে সশিষ্য কবীর বসেছিলেন। সব শিষ্যই দুজনের কথাবার্তা শোনাব জন্ম উৎসুক হয়ে ছিল। শিষ্যবা ভাবছিল কে আগে কথা বলবেন—কবীর, না কবীদ। সগাই বসে প্রতীক্ষা

কবিতা লাগল। এক ঘণ্টা গেল, দু ঘণ্টা গেল। সবাই মৌন। দুই
জ্ঞানীও মৌন। কবীর ফবীদেব এক ফবীদ কবীবেব দিকে ঝুঁকে ছিলেন।
দু জনেব চোখে চোখে মিলন হুছিল। কিন্তু তাঁদেব মুখেব তালা
খোলে নি। মৌন, মৌন, কেবল মৌন। কেউ কথা বলছেন না।
না কবীর কথা বলছেন, না ফবীদ কথা বলছেন। শিষ্যবা প্রতীক্ষা
কবে ধোঁকা খেবে গেল। এই ভাবে সময় চলে বেতে লাগল, প্রতীক্ষাব
কাল দীৰ্ঘ থেকে দীৰ্ঘতব হল, সবাই প্রতীক্ষা কবে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।
এই ভাবে প্রতীক্ষাব কাল বেড়ে চলল, আব সবাব মনে গভীৰ আকাঙ্ক্ষা।
আব উৎকণ্ঠাব সৃষ্টি হল। প্রতি ক্ষণ তাদেব অতি দীৰ্ঘ মনে হতে
লাগল। এক এক গণ এক এক ঘণ্টাব নত দীৰ্ঘ বোধ হল। সব শিষ্য
প্রতীক্ষা কবতে ববতে ক্লান্ত এবং বিবস্ত হল। তাঁবা ভাবতে লাগল—
ফবীদ কি বোবা, না কবীবই বোবা। দুজনেই নীবব। দুজনেব কেউই
কথা বলছেন না। শেষ পৰ্যন্ত কি হল? আবও কিছুটা সময় কেটে
গেল। তাব পবে কবীর উঠে দাঁড়ালেন। ফবীদও উঠলেন। দুজনেই
সেখান থেকে চলে গেলেন। নিজ নিজ কাজে বত হলেন। ভোজনেব
সময় এল। ভোজন কবলেন। বিশ্রাম কবলেন। মধ্যাহ্নে দুজনে
আবাব মিলিত হলেন। তাঁবা দুজনে বসে বইলেন, আব একে
অগ্ৰেব দিকে চেয়ে বইলেন। দুজনেব চোখে চোখে মিলন হল, দুজনে
মৌন। শিষ্যবা প্রতীক্ষা কবে বইল। পুরো দিন কেটে গেল। সূৰ্যাস্ত
হল। সন্ধ্যা শেষ হল। শিষ্যবা ভাবল, হয়তো তাঁবা বাতে কথা
বলবেন। বাতে আবাব তাঁবা একত্ৰ হলেন। আবাব সেই নীববতাৰ
পালা। শিষ্যবা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবাব দিন এল। সাবা দিন গেল।
শুধু নীববতা। কোনও কথাবার্তা নেই। বাতে দেখা, তবুও কোন
কথা নেই। শিষ্যদেব মন বিবস্তিতে ভবে গেল। তৃতীয দিন এল।
ফবীদ চলে যাওঁবাব জন্ত প্রস্তুত হলেন। কবীর তাঁকে এগিবে দিতে
সাথে সাথে চললেন। দুজনেই নীববে চলতে লাগলেন। অবশেবে
দুজনেব ছাড়াছাড়ি হওঁবাব সময় এল। দুজনে দুজনেব গলা জড়িয়ে

ধবলেন। কবীদ এগিয়ে গেলেন। কবীর নিজের আশ্রমে যাবে এলেন। আশ্রমে পৌঁছে শিষ্যবা কবীকে বলল, ‘এ কেমন ব্যাপার ? আমাদের শুধু ধোঁকা দিলেন কেন ? আপনাবা কেউ কথা বলবেন না, এ কথা আমাদের আগে বলতে পাবতেন। আমরা তাহলে এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবতাম না। আমরা আটচল্লিশ ঘণ্টা প্রতীক্ষা কবেছি। আমাদের কি গভীর উৎকণ্ঠা হয়েছিল। আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, ভাবনা হয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম—তুই জ্ঞানী মিলবেন। এক কবীর, আর এক কবীদ। দুজনের কথাবার্তা হবে। আমরা শুনব, আমাদের জ্ঞান বাড়বে।’

কবীর বললেন—কাব সঙ্গে বাক্যালাপ কবব ? কাব সঙ্গে কথা বলব ? কবীদ সামনে বসে ছিলেন। কবীদ এত জ্ঞানী যে মনের কথা বুঝতে পাবেন, তাঁর সামনে কথা বলে কি নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ কবব ? কথা বললে শুধু নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পেত। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব ? তোমবাই বল। আমার সামনে যদি কোনও অজ্ঞানী লোক বসে থাকত তবে অবশ্যই তাব সঙ্গে কথা বলতাম। কিন্তু তিনি তো মহাজ্ঞানী, তাঁব সঙ্গে কি কথা বলব ? তিনি আমার মনের সমস্ত কথাই জানতে পেরেছেন।

কবীদের শিষ্যবাও কবীদকে ঐ প্রশ্ন কবেছিল এবং তিনিও তাদের ঐ উত্তরই দিয়েছিলেন। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব ? কবীরের মত জ্ঞানী ব্যক্তি সামনে ছিলেন, তিনি আমার মনের সমস্ত কথা জেনেছিলেন। তাব পরে আমি আব কি বলব ? আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সে সব কিছুই তিনি জানতে পেরেছিলেন। ঐ বকম পৰিস্থিতিতে তাঁব সামনে আমি কিছু বললে শুধু নিজের মূর্থতাই প্রকাশ কবতাম। আমার সামনে কথা বলাব কোনও প্রশ্নই ছিল না। যেখানে সামনে অজ্ঞানী উপস্থিত থাকে সেখানেই কথা বলাব দরকার হয়। দুজনেই যদি অজ্ঞানী হয় তবে তাদের কথা কখনই শেষ হয় না। দীর্ঘকাল বাক্যালাপ হয়। তুই পণ্ডিতের সাক্ষাৎ হলে শাস্ত্রার্থ আলোচনা কখনও শেষ হয় না। বিবাদ

কখনও সমাপ্ত হয় না। এই বকম পৰিস্থিতিৰ কথা মনে বেখে ভগবান মহাবীৰ বলেছেন—যদি কোন পণ্ডিত, কোনও অৰ্থশাস্ত্রীৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাকে বোকাও, আবাব বোকাও। যদি বোকাবাব পৰেও সে স্বীকাৰ না কৰে তৰে বাকগুপ্তি কৰ, বচন গোপন কৰ, অৰ্থাৎ মৌনাবলম্বন কৰ। একেবাবে মৌন হয়ে যাও। সেটিই সবচেয়ে সুন্দৰ সমাধান।

বাদশাহ বীৰবলকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলেন—‘মুখৰে পাল্লাৰ পডলে কি কৰা উচিত?’ বীৰবল বলেছিলেন—‘জাঁহাপনা, মৌন হয়ে যাওৱা উচিত। মৌন থাকাই সবচেয়ে ভাল সমাধান।’ বিবাদ শেষ কৰাব এৰ চেয়ে ভাল উপায় আব হতে পাৰে না।

মহাবীৰও বলেছেন, যদি কোনও পণ্ডিত বা ভাষাশাস্ত্রী উপস্থিত হয় এক কেবল তৰ্কৰ কথা বলে বিবাদ বাড়াতে চায়, শাস্ত্ৰাৰ্থ কবতে চায় তৰে মৌন হয়ে যাও, বাকগুপ্তি কৰ। ঐ তাৰ সমাধান বটে।

হুই জ্ঞানী মিলিত হলে তাঁৰা বাক্যালাপ কৰেন না। যেখানে এক জন অতিশয় জ্ঞানী আব একজন তাঁৰ চেয়ে কম জ্ঞানী, সেখানে ভাষাৰ প্ৰয়োগ হয়। যেখানে দুজনেই জ্ঞানী, দুজনেই সমান বোদ্ধা, সেখানে ভাষাৰ প্ৰয়োগ নিবৰ্হক।

মৌন থাকাব এই বড় সুবিধে যে তাতে আমাদেব জ্ঞান বাড়ে। যখন ভাষাৰ ব্যবহাৰ কম হবে তখন আমাদেব জ্ঞান বাড়বে। যত বেশি ভাষাৰ প্ৰয়োগ হবে, আমবা যত বেশি কথা বলব ততই আমাদেব অন্তৰ্জ্ঞানে বাধা ঘটবে। চঞ্চলতা বাধা সৃষ্টি কৰে। ভাষাৰ প্ৰথম কাজ চঞ্চলতা সৃষ্টি কৰা। পূজ্যপাদ লিখেছেন—জনেভে বাক্ ততঃ স্পন্দঃ—যখন সম্পৰ্ক হয় তখনই বাক্য আসে। একলা একলা তো কোনও কথাবাত্তা হয় না। একাকী কেউ কথা বলে না। একলা থাকলে কথা বলাব কোনও প্ৰয়োজন থাকে না। দ্বিতীয় কেউ থাকলে সম্পৰ্ক হয় এক বাক্যালাপ হয়। আব, কথাৰ পৰে আসে চঞ্চলতা। কথা বলাব আগেও চঞ্চলতা, আব পৰেও চঞ্চলতা। আমাদেব কথা বলতে হলে সবাব আগে আমাদেব মনকে চঞ্চল কবতে হয়। মনকে চঞ্চল না কবলে

কোনও লোক কথা বলতে পারে না। লোকে কোনও কিছু বলতে চাইলে প্রথমে চিন্তা কবে, তাব পবে বলে। বলাব মতলব থাকলে প্রথমে মনকে চঞ্চল কব, তাবপবে বল। বলাব আগে চঞ্চলতা, আঁবাব পবেও চঞ্চলতা। কথা বলা নিজেই চঞ্চলতা বিশেষ। বলাব পবে ঐ বিষয়ে আঁবাব যে চিন্তা হতে থাকে তা স্বয়ং চঞ্চলতা উৎপাদন কবে। ভাষণেব আগে চাঞ্চল্য, ভাষণেব সময়ে চাঞ্চল্য। ভাষণেব পবেও চাঞ্চল্য। এ সমস্তই চঞ্চলতাৰ ব্যবহাৰ, আৰু এই ব্যবহাৰ অন্তৰ্জ্ঞানেব পথে বাঁবা উপস্থিত কবে। যে লোক অন্তৰ্জ্ঞানেব সঠিক মৰ্ম বোঝেন তিনি খুবই কম কথা বলে থাকেন। তিনি বেশিৰ ভাগ সময় মৌন থাকেন।

ভগবান মহাবীৰকে জিজ্ঞাসা কৰা হবোছিল—‘ভগবন, বচনেব গুপ্তি অৰ্থাৎ মৌন দ্বাৰা লোকে কি পায়?’ ভগবান উত্তবে বলোছিলেন যে বচনগুপ্তি থেকে মানুষ নিৰ্বিচাৰতা প্ৰাপ্ত হয়। ‘নিৰ্বিচাৰতা’ কথাটি প্ৰাকৃত ভাষাৰ শব্দ। সংস্কৃতে তাৰ দুটি ৰূপ হতে পাৰে—নিৰ্বিচাৰত্ব বা নিৰ্বিকাবত্ব অৰ্থাৎ নিৰ্বিচাৰতা বা নিৰ্বিকাবতা। বচনগুপ্তি দ্বাৰা নিৰ্বিচাৰতা বা নিৰ্বিকাবতা প্ৰাপ্ত হওয়া যায়। বিকৃতিৰ অৰ্থ পৰিণতি। নিৰ্বিকৃতিৰ অৰ্থ স্থিৰতা, বাব কোনও পৰিণাত নেই। স্থিৰতা স্থায়ী। ভাষা থেকে যে বিকৃতি সম্ভূত হয় তাব সমাপ্ত আছে।

বচনগুপ্তিৰ এক পৰিণাম—নিৰ্বিচাৰতা। আমবা এই জগত চিন্তা কৰি যে আমবা বলব, অন্ত লোককে বলব। আমাদেব মনে যখন বলাব কথা আসে তখন আমবা চিন্তা কৰি। যখন আমবা মৌন থাকি তখন নিৰ্বিচাৰতাৰ স্থিতি উৎপন্ন হয়। বচনগুপ্তি থেকে মহৎ লাভ নিৰ্বিচাৰতা। অভাষণেব মূল্য নিৰ্বিচাৰতা। সেখানে বিচাৰেব স্থিতিৰ শেষ।

ভাষা ব্যবহাৰ না কৰাৰ আৰু একটি মূল্য—বিবাদমুক্তি। বিবাদ থেকে ছুটি মিলে যায়। মৌন হয়ে যাও, বিবাদ আপনা থেকে শেষ হয়ে বাবে। হামেশাই কথা বলাব বলে বিবাদ তথা লড়াই হয়। যখন একজন বলতে থাকে তখন অপব জন যদি মৌন থাকে তবে বিবাদ সমাপ্ত হয়ে যায়। ‘অতুণে পতিতো বহিঃ স্বয়মেব বিনশ্চাত।’ আগুন

জ্বলছে। তাব ইন্ধন স্বৰূপ ঘাস না মিললে, ভোজন না মিললে সে নিবে যাবে, আব জ্বলবে না। সেই বকম ছুই ব্যক্তি যদি কথা বলে চলে তবে লড়াইয়েব আগুন লকলক কবে জ্বলে ওঠে, নেবে না, শাস্ত হয় না। লড়াইয়েব আগুনেব ইন্ধন মিলে যায়, খাও মিলে যায়, আব আগুন জ্বলতেই থাকে। যখন একজন কথা বলে তখন আব একজন যদি চুপ কবে থাকে, কোনও কথা না বলে তাহলে আগুনেব খাও মেলে না, ফলে তা আপনা থেকে শাস্ত হয়ে যায়, নিবে যায়। মৌনেব দ্বিতীয লাভ—বিবাদমুক্তি।

মৌনেব তৃতীয লাভ—অহংমুক্তি। কথা না বললে অহঙ্কাৰ শেষ হয়ে যায়। কথায অহঙ্কাৰ বুদ্ধি পায়। ‘আমি বেশ বলেছি’—এ অহঙ্কাৰ। ‘ভাষাব উপবে আমাব প্রভুত্ব আছে’—এও অহঙ্কাৰ। এতে অহং উৎসাহিত হয়। ভাষাব জ্ঞান যতটা হয় ততটাই অহং বোধ বুদ্ধি পায়। এইজন্যই ভগবান মহাবীৰ বলেছেন, ‘ন চিন্তা তায়যে ভাসা কযো বিজ্ঞাপুসাসন’—ভাষা আমাদেব ত্রাণ কবে না। নানা প্রকাৰ ভাষা ত্রাণস্বৰূপ হয় না। আমি সংস্কৃত জানি, হিন্দি জানি, প্রাকৃত জানি—এই বকম ভাবে ভাষাব অহঙ্কাৰ বেড়ে যায়। ভাষা বাক্যেব মাধ্যম, বিচাৰ ব্যক্ত কৰাব মাধ্যম, তা আমাদেব অহঙ্কাৰেব মাধ্যমে পৰিণত হয়।

স্বামী বামতীৰ্থ আমেবিক। গিয়েছিলেন। আমেবিকাব বাষ্ট্ৰাধ্যক্ষ তাঁব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবতে এসেছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, ‘স্বামীজি, আপনি নিজেকে বাদশাহ বলে থাকেন, এ কেন কবেন ? আপনাব তো কিছুই নেই। যা আছে তা সামান্য। তবে আপনি বাদশাহ কিভাবে হলেন তা আমি ঠিক বুঝতে পাবছি না।’ বামতীৰ্থ বলেছিলেন—‘আমাব কিছু নেই বলেই তো আমি বাদশাহ। যে বস্তকে আঁকড়ে ধৰে সে তো গবীৰ। যে গবীৰ সে সব কিছু সংগ্ৰহ কবতে চায়, সব কিছু সঞ্চয় কবতে চায়। আমি গবীৰ নই, আমি বাদশাহ। আমাব কোনও কিছুৰ প্রযোজন নেই। সাবা ছুনিষা আমাব। আমি

কেন সংগ্ৰহ কৰিব, কেন সঞ্চয় কৰিব, কোথায সঞ্চয় কৰিব ? সাৰা দুনিয়া তো আমাৰ। গৰীব সংগ্ৰহ কৰাব চেষ্টা কৰে। আপনাৰা সবাই সংগ্ৰাহকেব দল, আপনাৰা সবাই তো গৰীব। আমিহি প্ৰকৃত বাদশাহ, যে কিছুই সংগ্ৰহ কৰে না বা সঞ্চয় কৰে না। আমাৰ কিছুই নাই, এই জন্ম আমি বাদশাহ।’

বস্তুত এই কথা অতিশয় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। তা বাস্তৱাধ্যক্ষেব মনে বোধ জাগিযেছিল। একজন অকিঞ্চন লোকেৰ কথা কাৰ্যকৰ হতে দেখে সন্ন্যাসীও সন্তোষ লাভ কৰেছিলেন। তিনি ভাবতে যিবে এলেন। তিনি ভাবলেন—আমি যা কিছু বলেছি, যা কিছু অনুভব কৰেছি তা ভাবতেব লোকদেবও বলব। ভাবতে তিনি কাশীধামই বেছে নিলেন, কাষণ কাশী পণ্ডিতদেব নগৰ। পণ্ডিতবা তাঁব ঐ কথা ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হব, বেশি গুৰুত্ব দেবে। তিনি কাশী এলেন। সভা আযোজিত হল। বহু লোক এল। বড় বড় পণ্ডিত, দিগ্গজ্ঞ বিদ্বান লোক এলেন। বামতীৰ্থ তাঁব অভিজ্ঞতাৰ কথা শোনালেন। সে কথা শোনাৰ পৰে এক বিদ্বান উঠি বললেন—‘মহাবাজ। আপনি কি সংস্কৃত জানেন?’ বামতীৰ্থ উত্তৰ দিলেন, ‘আমি সংস্কৃত জানি না।’ তখন সেই পণ্ডিত বললেন, ‘তবে আপনি জ্ঞানেৰ কথা কি বলছেন? যে সংস্কৃত জানে না সে ব্ৰহ্মজ্ঞানেৰ কথা কি বুঝবে। সে আৰাৰ ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কি আলোচনা কৰবে, কেমন কৰেই বা কৰবে? সে লোকেৰ ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কৰাব অধিকাৰ নাই।’

আলোচনা সেখানেই শেষ হযে গেল, মনে হল সংস্কৃত যেন ব্ৰহ্মজ্ঞান অধিকাৰ কৰে নিষেছে। কিন্তু ব্ৰহ্মজ্ঞানে অস্ত্ৰ ভাৰাবও অধিকাৰ আছে। যে ব্ৰহ্মজ্ঞান আত্মাৰ নিৰ্মলতা, পবিত্ৰতা তথা বিস্তৃতি থেকৈ উদ্ভূত হয়, যে ব্ৰহ্মজ্ঞান অন্তৰ্বেষণেৰ পবিত্ৰতা থেকৈ সঞ্জাত, তাকে ভাৰায় বন্দী কৰা হযেছে, এ কত বিডম্বনা। যে সংস্কৃত জানে সে-ই ব্ৰহ্মজ্ঞানে অধিকাৰী। যে সংস্কৃত জানে না সে ব্ৰহ্মজ্ঞানেৰ অধিকাৰ প্ৰাপ্ত হয় না। অন্তৰ্বেষ জ্ঞান, আত্মাৰ সহজভাবে উৎপন্ন জ্ঞানকে

ভাষাৰ বাঁধনে বেঁধে আমবা অহাৰ্কে বৰ্ধিত কৰাব বাস্তা প্ৰাপ্ত কৰেছি। এই জনাই ভগবান মহাবীৰ বলেছেন—‘ন চিত্তা তাম্যে ভাষা।’ নানা প্ৰকাৰ ভাষা আপনাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে না, দুঃখ থেকে ত্ৰাণ কৰতে পাবে না, আত্মিক জ্ঞান উৎপন্ন কৰতে সমৰ্থ হবে না। ‘কথো বিজ্ঞানুসাশন’। এই বিজ্ঞাব অনুশাসন, যা সমস্ত হয বচনেৰ মাধ্যমে, ভাষাৰ মাধ্যমে, তা আপনাকে সুবক্ষিত কৰতে পাবে না। আপনাৰ নিজেৰ সুবক্ষা আপনাৰ জ্ঞানে, আপনাৰ নিজেৰ মাথ্যেই নিহিত আছে। ঐ জ্ঞান কথাৰ দ্বাৰা পাওযা যায় না, কিন্তু অভাষণেৰ দ্বাৰা অবশ্যই পাওযা যায়। ঐ জ্ঞানেৰ কথা নিজেৰ বলাৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনও ভাষাৰও প্ৰয়োজন নাই।

ছনিয়াতে অনেক আত্মজ্ঞানী লোক এসেছেন। ইংবেজি, ফৰালী, তথা হিন্দি ভাষা জ্ঞানী লোকও আত্মজ্ঞানী হয়েছেন। সংস্কৃত এবং প্ৰাকৃত জ্ঞানী লোকও আত্মজ্ঞান লাভ কৰেছেন। এ ছাড়া কোনও ভাষাই ভালভাবে জ্ঞানেন না বা বুঝতে পাবেন না, এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হয়েছেন। আৰাৰ এমন লোকও আত্মজ্ঞানী হয়েছেন যিনি নিজেৰ বিচাৰ ভাষাৰ প্ৰকাশ কৰতে পাবেন না, ভাষণ দিতে জ্ঞানেন না, নিজেৰ কথাও সম্পূৰ্ণ বলতে পাবেন না। ভাষাৰ সঙ্গে আত্মজ্ঞানেৰ কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাষা বাইবে থেকে আসে, আৰ আত্মজ্ঞানেৰ স্ৰোত ভেতৰ থেকে প্ৰবাহিত হয়। ভাষা কথা বলাৰ একটা উপায় বা যন্ত্ৰ মাত্ৰ, ব্যবহাবেৰ মাধ্যম মাত্ৰ। সেই ভাষাকেও আমবা অহঙ্কাৰেৰ সাধনযন্ত্ৰে পৰিণত কৰেছি। আমি বুঝতে পাৰি না—বলা থেকে একটা মন্ত বড় লাভ হয়। সেটা অহংমুক্তি বটে। অহঙ্কাৰ থেকে আমবা মুক্ত হবে যেতে পাৰি, ছাড়া পেতে পাৰি, আৰ যাৰ মাধ্যমে অহঙ্কাৰ এত বৰ্ধিত হয় তা থেকে বেঁচে যেতে পাৰি।

আমি একথা মানি সাধাৰণ মানুহেৰ কথাৰ প্ৰয়োজন আছে, কথা ছাড়া তাৰ ব্যবহাৰ চলতে পাবে না। বাক্যেৰ ব্যবহাৰ ছাড়া তাৰ জীবনচৰ্চা অচল হয়ে যেতে পাবে। বলতেই হয়, এ এক বকম কথা।

আব বলা আবশ্যক, বলাকে আমবা অনিবার্ঘ বলে মেনে নিযেছি, বলাতে আমবা প্ৰাথমিকতা আবোপ কৰেছি, এ সব অন্তৰকম কথা। এই দু বকম কথাৰ মধ্যে অনেক তফাৎ। কেমনা যখন বলাকে আমবা প্ৰাথমিকতাৰ গুৰুত্ব দিই, তাকে অনিবার্ঘ বলে মেনে নিই, তখন আমাদেব মানসিক ক্ষমতা কমে যায়, ক্ষীণ হুবে যায়। যে কথা মনেব দ্বাৰা বলা যায় সে কথা বলতে আমবা অসমৰ্থ হুবে পডি। মনেব শক্তিব বড অন্তৰায় এসে যায়।

আধুনিক প্যাৰাসাইকোলজিষ্টৰা টেলিপ্যাথিব প্ৰাষণ কৰছেন। টেলিপ্যাথিব অৰ্থ বিচাবসংপ্ৰেৰণ। একটি লোক হাজাৰ ক্ৰোশ দূৰে আছে। তাব সঙ্গে কথা বলতে হুবে। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পাবে? আজ তো টেলিফোন এক বেতাৰ যন্ত্ৰ হযেছে। যবে বসে লোকে হাজাৰ ক্ৰোশ দূৰে থাকা নিজেব লোকেব সঙ্গে কথা বলছে। প্ৰাচীনকালে এসব যন্ত্ৰ ছিল না, তখন লোকে দূৰে অবস্থিত মানুষেব সঙ্গে কথা বলত কি কবে? তাৰা টেলিপ্যাথি বা বিচাব-সংপ্ৰেৰণ দ্বাৰা আলাপ কবত। প্ৰাচীনকালে টেলিপ্যাথি বলে কোনও কথা ছিল না। ঐ কথাটি ইংবেজি কথা। সে সময়ে প্ৰচলিত শব্দ ছিল বিচাব-সংপ্ৰেৰণ। তাব অৰ্থ—এক জাযগায় বসে নিজেব বিচাব হাজাৰ ক্ৰোশ দূৰে প্ৰেৰণ কৰা। যথা—এক বোগী ছিলেন। তাব শিষ্য পাঁচ হাজাৰ মাইল দূৰে ছিল। বোগী তাকে কিছু বলতে চেযেছিলেন, তাব সঙ্গে আলাপ কবতে চেযেছিলেন। এখন তিনি কি কবে বাক্যালাপ কবলেন? তখনকাৰ দিনে আধুনিক যন্ত্ৰপাতি ছিল না। কিন্তু তখন বিচাব-সংপ্ৰেৰণেব সাধনা কৰা হত। এই সাধনায স্পন্দক ব্যক্তি ধ্যান মুদ্ৰায় স্থিত হুযে আপন বিচাবেব তবঙ্গ অভীষ্ট স্থানে সংপ্ৰেৰিত কবতেন। বিচাবেব তবঙ্গ শক্তিশালী হুযে যে স্পন্দৰ স্থানে সাধক তাব চেতনা পৌছতে চান সেখানে পৌছে যেত। সেখানে কোনও ব্যক্তিৰ মস্তিষ্ক চেতনা-প্ৰাপকেব কাজ কবত। সেই ব্যক্তি সেই বিচাব তবঙ্গকে ধাবণ কবত আব তাব মাধ্যমে জানতে পাবত

কে কি কথা বলছে। আবার যদি তাব উদ্ভব দেওয়াৰ প্ৰযোজন হতো তৰে সে নিজে ধ্যানস্থ হযে যেত এবং ধ্যানযোগে বিচাৰতবঙ্গ গুৰু বা ইষ্ট ব্যক্তিকে পৌছে দিত। এই ভাবে বিচাৰ জানানো হতো। এই ছিল বাক্যানাপ কৰাৰ পদ্ধতি। এই ছিল বিচাৰ সংপ্ৰেষণেৰ মাধ্যম, আৰু তাৰ জগুই মানসিক ক্ষমতাৰ বিকাশেৰ প্ৰযোজন হতো। সাধকৰা মানসিক ক্ষমতা বাডানোৰ চেষ্টা কৰতেন।

আমৰা অতিবিক্ত কথা বলাৰ অভ্যাস কৰে ফেলে মানসিক ক্ষমতাকে ক্ষীণ কৰে ফেলি, হাবিয়ে ফেলি। আজকাল মানসিক ক্ষমতা বিকশিত কৰাৰ কোনও চেষ্টা নেই। তাৰও দুটি কাৰণ আছে। এক কাৰণ, আমৰা বলাকেই প্ৰাথমিক অধিকাৰ বা প্ৰাধাণ্য দিযেছি। পত্ৰ দ্বাৰাও আমৰা কিছু কিছু বলাৰ কাজ কৰে থাকি। আজকাল নানা বকম বন্ধপাতি বা কৰ্মসাধনোপায় উদ্ভাবিত হযেছে, তাৰ ফলে মানসিক ক্ষমতাৰ কোনও প্ৰযোজন অনুভূত হয় না। যখন আমাদেব মানসিক ক্ষমতাৰ ওপৰে বিশ্বাস নষ্ট হযে যাৰ তখন আমৰা ভাৰা-প্ৰযোগেৰ প্ৰযোজন অনুভব কৰি। যদি আমৰা কথা না বলে আমাদেব মানসিক ক্ষমতা বিকশিত কৰি তৰে এ বকম হওবা সম্ভব যে, না বলা কথা আমৰা বুঝতে পাৰব। ‘গুৰোস্ত মৌন ব্যাখ্যান শিষ্টাস্ত ছিন্নসংশয়াঃ।’ যে গুৰুৰ আত্মশক্তি প্ৰবল তিনি মৌন ভাবে সমাসীন থাকেন। নানা প্ৰকাৰ সন্দেহ নিৰে শিষ্টৰা আসে। গুৰুৰ পাশে বসে, গুৰুৰ সান্নিধ্য প্ৰাপ্ত হব। তাৰ সমস্ত সংশয়েৰ নিবসন হৰে যায, তাৰেব সমাধান হৰে যাৰ। তাৰা আপনা-আপনি তাৰেব প্ৰশ্নগুলিৰ উদ্ভব পেয়ে যাৰ। কাৰণ কি ? তখন মনেৰ ভাৰা চলতে থাকে। মন নিজেৰ কাজ কৰে, সন্দেহ মিটে যায। কাজ সমাপ্ত হলে যায। দিগন্তবৰ্গণ বলেন, তীৰ্থঙ্কৰ কথা বলেন না, শ্বেতাশ্বৰ্গণ বলেন যে তীৰ্থঙ্কৰ কথা বলেন। আমি শাস্ত্ৰীয় আলোচনাৰ মध्ये যাৰ না। দিগন্তবৰ্গণ বলেন—তীৰ্থঙ্কৰ কথা বলেন না। কেবল ধ্বনি নিৰ্গত হব। আমাৰ এ কথা বৈজ্ঞানিক মনে হয়। এ কথা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত।

তাঁরা কথা বলেন না, কিন্তু যা বলতে চান সে সব কিছু সবার কাছে পৌঁছে যায়। সেখানে কেবল ধ্বনি হয়, কিন্তু কোন ভাষার প্রয়োগ হয় না। কিন্তু যত লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তাঁরা ঐ ধ্বনি আপন আপন ভাষায় বুঝে নেয়। ঋতাস্থবাবা বলেন, তীর্থঙ্কর এক ভাষায় কথা বলেন। যে হিন্দি জানে সে হিন্দিতে সে কথা বোঝে, যে সংস্কৃত জানে সে সংস্কৃত ভাষায় বোঝে, যে প্রাকৃত ভাষা জানে সে প্রাকৃত ভাষায় বোঝে। যে হিন্দি জানে সে বোঝে তিনি হিন্দিতে কথা বলছেন, সংস্কৃতজ্ঞ মনে কবেন তিনি সংস্কৃতে কথা বলছেন, আবার প্রাকৃতজ্ঞ মনে কবেন, তিনি প্রাকৃত ভাষায় কথা বলছেন। মানুষ বোঝে তিনি মানুষের ভাষায় কথা বলছেন, পশুবা ভাবে তিনি পশুবা ভাষায় কথা বলছেন। তাঁর ধ্বনি ও বাগী মানুষ বুঝতে পারে, পশুও বুঝতে পারে, আবার দেবতাবাও বুঝতে পারেন। এ কেমন কবে সম্ভব হয়? সেখানে কি কোন অনুবাদক বসে থাকে? না, কোনও অনুবাদক থাকে না। এটা স্বাভাবিক পৰিণতি। একে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, তা ধ্বনি মাত্র এক ঐ ধ্বনির বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তর হয়। আব ঋতাতা তা নিজ নিজ ভাষায় গ্রহণ করে। বক্তার কথা বলার কোন প্রয়োজন হয় না। তিনি যা বলতে চান তা ঐ ধ্বনির মাধ্যমে বলেন। মনোবর্গনাব পুদগল এত শক্তিশালী হয় যে তা বিভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে নিজের কাজ করে।

তাঁরা প্রয়োগ না করার আবও একটি মূল্যবান কথা আমি বলব। তা হল আমাদের অনির্বচনীয়তার সিদ্ধান্ত। তাঁরতের প্রাচ্য সমস্ত দর্শন শাস্ত্রেই এই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। বেদান্তে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম অনির্বচনীয়। ব্রহ্মকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই কোনও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বৌদ্ধ দর্শনে অনির্বচনীয়তার বহুল প্রয়োগ হয়েছে। বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—পবলোক কি? বুদ্ধ বলেছিলেন—অনির্বচনীয়, তাকে কথায় প্রকাশ করা যায় না। আত্মা কি? পুনর্জন্ম আছে, কি নেই? বুদ্ধ বলেছেন—অনির্বচনীয়, তাকে

ভাষায় বর্ণনা' ক'বা সম্ভব নয়। কথায় প্রকাশ ক'বা যায় না। যতগুলি
 গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক'বা হয়েছিল সবাব উত্তরেই তিনি বলেছিলেন,
 অনির্বচনীয়। তিনি বলেছিলেন ঐ সব বিষয়কে কথায় ব্যাখ্যা ক'বা যায়
 না। মহাবীর বলেছেন—পূর্ণ সত্য অব্যক্ত, কথায় তাকে প্রকাশ ক'বা
 সম্ভব নয়, কেননা বস্তু অনন্তধর্মী। বস্তুতে অনন্ত ধর্ম আছে। আমবা কি
 কবে অনন্ত ধর্মের কথা বলতে সক্ষম হব? আমবা আপন ভাষায় এক
 ক্ষণে এক ধর্মের প্রতীপাদন করতে পাবি। শেষ পর্যন্ত অনন্ত ধর্ম চাপা
 পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আমবা অনন্ত ধর্ম কি কবে প্রতীপাদন করতে
 সমর্থ হব? সেজন্ত বলা হয়েছে, বস্তু অব্যক্তব্য অর্থাৎ ভাবের অতীত।
 সমস্ত বস্তুর স্বরূপ কথায় প্রকাশ ক'বা যায় না। এক ধর্মের কথা বলা
 সম্ভব। অনন্ত ধর্ম অনির্বচনীয়। অনন্ত সত্য অব্যক্তব্য। অথগু সত্য
 অব্যক্তব্য। সম্পূর্ণ সত্য অব্যক্তব্য। এ বেশ ভাল হয়েছে। আমবা
 ভ্রান্তিতে বা অসত্যেও আবদ্ধ হই না। অনন্তধর্মী বস্তুকে যঁবা
 জেনেছেন তাঁবাও তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পাবেন না। আব যখন
 তাঁবা ভাষা প্রয়োগ কবেন তখন এক ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। কেবলজ্ঞানীই
 বল, সর্বজ্ঞই বল, পবমাস্বাই বল, যা কিছু বল, তাঁবা পূর্ণকে জানেন,
 কিন্তু তাঁবা যা কিছু বলেন তা অপূর্ণ হয়ে যায়। তাঁবা অপূর্ণ কথা
 বলবেন। আমবা আবার সে কথা আবও খণ্ড খণ্ড কবে বলব। তাকে
 আমবা খণ্ড খণ্ড কবে বিভবণ কবব। আমবা একটি কথা গ্রহণ কবব,
 আব আগ্রহ শুরু হয়ে যাবে। তাব বল এই দাঁড়াবে : আমবা বা
 জেনেছি তাকে আমবা সত্য বলব, আব তোমবা বা বলবে তাকে অসত্য
 বলব। এই ভাবে সত্য এক অসত্যের বটাপটি শুরু হয়ে যায়। বিবাদ
 আবিস্কৃত হয়। তর্কাতর্কি শুরু হয়। এই পরস্পরের মত খণ্ডন এবং
 পরস্পর দূষণে কোনও কিছু বস্তু থাকে না। বিবাদেবও কোনও তাৎপর্য
 থাকে না। যে যা বলে সে শুধু আংশিক তত্ত্ব। আমবা অংশকে পূর্ণ
 বলে মেনে নিই। আব এই অংশকে সত্য বলে মেনে নেওয়া থেকে বিবাদ
 শুরু হয়ে যায়। বাবুয়ঙ্ক শুরু হয়ে যায়। সিদ্ধান্তেব লড়াই শুরু হয়ে

যায়। লড়াইয়ের একমাত্র কাৰণ অপূৰ্ণকে ভাৰাষ প্ৰকাশ কৰা উচিত নহ, কিন্তু আমবা তাই কৰে থাকি। যদি লোকে মৌন থাকে, শব্দও থেমে যায়, জ্ঞানীও মৌন থাকেন, এক বলেন, আমি পূৰ্ণকে জেনেছি, কিন্তু তাকে ভাৰাষ প্ৰকাশ কৰতে পাৰি না, তাহলে লড়াই থেমে যায়। কিন্তু ঐসব জ্ঞানী লোক অনুকম্পাবশত অল্ল কিছু বলেন। সম্পূৰ্ণ বলা তাঁদেব সম্ভব হয় না। তাঁবা অল্ল যা কিছু বলেন তাব জন্ত লড়াই আবম্ভ হয়ে যায়। তাঁবা যদি পুৰো বলতেন তবে লড়াই হতো না।

পাঁচটি শিশু আছে, পাঁচটি লাড্ডু আছে। সবাইকে একটি একটি কৰে লাড্ডু দেওয়া হল। সবাই সমান ভাগ পেল। কোনও লড়াই হবে না। পাঁচটি শিশু আছে, আব একটি লাড্ডু আছে। আপনি লাড্ডুটি টুকৰো টুকৰো কৰে সবাইকে এক একটি টুকৰো দিলেন। লড়াই শুরু হয়ে বাবে। শিশুবা বলতে আবম্ভ কৰবে—ওকে বেশি দিযেছেন, আমাকে কম দিযেছেন। ওকে অনেক দিযেছেন, আমি অতটা পাই নি। যেখানে ভাগ অনেক, আব বিভাজ্য বস্তু নহ, সেখানে বিবাদ হয়, লড়াই হয়।

সেই বকন আমাদেব আগ্ৰহ অনন্তকে জানাব, সম্পূৰ্ণ সত্যকে জানাব, অখণ্ড সত্যকে জানাব। তা আমবা পুৰোপুৰি পাই না। আমবা জানতে পাৰি ছোট একটি অংশ, অনন্তেব এক খণ্ড। আমবা ঐ খণ্ডকে আয়ত্ত কৰে, তাকে পেৰে, অখণ্ডেব জন্ত লড়াই কৰতে শুরু কৰি। ঐ লড়াই কখনও শেষ হয় না। লোকে যদি কথা না বলে, তবে ভাল হয়। অন্তত তাবা যদি সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে, কেবল ব্যবহাবেব সম্পূৰ্ণিৰ জন্ত কথা বলে, তবে লড়াই হতে পাৰে না। সত্যেব সম্বন্ধে কিছু না বলাই অসত্য খেকে বলা পাবাব সবচেয়ে ভাল উপায়। কিন্তু এ বকন হতে পাৰে না। জ্ঞানী ব্যক্তিবা অনুকম্পা কৰেন, দয়া কৰেন যাতে অজ্ঞ লোক সম্পূৰ্ণ জ্ঞান লাভ কৰতে না পাবলেও অন্তত অল্ল কিছু জানুক। এই অনুকম্পা ভাব হবে পড়ে, কাৰণ সেটাই বিবাদেৰ পথ থুলে দেয়। আজকাল পৰিস্থিতি এ বকন

দাঁড়িয়েছে যে লোকে সত্যকে জানুক বা না জানুক, তাবা সত্যের জন্য
বিবাদ কৰতে প্রস্তুত হয় ।

কথা না বলার একটি মহৎ উপকাৰিতা—সত্যকে সুবক্ষিত কৰা ।
কথা না বললে সত্য সম্পূর্ণভাবে সুবক্ষিত হয় । অবজ্ঞা, অনির্বচনীয়
অব্যাকৃত—এই কথাগুলি সত্যকে সুবক্ষিত কৰে । এক জন বলে,
‘অস্তি’ অৰ্থাৎ আছে । আৰ একজন বলে, ‘নাস্তি’ অৰ্থাৎ নেই । দুই
কথাৰই দুটি দিক আছে । বিবাদেৰ পৰিস্থিতি এসে যায় । মহাবীর
বলেছেন, ‘যে অস্তি বলে সেও ঠিক বলে না, আৰ যে নাস্তি বলে সেও
ঠিক বলে না ।’ দুজনৰ কথাই ঠিক হতে পাৰে যদি দুজনই আপন
আপন বক্তব্যৰ সচে অপেক্ষা যোগ কৰে দেখে আৰ বলে যে, এই দৃষ্টি-
কোণ থেকে এটা হয় আৰ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হয় না । স্তাদস্তি,
স্তান্নাস্তি । যখন স্তাদস্তি বললেও বাৰু হয় না আৰাৰ স্তান্নাস্তি বললেও
বাৰু হয় না । তখন স্তাদ্ অবজ্ঞা বলা হয় । আনবা যেন একথা
মেনে চলি যে সত্যৰ সম্পূর্ণ সত্যৰ স্বৰূপ কথায় প্রকাশ কৰা সম্ভব
নয় । সত্যৰ প্রকৃতি এবকম, সত্যৰ স্বভাব এবকম, এ কথা বলা চলে
না । আনবা যা কবছি সেটি সত্যৰ অংশ মাত্র । এক দৃষ্টিভঙ্গি
থেকে বলা যায় যে, আনবা আমাদেৰ দৃষ্ট অংশ মাত্র সত্য ভাষায় প্রকাশ
কৰতে গিয়ে অখণ্ড সত্যৰ প্রতি কখনও কখনও অশ্ৰাৱ কৰে বসি । এ
কথা মানা প্রয়োজন, তুমি শুধু বলাৰে যে পূর্ণ সত্যকে ভাষায় প্রকাশ
কৰা যায় না । তা বোবাৰ কণ্ঠস্বৰেৰ মত গুচ অপ্রকাশ । তাৰ
স্বাদ অবর্ণনীয় ।

আমি এই বুঝি যে ভাষা প্রয়োগ না কৰা, মৌন থাকা সত্যৰ
স্ববন্ধৰ সবচেয়ে সুলভ এৰ প্রবল উপায় । আমি মৌনেৰ মূল্যট
কিছুটা বৰ্ণনা কবলোম । আনবা যেন মৌনেৰ মূল্য বুঝি, যেন শুধু ভাষা
প্রয়োগেৰ মূল্যই না বুঝি, না বলাৰও বে মহৎ মূল্য আছে সেটা
অনুভব কৰি, এৰ বলা এ না বলাৰ মধ্যে একটা সত্যৰূপে ধাপন
কৰি । ভাষাপ্রয়োগবলন সনিতিক মহত্ব বোঝাৰ সত্য সত্য

যেন বাক্‌গুপ্তিব ভাৎপর্ষও অনুভব কবি। এই ছুটি দিক সমভাবে বুঝতে
পাবলে এই সাধনার মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং নিজের আন্তরিক
জ্ঞানকে প্রকটিত করা সম্ভব হবে।

ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ

ଜଳାଶୟେବ ଥାବେ ଗିସେ କଳସୀ ଭବତି ବବେ ଜଳ ନିସେ ଆସେ ଏମନ ବହୁ ଲୋକ ପାଞ୍ଚା ସମ୍ଭବ । ନଦୀ ବା ପୁକୁବେବ ପାଞ୍ଚେ ଗିସେ ତାବା ଯତ ଥୁଶି ଜଳ ନିସେ ଆସେ । କିନ୍ତୁ ନଦୀବ ଗଭୀରେ ଡୁବ ଦିତେ ପାବେ ଏମନ ଲୋକ ଥୁବି କମ ପାଞ୍ଚା ଯାସ । ପୁକୁବ ବା ମାଗବେବ ଗଭୀବତାସ ଡୁବ ଦିତେ ପାବେ ଏମନ ଲୋକେବ ସଂଖ୍ୟା ଥୁବ କମ । ତୀବେ ନାଞ୍ଜିସେ ଥାକାବ ଲୋକି ମେଲେ ଅନେକ ବେଶି ।

ଚିନ୍ତାବ ଘଡ଼ା ହାତେ ଏମନ ଲୋକ ବହୁ ପାଞ୍ଚା ଯାସ । ତାବା ଚେତନାବ ମାମାନ୍ତ ପରିମାଣ ଅଂଶ ପେସେଛେ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା ବବେ, ଦେଖେ ଓ ଜ୍ଞେନେ ତା ମନେବ ଆଧାବେ ସଂକ୍ଷ୍ମ କବେଛେ । କିନ୍ତୁ ଚେତନା-ରୂପ ସମୁଦ୍ରେ ଅବଗାହନକାରୀ ଲୋକ ମେଲେ ଥୁବି କମ । କାବଓ ଡୁବ ଦେବାବ ମାହସ ହସ ନା । ତାଦେବ ଭସ ହସ ପାଞ୍ଚେ ତାବା ତଳିସେ ଯାସ । ଡୁବ ଦିତେ ବା ତଳଦେଶେ ନେମେ ସେତେ ତାଦେବ ମାହସେ କୁଳାସ ନା । କେଉଁ ସେ ମାହସି କବେ ନା । ସେଥାନେ ଅନନ୍ତ ଗଭୀବତା ସେଥାନେ ସେତେ ତାବା ଭସ ପାସ । ଆତ୍ମାବ ଅନ୍ତହିନ ଗଭୀବତାସ ତଥା ଅଧଓ ଚେତନା-ରୂପ ମାଗବେ ଡୁବ ଦିତେ ମାହସ ବବେ ଏମନ ଲୋକ ଥୁବ କମି ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନିଛବ ସତ୍ୟ ସେ ତାତେ ଡୁବ ନା ଦିଲେ ବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ ପାଞ୍ଚା ଯାସ ନା । ସେ ଲୋକ ସମୁଦ୍ରେବ ତୀବେ ନାଞ୍ଜିସେ ଥାକେ

সে পাড়ে বা আশপাশে যা পড়ে থাকে তাই পাষ। নদী বা পুকুরেব পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে অল্পবিস্তর জল পেতে পাবে। সাগরতীরে যে দাঁড়িয়ে থাকে সে হয়তো কিছু বিন্দুক পেতে পাবে, কিন্তু তাব গভীরতব কোনও অনুভূতি সম্ভবপব নয। সমুদ্রেব তলদেশে যে সব মণিমুক্তা পড়ে আছে ডুব না দিলে তা পাওবা যায় না। যাব ডুব দেবাব সাহস আছে, গভীর তলদেশে যাবার ধৈর্য আছে সে সত্যিসত্যিই কিছু না কিছু পেয়েছে। আমবা চিন্তার অর্থ বুঝি, চিন্তাব কি মূল্য তাও বুঝি, আব চিন্তাব ঘড়া হাতে নিযে নিজেব কাজে চালিয়ে যাই। আমবা এক সীমা বেঁধে নিযেছি যে যা কিছু সেই কলসীতে ধবে তাই সব কিছু। তাবপবেও যে কিছু থাকতে পাবে সে কথা আমাদের কল্পনাতেই আসে না। প্রকৃতপক্ষে কল্পনা কবা সম্ভবও নয। যে মানুষ সীমার ভেতবে আবদ্ধ সে অসীমেব নাগাল পাষ না। সীমাই সীমা বেঁধে দেয এবং অসীমেব দিকে যেতে দেষ না। আমাদের বুদ্ধিব এক সীমা আছে, তথা মনেবও এক সীমা আছে। কাজেই তাবা আমাদের অসীমেব দিকে নিযে যেতেপাবে না। মনেব দ্বাবা যা জানা গিযেছে, বুদ্ধিব দ্বাবা আমবা শুধু তাই জানতে পাবি। যা ইন্দ্রিয় দিযে জানা গিযেছে তাই মন দিযে জানতে পাবি। যা শুল, ইন্দ্রিয় শুধু তাই জানতে পাবে। শব্দ, রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সব শুল বস্তুকে ইন্দ্রিয় জানতে পাবে। এই সমস্ত বস্তুব আধাবে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুব আধাবে মন কিছুটা এগিযে যায়। ঐ সমস্ত কাঁচা মাল বা ব-মেটিবিয়াল নিযে ইন্দ্রিয় কিছু কিছু তৈবি কবে, বুদ্ধি তাতে কিছুটা সংযোগ কবে, আব বিবেকও কিছুটা কবে এবং নির্ণয়ও কবে। এইখানেই আমাদের সীমানা সমাপ্ত, আমাদের গ্রহণ কবাব সীমানা সমাপ্ত। এই সব জ্ঞান কোন মতেই কোবা জ্ঞান নয। আমবা কখন ‘কোবা’ জ্ঞান লাভ কবতে পাবি? ‘কোবা’ জ্ঞান কি কবে লাভ কবতে হয় তা আমবা জানিই না, কেননা, ইন্দ্রিয়, মন আব বুদ্ধিব সীমাব মধ্যে বিন্দুক বলে কোন বস্তুই নেই। সব কিছুই মিশাল, সব কিছুই ভেজাল। যখনই কোন কিছু তাদের আওতায়

আসে অমনি মিশ্ৰণ শুক হৰে যায়। বাগেৰ জল এসে তাতে মেলে, দ্বেষেৰ জল এসে তাতে মেলে, আৰু নানা বকম ময়লা এসে তাতে মেশে। কোথাৰ প্ৰিয়তাৰ প্ৰভাৱ এসে সংযুক্ত হয়, কোথাও বা অপ্ৰিয়তাৰ ভাব জড়িত হয়। কোথাও ইচ্ছা সংযুক্ত হয়, কোথাও বা ঘৃণা এসে মেশে। এই চিন্তাৰ সীমাৰ মध्ये আমবা চিন্তাকে খুবই মূল্য দিয়ে থাকি। কিন্তু তাকে আমবা যতটো মূল্যবান মনে কৰি আসলে তা ততটো মূল্যবান নহ। অচিন্তনেৰ মূল্য বুঝতে পাৰি না বলে আমবা চিন্তাকে এত মূল্য দিয়ে থাকি। চিন্তা না কৰা এবং বিচাৰ না কৰাব মূল্য আমবা জানি না বলেই আমবা চিন্তা ও বিচাৰেৰ অধিক মূল্য দিই, তাতে অধিক মহত্ব আৰোপ কৰি। সেদিন আমবা অতল গভীৰতাৰ মধ্যে ডুব দিতে পাৰব সেদিন আমবা না চিন্তা কৰব, না বিচাৰ কৰবাব অৰ্থাৎ অচিন্তনেৰ মূল্য বুঝতে পাৰব, মহত্ব অনুভব কৰতে পাৰব, সেদিন আমাদেৰ জীৱনে বিৰাট ঘটনা। ইষ্ট্ৰিয়, মন ও বুদ্ধিৰ সীমানা অতিক্ৰম কৰে, পৃথিবীৰ গুৰুত্বাকৰ্ষণকে অতিক্ৰম কৰে যদি আমবা আকাশপথে এগিয়ে যাই তবে আমবা এক বিচিত্ৰ ভাবহীনতাৰ অনুভূতি পাই। সেখানে ভাব নেই, উদ্বেগ নেই, সময়েৰ বন্ধনও নেই। সময়েৰ গতি সেখানে মন্থৰ হৰে যায়। আমবা এই বকম অবস্থিতিৰ মধ্যে চলে যাই। এই বকম অবস্থায় আমবা অনুভব কৰতে পাৰি পৃথিবীৰ গুৰুত্বাকৰ্ষণে আবদ্ধ মানুহেৰ চেৰে ঐ আকৰ্ষণেৰ বন্ধন থেকে মুক্ত মানুহেৰ তফাৎ কত বেশি হতে পাৰে।

আমবা যদি জীৱনে অচিন্তনেৰ ক্ষণগুলি উপলব্ধি কৰতে পাৰি তবে বিচাৰেৰ স্থিতি ও নিৰ্বিচাৰেৰ স্থিতিৰ, তথা চিন্তনেৰ ক্ষণ ও অচিন্তনেৰ ক্ষণগুলিৰ মধ্যে ব্যবধান কতটো তা বুঝতে পাৰব। চিন্তনেৰ গুৰুত্বাকৰ্ষণেৰ সীমা অতিক্ৰম না কৰলে অচিন্তনেৰ মহত্ব বোকা সম্ভবপৰ হয় না।

এই বন্ধন কিভাবে ছিন্ন কৰা যায় ? এ এক মস্ত বড় প্ৰশ্ন। আমবা গুৰুত্বাকৰ্ষণেৰ পৰিধি অতিক্ৰম কৰে কিভাবে যেতে পাৰি ? কেননা আমবা শব্দ, ৰূপ ও শবীৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত হৰে আছি। আমাদেৰ

চাবদিকে যা কিছু আছে সব শব্দময়, রূপময় বা আকাৰময়। আমবা শব্দেব দ্বাৰা এমনভাবে বেষ্টিত হযে আছি যে শব্দেব কাৰাগাবেব প্ৰাচীৰ আমবা ভাঙ্গতে পাৰি না। আমবা ৰূপেব দ্বাৰা এমনভাবে পবিত্ৰত যে তাৰ পিঞ্জৰ থেকে আমবা কোন মতেই মুক্তি পেতে পাৰি না। বাঁধন এত কঠিনভাবে গেড়ে বসেছে যে বেবিষে আসাৰ কোনও পথই খোলা নেই বা তাৰ কোনও সন্যোগও নেই। আমাদেব চাবপাশে শব্দ আৰু শব্দ, কোলাহল আৰু কোলাহল, আকাৰেব জটিলতাৰ পৰা জটিলতা, আকৃতিৰ পৰা আকৃতি কেবল যুবে বিবে বেড়াচ্ছে। এই সব শব্দ, রূপ আৰু আকৃতি আমাদেব এমন অতল গহ্বৰে ডুবিয়ে দিয়েছে যে শবীৰ ছাড়া আৰু কোনও কিছু আমাদেব চোখেই পড়ে না। শবীৰ স্বয়ং এক আকাৰ। আমবা তাৰ মধ্য আবদ্ধ হযে আছি। আমবা শুধু শবীৰই দেখতে পাই। তাৰ বাহিৰে কোনও কিছুই আমবা দেখতে পাই না। শবীৰেব সঙ্গে প্ৰাণ, প্ৰাণেব সঙ্গে মন, আৰু মনেব সঙ্গে বুদ্ধি সংযুক্ত হযে আছে। তাৰ ফলে এমন এক বলয় বা বৃত্ত তৈৰি হযেছে যাৰ বাহিৰে বাৰাৰ কোনও পথই আমাদেব নেই। স্তূত্বাং আমবা ঐ বলয়েব মধ্যেই ঘূৰতে কিবতে থাকি। কখনও বুদ্ধি থেকে মনে চলে আসি, কখনও বা মন থেকে ইন্দ্ৰিয়ে চলে আসি, কখনও ইন্দ্ৰিয় থেকে প্ৰাণে, প্ৰাণ থেকে শবীৰে যাই। আৰাৰ উপ্টো পথে আমাদেব যাত্ৰা শুক হয়। শবীৰ থেকে প্ৰাণে পৌছই, প্ৰাণ থেকে ইন্দ্ৰিয়ে, ইন্দ্ৰিয় থেকে মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে বিবে আসি। এই ভাবে বলয়েব সঙ্গে সঙ্গে আমবা ঘূৰতে কিবতে থাকি, আৰু এই বলয়েব কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। তাৰ কোনও বেবোনৰ পথ নেই, কোথাও ফাঁক নেই। কেৱল চক্ৰব দিতে থাকে, বন বন কৰে পাক খেতে থাকে। বলূৰ বলদেব মত ঘানিৰ চাব দিকে পাক খেতে থাকাই আমাদেব কাজ হযে পড়ে। এই চক্ৰ ভেদ না কৰা পৰ্যন্ত অচিস্তন সন্মুখে কোনও কথাই আমাদেব বোধগম্য হতে পাৰে না। অচিস্তনেব কথা বোধগম্য না হলে শুদ্ধ চেতনাৰ গুঢ় অৰ্থ বোধ হয় না, আত্মাকে জানা বা তাৰ

পৰিচয় পাওবা সম্ভবপৰ হয় না। আত্মাকে ঘিবে হাজ্জাব হাজ্জাব তৰ্ক বচিত হয়েছে। আন্তিকগণ তাৰ অন্তিৎ সমৰ্থনে বহু যুক্তি উপস্থিত কৰে, আৰাব নাস্তিকবাও ঐ সব যুক্তিৰ খণ্ডনে বহু তৰ্কৰ অবতারণা কৰে। মনে হয় উভয় পক্ষই নিজ নিজ প্ৰচেষ্টায় অসফল হয়েছে। অন্তিকও তাৰ তৰ্ক দ্বাৰা আত্মাব অন্তিৎ প্ৰমাণ কৰতে পাবে নি, আৰাব নাস্তিকও তাৰ তৰ্ক দ্বাৰা আত্মাব অন্তিৎ প্ৰমাণ কৰতে সক্ষম হয় নি। ঐ বৈচাৰাবা চিন্তাব চক্ৰেৰ মध्येই পাক খাচ্ছে। তাৰা সেই চিন্তাব বলয়েব মধ্যে ঘূৰতে থাকে, যেখানে কখনও আত্মাব উপলব্ধি হয় না। যেখানে যা নেই সেখানে তা ধোঁজা বুখা। সেখানে তাকে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ প্ৰমাণ কৰাব প্ৰচেষ্টাও ব্যৰ্থ হয়। সেখানে তাকে স্থাপিত কৰাও সম্ভব নয়, উত্থাপন কৰাও সম্ভব নয়। যদি কোনও ব্যক্তি ঐ চিন্তনেব উদ্দেশ্য, ঐ শব্দজ্বালৈব, তৰ্কৰ তথা চিন্তনেব উদ্দেশ্য উঠে আত্মাকে সিদ্ধ কৰাব প্ৰয়ত্ন কৰতে চায় তবে সে কখনও অসফল হয় না। সত্যি সত্যিই আত্মাব স্থাপনা ও উত্থাপনা সেই সব ব্যক্তিবই বোষণা, যাঁবা শব্দ আৰু ৰূপ থেকে ওপৰে উঠতে পোৱেছেন, যাঁবা ঐ বলয়কে বিদীৰ্ণ কৰে বেৰিষে আসতে পোৱেছেন। যে লোক শব্দ আৰু ৰূপেৰ জ্বালে আবদ্ধ থাকে সে লোক কখনও আত্মাকে জানতে পাবে না বা তাৰ পৰিচয় পায় না। সে তাৰ স্থাপনাও কৰতে পাবে না, উত্থাপনাও কৰতে সক্ষম হয় না।

কথাটি খুব জটিলতাপূৰ্ণ। আমাদেব সামনে যা কিছু আছে সে সবই সাকাব। যাৰ আকাৰ নেই তাকে আমবা দেখতে পাই না। যা মূৰ্ত বা মূৰ্তিবিশিষ্ট তাই আমাদেব চোখেৰ সামনে আছে। যা অমূৰ্ত তা আমাদেব দেখাই দেয় না। আমবা কি কৰে জ্ঞানব অমূৰ্ত কি, অনাকাৰ কি? সে কি অখণ্ড চেতনা? সে কি আত্মা? কেমন কৰে তা জ্ঞানব? তা জ্ঞানাব কি উপায় আমাব কাছে আছে? উপায় আছে। এই দুনিয়াতে কোন কিছুই নিকপায় নয়। নিকপায় বলে কোনও কিছু হতেই পাবে না। দইয়েব মধ্যে ঘি থাকে। মাপ্তব

উপায় বেব কবেছে। তাতে ঘোল আলাদা হয়ে যায়, আৰ মাখনও
 আলাদা হয়ে যায়। ফুলে সুগন্ধ আছে। মানুহ উপায় বেব কবেছে।
 তাতে সুগন্ধ আলাদা হয়ে যায়, ফুলও আলাদা থেকে যায়। আন্তৰ
 তৈৰি হয়, সুগন্ধি পদাৰ্থ তৈৰি হয়। মানুহ আলাদা কৰতে, বিশ্লেষণ
 কৰতে জানে। মানুহ এও জানে যে আত্মাকে শৰীৰ থেকে আলাদা
 কৰা যেতে পাবে, শৰীৰকে চেতনা থেকে আলাদা কৰা যেতে পাবে।
 এই নশ্বৰ থেকে অনশ্বৰ বা পৰম তত্ত্বকে আলাদা কৰা যায়। তাৰ
 উপায় আছে। উপায়েৰ কথা বলাও হয়েছে। নিজেকে দেখাবও
 উপায় আছে। মানুহ নিজের মুখ দেখতে পায় না। তাৰ উপায় বেব
 হয়েছে। তাৰ সামনে আয়না এসেছে। তাতে প্রতিবিম্ব দেখা যায়।
 আয়নাতো মানুহ নিজের মুখ দেখে না, শুধু তাৰ প্রতিবিম্ব দেখে।
 মানুহ আয়নাও দেখে না, নিজের মুখও দেখে না। সে কেবল প্রতিবিম্ব
 দেখে। প্রতিবিম্ব তাকে বিশ্বাস কৰায় যে তাৰ মুখ দেখতে ঐ বকম।
 প্রতিবিম্ব থেকে সে তাৰ মুখের পৰিচয় পায়। প্রতিবিম্ব দ্বাবাই তাৰ
 আত্মাকে জানা সম্ভব হতে পাবে। আমবা আকাশ দেখতে পাই না,
 কাৰণ আকাশ অমূৰ্ত। কিন্তু তাকে দেখাবও উপায় আছে। যে লোক
 ছায়া-পুৰুষেৰ সাধনা কৰে সে সূৰ্যেৰ সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ছায়াকে
 দেখে থাকে। নিজের ছায়া দেখতে দেখতে তাৰ এমন অভ্যাস হয়ে
 যায় যে কিছুক্ষণ পৰে যেমনই সে নিজের ছায়াৰ ওপৰে ধ্যান কেন্দ্ৰিত
 কৰে এবং চোখ বন্ধ কৰে, আৰ তাৰ পৰে আকাশেৰ দিকে তাকায
 সে আকাশপটে ছবছ নিজের আকাৰ দেখতে আনন্দ কৰে। ছায়া-
 পুৰুষ এমন এক দৰ্পণে পৰিণত হব যে আমবা ঐ প্রতিবিম্ব দ্বাবা
 আকাশকেও দেখতে সক্ষম হই।

আত্মাকেও দেখা সম্ভব হতে পাবে। তাকে দেখাব উপায় হচ্ছে
 অচিন্তন, চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া, শব্দ থেকে মুক্ত হওয়া, রূপ থেকে
 মুক্ত হওয়া। তা কেমন কৰে সম্ভব হতে পাবে? হ্যাঁ, তা সম্ভব।
 কৰাব সাধনা প্রেক্ষা ধ্যানের দ্বাবা কৰা যেতে পাবে। নিজেকে

নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া যায়, 'দেখ আব জান'। সূৰ্ভূতাবে দেখ আব জান। তাব সঙ্গে বাগ জুড়ে দিও না, ঘেৰ জুড়ে দিও না, প্ৰিয়-অপ্ৰিয় বোধও যোগ কোব না, যে জিনিস যেমন তাকে সেই বকম দেখবে। দেখাৰ জিন্সা আব জানাব জিন্সা—এগুলি আত্মাব প্ৰতিবিস্ব। এ হল এক দৰ্পণ যাতে আত্মাকে দেখা যেতে পাবে। এই প্ৰতিবিস্ব দ্বাৰা মানুষ আত্মাব নাগাল পেতে পাবে। জানা ও দেখাই হল আত্মাব স্বৰূপ। কেবল জানা আব দেখা। যে শুধু জানে আব দেখে, আব কিছুই কবে না সেই আত্মাব নাগাল পায়। আত্মাকে লাভ কৰাব প্ৰবৃত্তি মাধ্যম জ্ঞান ও দৰ্শন, অৰ্থাৎ জানা ও দেখা। শুধু জানা আব দেখা, তাব সঙ্গে আব কিছু সংযুক্ত না কৰা। অগ্ৰ কিছুব সংযোগ কবলেই মনেন পৰিধিব ভিতবে মৰলা জমতে থাকে।

আপনি একটা বুল দেখছেন, তাব মিষ্টি স্নগন্ধে আপনাব মন লুকু হযেছে। আপনাব মনে আকৰ্ষণ সৃষ্টি হযেছে। আপনাব জানা ও দেখা মনেন সীমাব অন্তৰ্গত হযেছে। যে জিনিস যেমন শুধু তাই জানছেন না, তাব প্ৰিয়তাবে জানছেন। আপনি তাব আকৰ্ষণে আবদ্ধ হযেছেন এবং আপনাব জানা শেষ হয গিয়েছে। আমবা সব সময় জানা ও দেখাব সীমাব মধ্যে থাকি না, আবও অগ্ৰ জিনিসেব মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। যেখানেই বন্ধন তৈৰি হয় সেখানেই আমবা আত্মা থেকে দূৰে চলে যাই। যেখানে বিমুক্ত জানা ও দেখা ঘটে, সেখানেই তাব সমাপ্তি ঘটে। যখন আমাব শব্দেব ওপৰে উঠে যাই তখনই আমাদেব আত্মাব বলক বা জ্যোতিব দৰ্শন ঘটে, আব ঐ বলক আমাদেব নিৰ্বিচাবতাৰ দিকে প্ৰেৰণা দেব। আত্মাব বলক দৰ্শন না হলে নিৰ্বিচাবতাৰ স্থিতি হতে পাবে না। আত্মাদৰ্শন ছাড়া তা হওযা সম্ভব নয়।

পিণ্ডস্থ ধ্যানে শব্দীৰ ধ্যেয় হয়ে থাকে। পদস্থ ধ্যানে শব্দ ধ্যেয়, কপস্থ ধ্যানে আকাৰ ধ্যেয়। এই সব ধ্যানেন ধ্যেয় আছে। চতুৰ্থ ধ্যান হল কপাতীত ধ্যান। যেখানে কপাতীত, ভাবাতীত স্থিতি লাভ ঘটে

সেখানে কোনও ধ্যেয় থাকে না। চিন্তনেৰ ধ্যানই হচ্ছে ধ্যান, আৰ নিৰিচাৰতাই বাস্তবে সমাপ্তি।

জৈন পৰম্পৰাৰ দুটি শব্দ প্ৰচলিত আছে—ধ্যান ও সামাযিক। সামাযিকও ধ্যান, কিন্তু তা এ ধ্যান ৰূপে অনেকটা ভিন্ন। কেননা, ধ্যানে দ্বিতীয় কাৰও সঙ্গ সন্মুক্ত স্থাপিত হ'ব পাৰে। বৰ্ণনই আমি বলি ধ্যান কৰ, তখনই প্ৰশ্ন হয়, কাৰ ধ্যান কৰব? কিভাবে কৰব? কোথায় কৰব? কে কৰবে? ধ্যান আৰ ধ্যেয় আলাদা হ'বে বা, ধ্যান পদ্ধতিও আলাদা হ'বে বা এক ধ্যানেৰ সাধনাও ভিন্ন হ'বে বা। ঐ সব কৰ্তা কৰ্ম আধাৰ সেই ভিন্ন ভিন্ন হ'বে পড়ে। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা কৰবেন, কাৰ ধ্যান কৰব? তখন বলতে হ'বে, এৰ ধ্যান কৰন বা অমুক আকৃতিৰ ধ্যান কৰন, অথবা অমুক শব্দেৰ ধ্যান কৰন। ধ্যেয় বলে দিতে হয়। কোনও ধ্যেয়েৰ নিৰ্দেশ না দেওবা পৰ্যন্ত আপনি ধ্যান কৰতে পাৰবেন না। কিন্তু নিৰিচাৰতাৰ স্থিতি হলে এই সমস্ত প্ৰশ্নেৰ সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয়েৰ সমাপ্তি হ'বে বা। দ্বিতীয় পক্ষ বলে আৰ কিছু থাকে না। তখন ধ্যান, ধ্যান এক ধ্যেয় আৰ আলাদা থাকে না। যে ধ্যান, সেই ধ্যান, সেই ধ্যেয়, সেই ধ্যানেৰ সাধনা, আৰ সেই ধ্যানেৰ আধাৰ হ'বে থাকে। সব কাৰক এক হ'বে বা। সব কাৰকেৰ সমাপ্তি ঘটে। ভেদেৰ অবলান হয়, অভেদ প্ৰাপ্তি হয়।

নিৰিচাৰতাৰ স্থিতিতে কেবল সামাযিক হ'বে থাকে। সামাযিকেৰ অৰ্থ, সময়েৰ মধ্যে হওবা। সময়েৰ এক অৰ্থ আত্মা। আত্মাতে স্থিত হওবাই সামাযিক। যে অবস্থা হলে এই স্থিতি হয় সে অবস্থা উপস্থিত হলে সৰ স্থিতিৰ পৰিসমাপ্তি ঘটে।

ভগবান মহাবীৰকে জিজ্ঞাসা কৰা হ'য়েছিল, 'ভগ্নে, কে সামাই-এ ? কে সামাইবন্ত অট্টে ?' [সামাযিক কি ? সামাযিকেৰ অৰ্থ কি ?]

ভগবান বলেছিলে—'আয়া খলু সামাই-ত্ৰ। আয়া সামাইবন্ত অট্টে।' ['গৌতম ! আত্মাই সামাযিক। আত্মাই সামাযিকেৰ অৰ্থ।']

সামাযিকেৰ অৰ্থ আত্মাৰ স্থিতি হওবা। তথা নিজেৰ মধ্যে স্থিতি

হওয়া। যেখানে নিজের মধ্যে স্থিত হওয়ার কথা সেখানে ধ্যান করার কথা গৌণ হয়ে যায়। সামাধিকে আমরা কাবও ধ্যান কবি না, কেবল নিজের অস্তিত্বের মধ্যে নিমগ্ন থাকি। আর তাই হল নির্বিচারতাব স্থিতি। যতক্ষণ আমরা নিজের মধ্যে না হই ততক্ষণ আমরা নির্বিচারতাব কল্পনা করতে সমর্থ হই না, নির্বিচার হতে পাবি না। প্রকাবাস্তবে বলতে হয়, কোনও না কোনও বিচার আমাদের ঘিবে থাকে, বিচারের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে আত্মায় স্থিতি থাকে সে শুধু জানা ও দেখার কাজ করে, আর কিছুই করে না। ঐ স্থিতিতে সামাধিক হয় আর নির্বিচারতা আসে। আমরা যদি নির্বিচার ধ্যানকে সামাধিক বলি তবে খুব ভাল হয়। শব্দের ঐ প্রয়োগ অতিশয়: সূত্ৰ। ভগবানই এ শব্দের প্রয়োগ করে গিয়েছেন। তাই ‘সামাধিক’ কথাটির ব্যবহার শ্রাব্য।

এক ব্যক্তি মূনির কাছে এসে বলল, ‘সংসারে অনেক বকস্ব ছুঁতে আছে। সে সব ছুঁতে থেকে বিভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। আপনি তার উপায় বলে দিন।’ সাধু বললেন, ‘দেখ, এ প্রশ্ন বড় কঠিন। তুমি যখন জিজ্ঞাসা কবেই কেলেছ তখন উত্তর দিতেই হবে। তা না হলে উত্তর দিতাম না। এ প্রশ্ন খুবই জটিল। তোমাকে একটি উপায় বাতলে দিচ্ছি। যাও, এমন একজন লোকের অঙ্গবাখা নিয়ে এস যাকে জীবনে কখনও ছুঁতে স্পর্শ কবে নি। তার সেই অঙ্গবাখা গায়ে দাও, তোমার সব দুঃখ দূর হবে।’

সেই লোকটি বলল, ‘আপনি খুব সোজা উপায় বলে দিলেন। আমি যুবে যুবে অঙ্গবাখা বোঁগাড কবব। কোনও দিন দুঃখ অনুভব কবে নি এমন লোক মিলবেই।’

সে নিজের বাড়ি থেকে বেব হল। সবার আগে সে পাশের বাড়িতে গেল। গৃহস্থানীকে বলল, ‘আমি তোমার জামা নিতে এসেছি। কিন্তু জামা দেওয়ার আগে তুমি আমাকে বল, তোমার জীবনে কখনও দুঃখ এসেছে কিনা।’ গৃহস্থানী বলল—‘এই ছনিষাষ বেঁচে থাকব অথচ

হুংখ হবে না—এ কি বকম কথা বলছ ? এই ছুনিষাতে এমন কোন লোক বেঁচে আছে যে জীবনে কোন হুংখ অনুভব কবে নি ? আমি তো খুব হুংখী । আগাব অনেক টাকা আছে কিন্তু ছেলে নেই । এ কি হুংখ নয় ? এ তো খুবই বড় হুংখ ।’

সেই লোকটি বলল, ‘তোমাব জামা আমি চাই না ।’ সে আব একটি বাড়িতে গেল । জিজ্ঞাসা কবল, ‘তোমাব তো কোনও হুংখ নেই ।’ গৃহস্থামী বলল, ‘তুমি হুংখের কথা জিজ্ঞাসা কবছ ? এই ভাঙ্গা চোবা বাড়ি, ফুটো বাসনপত্র । এই ফাটাছেঁড়া কাপড়চোপড় । এব পবেও জিজ্ঞাসা কবছ আমাব হুংখ আছে কিনা ? আমি অত্যন্ত হুংখী ।’

সেই লোকটি বলল, ‘বড় বাড়ি দেখে গেলাম সেখানেও হুংখ, আবাব ছোট বাড়ি দেখে গেলাম সেখানেও হুংখ ।’

সে আব এক বাড়িতে গেল । জিজ্ঞাসা কবল, ‘তোমাব কোন হুংখ নেই তো ?’ সে বলল, ‘সমসাবে থাকব আব হুংখ থাকবে, না তাও কি সম্ভব ? বোজ বোজ আমাব স্ত্রীৰ সঙ্গে ঝগড়া, কলহ হয় । আমি হুংখী ।’

সে সেখান থেকেও যিবে আসে । সে ঘুবতেই থাকে । অনেক দিন, অনেক মাস সে ঘুবে বেডায় । গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুবে বেডায় । তাব সন্তান ছিল যে সেই অঙ্গবাখা পেতেই হবে এবং হুংখ থেকে মুক্তি পেতেই হবে । ঘুবতে ঘুবতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল । তাব মন নিবাশায় ভবে গেল । ‘আমি হুংখী নই’ এ কথা বলতে পাবে এমন লোক সে একটিও খুঁজে পেল না । ধনবান লোকও হুংখী, গবীৰ লোকও হুংখী । যাব সন্তান আছে সেও হুংখী, যাব সন্তান নেই সেও হুংখী । সে ক্লান্ত হল, হয়বাণ হল । অসফল হয়ে সে গুৰুব কাছে গেল এবং বলল, ‘মহাবাজ, ঐ অঙ্গবাখা তো পাওয়া গেল না । আমি তো মনে কবেছিলাম একদিন না একদিন আমি সফলকাম হবই । কিন্তু আমি মাসেব পব মাস বৃথাই চেষ্টা কবলাম । শেষ পৰ্বন্ত অসফল হয়ে আপনাব কাছে যিবে এলাম । এমন লোক পেলাম না যে বলতে পাবে সে হুংখী আব

যাব জামা পবে আমি হুংখ থেকে মুক্তি পাব ।’

গুৰু বললেন, ‘কত বড় মুৰ্খ তুমি । তুমি এই সত্য জান না যে এই ছুনিষায় যে জন্মেছে সে হুংখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না ।’

সে তখন বলল, ‘গুৰুদেব । আপনি যখন এ সত্য জানতেন তখন কেন শুধু শুধু ঘূৰিয়ে হয়বাণ কবলেন ? প্ৰথম দিনই তো এ কথা বলতে পাবতেন । আপনিই তো আমাকে মাসেৰ পৰ মাস ঘূৰিয়ে মাৰলেন । কেন এ বকম কবলেন ?’

গুৰু বললেন, ‘সত্য হুংপাচ্য । কঠিন পৰিশ্ৰম ছাড়া সত্য পৰিপাক হয় না । আমি যদি প্ৰথমেই বলতাম যে এই ছুনিষায় যে-ই জন্মেছে সেই হুংখ থেকে বাঁচতে পাবে না, হুংখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না, তাহলে সেই সত্য তোমাৰ বোধগম্য হতো না । এখন তুমি অনেক জাযগায় ঘূবে এসেছ, অনেক কষ্ট কবেই ঘূবেছ । এবা । তুমি এই সত্য সহজেই বুঝতে পাববে যে এই ছুনিষাতে কোনও লোকই হুংখেৰ স্পৰ্শ থেকে বাঁচতে পাবে না । ঐ সত্য এতই অপাচ্য, এতই হুংপাচ্য যে প্ৰথম স্নেহেই তা পৰিপাক কৰা সম্ভব হতো না ।’

অনেক লোক জিজ্ঞাসা কৰে—‘নিৰ্বিচাৰ কিভাবে হবে ?’ আমি যদি প্ৰথম দিনেই বলে দিতাম যে এইভাবে নিৰ্বিচাৰ হতে পাবে তবে ঐ সত্য তোমাৰ পৰিপাক হতো না । তোমাৰ বোধগম্য হতো না । প্ৰথমে তো তোমাকে জামাৰ খোঁজ কবতে হতো । ঘূবে ঘূবে বেড়াতে হতো, বাডিতে বাডিতে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো । সব কিছু দেখতে হতো । সব কিছু দেখে, চিন্তনেৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰে, বিচাবেৰ পথ সম্পূৰ্ণ অভিক্ৰম কৰে, বিচাবেৰ ক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হলে এ কথা বুঝতে পাববে যে নিৰ্বিচাৰতাবও মূল্য আছে, আৰ এই ভাবেই নিৰ্বিচাৰ হওবা যায় । যত দিন পৰ্যন্ত এই বকম না হবে, যত দিন পৰ্যন্ত চিন্তনেৰ পৰিক্ৰমা সম্পূৰ্ণ না হবে, যত দিন বিচাবেৰ পথে বাত্ৰা সম্পূৰ্ণ না হবে, ততদিন অচিন্তনেৰ কথা, চিন্তা না কৰাৰ কথা তোমাৰ বোধগম্য হবে না, আৰ তাৰ মূল্যও তুমি বুঝতে পাববে না ।

এই ছুনিয়াৰ যাৰা বাস কৰে, যাৰা শবীৰ, প্ৰাণ, মন আৰু বুদ্ধিৰ সীমাৰ মध्ये বাস কৰে তাৰা কেউ নিৰ্বিচাৰ হতে পাবে না। কাৰণ মোহ, মায়া ও মমতাৰ সীমাৰ মध्ये যাৰা জীবন ধাৰণ কৰে তাৰা দুখ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হন না। সেই বকম বুদ্ধিৰ ও শবীৰেৰ গণ্ডিৰ মध्ये যাৰা বাস কৰে তাৰা কেউ বিচাৰ থেকে মুক্ত হতে পাবে না। এই হল পৰম সত্য। এই সত্য তখনই আমবা উপলব্ধি কৰতে পাবৰ যখন আমবা অন্ধবাখাৰ সন্ধানে গ্ৰাম থেকে গ্ৰামে ঘূৰে বেড়াব, বিচাৰেৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰব, আৰু চিন্তনেৰ সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্ক বুঝতে পাবৰ। তখনই এই কথা আমাদেৰ বোধগম্য হবে, তখনই আমবা এই সত্য জানতে পাবৰ, পৰিচয় কৰতে পাবৰ, পৰিপাক কৰতে পাবৰ।

অচিন্তন ও নিৰ্বিচাৰতাৰ কথা বড়ই চিন্তাকৰ্ষক বলে মনে হয়, কেন না আমবা সৰ্বদাই চিন্তনেৰ মध्ये বেঁচে থাকি, আৰু তাৰ মध्येই জীবনকে অনুভব কৰি। কিন্তু যখন আমাদেৰ সামনে অচিন্তনেৰ কথা, চিন্তা না কৰাৰ কথা, বিচাৰশূন্যতাৰ কথা হতে থাকে তখন সহজেই একটা আকৰ্ষণ সৃষ্ট হয় এবং আমাদেৰ মনে হয় ঐ ভাবে জীবন যাপনই শ্ৰেষ। এ এক অভিনব ব্যাপাৰ। এও কি সম্ভব? লোকে চিন্তা আৰু বিচাৰ বাদ দিহে জীবন যাপন কৰতে পাবে, এ আৰাৰ কি বকম কথা? বিচাৰেৰ প্ৰবাহ এত প্ৰবল আৰু তাৰ শৃঙ্খল এত দীৰ্ঘ যে কেউ তা ভাঙতে বা ছিঁড়তে পাবে না। একেৰ পৰা এক বিচাৰ আসে যায়। কখনও তাৰ প্ৰবাহ কম হয় না। সে সদা সৰ্বদা গতিশীল। তাৰ কোনও শেষ নেই। এই বকম পৰিস্থিতিতে এটা কি সম্ভব, এই নিৰ্বিচাৰতাৰ কথা লোকে চিন্তা কৰতে পাবে এবং সেই অনুসাৰে জীবন যাপন কৰতে পাবে? এ প্ৰশ্ন অত্যন্ত সহজ। এ বকম প্ৰশ্নও হয় এবং আকৰ্ষণও সৃষ্ট হয়। এই আকৰ্ষণেৰ আধাৰে এ দিকে যত্নবান হই।

চিন্তনেৰ চেয়ে অচিন্তনেৰ মূল্য অনেক বেশি। এ কথাটি খুবই অৰ্থপূৰ্ণ। আমবা এ কথা জানি যে বেশি ভাবা বা চিন্তা কৰা শুধু শক্তি ক্ষয় কৰা। প্ৰত্যেক কৰ্ম ও প্ৰযুক্তি শক্তিকে জীণ কৰে।

শৰীৰেৰ কৰ্ম, বাণীৰ কৰ্ম, মনৰ কৰ্ম, চিন্তনেৰ কৰ্ম ইত্যাদি প্ৰত্যেকে কৰ্মশক্তি হ্ৰাস কৰে। শৰীৰশাস্ত্ৰী বলেন যে, প্ৰত্যেক প্ৰবৃত্তিৰ সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব দেহে বিষ উৎপাদিত হয়, শক্তি ক্ষীণ হয়। যে লোক বেশি চিন্তা কৰে তাৰ বোগ হয়, মানসিক বিকৃতি ঘটে। বুদ্ধিজীবীদেব শৰীৰ বেশি পৰিমাণে খৰাপ হয়। তাৰা পেটেৰ বোগে আক্ৰান্ত হয়। তাৰ কাৰণ তাৰা অধিক ভাবে, অধিক চিন্তা কৰে। চিন্তা শৰীৰেৰ ধৰ্ম হতে পাবে। কিন্তু শৰীৰেৰ ধৰ্ম হলেও তাৰ একটা সীমা আছে। সীমাৰ অধিক চেষ্টাও হানিকাৰক হয়ে থাকে।

অচিন্তন শৰীৰেৰ ধৰ্ম নহ। অচিন্তন শব্দ ও কপেৰ কাৰ্যও নহ। তা আত্মাৰ ধৰ্ম, তাৰ স্বভাব। যা স্বভাব তাৰ দ্বাৰা শক্তি ক্ষয় হয় না। অচিন্তন আমাদেব স্বভাব। আমবা অচিন্তনেৰ অবস্থায় যখনই উপনীত হই বা থাকি তাতে আমাদেব শক্তি ক্ষয় হতে পাবে না। তাতে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চিন্তাতে ওজঃশক্তি নিঃশেষিত হয়, কাৰণ চিন্তাৰ জ্ঞান ওজঃশক্তিৰ প্ৰযোজন, ইন্ধনেৰ প্ৰযোজন। যাতে ইন্ধনেৰ প্ৰযোজন হয় তাতে ইন্ধন নিঃশেষিত হয়। অচিন্তনেৰ জ্ঞান প্ৰাণীজ ওজঃশক্তিৰ কোন প্ৰযোজন নেই। তাৰ কাৰণ তা আত্মাৰ স্বভাব, অখণ্ড চেতনাৰ সহজ ধৰ্ম। এই কাৰণে তাকে জানা ও দেখাৰ মধ্যে স্থিতি আছে। তাৰ জ্ঞান কোনও শক্তিৰ অপব্যয় হয় না। ঐ সময় আমবা আপন মূল স্বভাবে অবস্থান কৰি।

চিন্তনেৰ কাজ হল শক্তি ব্যয় কৰা। অচিন্তনেৰ অবস্থাব স্থিতিতে আমাদেব শক্তি বাড়ে, কম না। অচিন্তনে শক্তিৰ বিক্ষোৰণ হয়। আমাদেব জ্ঞানৰ শক্তি এত বেড়ে যায় যে চিন্তনেৰ দ্বাৰা অতটা জ্ঞানৰ ক্ষমতাও হয় না, জানতেও পাৰি না। আমাদেব ক্ষমতা বেড়ে যায়। চিন্তনেৰ দ্বাৰা সেইটুকু জানতে পাৰি যা আমাদেব জ্ঞানৰ সীমাৰ মধ্যে আবদ্ধ। সীমাৰ মধ্যে জানা সম্ভব হয়। জ্ঞানৰ সীমাৰ মধ্যে অবস্থিত নহ এমন বস্তুও অচিন্তনেৰ দ্বাৰা আমাদেব কাছে দৃশ্যমান হয়। তাৰ দ্বাৰা দূৰবৰ্তী বা ব্যবস্থিত বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়, আৰাৰ

মুসল বস্তুকেও জানা সম্ভব হয়। এ সবই অচিন্তনের দ্বাৰা সম্ভব হয়। বস্তুত অচিন্তন খুবই মূল্যবান। তাৰ মহত্ব বুঝতে পাৰি। আমবা তাৰ মূল্য নিকপণও কৰেছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, আমবা কি কৰে অচিন্তনেৰ স্থিতিতে পৌছতে পাৰি। এখনই আপনি তাডাছডো কৰবেন না। এখনই নিৰ্বাচাবেৰ কথা ভাববেন না। প্ৰথমে অভ্যাস কৰতে আবন্ত কৰুন। ধ্যেৰ নিৰ্বাচন কৰুন এবং ঐ ধ্যেৰেৰ সঙ্গে চলতে থাকুন। এই ভাবে আপনাৰ মনকে এক অভ্যাস দিন। ঐ প্ৰক্ৰিয়া দ্বাৰা আপনি উত্তীৰ্ণ হতে পাৰবেন, চলতে পাৰবেন। চলতে চলতে এমন অবস্থা আসবে যখন আপনাৰ একাগ্ৰতা সাধিত হবে। আপনাৰ অভ্যাস পৰিপক্বতা লাভ কৰবে, আব আপনি অপ্ৰিয়তা ও প্ৰিয়তাৰ মঞ্জিল খানিকটা পাৰ হয়ে যাবেন। আপনি কেবল জানা এবং দেখাৰ ক্ষমতা আয়ত্ত কৰবেন। এই অবস্থায় নিৰ্বাচাবতাৰ কথা সহজে বোধগম্য হবে।

আমি শুব্বতেই বলেছিলাম, লোকে যা দেখে তা ভাবে না, যা ভাবে তা দেখে না। দেখা ও ভাবা—এ দুটি একই সঙ্গে চলতে পাৰে না। যে জানে সে বিচাব কৰে না। আব যে বিচাব কৰে সে জানে না। ভাবা, দেখা, বিচাব কৰা—এ সবই যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া, মস্তিষ্কেৰ ক্ৰিয়া। এ সবই মস্তিষ্কেৰ মাধ্যমে ষটে।

দেখা ও জানা—এ যান্ত্ৰিক ক্ৰিয়া নয। এ অখণ্ড চেতনাৰ ক্ৰিয়া এবং স্বভাবত মুৰ্ত্ত হয়। এব উৎস বা উদগমস্থল অখণ্ড চেতনা, আত্মা। এ যান্ত্ৰিক ক্ৰিয়া নয, মস্তিষ্কেৰ ক্ৰিয়া নয, এমন কি মনোদৈহিক ক্ৰিয়াও নয। এব বলে আমবা অখণ্ড চেতনাৰ সঙ্গে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি, তাতে ডুব দিই। এতে বিপদ হতে পাৰে। যাব বিপদেৰ ঝুঁকি নেওচাব ক্ষমতা এসে যায় এবং যে মৰতে সাহস সংগ্ৰহ কৰতে পাৰে সে-ই এ পথে অগ্ৰসব হতে পাৰে। যে মানুষ নিজেৰ লক্ষ্যেৰ দিকে অগ্ৰসব হতে চায় তাকে সবাব আগে নিজেৰে যত্নেৰ জ্ঞাত প্ৰস্তুত কৰতে হবে। মৰণেৰ জ্ঞাত তৈবি না হওয়া পৰ্যন্ত অচিন্তনেৰ কথা উঠতেই পাৰে না।

কোন কোন লোক ভয় পেয়ে যায়। ধ্যানের গভীরতায় যায, তখন এক প্রকার বিচিত্র অনুভূতি হতে থাকে। তাবা ভয় পেয়ে ধ্যান ছেড়ে দেয়। জিজ্ঞাসা করলে বলে, ‘ধ্যানের গভীরতাব মধ্যে গিয়েছিলাম। মনে হল যেন হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছে।’ এমন লোক অচিন্তনের মধ্যে ডুব দিতে পাবে না।

আচার্য ভিক্ষু মহান সাধক ছিলেন। তাঁর সামনে এক লক্ষ্য ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মৃত্যুর জ্ঞান প্রস্তুত হলেন। ক্রীমজ্জাচার্য লিখেছেন, ‘মরণের ধাব শোধ চেয়ে নাও।’ আচার্য ভিক্ষু মৃত্যুর জ্ঞান প্রস্তুত হয়ে শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হলেন। মরণের কথা না ভাবলে কোন লোক শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হতে পাবেন না। শুদ্ধ মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার মার্গ অনেক পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুর জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছে সে-ই শুধু শুদ্ধ মার্গে পৌঁছানোর পথ খুঁজে পায়। সে এত সাহস সঞ্চয় করেছে যে তার বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাও নেই, মরণের ভয়ও নেই। ঐ লোক নির্বিচাবতার স্থিতিতে পৌছতে আর চেতনাব অতল গভীরতায় ডুব দিতে সক্ষম। ঐ ব্যক্তিব অথও চেতনাব কপসাগরে ডুব দেওয়ার অধিকার আছে, তাব জ্ঞান আমবা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে না যেন তাবাব ভূমিকায় বাই, অচিন্তনের ভূমিকায় বাই। কপ এবং আকৃতিব সীমা অতিক্রম কবে সেই স্থিতিতে চলে যাই যেখানে কোন শব্দ আমাদের প্রভাবিত কবে না।

ধ্যান শব্দকে প্রভাবিত কবে। রাজর্ষি প্রসন্নচন্দ্র ধ্যানস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন। একটি লোক এল। তাকে একটি কথা বলে রাজর্ষি রাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন। রাজ্যেব ভাব ছেলেকে দিলেন। ছেলে খুবই ছোট ছিল। এই ছোট ছেলের কাঁখে রাজ্যেব বিরাট ভাব পড়ল। শত্রুবা রাজ্য আক্রমণ কবল। তাবা রাজ্য ধ্বংস কবতে শুরু কবল। তাতে অনেক শব্দ হল। কোনও ঘটনাই ঘটে নি। রাজর্ষি শুনলেন। শব্দ তাঁকে এতই প্রভাবিত কবল যে ধ্যানে দণ্ডায়মান হয়েই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। যুদ্ধ আবিস্ত হয়ে গেল, তিনি

শত্ৰুকে পবাস্তু কবতে লাগলেন। এই সময়ে এক লোক এল এবং ধ্যানস্থ বাজৰ্ষিকে দেখে বলল, ‘কত বড় ধ্যানী! কত বড় ধ্যানী! কত বড় সাধক! অচল ধ্যানমুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন।’ বাজৰ্ষি এ কথা শুনলেন, তাঁৰ চেতনা মোড় নিল। যুদ্ধভূমি থেকে ধ্যানভূমিতে যিবে এলেন। আঁৰাৰ ধ্যানেৰ বাঁৰা অখণ্ড প্ৰবাহে বহিতে লাগল।

শব্দেৰ পৰিধিৰ মध्ये গতিশীল ধ্যান শব্দেৰ দ্বাৰা প্ৰভাবিত হয়। ধ্যান কখনও লড়াই কবতে লেগে যায়, কখনও বা আত্মসাধনাৰ কথা ভাবতে লেগে যায়। সে কপেৰ দ্বাৰাও প্ৰভাবিত হয়।

অচিন্তনেৰ স্থিতিতে যে প্ৰতিষ্ঠিত, সামাযিকে যে অবস্থান কৰে, যে আপন আত্মাৰ স্থিত, সে কখনও শব্দ দ্বাৰা প্ৰভাবিত হয় না। কখনও কপেৰ প্ৰভাবাধীন হয় না। তাৰ শব্দেৰ অভ্যাস হয় না, জীৱনেৰ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, মৃত্যুৰ ভয় থাকে না। সে সব বিছুৰ অতীত হয়। পৃথিৱীৰ গুৰুত্বাকৰ্ষণ অতিক্ৰম কৰে তাৰ আত্মা অন্তৰীক্ষে চলে যায়। সেখানে তাৰ ভাবেৰ কোনও অন্তৰ্ভূতি হয় না।

লাড়নু শিবির

(২ মার্চ, ১৯৭৬ থেকে ১১ মার্চ, ১৯৭৬)

রাজলদেঙ্গর শিবির

(১ জানুয়ারি, ১৯৭৭ থেকে ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৭)

শরীর পরিচয়

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিষ্কের জ্ঞান আবশ্যিক। মস্তিষ্কের জ্ঞান না থাকলে অনেক সাধনা সত্ত্বেও সাধক যথেষ্ট সফলতা লাভ করতে পাবেন না।

মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের গঠন অত্যন্ত জটিল। তা অসংখ্য প্রকোষ্ঠ দ্বারা বচিত এবং তাব যন্ত্রপ্রণালী এত জটিল ও দুৰ্জ্ঞ যে আজ পর্যন্ত তাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় নি। বহুদিন ধরে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু আজও এ কার্যপ্রণালী বহিস্কার্য হইতে বসেছে। মস্তিষ্ক মানুষের সকল মনোবৃত্তি ও সংস্কারের মূল কেন্দ্র। শরীরশাস্ত্রীগণ অনেক কেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছেন। সংবেদন, জ্ঞান, বাসনা প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়ার কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত কেন্দ্রের সূক্ষ্মতাও এখন আমাদের বিদিত। তাদের চিকিৎসা, এমন কি তাদের পরিবর্তনও করা হয়।

আমাদের মস্তিষ্কে দুই প্রকার পদার্থ ও বর্ণ পাওয়া যায়। এক বকম দ্রব্য ধূসর বা হালকা হলুদ বর্ণের। তা বুদ্ধির ধারক। যে লোকে

ধূসৰ বস্তু অধিক পৰিমাণে থাকে তাৰ জ্ঞানবাহী তন্তু সবল হয় এবং বুদ্ধি, প্ৰথৰ বা সতেজ হয়। মস্তিষ্কেৰ অপৰ পদাৰ্থটি শ্বেত বৰ্ণ, তা কৰ্ম-প্ৰেৰণাৰ সূচক। মস্তিষ্কেৰ শ্বেত অংশ দ্বাৰা ক্ৰিয়া এবং ধূসৰ অংশ দ্বাৰা বুদ্ধি নিয়ন্ত্ৰিত হয়।

আমাদেৰ বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে অসংখ্য তাৰ বা স্মৃতিৰ মত বস্তু বেৰিযেছে। সেগুলি জ্ঞানবাহী ও গতিবাহীও বটে। এই তন্তুগুলি বৃহৎ মস্তিষ্ক থেকে বেৰিযে লঘু মস্তিষ্কেৰ ভেতৰ দিযে স্মৃষ্ণাশীৰ্ষ পাব হযে পৃষ্ঠবজ্জু বা মেকদণ্ডেৰ মধ্যৰে স্মৃষ্ণা আছে সেখানে গিযেছে এবং সেখান থেকে সমস্ত শৰীৰে ছড়িযে পড়েছে। এক দৃষ্টিতে বলা যায় মস্তিষ্ক শৰীৰেৰ নিয়ামক বা নিয়ন্ত্ৰণকৰ্তা। বৃহৎ মস্তিষ্ক, লঘু মস্তিষ্ক-ও স্মৃষ্ণাশীৰ্ষ—এই তিনিটিই শৰীৰেৰ নিয়ামকতন্তু।

মস্তিষ্ক জ্ঞানকেন্দ্ৰ। তা চৈতন্ত্যেৰ সবচেয়ে বড় কেন্দ্ৰ। সূক্ষ্ম শৰীৰেৰ মুখ্য প্ৰকাশ মস্তিষ্কেৰ মাধ্যমেই আমাদেৰ স্থূল শৰীৰে নেমে আসে। মস্তিষ্ক এক প্ৰকাৰ মধ্য-সেতু। স্থূল শৰীৰ ও সূক্ষ্ম শৰীৰেৰ মধ্যৰে তা সেতুৰ কাজ কৰে। সূক্ষ্ম শৰীৰ থেকে অববাহী শক্তি বা চৈতন্ত্য মস্তিষ্কেৰ মাধ্যমে স্থূল শৰীৰ বা জাগ্ৰত মনে নেমে আসে। অবচেতন মন ও চেতন মনেৰ কাজও তাৰ মাধ্যমে হয়। এই কাৰণে সাধকেৰ পক্ষে মস্তিষ্কেৰ জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। যদি আমি মস্তিষ্কেৰ ক্ৰিয়া ঠিকমত বুঝতে পাবি তৰে আমাৰ পক্ষে জ্ঞানকেন্দ্ৰকে বিকশিত কৰা সম্ভবপৰ। এখ আধাবেই সাধকগণ সহস্ৰাবেৰ পৰিকল্পনা কৰেছেন। তাঁদেৰ কল্পনা অনুযায়ী আমাদেৰ মস্তিষ্কে সহস্ৰাব নামে এক চক্ৰ বা চৈতন্ত্যকেন্দ্ৰ আছে। আমবা আমাদেৰ খুশিমত তাকে চক্ৰ, বুদ্ধি বা-অন্ত কোনও নাম দিতে পাবি। তা একটা অতি বৃহৎ জ্ঞানকেন্দ্ৰ বটে। তাকে বিকশিত কৰতে পাবলে অতিবিস্তৃত জ্ঞানপ্ৰাপ্তি সম্ভবপৰ হতে পাবে। এ সামান্য কথা, তেমন বড় ব্যাপাৰ কিছু নয। প্ৰত্যেক লোকই তা পৰীক্ষা কৰে দেখতে পাবে। যদি কোন লোকেৰ মনে হয় তাৰ বুদ্ধি সঙ্কুচিত হযে যাচ্ছে, জ্ঞান মন্দীভূত হচ্ছে তৰে সে দশ মিনিট

কাল নিজেব মস্তিষ্কেব তালুতে হলুদ বড়ের ওপাবে ধ্যান কেন্দ্রিত ককক ।
 ধীবে ধীবে তাব অনুভব হবে জ্ঞানেব বিকাশ হচ্ছে, বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
 আপনি এই উপায় প্রয়োগ ককন, তখন নিজেবই বিশ্বাস হবে । এই
 প্রয়োগ দ্বাৰা বুদ্ধি প্রবল হতে পাবে, চৈতন্যশক্তি পুষ্টি ও দৃঢ়তা লাভ
 কবতে পাবে, বিকশিত হতে পাবে । একে সমগ্রভাবে উপাসনা কবলে
 মানুষেব মধ্যে অতিবিস্তৃত জ্ঞানেব অবতরণ সম্ভব হতে পাবে ।

দুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে—জ্ঞানকেন্দ্র ও কামকেন্দ্র । মস্তিষ্ক জ্ঞান-
 কেন্দ্র আব কচিদেগেব আশপাশেব স্থান কামকেন্দ্র ।

মানুষ কামেব উত্তেজনা দ্বাৰা অতিশয় অভিভূত । তাব মধ্যে
 বিচিত্র প্রকাৰ কামনা উৎপন্ন হয়, তাব উত্তেজনা হয় এবং তাব
 উত্তেজনা দীৰ্ঘকাল থাকে । ক্রোধ থেকেও উত্তেজনা হয়, কিন্তু তা মাঝে
 মাঝে হয় । অভিমান, লোভ ও মায়া থেকেও উত্তেজনা হয়, কিন্তু তাও
 সৰ্বদা হয় না । কিন্তু কামনাব উত্তেজনা দীৰ্ঘকাল ধৰে চলতে থাকে ।
 এই উত্তেজনাই সবচেয়ে প্রবল ও তীব্র ।

আমাদেব শবীবেব ওজঃ বা শবীবেব বিদ্যুৎ কামকেন্দ্রেব দিকে অধিক
 প্রবাহিত হলে কামকেন্দ্র পুষ্ট হয় এবং জ্ঞানকেন্দ্র ক্ষীণ হয় । আমাদেব
 শবীবেব সাৰাংশ ওজঃ বা বিদ্যুৎ যদি জ্ঞানকেন্দ্রেব দিকে প্রবাহিত হয়
 তবে জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হয় এবং কামকেন্দ্র ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় । এই
 দুটিব মধ্যে সম্বন্ধ অতিশয় নিবিড় ।

সাধনাব অৰ্থ, কামকেন্দ্রস্থিত ওজঃশক্তিকে ওপাবেব দিকে প্রবাহিত
 কবে জ্ঞানকেন্দ্রে নিযে যাওয়া যাতে জ্ঞানকেন্দ্রেব সিঞ্চন, পোষণ ও
 পুষ্টি হতে পাবে । সাধাবগত মানুষ নিজেব কামনা দ্বাৰা ধ্যানকেন্দ্রকে
 নিচেব দিকে নিযে যায় এবং কামকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে । শবীবেব গঠন
 সম্বন্ধে বোধ হবাব পবে কামকেন্দ্রগত ওজঃশক্তিকে জ্ঞানকেন্দ্রে নিযে
 যাওয়া সম্ভব হয় । সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেব এ বিষয়ে যত্নবান
 হওয়া উচিত । তাব সবচেয়ে প্রশস্ত পথ—শুষ্ণা ।

আমাদেব শবীবে তিনটি প্রধান প্রধান পথ আছে—ডানে, বাঁয়ে

আব মাঝখানে। এই তিনেব মহেশ্বের কাবণ, তাদের ভেতব দিয়ে প্রাণ-
 তবঙ্গ ওপবের দিকে যায়। এগুলি প্রাণধাবা বা প্রাণতবঙ্গের প্রবাহ-
 কক্ষ। তাই তাব মহন্ত। তিনটিব মধ্যেই সুষুন্না আছে। তা সবচেয়ে
 বড় এবং মহন্তপূর্ণ প্রাণধাবাব প্রবাহকক্ষ। তাব ভেতব দিয়ে প্রচুব
 মাত্রাব প্রাণধাবা ওপব দিকে যায়। ষোগেব ভাবাব বাঁ দিকেব পথকে
 ইড়া আব ডানদিকেব পথকে পিঙ্গলা বলে। মাঝখানকাব পথকে সুষুন্না
 বলা হয়। পৃষ্ঠবজ্জু ছত্রিশটি হাড় দিয়ে গঠিত। তাব ভেতবকাব
 কোমল অংশ হল সুষুন্না কক্ষ। এব ভেতব দিয়ে প্রাণতবঙ্গ আসে ও
 যায়। বাঁয়েব পথ পৃষ্ঠবজ্জুব বাইবে নিচু থেকে আবন্ত হয়ে ওপবের
 দিকে যায় এবং বাঁ দিকেব নাসাছিত্রে এসে তাব শেষ হয়। ঐ হল
 ইড়াব পথ। ডান দিককাব পথ পিঙ্গলাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জু নিচে তাব
 আবন্ত এবং ওপবে গিয়ে ডান দিকেব নাসাছিত্রে তাব সমাপ্তি।
 মাঝখানকাব পথ সুষুন্নাব পথ। পৃষ্ঠবজ্জুব নিচ থেকে তাব আবন্ত,
 আব মাস্তকে এসে তাব সমাপ্তি। এই তিন পথ আছে। দুটি যায়
 নাসাছিত্রে, আব একটি যায় মাস্তকে। আমাদের প্রাণধাবাকে বাম ও
 দাক্ষিণেব পথে যেতে না দিয়ে মধ্যপথ দিয়ে চালনা কবাব চেষ্টা কবা
 উচিত। প্রাণেব তবঙ্গকে বেশি মাত্রায় প্রবাহিত কবতে হবে যাতে
 তা মাস্তক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। দুটি পথ দিয়ে প্রবাহিত প্রাণধাবা
 মাস্তক পর্যন্ত পৌছয় না। কেবল মাঝখানকাব পথ দিয়ে অর্থাৎ সুষুন্না
 দিয়ে প্রবাহমান প্রাণধাবা মাস্তক পর্যন্ত পৌছতে পাবে। মস্তিকে প্রাণ-
 ধাবা নিয়ে যাওবাব অর্থ, জ্ঞানকেন্দ্রকে প্রাণধাবা দিয়ে পবিপূর্ণ কবা।
 এই দৃষ্টিকোণ থেকে সুষুন্নাকে জানা, ঐ পথে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত
 কবা, তাকে প্রাণ দিয়ে পাবিপূর্ণ কবা, সাধনাব জন্ত প্রযোজন। এই
 প্রযোজন মেটাবাব জন্ত আমবা অনেক ক্রিয়া কবে থাকি।

আমবা দীর্ঘকালসেব অভ্যাস কবি। তাতে শাবীবিক লাভ হয়।
 ফুসফুসে নির্মলতা আনা সম্ভব হয়। প্রাণবায়ু পূর্ণ মাত্রাব ভেতবে চলে
 যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বেব হয়ে যায়।

আমাশয়েবও নিবাসৰ হয়। সম্পূৰ্ণ উদব যন্ত্ৰ শোষিত হয়। এ সব শাবীৰিক লাভ। কিন্তু লাভ হ'বে, কেবল এই উদ্দেশ্যে আমবা দীৰ্ঘশ্বাস অভ্যাস কৰি না। যদি শুধু তাই উদ্দেশ্য হ'তো তৰে তা আমাদেব স্বাস্থ্য নিকেতন হ'তো, সাধনা-নিকেতন হ'তো না। কিন্তু তা সাধনা-নিকেতন হ'লেও স্বাস্থ্যনিকেতন নহ। আমবা আধ্যাত্মিক লাভেব জন্তু দীৰ্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কৰি। দীৰ্ঘশ্বাসেব দ্বাৰা সুসুমাৰ পথ উন্মুক্ত হয়, বিছাৎ তবজ্ঞ প্ৰবল হয়। কামাব হাপৰ চালনা কৰে, তাব ফলে আগুন প্ৰবলভাবে জ্বলে ওঠে। দীৰ্ঘশ্বাসেব কাজও এই। তাব এমন ক্ষমতা যে তা সুসুমাৰ পথ খুলে দেয় এক তাব ভেতৰ দিষে প্ৰাণধাবাকে প্ৰবাহিত কৰে। প্ৰাণধাবা ঐ পথে প্ৰবাহিত হয়ে মস্তিষ্কেব কোশ্চে পৌছে জ্ঞানবেশ্ৰকে পুষ্ট কৰে। দীৰ্ঘশ্বাস অভ্যাস কৰাব এই প্ৰযোজন। সেখানে পৌছতে পাবলে আমাদেব প্ৰত্যেক কাজেবই আধ্যাত্মিক প্ৰযোজন থাকে এক তাব দ্বাৰা অনুপ্ৰেৰিত হয়ে আমবা ঐ সব কাজ কৰে থাকি।

যে সাধক পূৰ্ণ একাগ্ৰতা, নিষ্ঠা এক তন্ময়তাৰ সঙ্গে দীৰ্ঘশ্বাসেব প্ৰয়োগ অভ্যাস কৰে তাব প্ৰথম প্ৰথম অনুভূতি হয় তাব পৃষ্ঠবজ্জ্বৰ তাব বনবন কৰছে। তাব ভেতৰে কাঁপনও শুক হ'বে। একটু গভীৰতায গিয়ে সে যদি অনুভব কৰতে চেষ্টা কৰে তৰে তাব মনে হ'বে তাব পেছনে কিছু নড়াচড়া কৰছে।

দ্বিতীয় কথা—যখন সুসুমাৰ পথ খুলে যাব তখন এক বিচিত্ৰ শাস্তি ও তন্ময়তাৰ অনুভূতি হয় এক সমস্ত শবীৰে শীতলতা ব্যাপ্ত হয়। মনে হয় যেন ঐশ্বৰে প্ৰথম তাপে উৎপীড়িত কোনও পথশ্ৰান্ত পথিক গভীৰ ছায়াচ্ছন্ন কোন জায়গায় এসে বসেছে।

তৃতীয় কথা—দীৰ্ঘশ্বাসেব অভ্যাস পৰিপক্ব হ'লে দশ-পনৰ মিনিট কাল অভ্যাস কৰাব পৰ এক নিৰ্বিচাৰ স্থিতি সজ্জাত হয় এক সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প বন্ধ হয়ে যায়।

এ সবে কি হয়? এ একটি প্ৰশ্ন বটে। এব উত্তৰ এই যে,

সুবুন্নাতে প্রাণধারা প্রবেশ কবাব ফলে এই সব ঘটে। যদি আমাদের খাস ডান দিকের পথে প্রবাহিত হয় তবুও চঞ্চলতা আসবে। যখন আমাদের খাস সুবুন্না বা মাথার পথ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে তখন সমস্ত চঞ্চলতা আপনা থেকেই শেষ হয়ে যাবে। ঐ চঞ্চলতা শেষ হওয়ার একটি প্রবল কাবণ আছে। যদি আমরা শবীবশাজীব দৃষ্টিকোণ থেকে এর গুরুত্ব দেখতে না পাই, তবে বোগসাধনার তথা আভ্যাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকেও এর দ্বারা লাভবান হতে সক্ষম হব না। এই কাবণে শবীব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা একজন শবীবশাজীব পক্ষে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, একজন বোগী বা সাধকের পক্ষেও ততটা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমরা অন্তান্ত চৈতন্যকেন্দ্রের আলোচনা কবব।

মস্তিষ্কের একটু আগে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। এটাও চৈতন্যের অতি বৃহৎ কেন্দ্র। এর ক্ষমতা প্রভূত। কোনও কোনও শবীবশাজীব তথা পবানোবিজ্ঞানী একে এক বকম সর্বজ্ঞতার কেন্দ্র বলেছেন। একে আজ্ঞাচক্রও বলা হয়, আবার তৃতীয় নেত্রও বলা হয়। তা মস্তিষ্ক এবং তালুর নিচে, জ্বর নিকটে গভীরতার অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশের সাধকরা একে ‘হার্ড আই’ নাম দিয়ে এর সম্বন্ধে অনেক চর্চা কবেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক বইও লেখা হয়েছে। এটিও চৈতন্যের এক কেন্দ্র। আমাদের শবীবের অনেক জায়গায় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। আমাদের শবীবে যেখানে যেখানে চৈতন্যকেন্দ্র আছে, সেখানে সেখানে স্নায়ুগুলি বড় জালের মত তৈরি হয়েছে। ঐ স্নায়ুজালকে আমরা গ্রাহি বলি, চক্র বলি বা অন্য কোন নামে অভিহিত কবি। কিন্তু এ কথা সত্য যে আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় চৈতন্যকেন্দ্র আছে। ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র স্থূল শবীবের অন্তর্ভুক্ত নয়। স্থূল শবীবে কেবল তাদের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু এই সমস্ত কেন্দ্র অতিশয় গভীরতার সূক্ষ্ম শবীয়ে অবস্থিত আছে। এ বকম হওয়া সম্ভব যে আমাদের শবীব-পর্যাপ্তিতে ঐ সব চৈতন্যকেন্দ্র আছে। সূক্ষ্ম শবীবে তো ঐ কেন্দ্রগুলি নিশ্চিতভাবে অবস্থিত। শবীবের প্রতিবিশ্ব শবীব পর্যাপ্তিতে পড়ে,

এক শবীর পরীক্ষিত ছায়া স্থল শবীরে পড়ে—এই বক্স এক চিন্তাধাৰা প্রচলিত আছে।

আজ্ঞাচক্রে এক শক্তিশালী চৈতন্যকেন্দ্র। কোনও লোক জিজ্ঞাসা কবে, চেতনাকে জাগিয়ে তোলাব কোনও পথ পাওয়া যায় কিনা। বাস্তবে কোন পথ আছে, কিংবা তা কল্পনা মাত্র? পথ অবশ্যই আছে, কিন্তু খুঁজে বেব কববে কে? আমাদের অধ্যবসায় এবং প্রয়াসেব ওপবে এই পথ পাওয়া নির্ভব কবছে। পথ কঠিন নব। নিশ্চয়ই পথ আছে—অবশ্যই আছে। তাব অস্তিত্ব অনুভূত সত্য। তা কল্পনা মাত্র নব। আমি মনে কবি, কোনও সাধক যদি তিন ঘণ্টা ধবে আজ্ঞাচক্রে মন কেন্দ্রিত কবে বাধতে পাবে, যদি সে একাগ্র হয়ে থাকতে পাবে, তবে দশ দিন বাদে সেই সাধক কখনই বলবে না যে চেতনাব জাগবণেব কোন পথ নেই। দেখতে হবে তিন ঘণ্টাব মধ্যে কোনও বিকল্প না আসে। এটি অবশ্য কঠিন কথা। সাধাবণত এক-দুই মিনিট বা পাঁচ-দশ মিনিট কালও মনকে এক খাবাব চালিত কবা কঠিন, একই স্থানে এক নাগাড়ে তিন ঘণ্টা মনঃসংযোগ কবে বাধা অত্যন্ত দুষ্কব বটে। যে সাধক দশ-পনব মিনিট পর্যন্ত একাগ্রভাবে অবস্থানেব অভ্যাসে পৌঁছে যায় সে অনুভব কবতে পাবে যে, যদি কোনও লোক তিন ঘণ্টা ধবে একাগ্রতায় অবস্থিত থাকতে পাবে সে অবশ্যই পথেব সন্ধান পেয়েছে এবং বুখা ইতস্তত ভ্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাব আব গুরু বা উপদেশকেব প্রয়োজন হব না। কিন্তু তাঁব এতটা ব্রহ্মা, তত্ত্ববতা ও সামর্থ্য থাকা প্রয়োজন যাতে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ কবতে পাবেন।

অনেকে মনে কবে বাবা ধ্যান কবে তাবা কর্মহীন ভাবে থাকে, এবং অকর্মণ্য হয়ে যায়। তাদের নিষ্কর্মা বলা হব। ধ্যানকালে এত পবিমাণ শক্তি প্রয়োগ কবতে হব যে ধ্যানভাসী অনেক সময়ে নিজ শবীরেব ওপবে বলপ্রয়োগ কবে। ফলে শবীরে কঠিন ব্যাধি উৎপন্ন হতে পাবে। ধ্যানকালে গুরু বা শাবীর-বিদ্যা ব্যথিত হব। তাব

বলে মস্তিষ্কেব এতটুকু শ্রম হলে মনে হয় মাথা গবম হয়ে গিয়েছে। এবকম অন্নভূতিব কাৰণ মস্তিষ্কেব ওজঃ বা বিদ্যুৎশক্তি অতিবিস্তৃত পৰিমাণে ব্যয় হয়। এ বকম অবস্থায় কেন মাথা গবম হয় ? তাব কাৰণ, যতটা ওজঃশক্তি বা বিদ্যুৎ আছে তাব উপযোগিতা আমবা অধিক মাত্ৰায় ব্যয় কৰি। তাব ফলে তা এত বেশি জ্বলতে আবন্ত কৰে যে আমাদেব মাথা গবম হয়ে যায়, চুল্লিব মত জ্বলতে থাকে। যে অবয়বেব ওজঃ আমবা উপযোগ হিচাবে ব্যয় কৰি তাতে উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

ধ্যানকালে ওজঃশক্তিৰ অধিক ব্যয় হয়। মনকে একাগ্ৰ কৰাব জ্ঞান বহু চেষ্টা কৰতে হয়। এ প্ৰয়াস প্ৰবল হলে ওজঃশক্তিৰ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্ৰয়াস না কৰলে নিৰ্বিকাৰ স্থিতি পাওবা সম্ভবপৰ নহ। যদি আমাদেব প্ৰযত্ন সফল হয়, ওজঃশক্তি সম্পূৰ্ণভাবে প্ৰয়োগ কৰি, তখে লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় চৈতন্যকেন্দ্ৰ—কণ্ঠ। বোগেব ভাষায় একে বিশুদ্ধিচক্ৰ বলে। একে বিকশিত কৰলে বাসনাসমূহেব ওপৰে নিয়ন্ত্ৰণক্ষমতা পাওবা যেতে পাৰে। নিয়ন্ত্ৰণ নহ, আমি ভুল কৰছি। নিয়ন্ত্ৰণক্ষমতা পাওবা তেমন বড় কথা নহ। প্ৰযত্ন ব্যতীত আমবা নিৰ্বিচাৰ হতে পাৰি না। বড় কথা হল, বাসনাকে নিৰ্গল ও উদাস্ত কৰা। বিশুদ্ধিচক্ৰ বিকশিত হলে আমাদেব বুদ্ধিগুলি স্বাভাবিকভাবে শান্ত হয়ে যায়।

চতুৰ্থ চৈতন্যকেন্দ্ৰ—নাভিচক্ৰ। এটি হল অগ্নিৰ স্থান। এখানে অনেক তাপ, অনেক তেজস্বিতা অবস্থিত। যেখানেই উত্তাপ সেখান থেকেই তা অল্প সমস্ত বস্তুতে তেজ সংক্ৰমিত কৰে। এই চক্ৰে যদি একাগ্ৰভাবে ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰা যায় তৰে বুদ্ধিগুলি, তথা বাসনাগুলিৰ তেজ বৃদ্ধি হয়। তেজস্বিতাৰ বলে সমস্ত বস্তু প্ৰবল হয়ে উঠে।

বিশুদ্ধিচক্ৰ ও নাভি চক্ৰ—এই দুয়েব মध्ये পাবম্পৰিক সম্বন্ধ আছে। কোন লোক নাভিচক্ৰকে জাগ্ৰত কৰে যদি বিশুদ্ধিচক্ৰকে জাগ্ৰত না কৰে তৰে তাব কঠিন গীড়া উৎপন্ন হয়। দুই চক্ৰকেই এক সঙ্গে জাগ্ৰত কৰতে হয়। যদি তা কৰা যায় তৰে তেজস্বিতা

বুদ্ধি পায়, শক্তি সঞ্চিত হয়, বৃত্তিসমূহ শান্ত হয়।

এক মস্ত বড় চৈতন্যকেন্দ্র হল—হৃদয়। মস্তিষ্কের স্থান প্রথম, আব হৃদয়ের স্থান দ্বিতীয়। এ একটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ স্থান। এ সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত পুৰনো বিবাদ আছে—আত্মা মস্তিষ্কে, না হৃদয়ে অবস্থিত। আয়ুর্বেদ গ্রন্থ লিখেছে, ‘হৃদয়ং চেতনাস্থিষ্ঠান’—হৃদয়ে চেতনাব অধিষ্ঠান। ‘চৈতন্য পুরুষ’, ‘হৃদয় পুরুষ’ এই সমস্ত কথা হৃদয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ‘থাবে ঘট মে বাম বিবাজে’—এই ঘট বামেব বাসস্থান বটে। বাম, আত্মা বা প্রভুব অবস্থান ঘটে হৃদয়ে। হৃদয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। জীবনের দিক থেকেও হৃদয়ের স্থান মহৎ বা প্রধান। হৃদয় থাকলে জীবন থাকে, হৃদয় না থাকলে জীবনও থাকে না। হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হলে জীবন শেষ হয়ে যায়। শরীর-তন্ত্রের সঞ্চালক বস্তু। বস্তুই জীবন। বস্তু থাকলে জীবন থাকে। বস্তুর সঞ্চালক হৃদয়। হৃদয়ে বস্তু প্রবাহিত হয়। সুস্বপ্নে তাব শুদ্ধি হয়, তাবপব সেখান থেকে তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুই জীবন, আব তাকে সমস্ত শরীরে প্রসারিত কবে হৃদয়। এই হল হৃদয়ের গুরুত্ব কাবণ। ওটা আমাদের ভাবপক্ষও বটে। যদি মস্তিষ্ক জ্ঞান-পক্ষ হয় তবে হৃদয় ভাবপক্ষ।

হৃদয় চেতনাব অতিশয় বৃহৎ কেন্দ্র। সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে তা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। যে সাধক এই চক্রেব উদঘাটন কবে এবং তাকে জাগ্রত কবে, সে বাহ্য জগতেব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভেতবেব জগতে প্রবেশাধিকার পায়।

আমাদেব শরীরে এই বক্স অনেক চৈতন্যকেন্দ্র আছে। কোন কোন যোগী বলেছেন চৈতন্যকেন্দ্র ছটি, কেউ বলেছেন সাতটি, আবাব কেউ বলেছেন নটি। আমি মনে কবি চৈতন্যকেন্দ্রেব সংখ্যা এই সংখ্যাগুলিব চেয়ে বেশি। প্রধান প্রধান কেন্দ্রেব নামগুলি গোনা হয়েছ। সেগুলি ছাড়া আব যে সব ছোটখাটো চৈতন্যকেন্দ্র আছে সেগুলি গোনা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে তাদেব সংখ্যা অনেক।

চৈতন্যকেন্দ্ৰেব অৰ্থ—মৰ্মস্থান। ভাবতীৰ্য আযুৰ্বেদেব পুৰস্কৰ্তাগণ (অগ্ৰণীবা) সম্ভবটি মৰ্মস্থানেব কথা বলেছেন। চীন দেশে প্রচলিত আকুপাংচাব নামক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সাতশ' মৰ্মস্থানেব কথা স্বীকৃত হযেছে। শবীবে এই বকম সাত শ' বিন্দু বা মৰ্মস্থান আছে যেখানে চৈতন্যেব প্রবাহ সমধিক। এই সমস্ত মৰ্মস্থানকে উত্তেজিত কবে অনেক বকম বোগ নিবাময কবা যায়। এভাবে অসাধ্য বোগেব চিকিৎসা হচ্ছে।

‘মৰ্ম’ কথাটিব অৰ্থ বহুস্ত বা গোপন। মৰ্মস্থান কথাটিব অৰ্থ গূঢ়তাব বা গোপনতাব স্থান। এই সব মৰ্মস্থানে চেতনাব বিশেষ ধবনেব অভিব্যক্তি হয়। প্রয়োজন বোধ কবলে যে কেউ এক, দুই, তিন বা চাবটি মৰ্মস্থান স্পৰ্শ কবে পৰীক্ষা কবে দেখতে পাবেন। তাহলে বিশেষ উপলব্ধি হবে। চীন দেশে চিকিৎসকেব দৃষ্টিকোণ থেকে মৰ্মস্থানেব সন্ধান কবা হযেছে। সাধনাব দিক থেকে তাব অনেক মহত্ব আছে। মৰ্মস্থান ও চৈতন্যকেন্দ্ৰ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা কবেছি। ঐ প্রকাব মৰ্মস্থান আৰণ্ড থাকতে পাবে।

আৰণ্ড এক চৈতন্যকেন্দ্ৰেব কথা আলোচনা কবব। পৃষ্ঠবজ্জুব নিচেব স্থানকে মূলধাব বলা হয়। তা চৈতন্যেব কেন্দ্ৰ বিশেষ। সাধনাব দিক থেকে তাব তাৎপৰ্য অত্যন্ত মহত্বপূৰ্ণ এবং তা বিদ্যাং কেন্দ্ৰও বটে। আমাদেব সমস্ত শাবীৰিক ওজঃশক্তিব তা সঞ্চয়গৃহ। সেখান থেকে ওজঃশক্তিব প্রসাৰণ ঘটে। এখানে বিদ্যাং উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকেই তান বিস্তাব ঘটে।

আপনাবা জ্ঞানত চান যে ধ্যানকালে আপনাদেব মন একাগ্ৰ হযেছে কিনা। এ বিষয়ে পৰীক্ষা কবাব একটি কষ্টিপাথৰ আছে। যখনই মন একাগ্ৰ হবে নিচেব স্নায়ু ওপব দিকে উঠতে থাকবে। উৰ্দ্ধাৰ্কৰ্ষণেব অনুভূতি আপনাব সহজভাবেই হতে থাকবে। যদি এ বকম অনুভূতি হতে থাকে তবে জ্ঞানবেন আপনাব মন একাগ্ৰ হযেছে বা হচ্ছে। যদি এ বকম অনুভূতি না হয় তবে আপনাব মন একাগ্ৰ হয় নি বা হচ্ছে না। তা চঞ্চলভাবে যুবে বেড়াচ্ছে। মনেব একাগ্ৰতাব সঙ্গে নিচেকাব

স্নায়ুসমূহেব নিবিড় সম্বন্ধ আছে। মন একাগ্র হতে বা কেন্দ্রিত হতে থাকলে নিচেৰ স্নায়ু আপনা আপনি ওপৰ দিকে উঠতে আবন্ত কৰবে। যেমন যেমন একাগ্রতা বাডতে থাকবে তেমনি সঙ্কুচিত হতে থাকবে। সব কিছু সঙ্কুচিত হতে থাকবে। তাৰ অৰ্থ, যে বিদ্যাৎ সঞ্চিত আছে তা ওপৰ দিকে উঠছে। বিদ্যাতেব ধাৰা ওপৰেব দিকে প্ৰবাহিত হতে আবন্ত কৰেছে, ওপৰেব দিকে যাবাব জন্ত তা পথ খুঁজতে আবন্ত কৰেছে।

এই এক কষ্টিপাথৰ। প্ৰত্যেক সাধক একে কাজে লাগাতে পাবেন, নিজেই পথ কৰে দেখতে পাবেন। কোন উপায়ে মন একাগ্র হতে আবন্ত কৰলে নিচেৰ স্নায়ু সঙ্কুচিত হতে শুক কৰে। এই সঙ্কোচন একাগ্রতাৰ বিন্দুব সূচনা কৰে। সাধনাৰ দিক এ কথা মানতে হ'বে যে, সাধক যে কোনও বকম সাধনা কৰন না কেন নিচেৰাব স্নায়ুব সঙ্কোচ বা সঙ্কুচিত কৰা অবশ্য প্ৰয়োজন। স্নায়ু যতটা সঙ্কুচিত থাকবে ওপৰ দিকে ততটা বিকাশ ঘটবে। উৰ্ব্বীকৰণ তথা উদাত্তকৰণ ঘটবে। বিদ্যাতেব যে ধাৰা নিচেৰ দিকে প্ৰবাহমান ছিল তাকে বন্ধ কৰে ওপৰেব দিকে প্ৰবাহিত কৰা হ'বেছে। এব নাম সাধনা। এ এক বকম বিদ্যাতেব ধাৰা বদলানো, তাৰ মোড ঘোৰানোব উদ্যোগ। এই জন্ত একে মূলবন্ধ বলা হয়। মূল যতটা দৃঢ় হয় ওপৰকাৰ সমস্ত অবয়ব ততটা দৃঢ় হ'বে। বৃক্ষেব মূল দৃঢ় এক অশ্ল হলে তাতে পাতা, ফুল ও বল ধৰতে থাকবে। তাকে কেউ আৰ বাধা দিতে পাববে না। মূল যদি বিকৃত এক অশ্ল হয় তৰে বৃক্ষটি দীৰ্ঘকাল জীৱিত থাকতে পাববে না, ধৰাশায়ী হ'বে।

সাধনাৰ দিক থেকে এই হল মূল স্থান। এ যদি শ্ল হয় তো সমস্ত বিকাশ সহজ সবল হ'বে যাবে। যদি আমবা এই কথাগুলি ঠিক মত বুঝে থাকি, যদি তাৰ তাৎপৰ্য হৃদয়ঙ্গম কৰে থাকি, তৰে ওপৰকাৰ কেন্দ্ৰগুলিকে বিকশিত কৰা আনাদেব পক্ষে সহজ হ'বে। এ সব কেন্দ্ৰেব বিদ্যাৎধাৰা উপযুক্ত শিক্ষন ও পোষণ পাবে। এই জন্ত এ স্থানেব ওপৰে স্থান কেন্দ্ৰিত কৰা অতিশয় আবশ্যক।

এই বাব আমবা স্কুল শৰীবেৰ প্ৰসঙ্গ ত্যাগ কৰে স্কুল শৰীবেৰ আলোচনা কৰব। সাধনাৰ সঙ্গে স্কুল শৰীবেৰ বিবাট সম্বন্ধ। দৃশ্য শৰীৰ বা স্কুল শৰীৰ পৰ্যাপ্ত নহ। তাৰ সঙ্গে স্কুল শৰীৰ সংযুক্ত আছে। আমাৰ বুদ্ধি, আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, সংস্কাৰ প্ৰভৃতি সব কিছু স্কুল শৰীৰে প্ৰকট হয়, জাগ্ৰত মনে প্ৰকাশিত হয়। এ সব কোথা থেকে এল ? এব শ্ৰোতাই বা কি ? আমাকে তাৰ খোঁজ কৰতে হবে। শ্ৰোত কি, কোথা থেকে এল, এ সব খুঁজে বেব কৰতে হবে। এই স্কুল শৰীৰে যদি এই শ্ৰোতৰ উৎস না থাকে তবে এ সব কোথা থেকে আসছে ? কাৰ মাধ্যমে আসছে ? মাধ্যম সম্বন্ধে আমি এব আগে আলোচনা কৰেছি। এব মাধ্যম হল মস্তিষ্ক। ঐ সমস্তই মস্তিষ্কেৰ সাহায্যে নেমে আসে, কিন্তু তাৰেৰ মূল উৎপত্তিস্থল কোথায় ? এই প্ৰশ্ন এখনও অবশিষ্ট আছে।

এব শ্ৰোত হল—স্কুল শৰীৰ। আমবা তাকে দেখতে পাই না। বহু আবৰণ আছে। আমবা শুধু স্কুল শৰীৰকেই দেখতে পাই। সাধকদেৰ স্কুল শৰীৰ দৰ্শন কৰাব জগু প্ৰযত্ন কৰা আবশ্যক। স্কুল শৰীৰ দেখতে পাওবা সম্ভব, তাকে অনুভব কৰা সম্ভব। আপনি নিজেৰ স্কুল শৰীৰ দেখতে পেতে পাবেন, আবাব অন্ত্ৰেৰ স্কুল শৰীৰও দেখতে পাবেন। আপনাৰ শৰীৰেৰ চাবদিকে প্ৰভামণ্ডল দেখা যেতে পাবে, অগ্ৰ লোকেৰও প্ৰভামণ্ডল দেখা যেতে পাবে।

একটি ছোটখাটো প্ৰয়োগেৰ আলোচনা কৰব। আপনাৰা একাগ্ৰতা অভ্যাস কৰেছেন। আপনাৰ কাছে কোন লোক গেল। আপনি অনিমেৰ দৃষ্টিতে এক মিনিট ধৰে তাৰ দিকে চেৰে থাকলেন। তাকে দেখাৰ পৰে আপনি চোখ বন্ধ কৰলেন। আপনাৰ চোখ ছটি বন্ধই থাকল। তাৰ প্ৰতিমূৰ্তি আপনাৰ সামনে থকেই গেল। তাৰ শৰীৰ আপনি দেখেচেন না। তাৰ আকৃতি দেখেচেন না। কিন্তু যে ব্যক্তিকে আপনি দেখেচেন তাৰ শৰীৰ প্ৰমাণ প্ৰতিকপ আপনাৰ চোখেৰ সামনে আসবে। আপনি সেই প্ৰকাশমূৰ্তিৰ চাবদিকে নীল, কালো বা সাদা বঙেৰ যে বলয় আছে তা আপনি দেখতে পাবেন। এই প্ৰকাৰ

একাগ্রতাব সাধনা দ্বাৰা অশ্ল লোকেৰ শূন্য শবীৰ ও তাৰ আভাবলয় দেখতে পাওযা সম্ভৱ। নিজেৰ শবীৰও দেখা সম্ভৱ হয়। ঐ ধ্যান এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্ৰিত হয়, তাতে এক বিশেষ ধৰনেৰ স্থিতি উৎপন্ন হয়। তখন সাধকেৰ সামনে তাঁৰ শবীৰেৰ এক বিশেষ তৈজস-প্ৰকৃতিও প্ৰকটিত হয়। তিনি চোখ বুজি থাকলেও তাঁৰ অন্তৰ্দ্ৰষ্টি দ্বাৰা তিনি তা দেখতে পান।

শূন্য শবীৰ আৰু শূল শবীৰেৰ কি সম্বন্ধ তা জানা বিশেষ প্ৰয়োজন। শূন্য শবীৰ বিভাবে শূল শবীৰকে প্ৰভাবিত কৰে এক শূল শবীৰ ও শূল মন বিভাবে জাগ্ৰত মনেৰ সাধনাৰ দ্বাৰা শূন্য মনেৰ প্ৰকল্পনেৰ নাথাল পেতে পাবে, এ সব বিষয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক।

প্ৰেক্ষা প্ৰয়োগ

দুটি তত্ত্ব কাজ কৰে—দেখা এবং জাগা। আমবা একই সময়ে দেখি ও জেগে থাকি। আমবা গভীৰ ভাবে চিন্তা কবলে দেখতে পাব যে দেখা ও জাগা দুটি পৃথক কাজ নহ, দুটি একই কাজ। এ দুটিই প্ৰেক্ষাধ্যানে কাজ কৰতে থাকে। জাগা অৰ্থাৎ অপ্ৰমত্ত থাকা। এ মন্ত বড় কথা। ‘সুস্তেনু যাবি পডিবুদ্ধাবী।’ ঘুমন্ত লোকেৰ মध्ये জেগে থাকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাপাৰ। আমি যদি আব একটু গভীৰে যাই তৰে এই বচনেৰ এই অৰ্থ হৰে যে, ঘুমন্ত প্ৰবৃত্তিগুলিৰ মध्ये আমাদেব জেগে থাকতে হৰে। অৰ্থাৎ চেতনাৰ এমন এক শিখা জ্বালাতে হৰে যাতে বাতাসেৰ ঝাপটা তাকে নেভাতে না পাবে। হাওয়া বয়ে যাবে, ঝড় উঠবে, তুফান উঠবে, বজ্জা আসবে, তবুও আমাদেব অস্ত্ৰবে এমন জ্যোতি, এমন শিখা জ্বলে বাখতে হৰে যাকে কোন কিছুই নেভাতে পাববে না। এব নাম সাধনা। এই হল সাধনাৰ ফল। আমাদেব ভেতৰে এমন জ্যোতিৰ্ময় শিখা প্ৰজ্জ্বলিত কৰতে হৰে যাকে বিশ্বৰ কোনও শক্তিই নিৰ্বাপিত কৰতে সমৰ্থ হৰে না। বাইৰে যাই হতে থাক ভেতৰে এই জ্যোতি অনিৰ্বাপ জ্বলতে থাকবে। এ শিখা কখনই খণ্ডিত হৰে না। তাৰও এক সাধনা আছে। তা

প্ৰেক্ষাব অভ্যাস, দেখাব অভ্যাস। কেবল জ্ঞানাব সাধনা হয় না, কবাব সাধনা হয়। শুধু জেনে নেওয়া পৰ্যাপ্ত, কবাও জ্ঞকবী বা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যাপাব। কিছু কব। প্ৰয়োগ কব। প্ৰয়োগেৰ জন্তু, জাগ্ৰত থাকাৰ জন্তু কোন কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ।

আপন অস্তিত্ব থেকে শৰীৰকে ভিন্ন কৰে দেখতে হলে এক প্ৰয়োগ কৰতে হবে। আমবা যদি অভ্যাস কৰি তবে মৃত্যুকে দেখতে পাই। মৃত্যুকে দেখতে হলে, শৰীৰ থেকে নিজের অস্তিত্বকে পৃথক কৰে দেখতে হলে তাৰ জন্তু প্ৰয়োগ আবশ্যক। সে হল জাগ্ৰতিৰ প্ৰয়োগ, অপ্ৰমাদেৰ প্ৰয়োগ।

ক্ষুধা লাগে বলে আমবা খাই। ক্ষিদে লাগে শৰীৰেৰ। আমাব ক্ষিদে লাগে না। অন্ত কোনও বস্তুৰ ক্ষুধা লাগে। যদি প্ৰাণশক্তি থাকে, যদি শৰীৰ থাকে তবে ক্ষুধা নাগবেই। চেতনাৰ ক্ষুধা বোধ হয় না। শৰীৰেৰ খিদে পায় আব চেতনা দেখতে থাকে কিসে তাৰ ক্ষুধা পায় আব কিসে ক্ষুধা পায় না। চেতনাৰ স্থিতি যদি অভিযুক্ত হয়, যদি তাৰ জ্যোতি জ্বলে ওঠে, সে ক্ষুধাকে দেখে আব সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কৰে, ক্ষুধাবোধ তাৰ নহ, সে স্বয়ং তৃপ্ত, সদা তৃপ্ত, কখনও তাৰ অতৃপ্তি নেই, ক্ষুধাবোধ নেই। এই স্থিতিৰ অনুভূতিই প্ৰকৃতপক্ষে তপস্কা। চেতনাকে এভাবে জাগিয়ে তোলা যাতে সে দেখতে পাবে কাৰ ক্ষুধা পেয়েছে—এ এক খুব বড় তপস্কা।

লোকে যুস্মায়, শুবে থাকে, মুচ্ছিত হয়। আচাৰ্য কুন্দকুন্দন একেবাবে মৰ্মেৰ কথা লিখেছেন। সে কথা বোঝা সহজ নহ। তিনি লিখেছেন, আহাব বিজয়, নিদ্ৰাবিজয় এবং আসন বিজয় যে না জানে সে জৈনশাসন জানে না। সে ভগবান মহাবীৰেৰ বাণী বুঝতে পাবে না, তাঁকে বুঝতে পাবে না। এ তুচ্ছ কথা নহ, বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। যে আহাববিজয়, নিদ্ৰাবিজয় ও আসনবিজয়েৰ তাৎপৰ্য বুঝতে না পাবে সে জৈন শাসন বোঝে না, জানে না।

আহাববিজয়—সাধনাৰ দিক থেকে এ একটি অত্যন্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ

কথা । শবীব শবীবই বটে । আহাব ছাড়া দেহ বাঁচতে পাবে না ।
 এই স্থিতিতে আহাববিজয় কি ভাবে ? আহাববিজয় কবতে না পাবলে
 কেউ জৈন শাসন বুঝতে পাবে না । এ ছুটি কথা পবম্পববিবোধী
 বলে মনে হয় । বস্তুত তাবা পবম্পব-বিপবীত নয় । তাদের মধ্যে
 সঙ্গতি আছে । যে ব্যক্তি ক্ষুধিত, খাইধে লোক ও চৈতন্ত্বে
 প্রভেদ কবতে না পাবে সে আহাববিজয় কবতে সমর্থ হয় না । যে
 আহাববিজয় কবতে সক্ষম হয় না তাঁব অনববত ক্ষুধা বোধ হয় । সে
 উপবাস কবলেও তাব নিবস্তব ক্ষুধাব অনুভূতি হতে থাকে, আব ক্ষুধাব
 অনুভূতি হতে থাকলে তাপেব অনুভূতি কোথা থেকে হবে ? কবে
 হবে ? কি কবে হবে ? থাকেও না, না খাওযাব জন্ত্য সৰ্বদাই ক্ষুধাব
 দ্বাবা পীড়িত বোধ কববে না, তবেই হবে আহাববিজয় । যখন আমাব
 এই ভেদ স্পষ্ট অনুভূতিতে আসবে যে, যাব ক্ষুধা লেগেছে সে এবা আমি
 এক নয়, দুই ভিন্ন লোক, তখনই আমাব আহাববিজয় সম্পূৰ্ণ হবে ।
 আমাব কখনও ক্ষুধা বোধ হতে পাবে না, আমি কখনও ক্ষুধাব দ্বাবা
 পীড়িত বোধ কবি না । এই তথ্য ভেদ প্রয়োগ দ্বাবা স্পষ্টভাবে বোঝা
 যায় । আমবা যেন না খাই এক না খেয়ে এই প্রয়োগ কবি । ভগবান
 মহাবীব তপস্তা এক উপবাসেব ওপবে এত গুৰু আবোপ কবেছেন
 যে মনে হয় তপস্তাও তাঁব এক প্রয়োগ । উনি এক প্রয়োগ কবেছেন
 যে, না খেয়ে স্থিতিতে অধিষ্ঠিত থেকে চৈতন্ত্বে কতটা অনুভব কবা
 সম্ভব হয়, এক ক্ষুধা দ্বাবা যে সবল ব্যাধি হয়, ক্ষুধা থেকে সজ্ঞাত সে
 সকল পীড়া থেকে নিজেব অস্তিত্বকে কতটা পৃথক বা মুক্ত বাখা যায় ।
 তপস্তা তাঁব এক প্রয়োগ । শুধু না খাওয়া, শুধু উপবাস কবা তপস্তা
 নয় । নিবস্তব ধ্যান ও আমি খাই না এবা না খাওয়াব জন্ত্য আমাব
 কোনও কষ্ট হয় না, এই জাগৰুকতা তাব সঙ্গে সংযুক্ত হলে তপস্তা হয় ।
 অনাহাবকষ্ট কাব হচ্ছে ? এই কষ্ট কে অনুভব কবছে ? এই তথ্য সূৰ্ত্ত-
 ভাবে বোঝা তপস্তাব এক প্রয়োগ । এই কথা যে লোক বুঝতে পাবে
 সে আহাববিজয় কবতে সমর্থ হয় । সে জৈন শাসনেব মৰ্ম বুঝতে

সমর্থ হয়।

আমাদের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় নিদ্রাবিজয়। যে নিদ্রাকে জয় কবতে পারে না সে জৈন শাসন বুঝতে পারে না। শরীর আছে, সুতবাং এ সম্ভব নয় যে প্রত্যেক লোকই নিদ্রাকে জয় কববে। অকপটে স্বীকার কবতে হয় যে কিছু লোক আছে, যাদের নিদ্রা হয় না বা খুব অল্প নিদ্রা হয়। সবাই ঘুমোয়। ঝাঁবা বড় বড় তপস্বী হয়েছেন তাঁরাও ঘুমোতেন। তা হলে এটা কি কবে হতে পারে যে লোক নিদ্রা জয় কবতে পারে নি সে জৈন শাসন বুঝতে সক্ষম হবে না ?

‘আচাৰ্য্য সূত্রে’ একটি বচন আছে—‘সুপ্তেষু জাগবমাণে’—নিদ্রিত লোকের মাঝখানে যে জেগে থাকে অথবা যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে থাকে। মানুষ তিন প্রকার—সুপ্ত, জাগ্রত এবং সুপ্ত-জাগ্রত। সুপ্ত—যে নিদ্রিত, জাগ্রত—যে জেগে আছে, সুপ্ত-জাগ্রত—যে নিদ্রিত অবস্থাতেও জেগে আছে। যুনিব এমন হওয়া উচিত যে সে নিদ্রিত হয়েও জেগে থাকবে। সে শুয়ে থাকে, ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু অনুভব কবে, ‘আমি জাগ্রত, আমি জেগে আছি।’ এক মুহূর্তেও জগত তাব মনে হয় না যে সে ঘুমিয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব হতে থাকে, ‘আমি জেগে আছি।’ এ খুব বড় সাধনা। যে ব্যক্তি এ বকম সাধনা কবে থাকে সে ছয় ঘণ্টা অনববত ঘুমিয়ে থাকলেও তাব অনুভূতি হয় ‘আমি জেগে আছি,’ সে এক মহৎ উপলব্ধি অধিকারী হয়। অর্থাৎ তুল চেতনা ঘুমোয়, শরীর ঘুমোয়, কিন্তু যে জ্যোতি অন্তরবেব অন্তঃস্থলে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে তা নিবস্তব জাগ্রত থাকে এবং অনুভব কবে, ‘আমি জেগে আছি।’

‘সুপ্তেষু যাবি পড়িবুদ্ধজীবী’—সুপ্ত হয়েও প্রবুদ্ধ হয়ে জীবন ধারণ ককন, ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থেকে বাঁচুন। যে এই সাধনা কবেছে সে জৈন শাসনের মর্ম বুঝতে পোষেছে, সে নিদ্রাবিজয়ী হতে পারে। এবও প্রয়োগ হওয়া প্রয়োজন, অভ্যাস হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োগ ও অভ্যাস ছাড়া কেউ নিদ্রাকে জয় কবতে সক্ষম হয় না। আমরা

প্ৰতিদিন শোৰাব সময় সজ্জ কৰিব যে জাগ্ৰত থেকে ঘুমোব, নিদ্ৰিত অবস্থাতেও অপ্ৰমত্ত থাকিব, সন্নিহিত থাকবে যে আমবা জেগে আছি।' এক দিনে কোনও নিষ্পত্তি হবে না। অনেক দিন ধৰে প্ৰয়োগ কৰতে হবে। দীৰ্ঘ কাল অভ্যাস কৰতে হবে। আৰু দ্বিতীয় কোনও লোকেব সজে এই প্ৰয়োগ সম্বন্ধে আমবা আলোচনা কৰিব না। কাৰও সজে আলোচনা কৰলে সে বলবে, 'লোকটা কি বকম পাগল।' ঘুমিয়ে থেকেও জেগে থাকাব কথা পাগলামি নহ তৌ কি ? আপনি ঐ প্ৰয়োগ কৰতে থাকুন। এমন হতে পাবে আপনাব সফলতা লাভ কৰতে এক মাস, দু মাস, ছয় মাস, এমন কি পুৰো এক বছৰ লাগতে পাবে। এমন এক দিন আসবে যখন আপনি স্বয়ং অনুভব কৰবেন যে আপনি নিদ্ৰিত থেকেও সম্পূৰ্ণভাবে জাগ্ৰত আছেন, ঘুমিয়ে থেকেও আপনি জেগে আছেন। আমি এ কথা বলতে পাৰি না ছয় ঘণ্টা নিদ্ৰিত থাকাব কালে পুৰো ছয় ঘণ্টাই জাগ্ৰত অবস্থাব স্থিতি হবে। কিন্তু আমি এটা বলতে পাৰি কিছু সময় এমন বাবে যে, আপনি নিদ্ৰিত থেকেও অনুভব কৰবেন আপনি জেগে আছেন।

আমি জাগ্ৰত থাকাব বিষয়ে আলোচনা কৰলাম। এৰ পৰে আমি ক্ষেত্ৰেব, সেই সন্ধি-স্থলেব কথা বলছি, যেখানে চেতন ও অচেতনেব সঙ্গম হয়। চেতন এক অচেতনেব ঐ সন্ধিস্থল কি বকম হবে এটা বোঝা দৰকাৰ। কোন সে বিন্দু যেখানে এই দুয়েব মিলন হয় ? আহাব কাৰ্যেব সজে তুলনা কৰে এ বিষয় বোঝানো যেতে পাবে। চেতনেব ক্ষুধা লাগে না। চেতন আহাব কৰে না। ভোজন চেতনেব কাজ নহ। আহাব প্ৰাণশক্তিৰ কাজ। এ দিকে চেতনা আছে, অপৰ দিকে শবীব আছে, আৰু আছে সেই প্ৰাণেব ধাৰা বাব ক্ষুধা পায়, যে খায়।

চোখ দেখে। ইন্দ্ৰিয়গুলি আপন আপন কাজ কৰে যায়। ইন্দ্ৰিয়েব জ্ঞান বলে কিছু নেই। তাৰেব জ্ঞানাব শক্তি নেই। চেতনাব চোখ নেই, আৰু তাৰ চোখেব কোন প্ৰয়োজনও নেই। যদি চেতনাব

চোখের প্রয়োজন থাকত তাহলে বলতে হতো অশবীর একেবারে অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না। চেতনার কোন ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন নেই, আর ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান, জ্ঞান লাভ করার কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এমন এক সন্ধিস্থল আছে যেখানে চেতনার প্রাণধারার বিন্দু এবং ইন্দ্রিয়ের প্রাণধারার বিন্দু মিলিত হয়। এই ইন্দ্রিয়ের বিন্দু এক চেতনার বিন্দুর সন্ধিস্থলকে আয়ত্ত করার চেষ্টা কর। স্বাস ও প্রাণসেব সঙ্গমস্থলকে আয়ত্ত কর। চেতনার স্বাসেব প্রয়োজন নেই। চেতনা এমন দীপ নয় যে তাতে তেল দিলে তবে জ্বলবে, তেল না ঢাললে জ্বলবে না, নিভে যাবে। চেতনা তো অখণ্ড জ্যোতি। সে আপনা আপনি জ্বলে। তার জন্ম স্বাসেব প্রয়োজন হয় না। কিন্তু স্বাসেব প্রাণধারা আর চেতনার সঙ্গমস্থল বা সন্ধিস্থল আছে। তাদের মিলনবিন্দু আছে, তাকে আয়ত্ত কর। এই সব বিন্দু আমাদের জাগৃতির বিন্দু হতে পারে। যদি এই বিন্দুর ওপরে প্রয়োগ করা যায় তবে তা জাগৃতির একটি বিবার্ট বড় প্রয়োগ হবে, আর এই প্রয়োগের দ্বারা আমরা ঐ সূত্রকে সম্পর্ক করতে সমর্থ হবে, আর শবীর এবং আত্মা ভিন্ন বস্তু—এই কথাটির অর্থ বুঝতে পাব। তা ছাড়া আমরা এ কথা বটনা মাত্র থেকে যাবে। আমরা যখন চেতনা ও শবীরের মিলনবিন্দু ধবতে পাব তখনই আমরা তাদের ভিন্নতা বুঝতে পাব, তাব আগে নয়।

সেই মহৎ মিলনবিন্দু হল—ভাষা। চেতনা কথা বলে না। যে কথা বলে সে চেতনা থেকে ভিন্ন। যে বিন্দুতে ভাষা এবং চেতনার সঙ্গম হয় সেটি একটি মহৎপূর্ণ বিন্দু। ভাষার মধ্যে যে শক্তি নিহিত থাকে সে শক্তি চেতনা থেকে আসে। উভয়ের সঙ্গমস্থলকে আমাদের বুঝতে হবে, তাদের মিলনবিন্দুকে আমাদের ধবতে হবে।

চেতনার সঙ্কল্প বা বিকল্পের প্রয়োজন নেই। তাব ইচ্ছাও হয় না। চেতনার সঙ্কল্পও হয় না। ও সব কিছুই মনের কাজ। চেতনার মনকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু চেতনা ব্যতীত মন নির্মাণ হবে যায়। তাব নিজস্ব এমন কোন ক্ষমতা থাকে না যে সে সংকলন করবে, ইচ্ছা

কববে, কল্পনা কববে অথবা সঙ্কল্প কববে। তাবও এক মিলনবিন্দু আছে।

আহাৰ, শ্বাস, ইন্দ্রিয়, ভাবা এবং মন—এই পাঁচ মিলনবিন্দুকে আমবা ধরব। নিদ্রা এক জাগরণেব মিলনবিন্দু আমবা আয়ত্ত কবব এবং নিদ্রিত অবস্থাৰ ভেতবে জেগে থাকব। এই দিকে আসাব চেষ্টা চলতে থাকবে।

আমি পাঁচ-ছয় দিব থেকে আপনাদেব প্রস্তুত করাব চেষ্টা কবেছি।

আমাদেব যদি এই সব দিকে প্রয়োগ চলতে থাকে তবে এমন এক-দিন আসতে পাবে, এমন এক জগৎ আসতে পাবে যখন আমি অনুভব করতে সমর্থ হব যে আমাব চেতনা এবং আমাব শবীৰ দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমাব শবীৰ দুটি পৃথক বস্তু। আমি এবং আমাব দেহ দুটি আলাদা জিনিস। তা না হলে আত্মা ও শবীৰেব ভিন্নতার কথা, আত্মা আব দেহেব পার্থক্যেব কথা শুধু আমাদেব মেনে নেওয়াব ব্যাপাব, আমাদেব ধাবণাব ব্যাপাব হয়ে থাকবে। তাব তাৎপৰ্য উপলব্ধি কবতে আমবা সক্ষম হব না। ঐ কথা আমবা বাবে বাবে আবৃত্তি কবতে থাকব, কিন্তু তাব অর্থ বুঝতে পাবব না।

এ সবই জাগৰ্ণাতব সাধনা বা অপ্রমত্ত থাকাব সাধনা। ভগবান মহাবীৰ বলেছেন—সর্বদা অপ্রমত্ত থাকবে। যাব চেতনার দীপ সর্বদা প্রজ্জলিত থাকে সে-ই শুধু অপ্রমত্ত থাকতে পাবে। যখন চেতনাব ওপবে কোন আবরণ পড়ে, মুচ্ছা এসে যায়, তখন চেতনা অগ্রসব হতে পাবে না।

এক শুব্বি সন্ত ছিলেন বাবেয়া। তিনি বোদন কবতেন এবং হাসতেন। দুই-ই এক সাথে চলতে থাকত। লোকে বলত, এ বড় অদ্ভুত কথা। কোন মানুষ যদি হাসতে থাকে তবে সে কাঁদে না। কেউ যদি কাঁদতে থাকে তবে সে হাসে না। কোন লোকই হাসা এবং কাঁদা এই দুই কাজ এক সঙ্গে কবে না। সে যদি কাঁদে তো কাঁদতেই থাকে, আব যদি হাসে তো হাসতেই থাকে। কিন্তু এই

বাবেয়া একই সাথে হাসতেন ও কাঁদতেন। প্রশ্ন হল : দুই কাজ, হাসা ও কাঁদা, এক সঙ্গে কেন ? বাবেয়াকে প্রশ্ন কৰা হৈছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তোমবা আমাকে বুঝবে না। আমি একই সঙ্গে দুই বকম কাজ কৰি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি দেখি পৰমাত্মা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছেন, তাঁৰ সত্য সব জায়গায় বিস্তৃত হৈছে। এই দৃষ্টি যখন দেখি তখন হাসি। আমাব মনে হয় এই জগৎ কত সুন্দৰ ও বহুশ্রমব। তোমাদেব যখন দেখি তখনই কাঁদতে থাকি, ভাবি, এত স্পষ্ট ভাবে তিনি দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তবু তোমবা তাঁকে দেখতে পাও না। তিনি এত স্পষ্ট ভাবে দেখা দিচ্ছেন, কিন্তু তোমবা অন্ধ হৈয়ে তাঁকে দেখতে পাও না। এই দেখে আমাব কান্না পেষে যায়।'

আমাদেবও একই বকম অবস্থা হৈছে। চেতনা থেকে শবীৰ আলাদা। এ ছুটোই স্পষ্ট। চেতনা স্পষ্ট, তাৰ অস্তিত্ব স্পষ্ট, তাৰ কাজও স্পষ্ট। আৰাব শবীৰও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ। কিন্তু আমবা এই পার্থক্যেৰ বিন্দু ধৰতে পাবি না। আমি বলি কি মিলনবিন্দুকে ধৰ, সঙ্গমস্থলকে আয়ত্ত কৰ। কত স্থল কথা। কিন্তু তবুও ধৰতে পাবি না। মিলনবিন্দু কোথায় তা উপলব্ধিতে আসে না। কোথায় বিচ্ছিন্নতা, এই স্থল তথ্যও আমবা বুঝতে পাবি না। যদি চেতন আত্মা আৰ অচেতন শবীৰেৰ সঙ্গমস্থল আমবা ধৰতে পাবি, সন্ধিস্থল জানতে পাবি, মিলনবিন্দু বুঝতে পাবি, তবে ঐ দুয়েৰ বিভিন্নতাও জানতে আমবা সফল হব।

যে মৃত্যুকে দেখতে পাৰ না, সে মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। যখনই তাকে কেউ বলে, তোমাব মৃত্যু হবে, সত্যি সত্যি সেই মৃত্যুৰ্ত থেকে তাৰ মৃত্যু শুরু হৈয়ে যায়, তাৰ মনেৰ ওপৰে মৃত্যু নামতে শুরু কৰে। যখন মনে হয় মৃত্যু আসছে, তাৰ সাৰা শবীৰ ভয়ে বিকৃত হৈয়ে যায়। শবীৰ শক্ত হৈয়ে যায়। শবীৰ কেন শক্ত হয় ? সে মাৰা যাচ্ছে বলে নয়, মৃত্যুভয় তাৰ শবীৰকে শক্ত কৰে দেয়। উদ্বেগ এনে দেয়। মৃত্যুৰ প্রতিক্রিয়া এই—শবীৰকে চিলে কৰে দেয়, শিথিল কৰে

দেয়, আব আমাদের চেতনা এমনভাবে তৈরি কবব যে, আমাদের আত্মা শরীর থেকে আলাগা হয়ে গেলেও মনে হবে কিছুই হয় নি। শরীর তো শিথিল হয়েছে। আব আমরা তো শুক থেকে মবাব জন্ত প্রস্তুত হয়েছি। শরীর শিথিল হওয়ার অর্থ, মৃত্যুব জন্ত তৈরি হওয়া। যে সর্বদা মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত থাকে তাব শরীরে বিকৃতি হয় না, উদ্বেগ হয় না, ভয় হয় না। কোন কিছুই হয় না। এই জন্য জৈন আচার্যগণ মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বই হল, ‘মৃত্যু মহোৎসব।’ মৃত্যু এক মহোৎসব। তা মহোৎসব, কিন্তু তুমি তা থেকে ভীত হও, এ কি বকম ব্যাপাব। মহোৎসব হবে মঙ্গলগীত, শ্রীতি, উল্লাস, আনন্দপূর্ণ আলাপ। কিন্তু ভয়ের কথা তো হতে পাবে না। মৃত্যু মহোৎসব বটে। তা থেকে আবাব ভয় কি ?

জগদীশ কাশ্যপ নামে মস্ত বড় এক বৌদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। তাঁব সত্তা দেহাবসান হয়েছে। একবাব তিনি এক পত্র দ্বাবা আমাদের জানিয়ে ছিলেন, ‘আমি অন্তিম সমবে জৈন পদ্ধতিতে সমাধি মৃত্যুতে মবতে চাই। সেই জন্তে আপনি ঐ পদ্ধতি সম্পূর্ণ লিখে জানিয়ে দিন। কাবণ মৃত্যুব জন্ত প্রস্তুত হওয়ার যেবকম বিবরণ জৈন সাধনা পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে সন্তবত অগ্ৰ তা দুর্লভ।’

জৈন সাধনায় মৃত্যুব জন্ত প্রস্তুতি বাব বছব আগে থেকে আবস্ত হয়ে বায। বাব বছব আগে থেকে মৃত্যুব জন্তে প্রস্তুতি। অর্থাৎ মৃত্যু এমন একটি ঘটনা বাব জন্তে প্রস্তুত হতে বাব বছব লাগা উচিত। এ কথা যথার্থ।

আপনাবা দেখে থাকবেন, ছোটখাটো অপাবেশনের আগেও অনেক বড় প্রস্তুতি আবশ্যক হয়। অপাবেশন হবে একটি অঙ্গের, কিন্তু তাব জন্ত ডাক্তাবকে বেশ বড় খবনের প্রস্তুতি নিতে হয়। এক অপাবেশনের জন্তে কত ডাক্তাব, কত নার্স, কত উপকবণ, কত যন্ত্র, কত ওষুধ তৈরি বাখতে হয়। তাব কাবণ, একটি অবয়বের অপাবেশনের ফলে অগ্ৰ কোন অবয়বের ওপবে প্রভাব পড়তে পাবে। তাকে নিবাপদ বাখাব

জ্ঞান প্রস্তুত থাকতে হয় ।

মৃত্যু সমস্ত শবীবের ওপৰে অপাবেশন । সমস্ত শবীব থেকে সম্পূর্ণ চেতনাব নিৰ্গমন, চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নকৰণ—এ কত বড় অপাবেশন । এব জ্ঞান বাব বহুব ধৰে প্ৰস্তুতি প্ৰত্যাশিত । একে সংলেক্ষনা বলা হযে থাকে । সংলেক্ষনাব কাল—বাব বহুব । বাব বহুব আগে থেকে এভাবে নিজেকে প্ৰস্তুত কৰে নেওযা হয় যাতে সাধনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ফলপ্ৰসাদ হয় । বাব বহুব ধৰে অনশন কৰতে হয়, তাবপৰে সমাধি-মৃত্যু । কত মহৎ প্ৰস্তুতি । কত সুন্দৰ ক্ৰমবিহ্বাস । এ বিষয়ে কেন এত লেখা হয়েছে ? কেন এত বলা হয়েছে ? এব কাৰণ কি ? আমবা কাৰণ বুঝে নিতে চেষ্টা কৰি । কাৰণ এই যে, মৃত্যু সব চেয়ে বড় মুচ্ছা । মৃত্যু সবচেয়ে বড় বেছ'শ অবস্থা । এই বেছ'শ হওযাব মুহূৰ্ত্তে যাতে আমাদেব চেতনাব দীপ নিভে না যায়, আমবা মুচ্ছিত না হই, আমবা জেগে থাকতে পাৰি, তাব জ্ঞান এই প্ৰস্তুতি । মৃত্যুব ক্ষণে যে জাগ্ৰত থাকে সে চিবকাল জেগে থাকে । যে মৃত্যুব মুহূৰ্ত্তে জেগে থাকতে পাৰে সে চিবকালৰ জ্ঞান অপ্ৰমত্ত স্থিতি লাভ কৰে, সৰ্বকালে জাগ্ৰত থাকে । এই বকম জাগৃতিব ক্ষণেব জ্ঞান আমাদেব সমস্ত প্ৰস্তুতি চলতে থাকে ।

অপাবেশনেব সময় বোগীকে বেছ'শ কববাৰ জ্ঞান তাকে ক্ৰোবোৰ্ম শু'কিয়ে দেওবা হয় । আজকাল অন্ত বকম উপায় অবলম্বন কৰা হয় । বোগীকে বিদ্যুৎ প্ৰয়োগ কৰে মুচ্ছিত কৰা হয় এই জ্ঞান যে, ঐ অপাবেশনেব ভয়ঙ্কৰ যজ্ঞনা তাব সহ্য হৰে না । এতে যজ্ঞনাৰ অনুভূতি হয় না । বিদ্যুৎ প্ৰয়োগেব ফলে তাব চেতনা লোপ পেয়ে যায়, সে শান্ত হৰে যায়, আৰ খুব বড় অপাবেশনও অত্যন্ত সহজভাবে সম্পন্ন হয় ।

অপাবেশনেব জ্ঞান মুচ্ছা'ব অবস্থা আনতে হয় যাতে তাব অপাবেশনেব জ্ঞান কষ্টেব অনুভূতি না হয় । সম্ভবত প্ৰবৃত্তি মেনে নিযেছে যে, মৃত্যু মন্ত বড় অপাবেশন, আৰ মুচ্ছা' না হলে মানুষ কি কৰে যজ্ঞনা সহ্য কৰবে । এই কাৰণে মৃত্যুব পূৰ্বে কেউ ছু ঘণ্টা, কেউ বা চাৰ ঘণ্টা আগে,

কেউ বা দুদিন কিংবা চাব দিন আগে বেছ'শ হযে যায়, কেননা সমস্ত শবীবের ওপরে অপাবেশন হচ্ছে, মৃত্যু আসছে। কেবল যে লোক জাগৃতিব সাধনা কবে সিদ্ধ হয়েছে সে-ই বেছ'শ হয় না।

অপাবেশনের আগে সবাইকে বেছ'শ কবা হয়। কেবল যে জাগৃতিব সাধনায় সিদ্ধ হয়েছে তাব কোন মূর্ছাকাবী ওষুধেব প্রয়োজন হয় না, ইনজেকশনের প্রয়োজন হয় না বা বিদ্যুৎ প্রয়োগেব কোন প্রয়োজন হয় না।

আমবা এ বকম দেখেছি। এক মস্ত বড় শ্রাবক ছিলেন। তাঁব নাম ছিল চাঁদমলজী বৈদ। তিনি বাজল দেশেব অধিবাসী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাঁব শবীবের কোন গুহ্য স্থানে অপাবেশনের প্রয়োজন হয়েছিল। তিনি ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত হয়ে ডাক্তারকে বললেন, 'আপনাব যা কবাব আছে তা বকন। যতটা কবাব প্রয়োজন ততটাই বকন। আমি বসে আছি।' ডাক্তার বললেন, 'তা কেমন কবে সম্ভব হবে? এত বড় অপাবেশন। অচেতন না কবে, মূর্ছিত না কবে এ কেমন কবে হবে? আপনি এই কষ্ট কি কবে সহ কববেন?' তিনি বললেন, 'আমি ধ্যানে বসে আছি। আপনি চিন্তা কববেন না। আপনাব যা কবাব তাই বকন।' তাই কবা হল। তিনি ধ্যানে বসে থাকলেন আব অপাবেশন কবা হয়ে গেল।

আমি স্বয়ং দেখেছি। বোধপূবে ত্রীকালুগণীব চাতুর্মাস ছিল। মুনি কুন্দনমলজীব অর্ধেব অপাবেশন হওয়াব কথা ছিল। তিনি গুয়ে পড়লেন। তাঁব বড় ভাই মুনি চৌখমলজী আব মুনি মোহনলালজী অর্শ কাটতে শুরু কবলেন। মুনি কুন্দনমলজী বললেন, 'সাধু ভাইসব, দেখো, পুরো লক্ষ্য বাখবে। কাজ অর্ধসমাপ্ত না থেকে যায়। যতটা কাটা দবকাব সবটাই কেটে দেবে।' এও এক স্থিতি। মূর্ছিত না হয়ে, জাগ্রত থেকে এই কষ্টেব ধাক্কা সহ কবা তখনি সম্ভব হয় যখন ভেতরে কিছু জেগে যায়।

কাশীব নবেশ সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। তাঁব অপাবেশন হচ্ছিল।

ডাক্তারবা তাঁকে বেহুঁশ কবাব জন্তে ওষুধ শৌঁকাতে চাইলেন। নবেশ্ব
নিষেধ কবলেন। তিনি বললেন, ‘আমাব গীতা এনে দিন। আমি
গীতা পডতে থাকব আব আপনি আপনাব কাজ কবতে থাকবেন।’
তিনি গীতা পডতে আবস্ত কবলেন এবং এমন এক জগতে চলে গেলেন
যেখানে তাঁব শবীবে কি ঘটছে তা তাঁব খেয়াল বইল না। আমবা
অন্তবে এই বকম জ্যোতি ছেলে দিলে সেই আলো জ্বলাব পবে শবীবে
কি ঘটছে তা কিছুই জানতে পাৰি না। যা ঘটাব তা ঘটে। এই
জাগৃতিব ক্ষণ আমাদেব জীবনে এসে গেলে আমবা আব মুচ্ছিত হই না।
মৃত্যুবিক্রমেব এ এক বড় সাধনা। যে লোক মৃত্যুব মুহূর্তে মুচ্ছিত হয় না,
যে জেগে জেগে মৃত্যুকে বরণ কবে, সে সত্যিসত্যিই কিছু পোষে যাব।

আমাদেব সঙ্গেব একটি ঘটনাব কথা বলছি। এক মুনি ছিলেন।
তিনি একজন মস্ত বড় তপস্বী ছিলেন। তিনি ছাব্বিশ বছব ধবে
তপস্যা কবেছিলেন। প্রতি বছব তিনি মাসখম্নন কবতেন। তিনি
তেবাপস্থেব চতুর্থ গণী শ্রীমজ্জয়াচার্যেব বড় ভাই মুনি ভীমবাজেব সঙ্গে
থাকতেন। ভীমবাজজীব দেহাবসান হল। দাহসংস্কারেব জন্ত লোকে
তাঁব দেহ নিয়ে যাওবাব জন্ত এল। তপস্বী মুনি অস্ত্রাশ্র মুনিদেব ডেকে
বললেন, ‘দেখ, আমি এত দিন যাঁব সাথে বইলাম তিনি আজ চলে
গেলেন। তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমাব আব এখানে থাকাব
কি প্রয়োজন? সাধুগণ, তোমবা এই সব পুথিপত্র বন্ধা কববে। আমি
চলে যাচ্ছি।’ এই কথা বলে তিনি স্বর্গে গেলেন। তিনি মৃত্যুকে
বরণ কবে নিলেন। লোকে আগেব দাহসংস্কার কবে ফিবতে না ফিবতে
আব এক মুনি চলে গেলেন। একে বলে ইচ্ছামৃত্যু, সঙ্কল্পমৃত্যু। যে
সব লোক জাগ্রত অবস্থায় মাবা যান তাঁদেব এই বকম মরণ হয়, তাঁবা
সম্পূর্ণ জাগরক অবস্থায় মাবা যান।

এক মস্ত বড় সাধক ছিলেন। তিনি বলেছেন, ‘লোকে বেহুঁশ হয়ে
মবে। আমি বেহুঁশ হয়ে মবব না। আমি চলতে চলতে মবব।’ এক
দিন তিনি দেখলেন মরণ আগতপ্রায়। সেই স্বপ্ন যখন নিকটে এল

তখন তিনি ঘুমোতে আবদ্ধ কবলেন। নিদ্রিত অবস্থায় তিনি মবলেন। অনেক লোক বেছ'শ অবস্থায় মাৰা যায, কেউ ঘুমোতে ঘুমোতে মাৰা যায। বসে বসে, দাঁড়িয়ে, চলতে চলতে অৰ্থাৎ জাগ্ৰত অবস্থায় মাৰা যায এমন লোকেৰ সংখ্যা কম। আচাৰ্য ভিক্ষুব পদ্মাসনাবস্থায় মৰণ হুয়েছিল। তিনি সম্পূৰ্ণ জাগ্ৰত ছিলেন। প্ৰমাদগ্ৰস্ত অবস্থায় মবন নি। তিনি 'সুন্তেষু যাবি পডিবুদ্ধজীবী' অৰ্থাৎ সুপ্ত লোকদেব মধ্য জাগ্ৰত অবস্থায় ছিলেন। সুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্ৰত লোক ছিলেন। যে লোক জাগ্ৰতি ও সুষুপ্তিৰ বিন্দু ধবতে পাবে সেই পুথু মৰাব সময়ে জাগ্ৰত থাকতে পাবে।

আমাদেব সাধনাৰ অভ্যাস চলছে। এই সাধনাৰ অভ্যাসকালে আমবা দেখাব এক জাগ্ৰত থাকাব সঙ্কল্প কবেছি। আমবা দেখি আব জেগে থাকি। দেখাব এক জেগে থাকাব সঙ্কল্প কবি। এই দেখাব এক জাগাব সঙ্কল্প একদিন সেই জ্যোতিকে জাগিয়ে দেবে বাকে কোন ব্যাধি বা মৰণেৰ আগমন নিভিয়ে দিতে পাবে না। তাৰা কখনও বেছ'শ হবে না, প্ৰচণ্ড হবে না, তাৰেব জাগ্ৰতি কখনও থণ্ডিত হবে না। কিন্তু আপনি সতৰ্ক থাকবেন, আপনাৰ অস্ত্ৰেব জ্যোতি জ্বলে ওঠাব আগে আপনি ঘুমিয়ে না পড়েন। এ একটি সমস্তা। এই সমস্তা সম্বন্ধে যদি আমবা জাগৰুক তা থাকি তবে ঐ স্থিতি আমবা লাভ কবতে পাবব না। এব জন্তু খুব দৌড়বাঁপ কৰাব দবকাব নেই, এলোমেলো ভাবে ঘূৰে বেড়ানোৰ দবকাব নেই। কাবও কাহে যাওযাব কোন প্ৰয়োজন নেই। এ নিজেবেই কবতে হবে। আমাব নিজেবই আত্মাকে দেখতে হবে। সত্যকে আমাব নিজেবই সন্ধান কবতে হবে। এই হল পথ।

যে নিজেকে আত্মাব কথা বলে সে আপনাকে আত্মা দেখাতে পাবে না। আপনি নিজে চেষ্টা কবলে আত্মাব দেখা পেতে পাবেন। আপনি ছনিষাব কোন কোণে চলে যান, কেউ আপনাকে সত্য দান কবতে পাববে না। সত্যেব সন্ধান আপনাৰ নিজেবেই কবতে হবে। অগ্ৰ

লোক আপনাকে কোন সঙ্কেত বলে দিতে পারে, ইশাৰা কবতে পারে।
 রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তাবপৰেব প্ৰচেষ্টা আপনাকেই কবতে
 হবে, আপনাকেই পথ চলতে হবে। সমস্তই আপনাব চেষ্টার ওপৰে
 নিৰ্ভৰ কৰে, আপনাব নিষ্ঠাব ওপৰে নিৰ্ভৰ কৰে, আপনাব একাগ্ৰতা
 এক তন্ময়তাব ওপৰে নিৰ্ভৰ কৰে। আপনি মুছৰ্ছা ভাঙ্গতে কতখানি
 সমৰ্থ হযেছেন, জাগৃতিব আলো কতখানি প্ৰজ্জ্বলিত কবতে পেবেছেন,
 আলোকে সেই বিন্দুব ওপৰে কতটা নিবে যেতে পেবেছেন, যেখানে সে
 আলো নিবন্তব জ্বলে, কখনও নেভে না—এই সমস্ত কিছুব ওপৰে নিৰ্ভৰ
 কৰে। পৰিস্থিতিতেই সেই কথা সার্থক হবে—‘ভাকুণ্ড পক্ষী উহ
 চবল্পমন্তো’ অৰ্থাৎ ভাকুণ্ড পাখিব মত সদা জাগৃত থাক। যদি আত্মাকে
 বন্ধা কবতে চান, নিজেকে বাঁচাতে চান তো জাগ্ৰত থাকুন।

ভগবান মহাবীৰেব বাণীব সন্দৰ্ভ থেকে যে সত্য বুঝতে পেবেছি,
 অনুশীলন কৰেছি, অভ্যাস কৰেছি সেই সত্য মনে বাখতে হবে। আব
 এই অভ্যাসেব ধাবাকে সৰ্বদা প্ৰবহমান বাখতে হবে। আমাব বিশ্বাস,
 আমবা একদিন সেই জ্যোতিকে প্ৰজ্জ্বলিত কবতে পাবব যে জ্যোতিকে
 বোগেব ধাক্কা নেভাতে পাববে না, মৃত্যুব ভয়কৰ ঝঙ্কা নেভাতে পাববে
 না।

অনুপ্ৰেক্ষা

আমবা এতদ্বন্ধন প্ৰেক্ষা ধ্যানের প্ৰয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা কৰছিলাম। এই প্ৰেক্ষাধ্যানের পদ্ধতিতে আমবা তিনটি তত্ত্বকে অবলম্বন কৰে থাকি। সে তিনটি তত্ত্ব—স্বাস, ধ্বনি ও শব্দ। আমাদেব স্বাস সহজ এবং স্বাভাবিক, ধ্বনি স্বকৃত এবং কাল্পনিক, আব শব্দ সহজ এবং স্বাভাবিক। আমবা স্বাভাবিককে অবলম্বন কৰি না, স্বকৃত এবং কল্পনাকে অবলম্বন কৰে থাকি। আমি মনে কৰি তাব প্ৰযোজন আছে, তাকে আমি অনাবশ্যক বলতে পাৰি না। আমবা মাঝে মাঝে এই তিন অবলম্বনের আলোচনা কৰে থাকি, আব আমবা যা কৰে থাকি তা বোঝাব জ্ঞাত চেষ্টা কৰি। আজ আমবা ধ্বনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰব। এই আলোচনা আমি ছোট একটি গল্প দিযে আবস্ত কৰতে চাই।

কোন লোক পুকুৰেব ধাবে বেড়াতে যেত। গুটা ছিল তাব প্ৰতিদিনেব নিত্যকৰ্ম। পুকুৰেব জলে তাব প্ৰতিবিম্ব পডত। পুকুৰে অনেক মাছ ছিল। একটি মাছ পুকুৰেব জলে মানুষটিব প্ৰতিবিম্ব দেখত। সে দেখত—মাথা নিচে, পা ওপৰে। একদিন দেখল, দু দিন দেখল, দশ দিন দেখল। তাব ধাবণা দৃঢ় হল। সে জানল যাব

মাথা নিচে, পা ওপবে, সে মানুষ। একদিন লোকটি পুকুবেব কিনাবাষ বেডাছিল। মাছটি সেই সময়ে জলেব ওপবে ভেসে উঠল। তখন সে দেখল লোকটার সব উল্টো, তাব মাথা ওপবে আব পা নিচে। মাছটি ভাবল—সম্ভবত লোকটি শীর্ষাসন কবেছে। তা না হলে মানুষ ও বকম হতে পাবে না। যাব মাথা নিচে, পা ওপবে সেই মানুষ। আজ আমি দেখছি এব মাথা ওপবে, পা নিচে। এ নিশ্চয়ই উল্টো বা বিপরীত ক্রিয়া কবছে, শীর্ষাসন কবছে। তাব ধাবণা দৃঢ় হযে গিযেছিল।

ঐ মাছটিবই কেবল ঐ অবস্থা হযেছিল তাই নয। আমাদেব সকলেরই ঐ অবস্থা। মাথা ওপবে, কিন্তু আমবা দেখি মাথা নিচে। পা নিচে, কিন্তু আমবা দেখি পা ওপবে। আমবা ধাবণা কবে থাকি যাব পা ওপবে মাথা নিচে সে-ই মানুষ, আব যাব মাথা ওপবে পা নিচে সে মানুষ নয। এ আমাদেব কল্পনাব বচনা। এ বকম কত ধাবণা আমবা উদ্ভাবন কবি তা আমি বলতে পাবব না। ঐ সবই মিথ্যা ধাবণা। মিথ্যা ধাবণা বিলোপ কবাব জ্ঞান প্রেক্ষাধ্যান পদ্ধতিতে অনুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কবা হয। দুটি কথা আছে—প্রেক্ষা এবং অনুপ্রেক্ষা। আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি, প্রেক্ষা কথাটিব আগে ‘অনু’ কেন প্রয়োগ কবা হযেছে? এই বিষয়ে চিন্তা কবতে কবতে আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি—যা সত্য, তাকে দেখাই অনুপ্রেক্ষা। সত্যকে দেখ। নিজের ধাবণাব বশবর্তী হযে তাকে দেখ না। মাছের ধাবণা হযেছিল যাব মাথা নিচে পা ওপবে সে-ই মানুষ। এই ধাবণা অনুসাবে সে মানুষকে দেখত। এই বকম স্বীয় ধাবণা অনুযায়ী বস্তুকে দেখা অনুপ্রেক্ষা নয। নিজের ধাবণাব বশবর্তী হযে কিছু দেখ না। সংস্কাবেব দৃষ্টিতে দেখ না। কাল্পনিক বুদ্ধিতে দেখ না। কেবল সত্যেব দৃষ্টিতে সব কিছু দেখ। বাস্তবকে দেখ, যথার্থকে দেখ। যা সত্য, যে ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে তাকে দেখ। অনুপ্রেক্ষাব অর্থ—সত্যেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা। অর্থাৎ সত্যেব প্রতি, যথার্থেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা, বাস্তবেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা। যাব কবা ধাবণাব অনুবর্তী হযে কোনও কাজ কবো না,

বা ঘটনা, বা বাস্তব, বা সত্য, তাকে দেখ। এই বকম অনুপ্ৰেক্ষাব
তাৎপৰ্য, আমবা আমাদের মনগড়া ধাৰণাকে মন থেকে বহিষ্কৃত কৰে
দিই। আপনি পূৰ্বেৰ ধাৰণা ত্যাগ ককন এবং বা সত্য ও যথার্থ
তাকে দেখুন। প্ৰেক্ষা ধ্যান পদ্ধতিতে এই অনুপ্ৰেক্ষাব অভ্যাস কৰা
যায়। অনুপ্ৰেক্ষা অভ্যাস কৰাব কাৰণ, তদ্বাৰা আমবা সংস্কাৰকে,
ধাৰণাকে ভঙ-কৰে বা বাস্তব সত্য তাকে দেখতে শিখি। এটা সবচেয়ে
কঠিন সত্য। সবচেয়ে দুঃখেৰ বিষয় যে, মানুহ সত্যকে দেখে না। সে
সবাব আগে স্বকীয় ধাৰণাৰ চশমা মনেৰ চোখে লাগিয়ে নেয়, তাৰ
পৰে দেখা শুক কৰে। যা দেখে তা যদি স্বীয় ধাৰণাৰ অনুযায়ী হয় নি
তবে তাকে হুমড়ে মুচড়ে নিজের মনেৰ মত কৰে নেয়।

অনুপ্ৰেক্ষাব সিদ্ধান্ত যথার্থভাবে সত্যকে দৰ্শন কৰাব সিদ্ধান্ত।
সত্যেৰ কাছে নিজেকে সম্পূৰ্ণভাবে সমৰ্পণ কৰ। নিজের কোন ধাৰণাতে
কোনও গুৰুত্ব আৰোপ কৰো না। বা সত্য তাকে গ্ৰহণ কৰ, স্বীকাৰ
কৰ। তাৰ নাম অনুপ্ৰেক্ষা।

সমস্ত সংসাৰ প্ৰকল্পনেৰ সংসাৰ, অৰ্থাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্যপূৰ্ণ। এটাই
পৰম সত্য। কেবল কল্পন, কেবল চঞ্চলতা, কেবল অস্থিৰতা।
প্ৰকৃতিতে এত আন্দোলন, এত চঞ্চলতা যে, তাৰ কথা ভাবলে বিশ্বয়ে
চমকিত হতে হয়। এতই প্ৰচণ্ড আন্দোলন যে যদি তা দেখতে থাকি,
শুনতে থাকি তা হলে আমাব শাৰীৰিক অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণভাবে ব্যথিত
হবে। আমাদের পক্ষে এটা মঙ্গল যে আমাদের কানেৰ পৰ্দা এ ভাবে
তৈৰি যে সে সব প্ৰকল্পনেৰ শব্দ গ্ৰহণ কৰতে পাৰে না। যদি মানুহ
তাৰ প্ৰকল্পন গ্ৰহণ কৰতে পাৰে তবে এক দিনেই সে খতম হয়ে
যাবে। সে বেঁচে থাকতেই পাৰবে না। এই সংসাৰে এত ভয়ঙ্কৰ শব্দ
হচ্ছে, এত ভীষণ ধ্বনি হচ্ছে যে তা শোনাৰ ক্ষমতা আমাদের নেই।
আমবা ঐ শব্দ শুনতে বা সহ্য কৰতে পাৰব না। আমরা অনেক কষ্টে
কিছু ডেসিমেল পৰ্যন্ত শব্দ গ্ৰহণ কৰতে পাৰি, শুনতে পাৰি। এই
দুনিয়াৰ অনেক অনেক ধ্বনি হচ্ছে। আমবা ঐ সমুদয় ধ্বনি সহ্য

কবতে অসমর্থ। আমবা যখন চিন্তা কৰি তখন এক প্ৰকল্পনেৰ ধাৰা প্ৰবাহিত কৰি। আমবা কথা বললে এক প্ৰবল্পনেৰ তবঙ্গ সঞ্চাৰিত হয়। আমবা চললে প্ৰকল্পন সৃষ্ট হয়। আজ বাবা জীবলোকে বৰ্তমান আজ তাবাই যে শুধু প্ৰবল্পনেৰ বিস্তাৰ কৰেছে তাই নহ। এই দুনিয়ায় যত লোক ছিল, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগে বাবা জীৱিত ছিল, তাবা এই দুনিয়াৰ ওপৰে এমন এক বিশাল প্ৰবল্পনেৰ জাল বিছিয়ে বেখেছে, আমাদেৰ গুৰুত্বাৰ্ণমণ্ডলেৰ উপবিভাগে সেই প্ৰাচীন লোকেবা এমন বিপুল প্ৰবল্পনেৰ জাল বিস্তাৰ কৰে বেখেছে যে, আজ তাব কোনও লেখাজোখা কৰা যায় না। তাব হিসাব কৰাও কঠিন। কিন্তু আজকালকাৰ বিজ্ঞানে লেখাজোখা কবতে পাবে না এমন কোন জিনিসই নেই। বিজ্ঞান সব গুচ বহুস্ত উদ্ঘাটনেৰ চেষ্টাৰ নিযুক্ত আছে।

আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক ঐ প্ৰবল্পনেৰ পৰিমাণ নিকপণেৰ জন্ত অনববত চেষ্টা কৰে যাচ্ছেন। তাবা জানেন যে পৃথিবীৰ মাধ্যাকৰ্ষণমণ্ডলেৰ উপবিভাগে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগেকাৰ লোকেৰ চিন্তাসমূহেৰ প্ৰবল্পন জমা হয়ে আছে, তাবা বা বলেছিল তাব প্ৰবল্পনও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। ঐ বৈজ্ঞানিকবা এমন এক উপায় আৱেৰণ কৰছেন, এমন যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাব চেষ্টা কৰছেন যাৰ মাধ্যমে ঐ সমুদয় প্ৰবল্পনেৰ পৰিমাণ কবতে সক্ষম হতে পাবেন, প্ৰাচীন কালেৰ সমস্ত চিন্তা ও বিচাৰ বুঝতে পাবেন, পড়তে পাবেন। এই এই যন্ত্ৰেৰ মাধ্যমে তাবা জানতে চান যে আজ মহাবীৰ, বুদ্ধ, খ্ৰীষ্ট্বেৰ যে সব বাণী জগতে প্ৰচলিত আছে সেগুলি যথার্থ কিনা, তাঁদেৰ বাণী লোকে যে বকম উপলব্ধি কৰেছে সেটাই শুদ্ধ সত্য কিনা। তাবা জানতে চান মহাবীৰ, বুদ্ধ এবং খ্ৰীষ্ট্বেৰ যে বাণী সাধুবা প্ৰচাৰ কৰেছেন তাবা কি সেই সব কথাই বলেছিলেন। এই দীৰ্ঘ কালেৰ মধ্যে তাঁদেৰ ভক্তবা তাঁদেৰ বাণীতে কোন কোন কথা জুড়ে দিযেছেন, কোন কোন কথাই বা ছেড়ে দিযেছেন, বৈজ্ঞানিকবা এই উপায়ে সে সমস্ত জানতে সমর্থ হতে পাবেন। তাবা পৰীক্ষা কৰে, যাচাই কৰে

ভালভাবে দেখতে চান কোন্ কথাই বা আসল বা মূল, আৰু কোন্ কথাই বা মিশ্ৰিত বা প্ৰক্ষিপ্ত। এই চেষ্টা চলছে। এ শুধু কল্পনাব ফাল্গুন আকাশে ওড়ানো নহ। এসব স্বার্থ তথ্য। আজ বিজ্ঞান এতদূৰ এগিয়ে গিয়েছে যে তাদেব পক্ষে কিছুই কল্পনাবিলাস মাত্ৰ নহ। বিজ্ঞান আজ আমাদেব কল্পনাকে সাকাব কৰতে চলেছে। তাব কাছে সূক্ষ্মতম উপকবণ, সাধনেব বস্তু আছে।

আমি শুধু প্ৰকল্পন সৃষ্টি কবি তাই নহ। সাবা ছুনিয়াব বায়ু-মণ্ডলকে শুধু আমি প্ৰকল্পিত কবি না। অনাদি কাল থেকে বায়ুমণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, প্ৰকল্পিত হচ্ছে। আমাব ছাবা সৃষ্টি প্ৰকল্পন তাব সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে জমা হচ্ছে।

এ অনেক পুনো কথা। আমি ‘বিশেষাবশ্যক ভাষ্য’ নামে এক প্ৰাচীন গ্ৰন্থ পড়েছিলাম। ঐ পুস্তকে এক জাযগায় পড়েছিলাম যে, আমবা যে নিঃশ্বাস ত্যাগ কবি তা সৰ্বত্ৰ ছড়িয়ে পড়ে। পাশে পুকুৰ থাকলে ঐ নিঃশ্বাস-বায়ু পুকুৰেব জলে ছড়িয়ে পড়ে আৰু জলচৰ জীবদেব পীড়া দেয়, তাদেব ব্যাকুল কৰে। যখন আমবা কাপড় ছিঁড়ি তখন সূক্ষ্ম বোম হাওয়ায় সব জাযগায় ছড়িয়ে পড়ে এবং চাবদিকে জীবকে আঘাত কৰে। এ বকম লেখা আছে যে, সজীব বনস্পতিব ওপৰে অনিমেব ধ্যান কবা উচিত নহ, কাবণ অনিমেব ধ্যানেব সাথে সাথে আমাদেব দেহ থেকে যে চুষকীয় বিদ্যুৎ নিঃসৃত হয় তা সজীব চাবা গাছেব জীবনকে ক্ৰেশ দেয়, তাব শবীৰে পীড়া সৃষ্টি কৰে। এই কাবণে সেই পুস্তকে সজীব বস্তুব ওপৰে ধ্যান কৰতে নিষেধ কবা হয়েছে। নিম্প্ৰাণ বস্তুব ওপৰে ধ্যান কবা উচিত। জৈন আগম গ্ৰন্থে বলা হয়েছে মুনিদেব শুধু মাটিব ওপৰে কসা উচিত নহ, কাবণ শবীৰেব গবমে মাটিতে জীবনেব পীড়া হয়। সেইজন্ত সাধুদেব কখনও অনাচ্ছাদিত সন্তিকায় উপবেশন কবা উচিত নহ। বত সূক্ষ্ম নীতিবোধ বা বিবেচনাব কথা। কাপড় ছেঁড়াব সময়ে যে সূক্ষ্ম বোম হাওয়াতে উড়ে যায় তাতে প্ৰাণীবা আঘাত পেতে পাবে, এই কথাব অৰ্থ বুঝতে পাবে এমন

লোক তখন ছিল না। কিন্তু যখন দেখি বিজ্ঞানের উপলব্ধি, গবেষণা ও
 অন্বেষণমূলক প্ৰবন্ধে এ কথা বোঝানোৰ চেষ্টা হয়ছে তখন আমাদেব
 মনে হয় যে. আমাদেব আচাৰ্যগণ যা লিখেছেন তাঁবা নিঃসন্দেহে
 অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞানেৰ ক্ষমতায় লিখেছেন। তাঁবা দেখেছিলেন, তাঁবা প্ৰত্যক্ষ
 কৰেছিলেন. তাঁবা অনুভব কৰেছিলেন, এৰু তাঁদেৰ দৃষ্টি ও অল্পভূত
 তথ্য নিজেদেব আচাৰেব মধ্যে গ্ৰহণ কৰেছিলেন। কিন্তু সাধাৰণ
 মানুষেব কাছে ঐ তবু কঠিন এৰু দুৰ্বোধ্য খেকে গিয়েছে। বাডিব
 তেতলায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি নিচে দাঁড়ানো একজনকে বলল, ‘ওহে,
 বাস আসছে, গাড়ি আসছে, অমুক লোক আসছে।’ নিচেব লোকটি
 বলল, ‘তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কোথায় বাস? কোথায় গাড়ি?
 অমুক লোকই বা কোথায়? কোন কিছুই তো দেখা বাসছে না।
 তুমি মিথ্যা কথা বলছ।’ ওপাবেব লোক যা বলেছে তাও যথার্থ,
 আবাব নিচেব লোকটি যা বলেছে তাও ঠিক। এ-ও মিথ্যা কথা বলছে
 না, অপবজনও মিথ্যা কথা বলছে না। উভয়েব দৰ্শনেব মধ্যে যে
 ভিন্নতা তা হল, শুধু পৃষ্ঠভূমিৰ প্ৰভেদবশত। তেতলায় দণ্ডায়মান
 লোকেব দৃষ্টি বহু দূৰ পৰ্যন্ত বায, তাব বলে সে বাস দেখেছে, গাড়ি
 দেখেছে এৰু লোকে আসতে দেখেছে। নিচে মাটিব ওপাবে দণ্ডায়মান
 লোকেব দৃষ্টি দূৰে বায না, তাব বলে সে বাসও দেখতে পায় না,
 গাড়িও দেখতে পায় না, মানুষও দেখতে পায় না। ছজনেব জানাই
 ঠিক। কেবল ছজনেব দেখাব মধ্যে পৃষ্ঠভূমিৰ ভেদ। যে বলেছে,
 ‘আমি দেখেছি’, সে-ও সত্য কথা বলেছে। আবাব যে বলেছে, ‘আমি
 কিছুই দেখি নি’, সে-ও সত্য কথা বলেছে। ছজনেব একজনও মিথ্যা
 কথা বলেছে না। কেবল পৃষ্ঠভূমিৰ প্ৰভেদ।

আমাদেব পশ্চাৎভূমিৰ তফাৎ হয়। যাঁবা অতীন্দ্ৰিয় জ্ঞানেব
 গভীৰতায় প্ৰবেশ কৰে চেতনাৰ অন্তঃস্থলে গিয়েছেন তাঁবা যে সত্য
 উদ্ঘোষিত কৰেছেন, যে তথ্যেব অভিব্যক্তি দিবেছেন, যে বহুস্তা উদ্-
 ঘাটিত কৰেছেন, যে সত্যেব আবৰণ উন্মোচন কৰেছেন, সবই আমবা

অস্বীকাৰ কৰতে পাবি, বলতে পাবি ঐ বকম হয় না। কেননা যে পটভূমিকাৰ অবস্থিত থেকে তাঁৰা ঐ সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘোষিত কৰেছেন, ঐ সমস্ত সত্য প্ৰকাশিত কৰেছেন সেই ভূমিতে আমি পৌছতে পাবি না। ঐ ভূমিকা অনেক উঁচু। আমবা নিচে ধৰাতলে দাঁড়িয়ে আছি। ধৰাতলে দণ্ডায়মান লোক ঐ সব সত্যকে অস্বীকাৰ কৰতে পাবে। বস্তুত তাৰা অস্বীকাৰ কৰেও থাকে। ঐকপ কৰাতে তাৰ কোন ত্ৰুটি হযেছে এ কথা বলা যায় না। কাৰণ সে যে পটভূমিতে অবস্থিত, যে ধৰাতলপৰে যে দাঁড়িয়ে আছে, যে মাটিতে দাঁড়িয়ে সে দেখছে, তাতে তাৰ ঐ বকম বিচাৰ হওয়াই সম্ভব, তা থেকে ভিন্ন কিছু দৰ্শন হতে পাবে না। তাৰ বিচাৰ অলপ বকম কিছু হওয়া সম্ভব নহ। যদি আমাব সামনে জানলা খোলা থাকে, আৰ আমি জানলাৰ দাঁড়িয়ে থাকি তৰে আমি বাইবেৰ সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাব, বলতে পাবব, আমি পাহাড় দেখেছি, গাছ দেখেছি, মন্দিৰেৰ ধ্বজা দেখেছি, বালুৰ টিলা দেখেছি। আমাব ও কথা বথার্থ হৰে, বাস্তবিক হৰে। কিন্তু যে লোক জানলা থেকে নিচে বসে আছে, সে পাহাড় দেখতে পাবে না, গাছ দেখতে পাবে না, মন্দিৰেৰ ধ্বজা বা বালুৰ টিলা কিছুই দেখতে পাবে না। সে বলবে, ওসব কিছুই নেই। কোন কিছুই সে স্বীকাৰ কৰবে না। তাৰ এই অস্বীকৃতিতে তাৰ কোন দোষ নেই।

আমবা যদি এই ভূমিকাভেদ বুঝে চলি তৰে এ কথা আমাদেব বোধগম্য হৰে যে, সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল জগতেব যে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃতি এবং ধাৰণা তা অকাৰণ নহ। তাৰ পেছনে কাৰণেৰ দীৰ্ঘ শৃঙ্খল আছে। আমবা সেই কাৰণ উপলব্ধি কৰে অনুপ্ৰেক্ষাব কাছে যেন নিজেৰে সমৰ্পণ কৰে দিই। আমবা প্ৰেফা ধ্যান প্ৰয়োগ দ্বাৰা, অভ্যাস দ্বাৰা এমন এক সংস্কাৰ তৈরি কৰে নেব যে আনবা সত্যেব কাছে আত্মসমৰ্পণ কৰতে পাবব। ধাৰণাব মধ্যে আমবা যাব না। তাকে হস্তক্ষেপ কৰতে দেব না। যে জিনিস যেমন, যে ঘটনা যেমনভাবে ঘটছে, যে জিনিস যেমন কপে আমাদেব সামনে আসছে, তাকে যদি তেমনি কপে আমবা

স্বীকার কবে নিই, তবে আমাদের সাধনামার্গ প্রশস্ত হবে, স্পষ্ট হবে। সাধনাতে বড় বাধা আসে অসত্য থেকে, মিথ্যা ধারণা থেকে, মিথ্যা কল্পনা থেকে। ঐ সবকে একেবারে ভেঙ্গে ফেলতে হবে। সব পূর্বনো ধারণাকে ভেদ কবাব জন্ত নতুন ধারণা তৈরি কবতে হবে, পূর্বনো সংস্কারকে দূর কবাব জন্ত নতুন সংস্কার তৈরি কবতে হবে। পূর্বনো কল্পনাকে দূরীভূত কবাব জন্ত নতুন কল্পনা নির্মাণ কবতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, পূর্বনো সব কিছু ভেঙ্গে ফেললে তাদের জায়গায় নতুন সব কিছু নির্মাণ কবা কেন। এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। আমবা যেন এই কথা মেনে চলি যে আমাদের অন্তত সব পূর্বনো ধারণা, সংস্কার ও কল্পনা বর্জন কবতে হবে। কিন্তু ভেঙ্গে ফেলা প্রক্রিয়া এত সহজ এবং সবল নয়। এর চাবধাবে এক বিশাল বাহ ঘিবে আছে, তাব সাথে আমাদের মোকাবিলা কবতে হবে। এক সংস্কার ভাঙ্গাব জন্ত অন্য আব একটি নতুন সংস্কার বচনা কবতে হবে। ক্রোধেব সংস্কার ভাঙ্গতে হলে ক্ষমাব সংস্কার গড়তে হবে। লোভেব সংস্কার ত্যাগ কবতে হলে সন্তোষেব সংস্কার নির্মাণ কবতে হবে। একটি সংস্কার ভাঙ্গতে হলে অন্য আব একটি সংস্কারে গড়া প্রয়োজন।

যাতে আমবা এক সংস্কার বর্জন কবে অন্য আব একটি সংস্কার গড়তে পাবি তাব জন্ত অনুপ্রেক্ষায় ধ্বনিব প্রয়োগ কবা হয়। এই পবিস্থিতিতে আমাদের ধ্বনিব মহত্ব নির্ণয় কবা প্রয়োজন। ধ্বনি প্রকম্পন বটে। যেই আমবা কথা বলতে থাকি অমনি ধ্বনিব তবঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। ঐ তবঙ্গ বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে। উপবে ও নিচে, ডাইনে-বামে চাবদিকে ধ্বনিব প্রকম্পন ছড়িয়ে পড়ে। ঐ প্রকম্পন অন্য বস্তুসমূহকে আঘাত কবে, তাদের প্রভাবিত কবে। আপনাব প্রভাব বিস্তার কবে। আমবাও ঐ ভাবে প্রভাবিত হই।

এটা সংক্রমণেব জগৎ। এই ছনিষায় কেউ নিজেকে সংক্রমণ থেকে বক্ষা কবতে পাবে না। বাশিষাষ ক্রান্তি বা বিপ্লব হযেছিল। লোকে বলে এ লেনিনেব বিপ্লব, তাঁব সাথীদের বিপ্লব। কিন্তু বাশিষাব

বৈজ্ঞানিকবা একটি নতুন কথা বলেন। তাঁরা বলেন, এ বিপ্লব লেনিননবও নয়, তাঁর সঙ্গীদেবও নয়। সূর্যে বিস্ফোৰণ হযেছিল এবং তাবই ফলে বাশিয়ায এই বিপ্লব ঘটেছিল। এই বিপ্লবেব মূল কাবণ সূর্যমণ্ডলে বিস্ফোৰণ, কোনও মানুয এব কাবণ নয়। মানুয ক্রান্তিব কাবণ নয়। সূর্যে যখন যখন বিস্ফোৰণ ঘটে তখন মানুযেব মস্তিষ্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যে বছৰ সূর্যে ভযঙ্কৰ বিস্ফোৰণ হয় সে বছৰ সাবা পৃথিবীতে ভযঙ্কৰ মহামাবী, ভীষণ ঝড়ঝা, ভযানক ভূমিকম্প হয়। জাতিসমূহেব মধ্যে ভযঙ্কৰ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয়। এইভাবে সূর্যেব বিস্ফোৰণই এই সমস্ত যুদ্ধ, তুফান, মহামাবী, বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত কৰে, মানুয কৰে না। আমবা অনেক বস্তুৰ দ্বাবা প্রভাবিত হই। যা কিছু সংঘটিত হয় আমবা তাব দ্বাবা প্রভাবিত হই। আমবা অন্তৰ্কে প্রভাবিত কৰি এবং নিজে অন্তেব দ্বাবা প্রভাবিত হই।

এই সংক্রমণেব জগতে কেউ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবে না। কোথাও এমন কোন বন্ধাকবচ নেই যাব বলে মানুয ঐ সংক্রমণ থেকে নিজেবে বন্ধা কবতে পাবে।

ধ্বনি এক বকম কবচেব কাজই কৰে। যাতে আমবা অন্তেব দ্বাবা কম প্রভাবিত হই সেজন্য আমবা ধ্বনিব কবচ তৈরি কৰে নিতে পাবি। বোজ পশ্চিমে বাত্রিব সময আসে আব আমাদেব অনিত্য অনুপ্রেক্ষাব ক্রম আবস্ত হয়ে যায়। সব লোক তখন বসে এক সঙ্কল্প কৰে যে, অনিত্য অনুপ্রেক্ষা কবতে হবে। সব শাস্ত্র এবং জাগ্রত। সব শাস্ত্র এবং সচেতন। অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আবস্ত হয়।

আমাদেব প্রথম সূত্র—ইমং শবীৰ অশিচ্চ। এই শবীৰ অনিত্য। এই সূত্রেব ধ্বনিব সঙ্গে আমবা অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আবস্ত কৰি।

আমাদেব দ্বিতীয় সূত্র—ইমং শবীৰ চযাবচযথশ্যম্। এই শবীৰ চযাবচযথৰ্মা। তাব চয বা সঞ্চয় হয়, অপচয বা ব্যয় হয়। তা পুষ্ট হয়, ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

আমাদেব তৃতীয় সূত্র—ইমং শবীৰ বিপবিশামধশ্যম্। এই শবীৰ

বিপৰিণামধৰ্মা । এতে বিবিধ পৰিণাম সংঘটিত হুৱে থাকে, নানাধৰ্মৰ দৈহিক পৰিবৰ্তন ঘটে । কখনও শীতলতা দ্বাৰা পৰিবৰ্তন ঘটে, কখনও বা উত্তাপেৰে দ্বাৰা, কখনও ভোজনৰে দ্বাৰা পৰিবৰ্তন ঘটে । কখনও বা অগ্নি কোনও পুংগলেৰে সন্তাপে হয় । কখনও বোণৰে পৰিবৰ্তন ঘটে, কখনও বা আমাৰ নিজৰে ভাবনাৰে পৰিবৰ্তন আসে । আমাৰ ধৰ্মৰ মাধ্যমে এই বিভিন্ন বৰ্ম পৰিবৰ্তনৰে অনুপ্ৰেক্ষা কৰতে পাৰি, দেখতে পাৰি, প্ৰত্যক্ষ কৰতে পাৰি । ধৰ্মৰে সাধে সাধে সঙ্কল্পেৰে বিকাশ হওয়া আবশ্যিক ।

আপনাৰা শুনে থাকিবেন হিমালয় পৰ্বতৰে বৰফেৰে ওপৰে নগ্ন সাধক উপবিষ্ট থাকেন । তাঁৰ চাবলিকে শুধু বৰফ আৰু বৰফ । তিনি উত্তাপেৰে প্ৰয়োগ শুকু কৰেন । এক ঘণ্টা যায়, দু ঘণ্টা যায়, তাৰপৰে সাধকেৰে দেহৰে ঘামৰে শুকু কৰে । বৰফেৰে ভেতৰে ঘামৰে শুকু থাকে । এ প্ৰাকৃতিক ঘটনা নহয় । যদি প্ৰাকৃতিক ঘটনা হতো তাহলে শুধু একজনৰে শৰীৰৰে ঘাম চোৱাতো না, সকলোৰে শৰীৰৰে ঘাম চোৱাতো । কিন্তু একজনৰে শৰীৰৰে ঘামৰে শুকু থাকে, আৰু সকলোই শীতে কাঁপতে থাকে । এ প্ৰাকৃতিক ঘটনা নহয় । এ হল ধৰ্মৰে প্ৰয়োগ, সঙ্কল্পেৰে প্ৰয়োগ, সাধনাৰে প্ৰয়োগ । এ হল ভাবনাৰে পৰিবৰ্তন, প্ৰাকৃতিক পৰিবৰ্তন নহয় ।

গৰমেৰে দিন, ভয়ঙ্কৰ গৰম পড়েছে, লু বহিছে । সাধক শীতলতাৰে ভাবনা কৰেন, শীতেৰে সঙ্কল্প কৰেন । তাঁৰ শৰীৰে শীতলতাৰে ব্যাপ্ত হুৱে যায়, তিনি শীতে কাঁপতে থাকেন । তিনি কঁপল গায়ে দেন, কিন্তু তবুও কাঁপুনি ধামে না । এ পৰিবৰ্তন প্ৰাকৃতিক নহয়, ভাবনাৰে ।

অজ্ঞাপি জীৱিত এক ব্যক্তি প্ৰতি শুক্ৰবাৰে কল্পনাৰে ক্ৰুশবদ্ধ হতো । তখন তাৰ দু হাতে ক্ষত হতো, তাৰে বন্ধ কৰত । বুকৰে থেকেও বন্ধ কৰতে থাকত । শুধু শুক্ৰবাৰেই এ বৰ্ম হতো । এ পৰিবৰ্তন ভাবনাৰে । সে লোকটি ত্ৰাণকৰ্তা খৃষ্টেৰে সঙ্কল্প কৰত, তাৰে বন্ধে এ বৰ্ম ঘটনা ঘটত ।

পা কাটে, পাঁড়া হয় । এখন পা কাটাৰ সময় নহয়, তবু আপনি

ভাবনাত্মক প্রয়োগ কবে দেখুন। পা কাটুক বা না কাটুক, পায়ে ব্যথা হবেই। যদি ভাবনাব ফলে ব্যথা হতে পাবে, তবে ভাবনাব ফলে ব্যথা সেবেও যেতে পাবে। ছ বকম ঘটনাই ঘটা সম্ভব।

শবীর বিপবিধামধৰ্মা বা পবিবৰ্তনশীল। তাব নানা প্রকাব অবস্থাস্তব ঘটে। আমাদেব দেখতে হবে কি কি কাৰণে এবং কি কি ভাবে শবীবেব অবস্থাস্তব ঘটে।

আমাদেব চতুৰ্থ শ্লোক—ইমং শবীৰং জবামবণধৰ্ম্যম্। এই শবীব জবা-মবণধৰ্মা বটে। দেহেব জবা হয়, মবণ হয়। আমবা তাকে অনুভব কৰি। আমবা যদি শবীবকে এত শিখিল কবে দিই যে আমাদেব মনে হয় আমবা মবণকে অনুভব কবছি, তাহলে ঐ বকম অনুভূতি হয়। ঐ অনুভূতি হতে আবস্ত কববে। তা প্রাকৃতিক পবিবৰ্তন নয। মবণ সতিই ঘটছে না। ঐ পবিবৰ্তন ভাবনাত্মক। যে অবস্থা বহুদিন পবে ঘটাব কথা, ভাবনাত্মক পবিবৰ্তন দ্বাৰা, ভাবনাব অতিশয তীব্রতা এবং সঘনতা দ্বাৰা আমবা সেই অবস্থা অনুভব কবতে পাৰি।

এই অনিত্যব অনুপ্ৰেক্ষা বটে। যা ঘটছে, বা সংঘটিত কবা হচ্ছে, আমবা তাই দেখি। এতে ধ্বনিব বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ আছে। এই ক্ষণ্ত আমি ধ্বনিব আলস্বন তথা কল্পনাব আলস্বন মেনে নিযেছি। আমবা একটি সীমা পৰ্যন্ত ধ্বনি এবং কল্পনাব আলস্বন উপেক্ষা কবতে পাৰি না। ঐ সীমা পৰ্যন্ত আমাদেব মেনে নিতেই হয়।

অৰ্হেব জপে লোকে ধ্বনিব সঙ্গে অৰ্হেব ভাবনা কবে থাকে, আবাৰ শূন্য ধ্বনিব সাথে অৰ্হেব ভাবনা কবে, অধিকন্তু অৰ্হেব মানসিক ভাবনাও কবে। প্রত্যেক স্তরে আলাদা আলাদা অনুভূতি হতে থাকে।

আমি একবাৰ বলেছিলাম এই তীব্র ধ্বনি কবে দেওয়া যাক। একবাৰ ঐ প্রয়োগ স্থগিত কবে দিই। কিছু লোক বলেছিল, ঐ প্রয়োগ চলাই প্রযোজন, কাণ এটা ভাল লাগে, এতে একাগ্রতা সাধিত হয়, আব এটা স্বাভাবিক কথা। আমরা যেন মানুষেব এই স্বভাব ভুলে না যাই এবং বহুকাল-প্রচলিত শুল আলস্বন ত্যাগ কবে শূন্য আলস্বন

গ্রহণ না কবি, কাৰণ সহসা পৰিবৰ্তন কৰলে বেশিৰ ভাগ লোক সেটা গ্রহণ কৰতে পাববে না। প্ৰেক্ষা ধ্যানৰ পদ্ধতিতে এই বাস্তবিকতাৰ ধ্যান বাখা হৈছে যে সাধক স্থলৰ পৰা নৃত্যৰ দিকে যায়। যে স্থল দেখে নৃত্য সম্বন্ধে কথা তাৰ বোধগম্য হ'ব না। অনেক অভিযোগ কৰে সহজ স্বাস আশুত আশুত না, প্ৰকল্পৰ নাগাল পাৰে না। এটা ঠিক কথা। শুকতে ও বকম হ'ব না। আমাদেব সতৰ্ক থাকতে হ'ব যে, যে লোকৰে আমবা সাধনাৰ প্ৰেৰণা দিই সে যেন সাধনাৰালে ক্লান্তি বা বিবক্তি বোধ না কৰে, বা নিবাসণ না হ'ব। যদি তাৰ মনে নিবাসা এসে যাৰ তৰে সে সাধনা কৰতে পাববে না। যদি সে ক্লান্ত বা বিবক্ত বোধ কৰে তৰে সাধনাৰ ছেদ পড়বে এবং সে আৰু কখনও সাধনাৰ প্ৰবেশৰ নামও নৃত্য আনবে না। এইজন্য সাধকেব যাতে ক্লান্তি বা বিবক্তি না আসে, যাতে সাধনাৰ প্ৰতি সে আকৃষ্ট হ'ব, যাতে সাধনাৰ প্ৰতি তাৰ অনুভাগ ক্ৰমশঃ বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে দৃষ্টি বাখা আবশ্যক। এইজন্য শুকতে স্থল আবহাৰেব আবশ্যকতা আমি মেনে নিয়েছি, যদিও আমাদেব দেখতে হ'ব যে স্থলেতেই আমাদেব গতি কল্প হ'ব না যায। তাকে নৃত্য পৰ্যন্ত পৌছতে হ'ব। কিন্তু সাধাৰণ মানুহ সহসা স্থলকে অতিক্ৰম কৰে নৃত্য পৌছে যাবে এ কথা আপনাবা কল্পনা কৰতে পাবেন না। আবহাৰেই সোজানৃত্য নৃত্য পৌছে যাৰ এবংকম লোক বিবল।

এক সাধক তাৰ শুকৰ কাছে গিয়ে বলল, 'আমি সাধনা কৰতে চাই। আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি কি কৰব তাৰ নিৰ্দেশ দিন।' শুক শুনলেন। তিবন্ধাবেব নৃত্য বললেন, 'তুমি কি কৰবে তা জিজ্ঞাসা কৰতে এসেছ ? কেন দেখিবে দিচ্ছি না ? তোমাৰ কি চোখ নেই ? কেন শুনতে পাচ্ছ না ? তোমাৰ কি কান নেই ?' সাধক বলল, 'আমাৰ চোখ আছে। আমি দেখতে পাই। কান আছে। আমি শুনতে পাই।' শুক বললেন, 'আমাকে আবাব কি জিজ্ঞাসা কৰছ ? তোমাৰ সামনে কি দেখতে পাচ্ছ ?' 'পাহাড় দেখতে পাচ্ছি।'

‘কি শুনতে পাচ্ছ ?’ ‘ঝবণাব শব্দ শুনতে পাচ্ছি।’ ‘তাহলে চলে যাও। পাহাড় দেখ, আব নির্ঝবব ধবনি শোন। এই হল সাধনা।’

সাধক চলে গেল। সে পাহাড় দেখতে থাকল। ধবনি শুনতে থাকল। এইভাবে দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে সে অন্তিম বিন্দুতে পৌঁছে গেল।

মূল কথা—দেখা। ইচ্ছা কবলে আমবা শবীবকে দেখতে পাবি, পাহাড় দেখতে-পাবি, কোন ছবি দেখতে পাবি। মূল মন্ত্র হল—দেখাব অভ্যাস কবা। দেখ এক জ্ঞান। আব কিছুই কোবো না। কেবল দেখ। দেখাব সাথে আব কিছু জুড়ে দিও না। কেবল জ্ঞান। জ্ঞানাব সঙ্গে অন্ত কিছু জুড়ে দিও না। মূল কথা—জ্ঞান আব দেখা। ইচ্ছা কবলে আমবা শবীব দেখতে পাবি, শ্বাস দেখতে পাবি। আবাব প্রাচীবও দেখতে পাবি। যাই দেখি তাতে কোন প্রভেদ হবে না। কিছুই বাবে আসবে না। দেখাই একমাত্র দ্রষ্টব্য ব্যাপাব।

জৈন আগমে বলা হয়ছে মুনি যেন ভূমি দেখতে দেখতে চলেন। এটা পুবোপুবি ধ্যানের প্রক্রিয়া। তাকে গমন-যোগও বলা হয়। আমবা এ কথাব অর্থ বুঝতে পাবছি, কিন্তু এব পেছনে একটি মহৎ সত্য গোপন আছে। কোন লোক যদি অন্ত কোন প্রকাব সাধনা না কবে, কেবল চলাব সময়ে যদি দেখতে দেখতে চলতে থাকে, তবে ধ্যানের এক মহৎ সাধনা হয়ে যায়। ঐ সাধনা তাকে অনেক দূব এগিয়ে নিয়ে যাবে। উত্তবাধ্যয়ন পুত্রে বলা হয়ছে সাধক পথ চলতে চলতে যেন গমনময় হয়ে যায়। তাব সমস্ত শবীব-তত্ত্ব তাতে চলন্ত হয়ে যেন গতিতে পবিণত হয়। যে লোক গমন-যোগ অভ্যাস কবে, দেখতে দেখতে চলতে থাকে মানুষ না বলে গতি বলা উচিত। তাকে গমন বলা উচিত। কেবল গমন। সে কোন মানুষ নয়, সে শুধু গমন। এবভূত গ্রাযেব দৃষ্টিতে, শুদ্ধ গ্রাযেব দৃষ্টিতে যদি জিজ্ঞাসা কবা যায়, ঐ লোককে ভূমি কি বলবে ? মানুষ বলবে ? না, একেবাবেই না। ও মানুষ কোথায় ? ও তো গতি মাত্র, শুদ্ধ গতি। আব অন্ত কিছুই

নয়। তাৰ না থাকে ইন্দ্ৰিয়েৰ প্ৰয়োগ, না থাকে মনৰ প্ৰয়োগ। তাতে পাঁচ প্ৰকাৰ ইন্দ্ৰিয়েৰ বিষয়ও নাই, পাঁচ প্ৰকাৰ স্বাধাৰ্যও নাই। কোন কথা নাই, জিজ্ঞাসা নাই, প্ৰশ্ন নাই, পুনৰাবৃত্তি নাই। কোন অনুপ্ৰেক্ষাও নাই, ধৰ্মকথাও নাই। চোখেৰেও প্ৰয়োগ নাই, বান্ধেৰেও প্ৰয়োগ নাই। দেখাও নাই, শোনাও নাই। যে ব্যক্তিৰ কোনও ইন্দ্ৰিয়েৰ প্ৰয়োগ নাই, মন এক মস্তিষ্কেৰেও প্ৰয়োগ নাই, ভাবাৰেও প্ৰয়োগ নাই, সে তো কেবল গতি মাত্ৰ। শেষ পৰ্যন্ত আৰ কিছুই থাকে না, থাকে শুধু গতি। ভাবা সমাপ্ত, মন সমাপ্ত, ইন্দ্ৰিয়েৰ বিষয় সমাপ্ত। শেষ পৰ্যন্ত থাকে শুধু গতি, কেবল গতি। সে লোক আৰ কিছুই দেখে না। কেবল ভূমি আৰ ভূমি দেখে। এই হল গমনযোগ।

আমি বলছি, আমবা যেন একটি মাত্ৰ আলম্বন গ্ৰহণ কৰি। আপনাবা যেন ধাৰণা না কৰেন কেবল স্বাসই আলম্বন হতে পাবে। এ বকম ধাৰণা কৰলে অনুপ্ৰেক্ষা হবে না। যথার্থ বা সত্য ঘটনা সম্ভব হবে না। স্বাসও এক আলম্বন। আপনি যদি কেবল গমনকেই আলম্বন বান্ধিবে নেন তবে সেটা বিশেষ গুরুত্বপূৰ্ণ আলম্বন হতে পাবে। হৰিভদ্ৰ শুবী বলেছেন, ‘সৰ্বোহবি ধন্যবাবাবো মোক্ষেন জীৰ্ণাবো জীৰো’—মুক্তিদাতা, দুঃখ থেকে মুক্তিদাতা, এ সবই ধৰ্মৰ ব্যাপার যোগ। এ অনেক গভীৰ তত্ত্বৰ কথা। এই সব মুক্তিদাতা মহৎ সত্যেৰ উদ্ঘাটন কৰেছেন। আমবা কোন কিছুকে যদি আলম্বন বান্ধি নিই, শেষ পৰ্যন্ত তাই আমাদেব চৰম আলম্বন হবে।

আমি অস্ত্ৰ এক আলম্বনেৰ কথা বলছি। কোন লোক ধ্যান কৰে না, স্বাধাৰ্য কৰে না, বা অস্ত্ৰ কিছু কৰে না। সে যদি কেবল একটি কথা আঁকড়ে ধৰে থাকে, ‘আমি কেবল কটাই খাব, আৰ কিছু কৰব না’, তবে আমাৰ মনে হয় তাৰ একটা ধ্যানৰ ফল মিলে যাবে যে, আমবা তাৰ কল্পনাও কৰতে পাবব না। সে চিন্তা কৰে, ‘আমি কেবল খাব, আৰ কিছুই কৰব না।’ কেবল খাওয়াও খুব বড় সাধনা হতে পাবে।

ৰূপান্তৰণেৰ প্ৰক্ৰিয়া

এক গ্ৰামীণ শহৰে এসে এক হোটেলত উঠল। বাত এল। তাৰ ঘৰে বাতি জ্বলছিল। শোবাব সময় হল। সে ভাবল, বাতি নিভিয়ে দিহ। সে বাল্বেৰ কাছে গিয়ে ফুঁ দিল। আলো নিভল না। দু মিনিট পৰে আৰও জোৰে ফুঁ দিল। তবুও দীপ নিভল না। আৰও দু চাব-বাব ফুঁ দিল। কিন্তু আলো জ্বলতেই থাকল। হৰ্ষাণ হয়ে আলো জ্বলে বেখেই সে শুয়ে পড়ল। সকাল হল। হোটেলৰ বেযাবা এল। গ্ৰামীণ তাকে বলল, ‘ওহে, তোমাদেব এ কি বকম দীপ ? ফুঁ দিলেও নেভে না। এ দীপ অকেজো। আমাৰ সাৰা বাত আলোতে কাটাতে হুখেছে।’ বেযাবা বলল, ‘মহাশয়। ও প্ৰদীপ নৰ, বিত্ৰ্যৎ। ফুঁ দিবে ও আলো নেভান বাৰ না।’ সে স্নুইচেৰ কাছে গেল, বোতাম টিপল, অমনি বিজ্জলি বাতি নিভে গেল।

গ্ৰাম্য লোকটি জানত না বিজ্জলি বাতি কিসে নেভে, বা কিসে জ্বলে। সে জানত যাই আলো তাই প্ৰদীপ, আৰ ফুঁ দিলেই তা নিভে যাবে। যতক্ষণ আমবা না জানি ততক্ষণ আমবা দীপ জ্বলাতেও পাবি না, নেভাতেও পাবি না। না জানলে কিছুই কৰা সম্ভব হয় না।

অনুৰূপভাৱে না জানলে আমবা কি কৰেই বা ৰূপান্তৰিত হতে

পাবি ? আমাদের পবিত্রিত বা কপাস্থবিত হবাব এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই ।

দ্বিতীয় কথা—জানাব পবে অভ্যাস কবা প্রয়োজন । আমবা এই নিয়ম জানি যে আমবা নাসাবন্ধ দিবে স্বাস নিই, আব সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনেব মধ্যে সঙ্কল্প চলতে থাকে, ভেতব পর্বন্ত পৌছয় । আমবা এও জানি আমাদের দ্বিতীয় নাসাবন্ধ দিবে স্বাস বেবিযে আসে, সঙ্গে সঙ্গে মনেব সঙ্কল্প চলতে থাকে, মনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে । সাধনপদ্ধতিব পৌর্বাণ্ব আমবা জেনেছি এবং বুঝেছি । কিন্তু কাৰ্যকালে আমাদের মন প্রমাদে আচ্ছন্ন হয় । সক্রিয়তা থাকে না । অপ্রমাদ থাকে না । জাগৰুৰতা থাকে না । কৰ্মণ্যতা থাকে না । শুধু জ্ঞানলে কিছু হবে না, অভ্যাস কবতে হবে । আমবা যেমন জেনেছি পূৰ্ণ জাগৰুৰতাব সঙ্গে তা আমাদের পুনঃপুনঃ অভ্যাস কবতে হবে । বাব বাব অভ্যাস কবলে আমাদের কাৰ্য সম্পন্ন হবে, আমাদের অভ্যাস সফল হবে । সেই কাৰণে ভগবান বলেছেন—‘বিজ্ঞা চবণং পমোদে ।’ জ্ঞান ও আচৰণ মিলিত হলে মানুষকে হৃৎ থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হয় । জ্ঞান ছাড়া হৃৎ থেকে মুক্তি হয় না, আব ক্রিয়া ছাড়াও হৃৎ থেকে মুক্তি হতে পাবে না । যদি জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজন হয়, তবে আচৰণও অবশ্য প্রয়োজন । আমবা অপ্রমাদেব জ্ঞান কৰ্ম কবি, পূৰ্ণ জাগৰুৰতাব সাথে অভ্যাসেব পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কবি । এই জ্ঞান অপ্রমাদ অবশ্য প্রয়োজন । আমবা যাতে বিজলি বাতিব সামনে গিষে ফুঁ না দিই সেজ্ঞান আমাদের জ্ঞান দবকাব । যেখানে ফুঁ দেওয়াব কথা সেখানে যেন ফুঁ দিই, যেখানে বোতাম টেপাব কথা সেখানে যেন বোতাম টিপি । যে কাজ যেমন ভাবে কবাৰ কথা, সে কাজ তেমনি ভাবেই কবি । এ দুটি কাজ ঠিকমত হলেই আলো জ্বলবে, দবজা খুলে যাবে, জাননা খুলে যাবে । তা না হলে কোন কিছুই হবে না । আলোও জ্বলবে না, দবজাও খুলবে না, জানালাও খুলবে না ।

যখন আমাদের মনেব গভীৰে আকাঙ্ক্ষা জাগে তখনই এ বকম হতে

পাবে। এ বকম গভীৰ আকাজক্ষা হ'বে যে আমাৰ ঐ কাজ কৰা নিতান্ত আবশ্যক, ঐ বকম কবলে আমি নিজে ধন্য হব, উপকৃত হব, লাভবান হব। ওই বকম গভীৰ আকাজক্ষা বা অভীক্ষা উৎপন্ন হলে তাবই এ বকম হতে পাবে। গভীৰ আকাজক্ষা হলে আত্মাৰ নিবীক্ষণ হয়।

আমবা প্ৰথম দিন থেকেই আবৃত্তি কৰে যাচ্ছি, আত্মা দ্বাৰা আত্মাকে দেখ। এব অৰ্থ—স্ব-দৰ্শনেৰ ভাবনা, নিজেকে নিজে দেখাৰ ভাবনা উৎপন্ন হোক। নিজে নিজেকে দেখলেই গভীৰ আকাজক্ষা উৎপন্ন হ'বে। আত্মাকে দৰ্শন, নিজেৰ অস্তিত্বকে দৰ্শন আৰু গভীৰ আকাজক্ষা—এগুলি যখন ঘটে তখন আমাদেৰ দৃষ্টিকোণেৰ পৰিবৰ্তন হয়। জীবন বদলে যায়, তাৰ আগে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। দৃষ্টিৰ পৰিবৰ্তন হলে জীবনেৰও পৰিবৰ্তন হয়। ছুনিয়াতে যা আছে তাই আছে। ভাল হলে ভাল, মন্দ হলে মন্দ। যা আছে তাৰ আমবা কোন বকম অদলবদল কবতে পাৰি না। ছুনিয়াতে এ সবই চলতে থাকে। আজ পৰ্যন্ত তাৰ কেউ পৰিবৰ্তন কবতে সমৰ্থ হয় নি, ধ্বংস কবতে সক্ষম হয় নি, নতুন কিছু নিৰ্মাণ কবতেও সমৰ্থ হয় নি। যা আছে তা চলছে, চলতে থাকে। যে লোক নিজেৰ দৃষ্টি বদলাতে পাবে তাৰ জন্তু ছুনিয়া বদলাতে পাবে। যে আপনাৰ দৃষ্টিভঙ্গি বদলায় না, ছুনিয়াও তাৰ জন্তু কখনও বদলায় না।

এক গুৰু ছিলেন। তাৰ দুটি শিষ্য ছিল। তিনি তাদেৰ পৰীক্ষা কবতে ইচ্ছা কবলেন। এক শিষ্যকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'বল, জগৎ কেমন ? তোমাৰ জগৎ কেমন লাগছে ?' সে বলল, 'জগৎ খুবই মন্দ জায়গা। সব জায়গায় অন্ধকাৰ আৰু অন্ধকাৰ। আপনিই দেখুন। একটা দিন হলে ছুবাৰ বাত হয়। দুই বাত্ৰিৰ মাঝখানে একটা দিন। শুকতে বাত ছিল। শুধু আঁধাৰ আৰু আঁধাৰ। তাৰ পৰে দিন এল। আলো হল, প্ৰকাশ হল। আৰাৰ ৰাত এসে গেল, আঁধাৰে সব ছেয়ে গেল। এক বাৰ আলো তো ছুবাৰ আঁধাৰ। আঁধাৰ বেশি, আলো কম। এই তো ছুনিয়া।'

আচার্য দ্বিতীয় শিষ্যকেও একই প্রশ্ন কবলেন। সে বলল, 'গুরুদেব। জগৎ খুব ভাল জায়গা। কেবল আলো আব আলো। বাত গেল। আলোব প্রকাশ হল। সূর্যেব আলো সৰ্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। আলোব আবিৰ্ভাব হলে অন্ধকাৰ চূৰ্ণবিচূৰ্ণ হয়ে যায়। আলো সবাব বন্ধ চোখ খুলে দেখ, যা সত্য তাকে প্রকটিত কৰে। যা অন্ধকাৰে আবৃত ছিল তাকে এক মুহূৰ্তে অভিব্যক্ত কৰে, অনাবৃত কৰে দেখ। যে জগতে এই বকম আলোব খেলা সে জগৎ বত সুন্দৰ আব লোভনীয়। আমি দেখেছি দিন এসে চলে যায়, বাত আসে, চলে যায়, আবাব দিন আসে। এই ভাবে দুই দিনেব মাঝখানে এক বাত। আলো বেশি, অন্ধকাৰ কম। দু বাব আলোব প্রকাশ, একবাৰ আঁধাৰ।'

প্রশ্ন একটি ছিল, উত্তৰদাতা ছিল দু জন। তাবা দু বকম উত্তৰ দিযেছিল। এক জন বলেছিল, দুই বাতৰ মাঝখানে একটি দিন হয়। অপৰ জন বলেছিল, দুই দিনেব মাঝখানে একটি বাত। বাত দুজনেব পক্ষেই সমান ছিল, দিনও দুজনেব পক্ষেই সমান ছিল। দিনেবও প্রভেদ ছিল না, বাতৰও প্রভেদ ছিল না। ছিল দৃষ্টিকোণেব পার্থক্য, দৃষ্টিভঙ্গিৰ প্রভেদ। একজন অধিক পৰিমাণে আলোব খেলা দেখেছিল, সেই অনুসাৰে মূল্যাক্ষন কৰেছিল। সে তাব জালে আবদ্ধ হয়েছিল। তাব মনে হয়েছিল, ছনিষাব অন্ধকাৰেব চেয়ে বড় আব কিছুই নেই। সে আলোব চমক দেখতে পায় নি, তাব মূল্য বুঝতে পাবে নি।

এ হল সম্পূৰ্ণ দৃষ্টিকোণেব পৰিবৰ্তন। যদি আমবা চোখ বিশ্বেব সৌন্দৰ্য এবং সত্যকে দেখতে আবন্ত কৰি তবে সৰ্বত্র সত্য আমাদেব দেখা দেবে, সৌন্দৰ্য দেখা দেবে। যদি আমাদেব চোখ শুধু ছুঃখ আব ছুঃখ দেখতে থাকে তবে আমাদেব আশেপাশে ছুঃখ নাচতে থাকবে। সব কিছু ছুঃখময় হয়ে যাবে।

আমরা পশ্চিম বাজিতেঅ নুপ্ৰেক্ষাব অভ্যাস কৰি, অনুভব কৰি। শবীব অনিত্য, এই সত্য থেকেও আনন্দ অনুভব কৰি। শবীব চমাপচয়-শীল। কখনও তাব চয় অৰ্থাৎ বৃদ্ধি হয়, কখনও বা অপচয় অৰ্থাৎ ক্ষয়

হয়। কখনও তা পুষ্ট হয়, কখনও বা ক্ষীণ হয়। শবীর ক্ষীণ হলেও সত্যেব বোধ হতে পারে। এই শবীর বিপৰীতধৰ্মা, বিবিধ পৰিবৰ্তনেব মধ্য দিযে তার গতি। কখনও তাব ওপৰে শীতেব প্ৰভাব হয়, কখনও গ্ৰীষ্মেব, কখনও বা ঝড় তুফানেব। কখনও সে বোগ-যন্ত্ৰণা সহ কৰে, কখনও বা পৰিস্থিতি দ্বাৰা পীড়িত হয়। কখনও এটা, কখনও ওটা ঘটিত হয়। এই দেহ অনেক, অনেক পৰিবৰ্তনেব মধ্য দিযে যায়। বোগ আমাদেব প্ৰিয় বস্তু নয, কিন্তু বোগেব সত্যতাৰ অনুভূতি আমাদেব প্ৰিয়। প্ৰকৃতপক্ষে বোগ আছে—এই সত্য আমাদেবকে সত্যেব দিকে, যথার্থেৰ দিকে নিষে যায়।

এই শবীবেব মৃত্যু ঘটে। শবীবেব বাৰ্ধক্য হয়, মানুষ মাৰা যায়। মৰণেব অনুভব কৰাও অনেক বড় আনন্দ। আমবা অনিত্যেব অনুপ্ৰেক্ষা দ্বাৰা জীবদ্দশায় মৰণেব অভিজ্ঞতা লাভ কৰি। আৰ যে লোক মৰণেব শিক্ষা পেয়েছে সে সমস্ত কঠিন সমস্যা উত্তীৰ্ণ হতে পারে। মৰণ-ভয় ছনিষাব সবচেয়ে বড় ভয়। মৰণই হল অন্তিম ঘটনা।

আজ পৰ্যন্ত ছনিষাব শাসকবুল নানা ভাবে দণ্ডদানেব উপায় উদ্ভাবন কৰেছেন। তাঁবা বহু বিচিত্ৰ দণ্ডদানেব কৌশলেব আশ্ৰয় নিয়েছেন। বাঁধা, জেলে দেওয়া, হাতে হাতবঁড়া লাগান, পায়ে বেড়ি লাগান, মাৰা, পেটানো। তাঁদেব হাতে চৰম দণ্ড—কাঁসি দেওয়া। এটিই অন্তিম দণ্ড।

যে লোক জীবিত অবস্থায় মৰণ শিক্ষা কৰে, তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কৰে, তাকে অনুভব কৰে, নিজেব শবীৰ শিখিল কৰে সকল অবয়ব মৃত্তেব অবয়বেব মত কৰতে শিক্ষা কৰে—সত্যই সে লোক সকল সমস্যা, সকল প্ৰকাৰ ভয়, সকল প্ৰকাৰ বিপ্লবে অবশ্যই অতিক্ৰম কৰতে পারে।

আমবা অনিত্যেব অনুপ্ৰেক্ষা কৰে থাকি। ঐ অনুপ্ৰেক্ষাতে আমবা সত্যকে দেখি, আনন্দ নিৰ্গলিত কৰি, আমাদেব অন্তৰেব অন্তঃস্থলে যেতে প্ৰয়ত্ন কৰি এক তাব সাধনা কৰি। এ সবই দৃষ্টিকোণেব পৰিবৰ্তন। তাছাড়া যদি আমবা কাউকে বলি, মৰণ অনুভব কৰ, তবে সে ভাববে, কি বকম মূৰ্খেৰ মত কথা বলছে। বেঁচে থাকাব কথা

বলে ভাল লাগতে পারে, কিন্তু ও তো মরণের কথা বলছে। বড়ই খাবাপ কথা। বাঁচাব কথা বেশ ভাল লাগে। কিন্তু মরার কথা বড় মন্দ মনে হয়। আমবা তাকে অলক্ষ্যে কথা মনে কবি। অশুভ কথা বলে মনে কবি। কিন্তু সাধকবা এ বকম মনে কবেন না। তাঁবা মরার কথা ভাল কথা মনে কবেন। এক্ষণ মরণকে তাঁবা নিজেদের অভ্যাসেব অঙ্গীভূত করে সাধনা কবেন। বস্তুত এই হল দৃষ্টিব পবিবর্তন।

দৃষ্টি বদলালে সব কিছুই বদলে যায়। সাধনাব প্রথম সূত্র—দৃষ্টিব পবিবর্তন। কপাস্তবর্ণের প্রথম সূত্র—দৃষ্টিব পবিবর্তন। আমাদের সমস্ত কপাস্তব দৃষ্টিকোণের পবিবর্তন দ্বাৰা সাধিত হয়। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে আভ্যন্তরীণ সমস্ত তত্ত্বের পবিবর্তন শুরু হয়ে যায়। কপাস্তবর্ণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তখন ছনিয়ার দৃষ্টিতে অনেক উর্শ্টো কথা আমাদের কাছে ঠিক বলে মনে হতে শুরু করে। ছনিয়ার যে সব কথা ঠিক বলে মনে হয় সেগুলি সাধকের কাছে উর্শ্টো লাগতে পারে।

এক সাধক কনফুসিসকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আমি কি করে মনের ওপরে সংযম প্রয়োগ করতে পারব ? কনফুসিস মস্ত বড় সাধক ছিলেন। তিনি মহান যোগী, দার্শনিক ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—আমি এ বিষয়ে সহজ সবল উপায়, ছোট একটি সূত্র বলছি। তুমি কি কান নিয়ে শোন। সাধক উত্তর দিল—হ্যাঁ। কনফুসিয়াস বললেন—তুমি যে কান দিয়ে শোন এ কথা মানতে পারি না। তুমি মন দিয়ে শোন। একটা কাজ কর। আজ থেকে শুধু কান দিয়ে শুনতে শুরু কর। মন দিয়ে শোনা বন্ধ করে দাও। তুমি জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নাও এ কথা আমি মানতে পারি না। তুমি মন দিয়ে স্বাদ নাও। আজ থেকে কেবল জিহ্বা দ্বাৰা স্বাদ নেওয়া আবস্ত কর। মনের দ্বাৰা আস্বাদন করা বন্ধ কর। তুমি চোখ দিয়ে কি দেখ, তুমি মন দিয়ে দেখ। আজ থেকে শুধু চোখ দিয়ে দেখা শুরু কর। আপনা আপনি মনের ওপরে সংযম ক্ষমতা এসে যাবে।

কেবল কান দিয়ে শোনা, জিহ্বা দিয়ে চাখা, চোখ দিয়ে দেখা—

কপাস্তবেব একটি ছোট সূত্ৰ। কিন্তু আমবা কেবল কান দিয়ে শুনি না, জিভ দিয়ে চাখি না, চোখ দিয়ে দেখি না। মন দিয়ে শুনি, চাখি, দেখি। যদি আমাকে প্ৰশ্ন কৰা হতো তবে আমি উস্তবেব সঙ্গ আব একটু কথা জুড়ে দিতাম—আমবা সংস্কাৰ দ্বাৰা শুনি, স্বাদ গ্ৰহণ কৰি, দেখি। আমবা পূৰ্ব ধাৰণাসমূহেব বশবৰ্তী হযে এই সব কৰে থাকি।

মা ছেলেকে বলে—কিছু বোঝ না, তুমি নিবেট মূৰ্খ। ছেলে কান দিয়ে শোনে, মন দিয়ে শোনে, সংস্কাৰ এবং ধাৰণা দিয়ে শোনে। কোন বিৰোধী বা শত্ৰু ছেলেকে বলল—বুঝতে পাবছ না? তুমি আকাট মূৰ্খ। এ কথাও সে কান দিয়ে শুনল, মন দিয়ে শুনল, সংস্কাৰ দিয়ে শুনল, ধাৰণা দিয়ে শুনল। কানে দুটো আঙাৰ্জাই সমান লাগল। চাই মা বলুক, তুমি মূৰ্খ, চাই শত্ৰু বলুক, তুমি মূৰ্খ—দুটো কথাৰ আঙাৰ্জাই সমান। কানেৰ কাছে দুজনেৰ দ্বাৰা ব্যবহৃত শব্দ এবং তাৰেৰ ধ্বনিব কোন প্ৰভেদ নেই। শোনাতেও কোন প্ৰভেদ নেই। কিন্তু মনেৰ দিক থেকে ধাৰণাৰ এত পাৰ্থক্য হবে যে মায়েৰ কথা প্ৰিয় লাগতে পাবে, কিন্তু দুশমনেৰ কথা আপ্তনেৰ মত গায়ে জ্বালা ধৰাতে পাবে। বিৰোধীৰ কথায় ছেলোটো এত কুপিত হযে যাবে যে তাতে কখনও কখনও বিৰাট অনৰ্থকাৰী ঘটনাও ঘটে যেতে পাবে।

এই প্ৰভেদ কেন হয়? যদি শুধু কান দিয়ে শোনা হতো তবে দুজনেৰ কথাৰ কোন তফাৎ হতো না, কাৰণ দুজনেৰ কথাৰ ধ্বনি এবং শব্দাবলী সমান। দুজনেৰ কথাৰ প্ৰভেদ এই জন্ত হযেছে যে শ্ৰোতা শুধু কান দিয়ে শোনে নি, সে সংস্কাৰ দিয়ে, মন দিয়ে, তথা পূৰ্ব ধাৰণা দিয়ে শুনেছে।

কনফুসিয়াস ঠিকই বলেছেন, কান দিয়ে শোন, মন দিয়ে শোনা বন্ধ কৰ। কেবল জিভ দিয়ে চাখ, মন দিয়ে চাখা বন্ধ কৰ। কেবল চোখ দিয়ে দেখ, মন দিয়ে দেখা বন্ধ কৰ। আপনা আপনি সংযম এসে যাবে।

এটি কপাস্তবৰ্ণেৰ মন্ত বড় সূত্ৰ। সাধাৰণ মানুহেৰ কাছে এ কথা

ছলনাপূৰ্ণ ও দুৰ্বোধ্য মনে হতে পাৰে কিন্তু সাধকেৰ পক্ষে তা গভীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আমবা যেন ইন্দ্ৰিয়গুলিকে তাদেৰ কাজ কৰতে দিই এক মনকে তাৰ আপন কাজ কৰতে দিই, সংস্কাৰ এক পূৰ্ব ধাৰণাসমূহকে আপন আপন কাজ কৰতে দিই। তাদেৰ কাজেৰ সঙ্গে আমবা যেন কিছু জুড়ে বা মিলিত কৰে না দিই।

কেন অসংযম হয় ? কান, মন, সংস্কাৰ এক ধাৰণা এক ধাৰাৰ মিলিত হয়। তাদেৰ এক ধাৰাৰ মিলিত হওঁযাৰ ফলে অসংযম উৎপন্ন হয়। অসংযম কানে নহ, চোখে নহ, জিভেতে নহ। তাৰা যে যেমন আছে সেই ভাবেই আমাদেৰ দেখা দেয়। তাতে কোন প্ৰিয়তাও নেই, অপ্ৰিয়তাও নেই। কোন বাগও নেই, কোন দ্বেষও নেই। যে যেমন সে ঠিক তেমনি আকৃতি এক বৰ্ণ নিষে আমাদেৰ চোখেৰ সামনে আসে, আৰ চোখ তাকে তেমনি ভাবেই গ্ৰহণ কৰে। যদি মনে কাবও ওপৰে প্ৰিয়তা বা কাবও ওপৰে অপ্ৰিয়তাৰ ভাব আসে তাতে বেচাৰি চোখেৰ কি দোষ ? তাৰ কোন দোষ নেই। ও তো প্ৰণালী মাত্ৰ। তা দিয়ে নোংৰা জল প্ৰবাহিত কৰ, নিৰ্মল জল ওৰ ভেতৰ দিবে নিষে যাও। বা কিছু প্ৰবাহিত কৰ। সে তো মাধ্যম মাত্ৰ। তাৰ কোনও দোষ নেই। প্ৰিয়তা বা অপ্ৰিয়তাৰ ভাব, বাগ বা দ্বেষ—এ সবই আসে মনেৰ পথ দিয়ে, সংস্কাৰেৰ তথা ধাৰণাৰ পথ দিয়ে। আমাদেৰ মনে যে লোকেৰ সন্মুখে যে ধাৰণা জমে আছে, যে চোখে আমবা তাকে দেখেছি তদনুসাৰে আমাদেৰ দেখাৰ সঙ্গে সূক্ষ্ম ভাবে ধাৰণাৰ ভৰঙ্গ তথা আমাদেৰ মনেৰ ভৰঙ্গ এসে মিলিত হয়। তাৰ পৰে আৰ চোখেৰ কোন কাজ থাকে না। তাৰ পৰে আমবা চোখ দিয়ে দেখি না। দেখি সংস্কাৰ দিয়ে, ধাৰণা দিয়ে, তথা মন দিয়ে।

প্ৰতিসংলীনতা তথা সংযমেৰ এই হল অতিশয় মহত্বপূৰ্ণ সূত্ৰ—ইন্দ্ৰিয়েৰ কাছ থেকে ইন্দ্ৰিয়েৰ কাজ নাও, অস্ত্ৰ কোন কাজ নিও না। এই হল সংযমেৰ সূত্ৰ।

আমি কপাস্তবণেৰ সূত্ৰেৰ আলোচনা কৰছি। আমবা অবশ্যই

বদলাতে চাই। প্রত্যেক মানুষই যে বদলাতে চায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে ক্রোধপ্রবণ, সে চায় তাব স্বভাব বদলাতে। যে পবনিন্দাপ্রবণ, সে চায় তাব স্বভাবের পৰিবৰ্তন কৰতে। যে খাঙ-লোলুপ, সে-ও চায় আপন স্বভাবের পৰিবৰ্তন। তাৰা মন থেকে ইচ্ছা কৰুক বা বাধ্য হয়ে কৰুক, তাৰা সবাই পৰিবৰ্তন চায়।

কিন্তু বাস্তবে কাৰও অভ্যাস বা স্বভাব বদলায় না। খুব কম লোকেই নিজে নিজের স্বভাব পৰিবৰ্তিত কৰতে পাবে। তাৰা জানে ঐ সব কাজ খাবাপ। তাৰা ঐ সব কাজ খাবাপ বলে মানে। তাৰা ঐ সব অভ্যাস ছাড়তে বা বদলাতে চেষ্টা কৰে। কিন্তু তাৰা সেগুলি ছাড়তে বা বদলাতে সক্ষম হয় না। কেন? ঐ বকম হয় কেন? এ একটি মন্ত বড় প্রশ্ন। এব উত্তৰ দিতে অস্ত্রের গভীৰতাৰ নামতে হবে। আমি এ কথা স্বীকাৰ কৰি যে সাধনাৰ অস্ফল সফলতাৰ মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূৰ্ণ সফলতা যে, আমবা এ প্ৰশ্নের উত্তৰ পেতে সক্ষম হই। লোকে পৰিবৰ্তিত হতে চায় অথচ তাৰা বদলাতে পাবে না কেন? এই প্ৰশ্নের উত্তৰ সাধনাৰ ভূমিকা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নহ। একমাত্র সাধনাৰ ভূমিকাতেই আমবা এই প্ৰশ্নের সমাধান কৰতে পাৰি।

আমবা স্বাসেব প্ৰবোগ কৰে থাকি। স্বাসকে ভেতৰে নিয়ে যাবাব চেষ্টাব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতৰে নিয়ে যাবাব চেষ্টা কৰি। কেন এ বকম কৰি? আমবা কেন একাগ্ৰতাৰ অভ্যাস কৰে থাকি? এ কথা আমাদেব বুঝতে হবে। আমবা কাজ কৰে চলি, কিন্তু কেন কৰি?

আমাদেব দুই শৰীৰ আছে—স্থূল শৰীৰ আৰু সূক্ষ্ম শৰীৰ। আমাদেব চেতনাৰ অনেক স্তৰ। এক হল মনের চেতনা, অৰ্থাৎ চেতনাৰ মানসিক স্তৰ। আৰু একটি অধ্যবসায়েৰ স্তৰ। মন এক, অধ্যবসায়েৰ অনেক। অধ্যবসায়েৰ অৰ্থ, সূক্ষ্ম চেতনা। সূক্ষ্ম চেতনাৰ স্তৰ অসংখ্য। তা অতিশয় গভীৰতাৰ প্ৰতিষ্ঠিত। আমাদেব স্থূল মনের কাছ তা প্ৰীতিকৰ নহ, আমাদেব জাগ্ৰত মনের পক্ষে তা

প্ৰীতিকৰ নথ। তৎক্ষণাৎ আমবা প্ৰভাবিত হুমে পড়ি আৰ চিন্তা কৰি
 যে, এসব ত্যাগ কৰতে হুবে। মনে মনে ত্যাগেব সঙ্কল্প কৰি। মমে
 বকন, আমবা চা পান কবাব অভ্যাস ত্যাগ কৰাব সঙ্কল্প কবলাম।
 যখনই সকাল হল, জলখাবাবেব সময় এল, চা মাখায় চড়ে বসল। মাখায়
 চেপে বসে চলতে আবন্ত কবে। চা পানেব জন্ত আকুলতা বাড়তে থাকে।
 চা পানেব অভ্যাস ত্যাগ কবাব ইচ্ছা হুয়েছিল। কিন্তু চা আমাদেব
 সান্নানে এলে আমবা ভাবি, যাক গে, আজ তো খাই। কাল থেকে
 ছাডব। একদিনে কি যাবে আসবে? পবেব দিন চা এলে একই প্ৰশ্ন
 ওঠে এবং মন একই ভাবে সমাধান কবে। এই বকম দিনেব পব দিন
 চলতে থাকে।

বাজা ভ্রমণে বেবিযেছেন। তিনি এক বাগানে এলেন। মন্ত্ৰী তাঁকে
 সাবধান কববাব জন্ত বললেন, ‘মহাবাজ। আপনি আম গাছেব
 তলায় বসবেন না। আপনাব আম খাণ্ডা নিষেধ, এমন কি আম
 গাছেব তলায় বসাও নিষেধ। বৈজ্ঞ বলেছেন আপনি আম খেলে
 বাঁচবেন না, মবে যাবেন। আপনি যদি আম হাতে নেন তবে মনে
 কববেন যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে হাতে নিয়েছেন। আপনাব পক্ষে আমেব
 অৰ্থ মৃত্যু।’

বাজা মনে মনে চিন্তা কবলেন—এ কি বকম বৈজ্ঞ? এত কড়া?
 এত নিষেধ। আম গাছেব ছায়া বেশ ঘন। আম গাছেব নিচে বসতে
 কি দোষ আছে? আম খাণ্ডাতে দোষ হওযাব সম্ভাবনা থাকতে পাবে,
 আম গাছেব ছায়াতে কোন দোষ থাকতে পাবে না। বাজা আম
 গাছেব ছায়ায় বসলেন। পাকা আমেব গন্ধে তাঁব মন ভবে গেল। তাঁব
 জিভে জল এসে গেল। এই সময়ে দমকা হাণ্ডাব শ্ৰোত এল।
 গাছ থেকে একটি আম বাজাব কোলে পড়ল। বাজা সেটা ছুঁলেন,
 হাতে তুলে নিলেন। শুঁকলেন। তাব মনমাতানো বড় আৰ মিষ্ট গন্ধ।
 মন্ত্ৰী বললেন—মহাবাজ। ও আপনি কি কবছেন? আপনি কি
 নিজেব মৃত্যু ডেকে আনছেন? আমটি দূবে ছুঁড়ে ফেলে দিন। বাজা

হাসতে হাসতে বললেন—তুমি তো বড়ই অবিশ্বাসী। দেখাতে আব শোঁকাতে বিপদ কোথায়? আমি এটি খাব না। বাজা আমটি বাব বাব শুঁকতে লাগলেন। মন মিষ্ট গন্ধে ভবে গেল। শুঁকতে শুঁকতে তিনি আমটিকে চুষতে লাগলেন। বড়ই মিষ্ট বস। মন্ত্রী তাঁব হাত চেপে ধবলেন। বাজা বললেন—মন্ত্রী, বৈজ্ঞব অনেক ভয় দেখায়। একটি ভাল আম চুষলে মানুষ কি কবে মবে যেতে পারে? আমি তো শুধু শুঁকছি, খাচ্ছি না। তুমি চিন্তা কবো না। মন্ত্রী নিষেধ কবতে লাগলেন, আব বাজা গোটা আমটি চুষলেন। কিছু দিন পবে বাজা বেগপ্রস্তু হষে মাৰা গেলেন।

লোকে জেনেশুনেও ছাড়তে পারে না কেন? হাত থেকে পড়ে বাওবা কাঁচের গ্লাসেব মত তোমাদেব সঙ্কল্প ভেঙ্গে যায়, চূর্ণবিচূর্ণ হযে যায়। তাব কাৰণ ঐ সমস্ত সঙ্কল্প আমাদেব শুল চেতনাৰ স্তবে, আমাদেব জাগ্রত মনেব স্তবে ঘটে। সঙ্কল্প কবে জাগ্রত মন, আব বিল্ল আসে অন্ত কোন জাযগা থেকে। ব্যাধি কোন এক জাযগায়, আব আমবা চিকিৎসা কবি অন্ত কোন জাযগায়।

এক জনেব চোখে ব্যথা শুক হল। সে বৈজ্ঞব কাছে গেল। বৈজ্ঞ বললেন—এই বড়ি নাও। এটিকে ঘসে চোখে কাজলেব মত লাগিয়ে দিও। হুদিন পবে বৈজ্ঞ বোগীব বাড়িতে এলেন। তিনি দেখলেন বোগী বড়িটি ঘসছে পিঠেব ওপবে। বৈজ্ঞ জিজ্ঞাসা কবলেন—তুমি কি কবছ? ঐ ওষুধ তো চোখেব জন্ত। তুমি ওটা পিঠে লাগাচ্ছ কেন? সে উত্তব দিল—কি কবব? প্রথম দিন চোখে কাজলেব মত লাগিয়েছিলাম, কিন্তু খুবই জ্বালা কবল। তখন আমি ভাবলাম, যাক গে। চোখে যদি না সয, তবে পিঠে ঘসে দিই। কি আব তফাৎ হবে।

আমবাও ঠিক এই বকম কবে থাকি। কোথায় বোগ হয, আব কোথায় আমবা ওষুধ লাগাই। ব্যাধি শূন্য চেতনায়, কর্ম শবীবে তথা বাসনা শবীবে, আব আমবা চিকিৎসা কবি শুল মনেব, জাগ্রত মনেব, তথা শুল শবীবেব। এই মনেব ঐ কাজ নয। যেখানে সমস্ত আকাজকা

এক বাসনাব বাস, যেখানে তাদের শ্রোত বসে যাচ্ছে, তাব নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় মলিন হতে পাবে, আবার নির্মলও হতে পাবে। অধ্যবসায়ের মলিনতা বা নির্মলতাব আধাবে ভেতরের সব কিছু কাজ চলে। আমবা কেবল স্থূল মনের পবিচৰ্চা কবতে থাকি, জাগ্রত মনের সেবা কবতে থাকি। সাবা জীবন আমবা পবিচৰ্চা কবে চলি। কিন্তু বোগ কখনও নিবামষ হয় না। আমবা ভাবি, এক চেষ্টা কবাব পবেও বোগেৰ শেষ হল না। যে গ্রামীণ ফুঁ দিযে বিজলি বাতি নেভাতে চেয়েছিল আমবা ঠিক তাব মত। ফুঁ দিলে বিজলি বাতি নিভবে না। বোগ সাববে না।

আমবা যেন স্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতবে নিবে যাই, যাতে অবচেতন মনের ছবাব খোলা সম্ভব হয়, স্থূল শবীব এবং সূক্ষ্ম শবীবের মধ্যে যে প্রাচীর আছে তা ভাঙতে পাৰি, তাদের মাঝখানে এমন এক ছবাব বানাতে পাৰি যা দিযে সোজাসুজি স্থূল মন থেকে সূক্ষ্ম মনে, স্থূল শবীব থেকে সূক্ষ্ম শবীবে চলে যেতে পাৰি। আমবা যদি মধ্যবৰ্তী প্রাচীর ভাঙতে পাৰি, মধ্যবৰ্তী ছবাব থুলতে পাৰি তবে তা সাধনাব এক বিবাট বড় উপলব্ধি হবে।

এই দবজা খোলাব যে সাধনা তাব নাম একাগ্রতা। দূবন্ধকে অতিক্রম কবাব সাধনাব নাম একাগ্রতা। আমবা যত বেশি একাগ্রতাব অভ্যাস কবতে পাবব তত বেশি পরিমাণে আমবা এই ব্যবধান দূব কবতে সমর্থ হব। যেমন যেমন আমাদের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে তেমন তেমন আমাদের স্থূল মন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে আব সূক্ষ্ম মনের কাজ কবাব সুযোগ মিলবে। সূক্ষ্ম মন সক্রিয় হবে। দবজা খুলে যাবে। যেমন আমাব বিচাবশূন্যতা বৃদ্ধি পাবে তেমন এত জোৰে ধাক্কা লাগবে যে সূক্ষ্ম মনের দবজা খুলে যাবে। যখন আমবা স্বাসেব গতি বুঝতে পাবব, স্বাসেব গতি মুছ কবতে পাবব, তখন ঐ মুছ স্বাস এত শক্তিশালী হবে যাবে যে তাব ধাক্কাব সেই দবজা খুলে যাবে। আমাদের স্থূল জগতের বিশ্বাস, যা স্থূল তা অতিশয়-শক্তিশালী। কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের

বিশ্বাস এব একেবাবে বিপৰীত। যা সূক্ষ্ম তাতেই শক্তি। আধুনিক
আণবিক তত্ত্ব এই কথাৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰে দিছে। আজকাল এই
বিশ্বাস হৈছে যে, স্থুলে কোন শক্তি নাই, শক্তি সূক্ষ্মতায়। এক প্ৰাচীন
শ্লোকে এই তথ্যৰ সুন্দৰ অভিব্যক্তি বৈছে—

হস্তী শূলবপুঃ স চাক্ষুশবশঃ কিং হস্তিমাঽন্ধুশঃ ?

দীপে প্ৰজ্জ্বলিতে, বিনশ্চতি তমঃ কিং দীপমাত্ৰং তমঃ ?

বজ্জেনাপি হতাঃ পতন্তি গিবয়ঃ কিং বজ্জমাত্ৰো গিবিঃ ?

তেজো যন্ত বিবাজতে স-বলবান্ স্থুলেষু কঃ প্ৰত্যয়ঃ ?

[হাতি বিশালদেহ, কিন্তু অন্ধুশেব বশ। তবে কি হাতি অন্ধুশ-
মাত্ৰিক, অৰ্থাৎ হাতিৰ শক্তিৰ মাপ কি অন্ধুশেব দ্বাৰা হবে ? দীপ জ্বললে
অন্ধকাৰ দূৰীভূত হয়, তবে কি অন্ধকাৰ দীপমাত্ৰিক ? বজ্জেব দ্বাৰা
আহত হবে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, তবে কি পাহাড় বজ্জমাত্ৰিক ? যাতে
তেজ নিহিত আছে সেই বলবান, স্থুলে কোনও প্ৰত্যয় নাই।]

হাতি মস্ত বড়, কিন্তু সে ছোট জিনিস অন্ধুশেব অধীন। দীপ
জ্বললে অন্ধকাৰেব সমাপ্তি ঘটে। কিন্তু দীপ থেকে অন্ধকাৰ বত
বিশাল। দীপ ছোট জিনিস, অন্ধকাৰ মস্ত বড় জিনিস। কিন্তু
অন্ধকাৰ বেশি শক্তিশালী নয়, দীপ বেশি শক্তিশালী। পৰ্বত অতিশয়
উচ্চ, বিবাট জিনিস। বজ্জ ছোট জিনিস। কিন্তু বজ্জ পৰ্বতকে
চূৰ্ণবিচূৰ্ণ কৰে ফেলতে পাৰে। শক্তি স্থূল আধাবে থাকে না, সূক্ষ্ম
আধাবে থাকে। শক্তি বড় জিনিসে থাকে না, ছোট জিনিসে থাকে।
যাব তেজ আছে সে বলবান। আকাৰে ছোট হলে কি আসে যায় ?

স্থূল হওয়া, বিবাট বড় আয়তনেৰ হওয়া, কোন বিশেষ মহত্বের
সূচক নয়। আজকাল সূক্ষ্মেব শক্তিতে প্ৰত্যয় বেড়ে চলেছে।

কাজেই আমাদেব স্থূল শবীৰ থেকে সূক্ষ্ম শবীৰেব দিকে যাওয়াব
জ্ঞাত বিশেষ প্ৰয়ত্ন কৰতে হবে। আমবা যেন স্থূল চেতনা থেকে সূক্ষ্ম
চেতনাৰ দিকে যাই। সূক্ষ্ম শবীৰকে, সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগিয়ে তুলি।
এই জ্ঞানই আমাদেব সমস্ত প্ৰক্ৰিয়া তথা অভ্যাসেব প্ৰয়োজন।

আমবা আজকেৰ দিনে যে প্ৰযত্ন কৰছি সে শুধু অন্ধকাৰে ঢিল
 ছোঁড়া নয। আমবা জেনে এং বুঝে চেষ্টা কবব। আমাদেব পক্ষে
 তাব নিশ্চিত প্ৰযোজন আছে। আমবা জানি কেন আমবা ঐ বকম
 প্ৰযত্ন কবি। তাব পেছনে আছে আমাদেব এক গভীৰ প্ৰযোজন, সেটি
 হল—আমবা যেন স্বাসেব আলস্থন, তথা এক স্থূল আলস্থন নিয়ে চলি।
 স্থূল আলস্থনেব সাহায্যে, স্বাসেব সাহায্যে মনকে এমনভাবে তৈবি কবে
 নিই যাতে মন ভেতবে যায়, গভীৰে অবতৰণ কবে। মনেব এই গভীৰতায়
 অবতৰণ কৰাব অভ্যাস আমাদেব হাবিষে গিয়েছে। আমবা এই স্বাসেব
 আলস্থন দ্বাৰা আবাব মনেব সেই স্বভাব তৈবি কৰছি, মনেব সংজ্ঞাব
 উৎপন্ন কৰছি। তাব পৰিণাম এই হবে যে ভেতবে যেতে থাকলে,
 দেখতে থাকলে এক গভীৰে অবতৰণ কবলে এমন এক ধাক্কা লাগবে যে,
 স্থূল চেতনা এং সূক্ষ্ম চেতনাৰ মধ্যবৰ্তী সেই দুযাব খুলে যাবে। তখন
 আমবা জানতে পাবব অভ্যাস বদলানো যায়, স্বভাব বদলানো যায়,
 দোষেব যে শ্ৰোত বযে যাচ্ছে তাকে বোধ কবা যায়। দোষেব
 জড উজাড হযে গেলে দোষেব সমাপ্তি ঘটে। স্থূল মনে বাব বাব সঙ্কল্প
 আবৃত্তি কৰাব কোন প্ৰযোজন হয় না।

হুল থেকে সূক্ষ্ম

সত্যেব সন্ধান। কথাটি বড় প্রিয়। ‘সত্য’ কথাটি নিজেই বড় প্রীতিকর। কিন্তু সত্যেব সন্ধান বিশেষ জটিল ব্যাপার। সত্য যখন এত বড়, এত বিবীট তখন তাব সন্ধান নিশ্চয়ই সামান্য ছোটখাটো ব্যাপার নহ। আমবা সত্যেব অন্বেষণ কবাব সঙ্কল্প কবেছি। আমাদেব মনে সত্যান্বেষণেব ভাবনা জেগেছে। আমবা সঙ্কল্প গ্রহণ কবেছি। কাবণ সত্যেব সন্ধান না কবলে, যথার্থকে না বুঝলে, কোন লোক ঠিক কাজ কবতে পাবে না। পৃথিবীতে যত উচিত কাজ হযেছে সে সবই সত্যেব সন্ধানেব পবে হযেছে। যেখানে সত্যেব চৰ্চা হয় না সেখানে সব কাজই ভ্রান্তিপূৰ্ণ হবে থাকে। আমবা অল্প সময়েব মধ্যে সত্যেব স্বৰূপ উপলব্ধি কবব, এ কি সম্ভব? সত্য অত্যন্ত মহৎ বস্তু এবং তাব সন্ধান পেতে হলে বিশেষ প্রয়ত্ন কবা প্রয়োজন। যদি আমাদেব অভ্যাস ভ্রান্তিহীন হয়, আমবা যা কিছু কবি তা যদি প্রমাদমুক্ত হয়, যদি তাব প্রতি আমাদেব নিষ্ঠা থাকে, যদি আমবা সত্যেব সাথে সাথে চলি, তবে আমবা সত্যেব স্বৰূপ অবশ্যই সন্ধান কবতে পাবব।

গুরুতেই আমবা বৃহৎ এবং বিবীট সত্যেব সন্ধান কবতে যাব না। কিন্তু আমবা সেই পৰিমাণ সত্যেব অবশ্য সন্ধান কবব যে পৰিমাণ

আমাদের সাধনার সহযোগী হতে পারে এবং যাব আধাবে আমরা বিনা নৈবাশ্বে, বিনা বাধায়, সাধনার পথে এগিয়ে যেতে পাবব। এই পবিমাণ সত্য আমাদের জ্ঞানতে হবে, ধোঁজ কবতে হবে। এই পবিমাণ সত্যও যদি ধোঁজ করা না যায় তবে সাধনার পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে না। পদে পদে বাধা আসবে—সন্দেহেব বাধা, অবিশ্বাসেব বাধা, মুর্থতােব বাধা। আমরা না ভেবেচিন্তে, না বুকেমুখে কাজ কবে চলি, বলে কিছুই মেলে না। এই সমস্ত বাধা পদে পদে আসতে থাকে, তােব কােবণ যে সত্যেব অনুভূতি, যে পবমার্থেব সাধনা আপনােব হওয়া উচিত তা হয় নি। তােব জ্ঞান আপনােব মনে ঐ বকম তীব্র প্রেবণা আসা সম্ভব নয়।

একশ' ডিগ্রি উত্তাপে জল বাষ্পে পবিণত হয়। তােব কম উত্তাপে জল বাষ্পে পবিণত হয় না। জলকে বাষ্পে পবিণত কবতে হলে তাকে একশ' ডিগ্রি উত্তাপ পর্যন্ত পৌছতে হবে। ঐ তাপমাত্রায় না পৌছনো পর্যন্ত ঐ পবিবর্তন ঘটবে না। সেই বকম সত্যেব যতটা উত্তাপ, যতটা তাপমাত্রা প্রযোজন, সেই পবিমাণ তাপমাত্রা আমাদের মিললে তবেই আমাদের পবিবর্তন সম্ভব হয়। তখনই শুধু ঐ পবিবর্তন সম্ভব হয়। তা না হলে সম্ভব হয় না।

সাধনােব পথে বহু বাধা আসে। সে সমস্ত বাধা আসে আমাদের শবীব থেকে। শুধু স্থূল শবীব থেকে বাধা আসে তাই নয়, সূক্ষ্ম শবীব থেকে বাধা আসে। সাধনােব পথে কিছু দূেব অগ্রসব হওয়ােব পবে সবােব থেকে বড় বাধা আসে আমাদের বিদ্যােব শবীব থেকে, তৈজস শবীব থেকে।

তৈজস শবীবেব, তথা বিদ্যােব শবীবেব চমকপ্রদ শক্তি আছে। তােব নানা বকম বাহাছুবি দেখানোেব ক্ষমতা আছে।

আমরা কলকাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে এক বিজ্ঞানকক্ষেব সামনে গেলাম। বন্ধ দবজা আপনা আপনি খুলে গেল। ভেতবে গেলাম, বিজলি বাতি জলে উঠল। পাখা চলতে লাগল। কিন্তু

ভেতৰে কেউ ছিল না। কোন লোক ঐগুলিকে সঞ্চালিত কৰে নি। ঐ সবই আপনা আপনি চলেছে। এই হল বিদ্যুতৰ বাহাহুবি, বিজুলিৰ কেবামতি। আনাদেব তৈজস শৰীবেৰ ঐ বকম বহু কেবামতি আছে। লোকে বলে—ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক, কাৰণ এঁৰ চেহাৰায জ্যোতি আছে। এত জ্যোতি যে মনে হয় তেজ বেন ঠিকৰে পড়ছে। এত বড় সাধক যে তিনি নাটি থেকে ওপৰে উঠে বান। এত বড় সাধক যে হাত থেকে বিভূতি ঝৰে পড়ছে। এত বড় সাধক যে হাত বাডালেই মিষ্টি, আতৰ, ফল সব এসে যায়। মিষ্টি খাও, আতৰ লাগাও, ফল খাও। এ সবই আনাদেব তৈজস তথা বিদ্যা শৰীবেৰ কেবামতি। এ সবই আনাদেব প্রাণশক্তিৰ চমৎকাৰিতা, আনাদেব বিদ্যাৎ এবং তৈজস শৰীবেৰ খেল। সাধক এই সবে আবদ্ধ হব পড়ে। আমি এ কথা বলতে চাই না যে এগুলি বিষয়কৰ নথ। আমি বলতে চাই যে এগুলি আধ্যাত্মিক ব্যাপাৰ, কেননা এগুলি স্থূল শৰীবেৰ দ্বাৰা সংঘটিত নথ। কিন্তু এগুলি আশ্চৰ্যজনক নথ।

আনাদেব সাধনাৰ সূত্র—বাগস্ দোবস্ য সংখ্যাং এগন্ত নোঙ্গং সগুৰেই নোঙ্গং—বাগ এবং ছেৰ দ্বীণ হলে নোঙ্গ মিলে যায়। আমবা যে নোঙ্গপ্রাপ্তিৰ সাধনা কৰি, যে বাঁতবাগতাৰ সাধনা কৰি, তাত্ত বাগ এবং ছেৰ দ্বীণ হলে তৰে মুক্তি হওয়া সম্ভব। আনাদেব বাগ ও ছেৰ দ্বীণ হওয়া প্রয়োজন। এব নাম আধ্যাত্মিকতা। একেই চেতনাৰ জাগৰণ, তথা আত্মাৰ উৎক্ৰমণ বা উৎক্ৰাণ্টি বলে। এতে আত্মাৰ সমস্ত মলিনতা দূৰ হয়। চেতনা নির্মল হয়, আত্মাৰ সঙ্কে সাক্ষাৎকাৰ হয়। এবই নাম অধ্যাত্মেৰ সাধনা। একেই বলে নির্বাণ বা নোঙ্গেৰ সাধনা।

এই সাধনাৰ নান্যথানে বহু ছটিলতাপূৰ্ণ তথা কুটিলতাপূৰ্ণ বাধা আসে। তাত্ত সাধকেৰ পথ বদলে যায়। তাৰা বাহাহুবিৰ খেলাৰ নেমে পড়ে। তাঁব প্রতি সহসা লোকেৰ আকৰ্ষণও হয়। কিন্তু লোকেৰ আকৰ্ষণ থেকে বোকা যায় না। সাধকেৰ বাগ-ছেৰ দ্বীণ হয়েছ কিংবা হয় নি। সাধকেৰ বাগ-ছেৰ দ্বীণ হয়েছ কিনা সে বিষয়ে জনতাৰ

কোন মাথাব্যথা নেই। তাতে তাদের কোন লাভ নেই। জনতা দেখে, সাধক ভূমি থেকে ওপরে উঠতে পাবেন কিনা, সম্ভান দিতে পাবেন কিনা, ধন দিতে পাবেন কিনা, অদৃশ্য হতে পাবেন কিনা, আকাশে উড়তে পাবেন কিনা, হাতেব ইশাবাষ বাঙ্কিত বস্তু নিয়ে আসতে পাবেন কিনা, লোহাকে সোনাষ পৰিণত কৰতে পাবেন কিনা। যদি সাধক এই সব কাজে নিপুণ হন তবে হাজাব লোক তাঁব প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাঁব প্রতি লোকেব আকর্ষণ বাড়তে থাকবে। সমস্ত আকর্ষণ হল ডেক্সিবাজিতে। বাগ-দেব ক্ষীণ হওয়া বা কমে যাওয়া সম্বন্ধে কাবও কোন আকর্ষণ নেই।

বিজলিতে চমৎকাবিদ্ধ আছে। লোকেব তাব ওপরে আকর্ষণ আছে। তা থেকে আলো পাওয়া যায়, গবম ও ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। আবও নানা কাজ বিদ্যতেব দ্বাবা হয়। তাব প্রতি লোকেব প্রচণ্ড আকর্ষণ।

আমাদেব শবীবও একটি বিজলি স্বব। তা সম্পূর্ণভাবে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। আমবা চিন্তা কবলে আমাদেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আমবা শাস্ত অবস্থায় থাকলেও বিদ্যুৎ তৈবি হয়। ধ্যানেব সময়ে পর্যন্ত বিদ্যুৎ জন্মায়। প্রযুক্তি কম কবলেও আমাদেব মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ জন্মায়, আলফা কিবণ উদ্ভূত হয়। চিন্তা কবাব সময়ে আলফা কিবণ উৎপন্ন হয় না, শাস্ত অবস্থায় তাব উদ্ভব হয়। ধ্যানেব অবস্থায় আমাদেব মস্তিষ্কে বিজলি তৈবি হয়, কিংবা আমবা যখন সহজ শাস্ত অবস্থায় থাকি তখন আমাদেব দেহে বিদ্যুতেব তবঙ্গ জন্মায়, এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। ঐ সবই বিদ্যুৎ। অনেক লোকে বলে, ‘আজ বিশেষ শাস্তিব অনুভূতি হচ্ছে।’ আমি বুঝতে পাবি, ঐ অনুভূতিও কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয়। শাস্তিব অনুভূতি হযেছে—তাব অর্থ, আপনাব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব তবঙ্গ প্রবাহিত হযেছে এবং তাব ফলে আপনাব শাস্তি মিলেছে।

এক বৈজ্ঞানিক একটি গবেষণামূলক প্রযোগ কবলেন। তিনি

মাটিৰ ওপৰে তামাৰ জাল বিছালেন এবং তাৰ ওপৰে একটি লোককে বসিয়ে দিলেন। ঐ লোকটিৰ শৰীৰে তিনি তামাৰ তাৰ লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁৰ শৰীৰেৰে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতৰ সংযোগ কৰে দিলেন। লোকটি শান্ত হুযে গেল। তাৰ অপূৰ্ব শাস্তিৰ অনুভূতি হল। সম্ভবত সে তখন চিন্তা কৰে, নিবন্তৰ ধ্যানমগ্ন লোক বত দীৰ্ঘকাল ধ্যান কবলে তৰে এই শাস্তিৰ স্থিতিতে পৌছতে পাৰে। আপনি জিজ্ঞাসা কবতে পাবেন, যখন তামাৰ তাৰ থেকে এত শাস্তি মেলে তখন আমবা তাৰেৰে প্ৰয়োগই কবব। একেবাবে শান্ত হুযে যাব।

সান্টাৰ নামে এক আমেৰিকান বৈজ্ঞানিক এই বিষয়ে অনেক প্ৰয়োগ কৰেছেন। তাঁৰ মনে এক বিকল্প চিন্তা এল। মানুষ ধ্যান কবলে শান্ত হুযে যায়। তৰে কি মানুষেৰ মস্তিষ্কে আলফা কিৰণেৰে তবঙ্গ উদ্ভূত হয়, পশ্চৰ মস্তিষ্কে হয় না? জানোযাবেৰে মাথায় কি আলফা তবঙ্গ তৈৰি হয় না? এই বিকল্প চিন্তা মনে আসতেই তিনি প্ৰয়োগ শুক কৰে দিলেন। একথা স্বীকাৰ কবতে হয় যে, সহজ শান্ত তাৰ থেকে আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ তবঙ্গ অশু ভাবে তৈৰি কৰা যায় না। কিন্তু যখন কোন যোগী বা ধ্যানী ধ্যানেৰে প্ৰয়োগ দ্বাৰা আলফা কিৰণেৰে তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন তখন বৈজ্ঞানিকবা এবং চিকিৎসকবা আশ্চৰ্য হুযে যান। দিল্লি মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটেৰে একদল ডাক্তাৰে পৰীক্ষা কৰে দেখেছেন, ধ্যানী নিজেৰে ইচ্ছাৰে আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কবেন বা তাকে বোধ কবেন। আবাৰ উৎপাদন কবেন, আবাৰ বোধ কবেন। সেই সব বিজ্ঞানীদেৰে জানা ছিল না, প্ৰযত্ন দ্বাৰা আলফা তবঙ্গ সৃষ্টি কৰা সম্ভব হয়। প্ৰথমে তাঁৰা স্বীকাৰ কবেন নি। শুকতে তাঁৰা মনে কৰেছিলেন যে, মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ সহজভাবে উৎপন্ন হয়। সান্টাবেৰে মনে প্ৰশ্ন জেগেছিল, জানোযাৰে কি ধ্যান কবতে পাৰে? তাৰেৰে মস্তিষ্কেও কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হতে পাৰে? তাৰেৰে মস্তিষ্কে কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন কৰা যেতে পাৰে? তিনি একটি বিভালেৰে ওপৰে পৰীক্ষা কবলেন। একটি বিভালকে অনাহাবে বেখে

তাকে বিছাভেব শক বা থাক্কা দেন। যেমন যেমন বিড়ালেব ওপাবে বিছাৎ প্ৰাৰোগ কৰা হল তেমন তেমন সে শান্ত হযে গেল, আৰ তাৰ মস্তিষ্কে আলফা তৰঙ্গ উৎপন্ন হল। আলফা তৰঙ্গ উৎপন্ন হওযাব পবে বিড়ালটিকে দুধ এৰ মিশ্টি খেতে দেওয়া হল। বিড়ালটি দুধ এৰ মিশ্টি খেল। এই পালা চলতে থাকল। প্ৰতিদিন আলফা তৰঙ্গ উৎপন্ন হওযাব পবে বিড়ালটিব দুধ ও মিশ্টি মিলতে লাগল। কিছুদিন পবে বিড়াল এই কথা বুঝে গেল যে, শান্ত এৰ স্থিৰ হযে গেলে দুধ এৰ মিশ্টি মেলে। সে শান্ত থাকতে আবন্ত কবল, ধ্যান শুক কবল। যখন তাৰ খাওয়াব ইচ্ছা হয় তখন সে একেবাবে শান্ত হযে চোখ বন্ধ কৰে দাঁড়িয়ে থাকে। আলফা তৰঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে। তাৰ মিশ্টি আৰ দুধ মিলে যায়। ঐ বিড়াল ধ্যান কৰতে, শান্ত হতে শিখে গেল।

এ থেকে এই তথ্য নিৰ্গলিত হয় যে, শান্ত বৃত্তি দ্বাৰা আপনাব মস্তিষ্কে আলফা তৰঙ্গ উৎপাদন কৰা সম্ভব হয়। তা বিছাভেবই চমক, কোনও আধ্যাত্মিক বিষয় নয়। এ এক পৰিণাম। যখন আমবা শান্ত থাকি, শবীৰ শিখিল হয়, উত্তেজনা থাকে না এৰ মৌন থাকি, তখন ঐ শান্ত অবস্থায় আলফা তৰঙ্গ উৎপন্ন হয়। আমাদেব শবীবেব স্বৰ্ণজাত বিছাৎ এৰ মস্তিষ্কেব বাবাবাহিক বিছাৎ—এই দুই প্ৰকাৰ বিছাৎ নিবন্তব সম্ভবমান এৰ তাৰা এত বকম ক্ৰিয়া কৰতে থাকে যে, সাধনাব পথে চলতে চলতে তাৰ মাঝে বিড়ালেব জগতেব অবস্থা এসে যায়। ঐ বকম অবস্থায় আমবা ভেবে বসি যে আমবা অনেক শান্তি প্ৰাপ্ত হযেছি। লোকে পাঁচ-দশ দিন শিবাবে থাকে। আমি তাৰেব বলতে শুনেছি—‘আহা, আমবা কত আনন্দে আছি। আমবা কত শান্তি পাচ্ছি।’ শিবাব শেষ হলে তাৰা যখন আবাব আপন আপন ব্যক্তিগত জীবনেব কৰ্মকাণ্ডেব মধ্যে এসে পড়ে, তখন তাৰেব আবাব ক্ৰোধ কৰতে দেখা যায়, লড়াই কৰতে দেখা যায়, গালাগালি দিতে দেখা যায়। তাৰেব শান্তিৰ অনুভূতি কোথায় যায়, কোথায় অদৃশ্য হযে

যায়, তাব পাভাও পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতি থেকে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে ঐ আনন্দের তথা শান্তিৰ অনুভূতি ভ্রম মাত্র ছিল। তা কেবল উপবিগত ভাসা ভাসা অনুভূতি ছিল। ঐ বকম অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদেব সাবধান থাকা প্রযোজন, কাবণ তা কেবল ওপবেব ব্যাপাব।

প্রবৃত্তিৰ দ্বাবা চালিত হয়ে আপনাকে বহু পবিশ্রম কবতে হয়। আপনাব শবীব ক্লান্ত হয়। আপনি বিশ্রাম কবেন এবং ক্লান্তিৰ স্থিতি-কালে গভীব নিদ্রায় গভীব মগ্ন হয়ে থাকেন। এক বা দু ঘণ্টা বাদে আপনি যখন জাগেন তখন আপনি অনুভব কবেন আপনাব শবীব সতেজ হয়েছে এবং আপনি অনেক শান্তি পেয়েছেন। এ স্বাভাবিক ব্যাপাব। মানুষ যখন প্রবৃত্তিৰ ক্ষণে পৌছয়, বিশ্রামের ক্ষণে পৌছয়, তখন সে শান্তি অনুভব কবে। এ কোনও মৌলিক কথা নয। মূল কথা হল, যেখান থেকে শান্তিৰ ওঠা উচিত, সেখান থেকেই যেন ওঠে। এব জগত অল্প প্রযত্নেব প্রযোজন আছে, কিছু কবাব প্রযোজন আছে। শান্তিৰ তত্ত্ব, বিদ্যাভেব তত্ত্ব অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্ব। শান্তিৰ অনুভূতি হয়, আবও অনেক বিচিত্র অনুভূতি হয়। এ সব কিছু ব্যর্থ নয। আমি এ সব বিষয়কে নিবৰ্থক বলি না। মধ্য মার্গ কাপে, মধ্য বিশ্রাম কাপে এবংও উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমবা যেন এ বকম ভুল না কবি যে এই অবস্থা আমাদেব অন্তিম লক্ষ্য, আমাদেব অন্তিম গন্তব্যস্থল, আমাদেব সাধনাব অন্তিম সাধ্য। আমাদেব দৃষ্টি স্পষ্ট হওয়া প্রযোজন।

লোকে শক্তিপাতের কথা জানে। শক্তিপাত কি? তা বিদ্যাভেবই কেবামতি। যে লোক আপনাব শক্তি বা আপনার বিদ্যাভেব বিকাশ কবতে সমর্থ হয়েছে সে-ই শুধু অস্ত্ৰেব দেহে শক্তিপাত কবতে পাবে। তিনি অপব লোকেব মাথায হাত বাখেন এবং নিজেব উৰ্জা বা বিদ্যা-শক্তি তাব মধ্যে সংক্রমিত কবেন।

কোন কিছু দেওয়াব জগত আমাদেব ছুটি উপায় বা সাধনযন্ত্র আছে, হাত আব পা। গ্রহণ কবাব মহৎ সাধন মাথা। মাথাই সংগ্রহ কবে।

হাতের আঙ্গুল আৰ পা দেয়, মস্তিষ্ক গ্ৰহণ কৰে। পুনৰো পদ্ধতি অনুসাবে শিষ্য গুৰুৰ নিকটে এসে তাঁৰ পাৰে মাথা ঠেকায়। সে বিদ্যাং নিতে চায়। গুৰুৰ চৰণ বিদ্যাং দিতে থাকে একে তিনি যদি শিষ্যেৰ মাথায় হাত বাখেন, তবে দু দিক দিষে তিনি শিষ্যকে বিদ্যাং দিতে থাকেন—হাত থেকে এবং পা থেকে। হাত থেকে শিষ্যেৰ মস্তিষ্কে বিদ্যাং প্ৰবাহিত হতে থাকে, পা থেকেও তাৰ মস্তিষ্কে বিদ্যাং সঞ্চারিত হতে থাকে। দু দিক থেকেই শিষ্যেৰ বিদ্যাংপ্ৰাপ্তি হতে থাকে। মাথা বিদ্যাং গ্ৰহণ কৰাব সবচেয়ে মহৎ সাধন। তা দু দিক থেকে প্ৰবাহিত বিদ্যাং গ্ৰহণ কৰতে থাকে। আমবা আচাৰ্যেৰ বন্দনা কৰি, আৰ তাঁৰ পাৰে আমাদেৰ মাথা বাখি। আচাৰ্য নিজেৰ হাত শিষ্যেৰ মাথায় বাখেন। এদিকে পা থেকে বিদ্যাং দিছেন, ওদিকে হাত থেকে বিদ্যাং দিছেন। মাথা দুদিক থেকে আগত বিদ্যাং গ্ৰহণ কৰতে থাকে। এই বিদ্যাতে চমৎকাৰিতা আছে, শক্তি আছে। তাৰ উপযোগিতাও আছে। এ কথা বলা চলে না যে তা সব বকমেই উপযোগবিহীন। কিন্তু এই শক্তিপাত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নহ। এই ব্যাপাবেৰ মূল তত্ত্ব উপলব্ধি কৰতে হবে যে বাগ ও ছেৰ ক্লীণ না হলে, আধ্যাত্মিকতাৰ বিকাশ না হলে, চেতনা নিৰ্মলতা লাভ না কৰলে, বিকাৰেৰ শেষ হবে না এবং বুদ্ধিসমূহেৰ পৰিবৰ্তন হবে না। যা থেকে পৰিবৰ্তন আসাৰ কথা, তা ঘটবে না। এ থেকে শুধু মধ্য পথে স্থিত কতকগুলি তত্ত্বেৰ সন্ধান পাওয়া যেতে পাবে।

সাধনাৰ প্ৰাৰম্ভেই আমাদেৰ এই সত্য বুঝতে হবে, বাতে আমবা তৈজস শৰীৰেৰ তথা বিদ্যাং শৰীৰেৰ চোখ ঝলসানো দীপ্তিতে, তাৰ চমৎকাৰিত্তে বিভ্রান্ত হবে তাকেই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বলে মনে না কৰে বসি, তাকে সাধনাৰ উপলব্ধি বলে না মনে কৰি। তা মানসিক সাধনাৰ উপলব্ধি মাত্ৰ। একে যেন আমবা বাগছেবেৰ ক্লীণতা থেকে, বাতবাগতা থেকে উদ্ভূত উপলব্ধি বলে মনে না কৰি।

আমবা কোন বস্তুৰ পৰিবৰ্তন চাই। সে বিষয়ে আমবা যেন বাৰ বাৰ

স্মৃষ্ণু ভাবে ভেবে দেখি । ‘অপ্লনা সচ্চমে সেজ্জা মেত্তি ভূত্ৰস্ম কপ্প’ত্র’—
 আমাদের সত্যকে জানতে হবে, নিজেকে এমনভাবে পৰিৱৰ্তিত কৰতে হবে
 যাতে শত্ৰুতাৰ ভাব একেৰাৰে নষ্ট হ’ব পাৰে । এই লোককে আমি শত্ৰু
 মনে কৰি । নিজৰ ভুল, নিজৰ দোষ অস্ত্ৰেৰ ঘাড়ে চাপিয়ে দিহে মনে
 কৰি সে আমাৰ অনিষ্ট কৰেছে, সে আমাৰ এই বকম ক্ষতি কৰেছে ।
 এই বকম শত্ৰুতাৰ ভাব যেন আমাদেৰ মনে বাসা না বাঁধে । সে
 নিজেকে কিছু অনিষ্ট কৰেছে, কিছু দোষ কৰেছে, এ কথা কেউ মানতে
 চায় না । সমস্ত কিছু দোষ আমাৰ অস্ত্ৰেৰ ঘাড়ে চাপিয়ে দিহি । পাখৰ
 কি বকম এবড়ো খেবড়ো, আমাৰ ঠোকাৰ লেগে গেল । আমাৰ ভুলেৰ
 জন্তু আমাৰ ঠোকাৰ লেগেছে, এ কথা আমাৰ কখনও স্বীকাৰ কৰিব না ।
 আমাৰ বলৰ পাখৰ ঠিক জায়গায় ছিল না, সেই জন্তু আমাৰ ঠোকাৰ
 লেগেছে । দৰজা ছোট, সেই জন্তু আমাৰ মাথাৰ চোট লেগেছে । কিন্তু
 দৰজা ছোট জেনেও আমি নিচু হই নি বা মাথা নোয়াই নি, সেই জন্তু
 আমাৰ মাথাৰ আঘাত লেগেছে—এ বকম ভাবে কেউ চিন্তা কৰে না ।
 ও আমাৰ সঙ্গে এই বকম ব্যবহাৰ কৰেছে, ঐ বকম ব্যবহাৰ কৰেছে,
 আমাৰ বন্ধুকে বিগড়ে দিহেছে, তাকে ভুল বুখিয়েছে—এই বকম
 ভাবে আমাৰ সমস্ত দোষ অস্ত্ৰেৰ ঘাড়ে-চাপাই । আমাৰ অস্ত্ৰেৰ দোষ
 দেখি, আৰ অস্ত্ৰকে দোষী সাব্যস্ত কৰে নিজেকে দোষেৰ ভাগী হওৱা
 থেকে বাঁচাই । কিন্তু যিহা সত্যেৰ সন্ধান কৰেছে বা এখনও কৰেছে,
 তাৰা অস্ত্ৰেৰ ওপৰে দোষাবোপ কৰে না । তাৰা এ কথা স্বীকাৰ কৰে
 যে তাৰেৰ নিজেকেৰ মধ্যে ভ্ৰান্তি নানা প্ৰকাৰ বিকৃতি উৎপাদন কৰেছে ।
 সেই জন্তু তাৰা যাতে অপ্ৰমত্ত থাকতে পাৰে, জাগ্ৰত থাকতে পাৰে,
 সৰ্বদা সজাগ থাকতে পাৰে, তাৰ জন্তু প্ৰযত্ন কৰতে থাকে ।

আমাৰ বিবেচনাৰ শত্ৰুতাৰ অৰ্থ শুধু এই নহ যেন অন্ত কোন
 লোকেৰ ওপৰে বিদ্বেষ থাকবে, আৰ মিত্ৰতাৰ অৰ্থও এই নহ যেন শুধু
 অন্ত কোন লোকেৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম থাকবে । শত্ৰুতাৰ অৰ্থ, নিজৰ
 কৰ্তব্যপালনে ভুল কৰে অস্ত্ৰেৰ বৰ্তব্যে অবহেলা লক্ষ্য কৰা । এ এক

বকমেব শক্ৰতা । পাথৰেব সঙ্গো আমাদেব শক্ৰতা হুযে যায । আমবা
 পাথৰকেও গাল দিতে আবন্ত কৰি । পাত্ৰটি জলে পৰিপূৰ্ণ ছিল ।
 তাকে এক হাতে ওঠালাম । পাত্ৰটি ফেটে গেল । কিন্তু জলে ভৰ্তি
 পাত্ৰ এক হাত দিযে ওঠালে সেটি ফেটে যাবে, এ সত্য আমবা খুঁজে
 পাই না । এ কথা আমবা চিন্তাই কৰব না । আমবা বলব পাত্ৰটি
 এত কাঁচা ছিল যে সেটি ফেটে যাবে না তো কি হৰে ? এ তো ঐ
 বকম পাত্ৰেব অবশ্যস্তাবী পৰিশাম । নিজেৰে কৰ্তব্যপালনে ত্ৰুটিব দোষ
 থেকে বাঁচানোৰ জন্তু এই বকম কথাবাতীও এক বকম অন্ত্ৰেব প্ৰতি
 শক্ৰতা । অপৰ বস্ত সজীব বা নিৰ্জীব যাই হোক না কেন, মিত্ৰতাৰ
 অৰ্থ শুধু তাৰ প্ৰতি প্ৰেম বা প্ৰীতি নয । প্ৰেমও মিত্ৰতা বটে । কিন্তু
 বাস্তবে মিত্ৰতাৰ অৰ্থ, সবাৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা, যে যেমন তাকে সেই
 ভাবে স্বীকাৰ কৰা, কাৰও ওপৰে কিছু আৰোপ না কৰা । এন নাম
 মিত্ৰতা । একেই ‘অনাশাতনা’ বলে । জৈন সাহিত্যেব একটি গুৰুত্বপূৰ্ণ
 শব্দ—আশাতনা । জীবেব আশাতনা হয়, অজীবেবও আশাতনা হয় ।
 বাড়িষেব আশাতনা হতে পাবে, কাপড়চোপড়েও আশাতনা হতে
 পাবে । সব কিছু জিনিসেবই আশাতনা হতে পাবে । আমাদেব পক্ষেব
 ব্যাপক মনোভাব হল, আমবা সত্যেব সন্ধান কৰব, সবাৰ সাথে মিত্ৰতা
 কৰব । অৰ্থাৎ যে যেখানে যেমন আছে আমবা তাকে তাৰ সেই সহজ
 ভাবেই স্বীকাৰ কৰে নেব এবং কাৰও ওপৰে কিছু আৰোপ কৰব না ।
 এই হল সত্য । এই সত্য আমাদেব উপলব্ধি কৰতে হৰে । এই সত্য
 গ্ৰহণ না কৰতে পাবলে কোন বকম সাধনা কৰা সম্ভব নয ।

এক সাধক আছেন । যদি তিনি ছু স্বৰ্গী ধৰে ধ্যান কৰেন, মৌন
 থাকেন, কিন্তু অন্ত্ৰেব মধ্যে নানা দোষ দেখতে পান, তৰে আমাব
 বিবেচনায তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায নিবত নন । তিনি প্ৰকৃতই ধ্যান
 এবং মৌন সাধনায ব্যাপ্ত নন । তাঁৰ দৃষ্টি অন্ত্ৰেব ওপৰে । এ থেকে
 তিনি কি পেয়েছেন ? নিজেৰ ভেতৰে তিনি কিসেব সন্ধান কৰেন ?
 তাঁৰ ভেতৰে এতে কি পৰিবৰ্তন হয় ? সাধনাৰ দ্বাৰা কিছু বদলানো

উচিত, পৰিবৰ্তন হওয়া উচিত। কিন্তু পৰিবৰ্তন কেন হয় না ?

তাৰ এৰ্কাট কাৰণ, আমাদেব সমস্ত শৰীৰ প্ৰকম্পিত। আমবা অনেববাব অম্মপ্ৰেক্ষা কৰি, এই কথা বাবে বাবে আৰুস্তি কৰি— ‘প্ৰকম্পনকে, শৰীৰে নিবস্তব ঘটিত প্ৰকম্পনকে, দেখ।’ মাথা থেকে পা পৰ্যন্ত আমাদেব শৰীৰ প্ৰকম্পনেব পুলিন্দা। প্ৰকম্পন আব প্ৰকম্পন, কেবল প্ৰকম্পন। আমাদেব ভাগ্য ভাল যে আমবা সব প্ৰকম্পন দেখতে পাই না। সমস্ত কিছু প্ৰকম্পিত হছে, কোন কিছুই শক্ত নয। হাডগুলি এত কাঁপা যে তাব ভেতব দিষে যে কোন কিছুই বেবিষে যেতে পাৰে।

গৌতম ভগবান মহাবীৰকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলেন, ‘ভন্তে ! কে বদলায ?’

ভগবান বলেছিলেন, ‘যা অস্থিৰ তাই বদলায। যা স্থিৰ তা বদলায না। যখন জীব বৌবন প্ৰাপ্ত হয় তখন তাব সমস্ত অবযব বদলায।’ হাত বদলে যায়, পা বদলে যায়, সব কিছু বদলে যায়। এই পৰিবৰ্তন কেন হয় ? এব উত্তব : দেহ অস্থিৰ, কম্পনেব অধীন। শুধু কম্পন ছিল বলে পৰিবৰ্তন হয়েছে। কম্পন যদি না হতো তবে পৰিবৰ্তন হতো না। সমস্ত কিছু কম্পনেব ব্যাপাব। বোগ কেন হল ? কম্পন ছিল, সেই জন্ত বোগ হল। কম্পন না থাকলে বোগ হতো না। স্থিৰ বস্তব কখনও কোন ব্যাধি হতে পাৰে না। অস্থিৰ বস্ততেই ব্যাধি হয়। কম্পন থেকে বোগ হয়, কাৰণ কম্পন থেকে বদলানোব ক্ষমতা আসে। সব কিছু বদলায, বদলাতে পাৰে, আব যা বদলায তাব পক্ষে সে পৰিবৰ্তন ভালও হতে পাৰে, মন্দও হতে পাৰে। সুন্দবও হতে পাৰে, অসুন্দবও হতে পাৰে, মিষ্টও হতে পাৰে, কটুও হতে পাৰে। যা বদলায তাব নানা প্ৰকাৰ পৰিবৰ্তন হতে পাৰে।

আমাদেব গোটা শৰীৰ প্ৰকম্পনেব পুলিন্দা। যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিগোচব হয় এব যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিব বহিৰ্ভূত সব কিছু প্ৰকম্পন। আমি কথা বলছি, কথাব সাথে সাথে শব্দেব তবঙ্গ এত বেগে ছুটে

যায় যে মনে হয় দশটি সাপ এক সাথে বেগে ধাবিত হচ্ছে। কিন্তু বিনা মাধ্যমে, খালি চোখে আমরা ঐ সব তবঙ্গ দেখতে পাই না। ব্যাঙ্গালোবে ডঃ বিশ্বেশ্বরায়া সাবেল ইনস্টিটিউটে গিবে আমি এক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলি। ঐ যন্ত্রের ওপরে ঐ শব্দের তবঙ্গ এত বেগে ছুটতে লাগল যে মনে হল পঞ্চাশটি সাপ দৌড়ছে। সবই প্রকম্পন আর প্রকম্পন। আমাদের শরীর প্রকম্পনময়, এই সত্য যেন আমরা ঠিক মত উপলব্ধি কবি। আমাদের শরীরের বত কিছু পৰিণাম, যত কিছু পৰিবর্তন হয় সে সব কিছুই প্রকম্পনের দ্বারা ঘটে থাকে।

আমি এই সত্য হৃদযন্ত্রম কবেছি যে প্রকম্পনের পৰিবর্তন কৰা সম্ভব। অর্থাৎ প্রতিবোধ থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হতে পারে। যেমন, বিচারের তবঙ্গ এক প্রকারের প্রকম্পন। এক বকম বিচার চলতে থাকে আর প্রকম্পন চলতে থাকে, তাব তবঙ্গ চলতে থাকে। আমরা ভাবনা কবি, বিবোধী তবঙ্গ উৎপাদন কবি। আগেকার তবঙ্গের সঙ্গে তাব সংঘাত হয়। সে তবঙ্গ এত শক্তিশালী যে আগেকার তবঙ্গের সমাপ্তি ঘটায়। এ সবই আমরা প্রকম্পনের বলে কবি।

‘ইমঃ শরীরঃ অনিচ্চ’—এ শরীর অনিত্য, এ কথা আমি বাব বাব বলে চলেছি। লোকে জিজ্ঞাসা কবে, এ দিয়ে কি হবে? আমরাও এ কথা দশ-বিশ মিনিট বাব বাব আবৃত্তি কবি, কিন্তু তাতে কি হবে? এর মর্ম আপনাবা এখনও বুঝতে পারবেন না। আপাতত এই কথাগুলি নির্ভাব সঙ্গে বাব বাব আবৃত্তি কবতে থাকুন। সঙ্কল্প ককন যে এই কাজ কবতেই হবে এক এই বকম কবা ভাল, হিতকর, কল্যাণকর। ঐ বকম কবে কি হবে সে কথা ধীরে ধীরে আপনাদের বোধগম্য হবে। আপনাবা শুরু থেকে স্বীকার কবে বসে আছেন, শবাব স্থিৰ, নিত্য। এই ধাবণা আমাদের সংস্কারে পৰিণত হয়েছে। তাব নিজের প্রকম্পন এক তবঙ্গ আছে। ঐ প্রকম্পন-তবঙ্গকে প্রতিহত কবতে হলে বিবোধী তবঙ্গের প্রয়োজন। আপনি ‘ইমঃ শরীরঃ অনিচ্চ’—এই বাক্যটি আবৃত্তি কবতে থাকুন। দশ-বিশ মিনিট ধবে আবৃত্তি কবে যান।

এ থেকে বাচিক বা বচন থেকে উদ্ভূত তবঙ্গ সৃষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভাবনা কবতে থাকেন। ভাবনা থেকে প্রকল্পন উৎপন্ন হয়। যেমন যেমন 'ইমং শবীক অনিচ্ছ' এই ধ্বনি এবং ভাবনা শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং তাব তবঙ্গ প্রবল হবে তেমন তেমন তা পূর্বগত সংস্কাৰেব তবঙ্গকে সমাপ্ত কবে দেবে, বিনষ্ট কবে দেবে। যদি এই কথা আমাদের বোধগম্য হয় তবে 'ইমং শবীক অনিচ্ছ'—এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবতে কবতে আমাদের বিবস্ত হওয়াব বা নিবিশ হওয়াব কোন কাৰণ থাকবে না। আমবা কথা বলে প্রকল্পন সৃষ্টি কবি। কিন্তু ঐ প্রকল্পন ততটা কাৰ্যকৰী হয় না। সেই জন্ত বাব বাব বলা হয়েছে, মনকে একাধা কব, মনকে সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে বাধ, তন্ময়তা অভ্যাস কব। তাব অৰ্থ, নিছক কথাব প্রকল্পন ততটা কাৰ্যকৰী হয় না। যখন তাব সাথে ভাবনাৰ প্রকল্পন সংযুক্ত হয় তখন তা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। ঐ শক্তিশালী প্রকল্পন আগেকাব প্রকল্পনকে বাতিল কবে দেখ।

প্রকল্পনকে বোধ কবা সম্ভব। আমি নিৰ্বিচাৰ ধ্যানের কথা বলছি। শবীকে স্থিৰ কব, কাযোৎসৰ্গ কব, শবীকে চিলে কব, মৌন থাক, আৰ মনকে শান্ত কব। কুস্তক কবে মনকে নিৰ্বিকল্প কব। কোন কল্পনাবিলাস কববে না। এই বকম কবলে প্রকল্পনকে বোধ কবতে পাবা যায়। প্রকল্পন বোধ কবা অত্যন্ত প্রয়োজন, আৰ তাকে বোধ কবলে তা যত ক্ষীণ হয়, তাব যত ধাক্কা লাগে, তা আমবা কল্পনাও কবতে পাবব না। চলতে চলতে যে গতি সহসা কল্প হয় তাকে সামলানো বড় মুশকিল। যে লোক দ্রুত বেগে চলছে সে হঠাৎ একেবাবে থামতে পাবে না। তাকে প্রথমে তাব গতিবেগ কমিষে দিতে হবে, পবে এক সময় আসবে যখন সে থামতে পাববে। সেই বকম তেজী গাড়ি থামানোৰ জন্ত হঠাৎ পূবো ব্ৰেক কষলে দুৰ্ঘটনা ঘটে। প্রথমে গতি মন্দ কব, তাব পবে ব্ৰেক কব। চলতে চলতে আমবা যদি বিচাৰেব ওপৰ পূবো ব্ৰেক লাগাই, স্বাসেব ওপৰে হঠাৎ ব্ৰেক লাগাই,

তাকে একবারে খামতে যাই, তবে এমন বিক্ষোভ হ'বে যে তাতে পুঞ্জীভূত সংস্কার ধ্বংস হবে। প্রকল্পনের বোধ এক সত্য। প্রকল্পন বোধ সম্ভব।

আমি ছোট ছোট কথাই উল্লেখ করছি। এগুলি ছোট ছোট সত্য। সেগুলি বুঝতে পাবলে সাধনাব ওপরে আমাদের নিষ্ঠা বেড়ে যাবে। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাগরুকতা বৃদ্ধি পাবে।

আপনাকে বলেছি, স্বাস্থ্যের মোড়ের ওপরে লক্ষ্য রাখুন। আমরা যখন পুরো স্বাস্থ্যের সাথে মনকে নিয়ে চলেছি তখন স্বাস্থ্যের মোড়ের ওপরে ধ্যান কেন্দ্রিত করার কথা কেন? এই কথা আপনি বুঝবেন যাতে আপনার মন এত সংবেদনশীল হয় বহু ছোট তত্ত্বেরও অবধান তা করতে পারে।

সাধারণ ক্যামেরা আপনার কোঠা বা প্রতিচ্ছবি তুলতে পারে। কিন্তু ধরুন আপনি কোন জায়গায় দু ঘণ্টা বা দশ মিনিট বসে বইলেন, তাবপরে উঠে চলে গেলেন। তখন আপনার ছবি তুলতে হবে। ঐ সাধারণ ক্যামেরায় সে ছবি তোলা যাবে না। তাব জন্য সংবেদনশীল বা অনুভূতিসম্পন্ন ক্যামেরা প্রয়োজন, এমন ক্যামেরা যাতে মানুষ কোথাও অবস্থান করার পবে সেখান থেকে চলে গেলেও তাব ছবি উঠতে পারে। তাব কারণ মানুষটির আকৃতির পবমাণু সেই জায়গায় সঞ্চিত থাকে। ঐ বকস ক্যামেরা দ্বারা চোব ধবা যেতে পারে, আবও অনেক বকস জিনিসের সন্ধান করা যেতে পারে, অনেক কিছু কথাব পাওয়া পাওয়া যেতে পারে। ঐ সব কাজ করার জন্য ক্যামেরায় বিশেষ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। আমাদের মন সম্বন্ধেও ঐ একই বক্তব্য। আমাদের মনের সংবেদনশীলতা যত বৃদ্ধি পারে তত আমরা সূক্ষ্ম কথা ধবতে পারব।

যে সমস্ত প্রবোগ দ্বারা মনকে ছোট বিন্দুকে গ্রহণ করতে সক্ষম করা যায় সে সমস্তই হল মনকে সংবেদনশীল করার প্রক্রিয়া। আপনি সম্পূর্ণ নাসাগ্রে আপনার স্বাস্থ্যের প্রকল্পন দেখুন। ঐ প্রক্রিয়া চলতে

চলতে আপনি এক সময় নির্দেশ পাবেন। নাসাগ্রের নিচে নাসাগ্রের এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে মনকে কেন্দ্রিত করুন এবং সেখানে প্রকল্পন লক্ষ্য করুন। আপনি হয়তো ভাবছেন, যখন সম্পূর্ণ নাসাগ্রের প্রকল্পন দেখছি তখন এক বিন্দুতে ঘটিত প্রকল্পন দেখাতে কি প্রভেদ হবে? এক আঙ্গুল পবিমিত স্থান কেন দেখব? এর উত্তর স্পষ্ট। যে মন সম্পূর্ণ নাসাগ্রের প্রকল্পন দেখছে তাকে এক বিন্দুতে এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে কেন্দ্রিত করার অর্থ, সেই মনের সংবেদন-শীলতা বেড়ে গিয়েছে, তাব ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে।

এই সব ছোট ছোট জিনিস কিভাবে আমাদের মনে পরিবর্তন নিয়ে আসে, কিভাবে আমাদের শারীরিক ক্রিয়াকলাপে পরিবর্তন ঘটায়, কি করে আমাদের খাবণ ও সংস্কারসমূহের উদ্ভব করে এবং কি করে আমাদের জৈবিক পুঞ্জীভূত সংস্কারকে উন্মূলিত করে, আপনারা যদি বুঝতে পাবেন তবে সাধনায় দ্বাবা আপনারদের যা পাওয়া উচিত, যা আপনারদের অভীষ্ট, তাই পাবেন।

রাজা একটি লোকের গুণে প্রসন্ন হয়ে বললেন, ‘কিছু চাও। তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।’ লোকটি একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। সে ধন বা প্রভু চাইল না। সে বলল—‘বাজন। আপনি যখন দান করতে চান তখন আমাকে শান্তি দান করুন। আমি শান্তি চাই, অন্য কিছু চাই না।’ রাজা চিন্তা করলেন, ‘আমি একে শান্তি দেব কোথা থেকে? আমি নিজেই অশান্ত, আমি কোথা থেকে একে শান্তি এনে দেব?’ তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে বললেন, ‘গুরুদেব। কৃপা করুন। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচান। আমি একটি লোকের প্রার্থনা পূরণ করার কথা দিতে সে বলল, ‘আমাকে শান্তি দিন।’ আমার কাছে তো শান্তি নেই, আমি তাকে কোথা থেকে শান্তি দেব। এখন আপনি আমাকে দয়া করুন।’

সন্ন্যাসীর নিজের শান্তি ছিল, কাজেই তিনি রাজাকে শান্তি দিতে পেরেছিলেন। রাজা সেই লোকটিকে ডেকে তাকে শান্তির উপায় বলে

দিলেন। সে শাস্তি পেল।

সাধনা থেকে যে ক্ষমতা, যে পুষ্কাব পাওয়া যায় তা অন্য কিছু থেকে পাওয়া যায় না। স্থূল শরীর ও স্থূল চেতনা থেকে পাওয়া যায় না, স্থূল কর্ম থেকে পাওয়া যায় না। সূক্ষ্ম চেতনা এবং সূক্ষ্ম জগতের স্তরে পৌঁছতে পারলে তবে তাকে পাওয়া সম্ভব হয়। কথা হচ্ছে' সেখানে পৌঁছতে হবে। আমরা যদি কোন স্থূল স্তরে থেকে যাই তবে ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হব না। সেই জন্য আমরা সাধনার মাধ্যমে স্থূল শরীর এবং স্থূল চেতনাকে অতিক্রম করে সূক্ষ্ম শরীর ও সূক্ষ্ম চেতনা পর্যন্ত পৌঁছনোর চেষ্টা করি। সেখানে পৌঁছলে আমাদের অভীষ্ট পূরণ হবে।

অধ্যাত্মের বহুস্যের সন্ধান

আমরা কোন লোকের সঙ্গে বিশ বছর বাস কবেও তাকে সম্পূর্ণ জানতে এবং চিনতে না-ও পাবি। দূরের মানুষকে জানা কিছুটা সহজ। কিন্তু যে লোকের সঙ্গে বাস কবি তাব পবিচয় পাওয়া বেশ কঠিন।

অধ্যাত্ম বিষয় আমাদের এত নিকট, এত অন্তবঙ্গ, তাই এত বহুস্তাবৃত। কিন্তু ঐ বহুস্ত উদ্ঘাটন ছাড়া আমাদের কোন গতাস্তব নেই। আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে যত বিকাশ হয়েছে সে সবই অধ্যাত্মের বহুস্ত উদ্ঘাটন দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা বহুস্ত উদ্ঘাটন কবছেন, আর এখন তাঁরা আণবিক বিস্ফোৰণের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছেছেন। মানসিক জগতে মনোবিজ্ঞানীরা অনেক অনেক বহুস্ত উদ্ঘাটন কবে অবচেতন মনের ভূমিকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছেন। অন্য অনেক ক্ষেত্রে যখনই বহুস্তের আবরণ উন্মোচন সম্ভব হয়েছে তখনই নতুন শক্তির প্রবাহ মানুষের আশঙ্কে এসেছে। আব, শক্তিস্রোতের উপলব্ধি বহুস্তের উদ্ঘাটন ছাড়া সম্ভব নয় এবং শক্তিস্রোতের উপলব্ধি না হলে এই সমাবে বিকাশ হতে পাবে না। আজ-কালকার ভৌতিক জগতের সমস্ত বিকাশ বিদ্যাৎ এক ইন্ধনের ওপরে নির্ভবশীল। পেট্রোলের কোন সমস্তা হলে পৃথিবীর সমস্ত বাষ্ট্র

টলদন কৰে, সৰুৰু জুৰাবনাৰ পড়ে। তাদেব সমস্ত শক্তিশ্ৰোত
 শুকাতে আহন্ত কৰে। আপনি কল্পনা কৰন নাবা ছুনিয়াতে পেট্রোল
 নেই, বিদ্যুৎ নেই, আণবিক ইন্ধন নেই। তা হলে কি এই ভৌতিক
 বিকাশ, টিংকৈ থাকতে পাবৰে? কখনই তা সম্ভব নহয়। এই সবই
 বিদ্যুতৰ আধাৰে সংঘটনশীল। আমাদেব এ বথা ভুললে চলবে না যে,
 আমাদেব শক্তিৰ বিকাশেৰে একটি উৎস হল বিদ্যুৎ। যেমন আধুনিক
 সমস্ত ভৌতিক বিকাশ বিদ্যুতৰ ওপৰ নিৰ্ভৰশীল তেননি অধ্যাত্ম শক্তিৰ
 বিকাশও বিদ্যুতৰ ওপৰ নিৰ্ভৰশীল। এই হল অধ্যাত্মেৰে বহন্ত।

আমাদেব শব্দৰ বিদ্যুতৰ শব্দৰ। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা
 কৰাব প্ৰয়োজন নেই। তৈজস সৰ্গনবিদ ভালভাৰেই জানেন যে, আমাদেব
 সমস্ত অভিভাৱিত তৈজস শব্দেৰে মাধ্যমেই হব। তৈজস শব্দৰ ছাড়া
 শব্দেৰে সঞ্চালন সম্ভব নহয়। তৈজস শব্দৰ বিনা কেউ কথা বলাতে
 পাবত না, অহুনিহেলন কৰতে পাবত না, হাস নিতে পাবত না, খেতে
 পাবত না, খাত্ত পৰিপাক কৰতে পাবত না। আমাদেব সমস্ত উৰ্জা বা
 শক্তি তৈজস শব্দেৰে মাধ্যমে প্ৰকট হয়। এই বিদ্যুৎমণ্ডল, বিদ্যুৎ
 শব্দৰ এবং তৈজস শব্দৰ—এ সবই নমুনাৰেই শক্তিৰ অবতৰণেৰ এবং
 অধ্যাত্মেৰে কাছে পৌছবাৰ জন্তু একটি দুৱাৰ। তৈজস শব্দৰ দ্বাৰা
 জানবা যে শক্তি আৱন্ত কবি তা আত্মকালকাৰ জগতে বিন্য়কৰ বটে।
 প্ৰাচীন সাহিত্যে এই সমস্ত শক্তিকে 'লকি' বলা হযেছে। এণ্টলিকে
 'যোগজ বিভূতি'ও বলা হযেছে। এই সমস্ত লকি, ঋজি, যোগজ বিভূতি
 তৈজস শব্দেৰে মাধ্যমে পাওয়া যায়।

তৈজস আগৰ প্ৰজ্ঞাপনাৰ ছু বকম মানুহেৰে বৰ্ণনা পাওয়া যায়—
 ঋজিপ্ৰাপ্ত হাব ঋজিবিহীন মানুহ। যে মানুহ ঋজি পেৰেছে, বিশেষ
 শক্তি উপলব্ধি কৰেছে, সে ঋজিপ্ৰাপ্ত মানুহ। তাৰ শক্তিসমূহ বখাখি
 বিন্য়কৰ।

অধ্যাত্মেৰে আলোচনাৰ প্ৰাৰম্ভ বাহু বহু এবং অধ্যাত্মেৰে মধ্যে
 আমাদেব একটি ভেদবেখা অঙ্কিত কৰতে হব। প্ৰাচীন আচাৰ্যগণ

একটি ভেদবেথা নির্দিষ্ট কৰেছেন। ভগবান মহাবীৰ বলেছেন—যে মানুহ অধ্যাত্মকে জানে আৰু যে বাহ্যকে জানে, সে অধ্যাত্মকে জানে। এয়া তাৎপৰ্য এই যে, আমাদেৰ দুই স্থিতি প্ৰকট—এক বাহ্য জগতেৰ এবং অপৰটি অধ্যাত্ম জগতেৰ। একটি আমাদেৰ বাহিৰেৰ সংসাৰ। অপৰটি আমাদেৰ ভেতৰেৰ সংসাৰ। বাহিৰেৰ সংসাৰেৰ নাম সমাজ, ভেতৰেৰ সমাজেৰ নাম ব্যক্তি। সময় সময় আমবা বাহ্য জগতেৰ সঙ্গৈ সংযুক্ত হই। তাৰ অৰ্থ, অন্ত লোকেৰ সঙ্গৈ আমাদেৰ সংযোগ হয়। ঐ লোকেৰ সঙ্গৈ আমাদেৰ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আমবা সমাজ হয়ে বাই। ব্যক্তি সমাজে পৰিণত হয়। যখন আমবা একলা থাকি, কাৰও সঙ্গৈ আমাদেৰ সংশ্লব থাকে না, আমাদেৰ একাকীত্ব সুবন্ধিত থাকে তখন সমাজ হয়ে বাই না, তখন আমবা ব্যক্তি থাকি। আমাদেৰ সামাজিক জীবনও আছে, আবার ব্যক্তিজীবনও আছে। ব্যক্তি জীবনে সংঘটনশীল ব্যাপাবগুলি ভিন্ন প্ৰকাৰেৰ হয়।

আমবা দু বকম জীবন যাপন কৰে থাকি—বৈযক্তিক বা ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবন। আমাদেৰ জীবন দু বকম মান-বিলিষ্ট। আমাদেৰ বৈযক্তিক জীবন আধ্যাত্মিক বা আন্তৰিক জীবন। আৰু সামাজিক জীবন আমাদেৰ বাহিৰেৰ জীবন। এ জীবন আমবা সাধাৰণত বাহিৰেৰ জগতে যাপন কৰি। আমবা দু বকম জীবন যাপন কৰি এবং দুযেবই বহুস্তৰেৰ সন্ধান কৰি। বাহ্য জগতেৰ বা সমাজজীবনেৰ, তথা আন্তৰিক জগতেৰ বা ব্যক্তিগত জীবনেৰ ঘটনাবলীৰ ব্যাখ্যা কৰি।

অন্তৰ্জগৎ চেতনাৰ জগৎ, কেবল চেতনাৰ জগৎ। সেখানে শুধু চেতনা থাকে, আৰু কিছুই থাকে না। তাকে আমবা শক্তি, জ্ঞান বা অন্ত যে নামই দিই না কেন, তা বিশুদ্ধ চেতনা মাত্ৰ। ঐ চেতনায যা আছে তা আনন্দও বটে, শক্তিও বটে, জ্ঞানও বটে। কিন্তু মোটেৰ ওপৰ তা বিশুদ্ধ চেতনা, তা ছাড়া আৰু কিছুই নহ।

বাহিৰেৰ জগৎ বৈচিত্ৰ্যেৰ জগৎ। সেখানে অনেক পদাৰ্থ, অনেক

জিনিস। সেগুলি অনুপবমাণুব দ্বাৰা সংঘটিত। অন্তৰ্জগতে আছে শুধু চেতনা, আৰু কোন কিছুই নথ।

একটি চেতনাৰ জগৎ, অপবটি পদাৰ্থেৰ জগৎ। যখন আমবা চেতনাৰ জগতেৰ দিকে অগ্ৰসৰ ইহ তখন আমবা যেখানে পৌছতে হবে বলে বিচাব কবি, সে-ই আমাদেব অভ্যাস। চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়ে, অত্ৰেব সঙ্গে মিলিত হয়ে আমবা যা কিছু কবি সেই আমাদেব ভৌতিক বা বস্তু জগৎ।

বহুস্তেব সন্ধানেব জগত আমাদেব কিছুটা গভীৰতাৰ মধ্যে যেতে হবে। কখনও কখনও কোন কিছু ঘটে আৰু বহুস্ত উদ্ঘাটিত হয়। কখনও কখনও কোন নিমিত্ত থাকে না, কিন্তু অনাযাসে অতল গভীৰতায় ডুব দেওবাৰ সুযোগ ঘটে যায়, আৰু বহুস্ত প্ৰকাশিত হয়।

আপনাবা বহুস্ত উদ্ঘাটনেব সিদ্ধান্ত জানেন এবং অনেক ঘটনাৰ কথাও শুনেছেন।

একটি লোক পাহাড়েৰ পাশে বসেছিল। সেখানে একটি ঝৰণা বয়ে যাচ্ছিল। সেখানে এক হবিনী এল। সে অনেকক্ষণ তাৰ একটি পা জলে ডুবিয়ে বাখল। আৰু এক দিন এল। তাৰ পবে তৃতীয এবং চতুৰ্থ দিনও এল। চাবদিন সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, পঞ্চম দিনে সে পা সোজা কবে চলতে লাগল। সেই লোকটি ভাবল—হবিনীটি কেন বোজ আসে? সে বিচাব কবল। হবিনীৰ পা দেখল। তাৰ পা জখম ছিল। হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। দু-চাবদিন জলেৰ উপচাব প্ৰয়োগেৰ বলে তাৰ পা ঠিক হয়েছিল।

লোকটি এই উপচাব আয়ত্ত কবল। প্ৰাকৃতিক চিকিৎসা আবিস্ত হল। জলেৰ এবং মাটিৰ উপচাব শুক হল।

একটি লোক বসে ছিল। সে দেখল একটি বাচ্চা শুয়ে আছে। তাৰ শ্বাস ফুলে উঠছিল। তাৰ গভীৰ শ্বাস পডছিল। পেট ফুলে ছিল, আৰু শৰীৰ ব্যথায কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সে লা-লা-লা কবে এক অব্যক্ত শব্দ কবছিল। লোকটি চিন্তা কবল। সে ভাবল যে ঐ ধ্বনিৰ সাথে

সাথে একটা কিছু হচ্ছে। সে তাৰ প্ৰয়োগ কৰল। ধ্বনি-চিকিৎসাৰ বিকাশ হল। লোকটি শব্দৰ উচ্চাৰণ দ্বাৰা ধ্বনি-চিকিৎসাৰ বিকাশ ঘটাল। এই পদ্ধতি দ্বাৰা বোগ নিবাস্য হল।

একটি লোকেৰ মাথাৰ অত্যন্ত ব্যথা হৰেছিল। সে বৈজ্ঞেয় কাছে গেল। অনেক চিকিৎসা কৰাল। কিন্তু সবই ব্যৰ্থ হল। সে জীবন সম্বন্ধে উদ্ভিগ্ন হল। তাৰ জীবন দুঃসহ হৰে উঠল। একবাৰ কোন একটি মানুষেৰ সঙ্গে তাৰ লড়াই হল। তাৰ শত্ৰু বেগে এসে তাকে বাণ মাৰল। তাৰ পায়ে লাগল। বাণটি পায়ে বিদ্ধ হওঁযা মাত্ৰ তাৰ মাথাৰ ব্যথা একেবাৰে সেৰে গেল। সে আশ্চৰ্য হৰে গেল। সে চিন্তা কৰল—এত উপচাৰ প্ৰয়োগেও আমাৰ ব্যথা সাৰে নি, আৰ একাটি তীব লাগতেই তা একেবাৰে সেৰে গেল। মনে হচ্ছে আমাৰ মাথাৰ কোন কালেই কোন ব্যথা ছিল না। এ বহুস্ত বুঝতে পাৰলোম না। সে বৈজ্ঞেয় কাছে গেল। নিজেৰ দীৰ্ঘ কাহিনী তাকে শোনাল। বৈজ্ঞেয় বিস্মিত হৰে গেল। সে ঐ বকম প্ৰয়োগ শুক কৰল। আৰ একাটি লোকেৰ মাথাৰ ব্যথা হল, তাকে সে তীব মাৰল। তাৰ ব্যথা সেৰে গেল। তৃতীয়, চতুৰ্থ, পঞ্চম লোকেৰ ওপৰে একই প্ৰয়োগ কৰল। এৰু তাৰেৰ মাথা ব্যথা সেৰে গেল। তখন এই তথ্য স্থাপিত হল যে, মাথাৰ ব্যথা হলে পাৰেৰ বিশেষ স্থানে বাণ বিদ্ধ কৰলে মাথাৰ ব্যথা সেৰে যাবে। এই প্ৰয়োগেৰ নাম আকুপাংচাৰ চিকিৎসা পদ্ধতি।

আমাদেৰ শবীৰ বিদ্যুতৰ শবীৰ। তাতে বিদ্যুতৰ প্ৰাধাণ্য। আমবা মানি বা না মানি বিদ্যুতৰ ভাবসাম্যেৰ অভাৱে যে শবীৰে অনেক বোগ হয় এটা অত্যন্ত স্পষ্ট তথ্য। তৈজস শবীৰ অস্থিৰ হলে তাতে নানা প্ৰকাৰ বিকৃতি সম্ভাৱ হয়। যদি আমবা তৈজস শবীৰেৰ সমুচিত ব্যৱস্থা কৰি, বিদ্যুতৰ ভাবসাম্য স্থাপন কৰি, তাৰ সমতা আনি, তৰে আমবা নিজে নিজে অনেক কিছুবই সমাপ্তি ঘটাতে পাৰি, অনেক পৰিস্থিতিৰ মীমাংসা আমবা নিজেবাই কৰতে পাৰি।

আমি এই সমস্ত আলোচনা এইজন্ত কৰছি যে বহুস্তেৰ সন্ধান না

কবলে, রহস্য উদ্ঘাটন না কবলে এই দুনিয়ায় বিকাশ সম্ভব হবে না, শক্তিব উপলব্ধি হবে না। প্রাচীন আচার্যগণ অনেক বহুস্তেব সন্ধান কবতেন। আন্ত আমবা যদি কোন সিদ্ধান্ত বুঝতে পাৰি কিছুকাল পাবেই আমবা তা বিশ্বত হই। সব কিছু ভুলে বাই। ভুলে বাওঁবাৰ কলে আমবা ঐ সমস্ত বহুস্তেব ঠিকমত ব্যাখ্যা কবতে পাৰি না, এৰ তাদেব প্ৰয়োগ কবতে পাৰি না।

এই প্ৰসঙ্গে আমি একটি ঘটনাৰ আলোচনা কবব। আমি সত্য একটি কথা পড়েছি—উত্তৰ দিকে মাথা দিবে বা দক্ষিণ মুখে পা বেখে শোয়া উচিত নহ। এই বচন আমাদেব দেশে প্ৰচলিত আছে। কেউ কেউ এ বচন অন্ধ বিশ্বাস বলে মনে কবে। তাৰা বলে—শয়নকালে আমবা পা দক্ষিণ, উত্তৰ, পশ্চিম বা পূৰ্ব বে দিকেই বাখি না কেন, তাতে কি পাৰ্থক্য হয়? কোন না কোন দিকে মাথা তো বাখতে হবে। কিন্তু আন্তকাল প্ৰত্যেক জিনিসেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্ৰস্তুত কৰা হইছে। বিজ্ঞানেব বহুস্ত উদ্ঘাটনেব পৰে ব্যাপাৰ এই বকম দাঁড়িয়েছে যে, কোন লোক যদি কোন বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলে তবে সে নিতান্ত দুঃসাহসী। আগেকাব দিনে এ বকম বলা চলত, আন্তকাল আব চলে না। সম্প্ৰতি আমি এই বিশ্বাসেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পড়ে বিন্মিত হইছি।

আমাদেব শৰীৰে দু বকম বিদ্যা আছে—পজিটিভ ও নেগেটিভ। এক হল ধনাত্মক, অপৰটি ঋণাত্মক। চোখ, কান, নাক, মাথা, মুখ প্ৰভৃতি শৰীৰে ওপৰেব অংশে আছে ধনাত্মক বিদ্যা। আব পা, জঙ্ঘা প্ৰভৃতি শৰীৰেব নিচেব অংশে আছে ঋণাত্মক বিদ্যা। ব্যক্তি ব্ৰহ্মাণ্ড থেকে, জগৎ থেকে পৃথক নহ। বখন জগৎতৰ সঙ্গে তাব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তখন সে সমাজে পৰিণত হয়। আমবা বাতাবৰণেব দ্বাৰা প্ৰভাবিত হয়ে এ জগতে বাস কৰি। পৰিস্থিতিবও প্ৰভাব আছে। আমবা এই সব কিছুব দ্বাৰা প্ৰভাবিত হই।

পৃথিবীৰ দুটি দিকে ঋব বলে মানা হয়—উত্তৰ ও দক্ষিণ। উত্তৰে

যে ঋব সেখানে অকুবন্ত বিদ্যাভাণ্ডার আছে। সেখানে এতই বিজ্ঞানিৰ
 প্ৰকাশ'ৰ্বে সেখানে গেলে মনে হয় শত শত সূৰ্য্যৰ উদয় হযেছে।
 এমন চোখ-ধাঁধানো আলো। অন্ধকাৰেব কোন পাত্ৰাই নেই। দক্ষিণী
 ঋবতে সম-পৰিমাণ বিদ্যাৎ আছে। উত্তৰেব ঋবতে ধনাঙ্কক বিদ্যাৎ,
 দক্ষিণেব ঋবতে ঋণাঙ্কক বিদ্যাৎ। যখন লোকে উত্তৰ দিকে মাথা দিয়ে
 শোঁষ তখন দক্ষিণেব দিকে তাব পা থাকে। দক্ষিণেব দিকে থেকে যে
 বিদ্যাভেব প্ৰবাহ আসে সেটি ঋণাঙ্কক। মান্নবেব পায়েব বিদ্যাৎও
 ঋণাঙ্কক। দুই ঋণাঙ্কক বিদ্যাৎ যেখানে মিলিত হয় সেখানে প্ৰতিবোধ
 ঘটে, সংঘৰ্ষ হয়। একই ভাবে যখন ধন বিদ্যাভেব সঙ্গে ধন বিদ্যাৎ
 মিলিত হয় তখন প্ৰতিবোধ ঘটে। ফলে একে অত্ৰেব সহায়ক না হবে,
 পৰস্পৰকে পৰাস্ত কৰতে প্ৰয়াস কৰে। সেই জন্ত যে লোক দক্ষিণদিকে
 পা বেখে শোঁষ তাব ঋণাঙ্কক বিদ্যাভেব সঙ্গে দক্ষিণী ঋব থেকে আগত
 ঋণাঙ্কক বিদ্যাভেব সংঘৰ্ষ লাগে। ঐ বকম পৰিস্থিতিতে লোকেব
 মনে নানা বকম ছশ্চিন্তা উপস্থিত হয়, সে খাবাপ খাবাপ স্বপ্ন দেখে,
 তাব শৰীবে নানা বকম বোগ ও বিকৃতি উৎপন্ন হয়। সেই কাৰণে
 বৈজ্ঞানিকবা প্ৰতিপন্ন কৰেছেন, দক্ষিণ দিকে পা বেখে ঘুমোনো উচিত
 নয়। তা থেকে শাৰীৰিক ও মানসিক উভয় প্ৰকাৰ বোগ হতে পাবে।

আমবা যেন একথা ভুলে না যাই যে বহন্ত উদ্ঘাটনেব পৰে যে
 তত্ত্ব আমবা বুঝতে পাবি এবং সত্য বলে দেখতে পাই এবং যাব ওপৰে
 আমাদেব যথার্থ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তা শুধু মেনে নেওবা থেকেই হয় না।

এখন আপনাদেব অধ্যাত্ম-বহন্ত বোঝানোব জন্ত এই সন্দৰ্ভেব অল্প
 আলোচনা কৰতে চাই।

ধৰ্মেব মূল সূত্ৰ—পাপ কোবো না, পাপ থেকে নিজেকে বন্ধা কৰ।
 কিন্তু কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে পাববে, সেই হল প্ৰশ্ন। মন কত চঞ্চল,
 শৰীৰ কত চঞ্চল। বাণী কত চঞ্চল। তা ঐ সব থেকে কিছু না কিছু
 পাপ হয়ে যায়। আমি পাপ থেকে কিভাবে আত্মবন্ধা কৰব ? পাপ
 থেকে বাঁচাব কি উপায় আছে ? অধ্যাত্মেব বহন্ত উদ্ঘাটন ছাড়া অস্ত্ৰ

কোন উপায় তা সম্ভব নয়, এই প্রশ্নের সমাধান সম্ভব নয়। মানুষ পাপের হাত থেকে বাঁচতে পারে এ কথা অনেক মানুষ পাবে না। তাইবে প্রশ্ন—যে দুনিয়াতে পাপ করার জন্য অনবরত হাজার হাজার প্রেরণা আসছে, সেই দুনিয়াতে বাস করে লোক কি করে পাপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

ভগবান মহাবীর এ বিষয়ে উপায় নির্ধারণ করার প্রসঙ্গে বলেছেন—
 এক কচ্ছপ ছিল, যখন কোন সড়টজনক পরিস্থিতি উপস্থিত হতো—
 পাখিতে তাকে ছৌঁ মেবে নিলে যেতে গেল, শিয়াল প্রভৃতি পশু তাকে
 খেতে চেষ্টা করলে, কোন রকম নিবাপ্তার অভাব বা ভয় উপস্থিত
 হলে—সে তৎক্ষণাৎ নিজের খোলসের মধ্যে ঢল যেত প্রকৃতি তাকে
 এমন একটি খোল নিজেছিল বা তার ঢালবে মত কাজ করত। প্রাচীন
 কাল যখন তলেয়ার আর ঢাল নিলে বুক হত তখন বোকা নিজের
 হাতে ঢাল রাখত। খোলটি কচ্ছপের পক্ষে সেই ঠাল হয়েছিল। কচ্ছপ
 নিজের খোলসের মধ্যে ঢলে গেলে সব রকম সুবক্ষিত হত। আশান্বে
 কি এমন কোন খোল আছে যেখানে পৌছলে আমরা পাপ থেকে
 মুক্তি পাব? আমাদের মনে বাসনা ফুল ফোঁপ উঠেছে। আশান্বে
 ওপরে বাসনা, ক্রোধ তথা আবেগের আক্রমণ হচ্ছে। এমন কোন
 উপায় আছে কি বাব বাদা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়? হ্যাঁ,
 উপায় আছে। ভগবান বলেছেন—কচ্ছপ যেমন বাইরের আক্রমণ
 থেকে বাঁচার জন্য নিজের খোলসে ভেতরে ঢলে যায় তুমিও তেমনি
 অধ্যাত্মের ভেতরে ঢলে যাও। সব আক্রমণ থেকে বেঁচে যাবে।
 অধ্যাত্মের ভেতরে ঢলে যাও চেতনার ভেতরে ঢলে যাও। ভেতরে ঢলে
 যাও অন্যের প্রবেশ কর, তা হলে সুবক্ষিত হবে। যত দিন মন বাইরে
 ঘূবে বেড়াবে, তত দিন পর্বস্ত বাসনা ও আবেগ ফুলে ফোঁপ উঠবে।
 যে সমস্ত পরিস্থিতি চিন্তা, ভয় এবং দুঃখ উৎপন্ন করে সে সবই মনকে
 ফুলিয়ে-কাঁপিয়ে দেয়। তুমি ভেতরে ঢলে যাও, চেতনার জগতে ঢলে
 যাও, চেতনার নৈকট্য লাভ কর, সম্পূর্ণভাবে নিবাপ্ত, সম্পূর্ণভাবে

সুবক্ষিত হবে। কোন বিপদ নেই, কোন ভয় নেই। সে এক
জ্বলন্ত শক্তি। এ শক্তি ভূমিও অনুভব করতে পাবে।

এক বকম কথা মানতেই হয়। আমাদের এক বকম কথা মানাব
প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনুভব করা সম্ভব। অধ্যাত্ম-কথা শুধু মনে
নেওয়ার জিনিস নয়। আপনারা যদি চান তবে আজই এই অবস্থাব
নির্ণয় করতে পারেন, আজ বাতেই শোবাব পব পবই এ সম্বন্ধে অনুভব
করতে পারেন। আপনার মনে কোন বিচার আসতে পারে, তাব
বিকল্প আসতে পারে, অনেক খাবাপ চিন্তা মনের ভেতব থেকে ঠেলে
উঠতে পারে। আপনি তৎক্ষণাৎ নিজের অন্তবে চলে যান, মনের
ভেতবে প্রবেশ করুন। আপনার মনে হবে আপনি যেন অল্প এক
জগতে এসে পৌঁছেছেন আব সমস্ত বিকাব, বিকল্প ও চিন্তা বাইবেব
জগতে থেকে গিয়েছে। আব তাবা আপনাকে আক্রমণ করতে পারবে
না। একেই বলে প্রেক্ষা ধ্যান। এব অর্থ—আপনি নিজেকে দেখতে
আবস্ত ককন। যে মুহূর্তে আপনি নিজেই নিজেকে দেখতে আবস্ত
করবেন, চেতনাব ক্ষেত্রে চলে যাবেন সেই মুহূর্তে আপনি বাসনা, ক্রোধ
ইত্যাদিব আক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন। আব কোন কিছুব আক্রমণ
হতে পারবে না।

অধ্যাত্মেব সাহায্যে আমরা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবি।
আমরা অধ্যাত্মেব চর্চা কবি তাব কাবণ অধ্যাত্মই আমাদের এই সব
বাইবেব আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারে, আব এই সব প্রভাবেব বশবর্তী
হওয়া থেকে বক্ষা করতে পারে। আজ আমরা অধ্যাত্ম থেকে খানিকটা
দূবে চলে গিয়েছি। আজ আমাদের পথ দেখানোব কেউ নেই।
অধ্যাত্মেব বহিস্তও আমাদের অজানা হবে গিয়েছে। এব কাবণ কি ?
যা ঘটেছে তা এই—

একটি লোক পথ চলছে। পায়েব আঘাতে জীব মবে যাচ্ছে।
আমরা বলি—জীবহিংসা হল। ঐ লোক অনেক প্রাণী মেবে ফেলল,
জীবহিংসা কবল। এই আমাদের বিচার, ব্যবহাবেব বিচার, বাইবেব

দুনিয়াৰ বিচাৰ। ভগবান মহাবীৰ এক কোন কোন মনস্বী আচাৰ্য
 এ কথা স্বীকাৰ কৰেন না। তাঁৰা এই কথা বলেছেন—অধ্যবসায় থেকে
 বন্ধন হয়। এক অধ্যবসায়, অপৰ ঘটনা। দুটো দুই জিনিস। অধ্যবসায়
 অন্তৰ্জগতৰ বিচাৰ, ঘটনা বাহ্য জগতে ঘটে। আচাৰ্য ভিক্ষু বলেছেন,
 যে হত্যা কৰে সে হিংসক। যে মাৰে অৰ্থাৎ যাব মাৰাব জন্তু অধ্যবসায়
 আছে সে হিংসক। জীৱ বেঁচে থাকল কি মাৰা গেল তাৰ সঙ্গে
 হিংসাৰ কোন সম্বন্ধ নেই। জীৱেৰ বেঁচে থাকা কোন দয়াৰ
 ব্যাপাৰ নয়, জীৱেৰ মৃত্যুও কোন হিংসাৰ ব্যাপাৰ নয়। জীৱ মৰুক বা
 না মৰুক, সেটা গোঁণ ব্যাপাৰ, অন্ত ব্যাপাৰ। হত্যা কৰাৰ যে সঙ্কল্প,
 অধ্যবসায় এক তাৰ পৰিণাম, সেই হল মুখ্য কথা। হিংসা হল হত্যাৰ
 জন্তু অধ্যবসায়, কোন জীৱেৰ মৃত্যুৰ ঘটনা নয়। অধ্যবসায়ৰ জগতে
 পৌছে যখন আমবা বহস্যসমূহ দেখি তখন আমাদেৰ সমস্ত সাধনপদ্ধতি
 পৰিবৰ্তিত হ'ব পাৰে। তাৰপৰ আমবা আৰ ঘটনাকে মুখ্য বস্তু বলে
 মেনে কাজ কৰি না, অন্তৰকে প্ৰধান মনে কৰে আচৰণ কৰতে থাকি।

সামাজিক জীৱন একটা দিক। আন্তৰিক জীৱনই সামাজিক
 জীৱন সম্বন্ধে নিৰ্ণয়ৰ আধাৰ। এই কাৰণে বলা হয়, দিন বা ৰাতি
 যে কালই হোক, কেউ দেখুক বা না দেখুক, তাতে কোন পাৰ্থক্য হয়
 না। যে স্থিতিতে দেখা বা না দেখাৰ মध्ये কোনও প্ৰভেদ থাকে না,
 সে হল আন্তৰিক ক্ষেত্ৰে স্থিতি। ব্যবহাৰেৰ জগতে প্ৰভেদ আসে।
 যে ব্যবহাৰেৰ নিয়ম অনুযায়ী চলে সে আচৰণ কৰাৰ আগে দেখে
 আলো না অন্ধকাৰ আছে, কেউ দেখছে কিংবা দেখছে না। এই
 বিচাৰেৰ আধাৰে তাৰ আচৰণ ঘটবে, সে পদক্ষেপ কৰবে।

স্বপ্ন কেন আসে? আমবা কেন ঘুমেৰ মধ্যে স্বপ্ন দেখি?
 মনস্তাত্ত্বিকদেৰ ব্যাখ্যা হল, আমাদেৰ মনেৰ দমিত বাসনাদি যখন
 আমাদেৰ জাগ্ৰত অবস্থাৰ প্ৰকট হ'বাব সুযোগ পায় না তখন তাৰা
 স্বপ্নেৰ ভেতৰে প্ৰকটিত হয়। সেই জন্তুই ঘুমেৰ ভেতৰে স্বপ্ন আসে।
 একটা সীমা পৰ্যন্ত এ কথা ঠিক বটে। কখনও কখনও এমন হয় যে,

শোঁবাব সময় যে কথা মনে থেকে যায় স্বপ্নে সেই কথা আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়। অধ্যাত্ম-বহুস্তৰ এটি একটি বড় সত্য। ক্ৰোধ আসে। সে পৰ্যন্ত পৌঁছে আপনাব স্থিতি বিনষ্ট হয়। তাব কোন ওষুধ নেই। তাকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যায় না। ব্যবহাৰেব দিক দিয়ে এ কথা তো ঠিকই বৰ্তে। আমি আপনাদেব সৰ্বদা ব্যবহাৰ থেকে মুক্ত থাকতে বলছি না। আমাদের নিয়ন্ত্ৰণ কৰাব শক্তি আছে, আমাদের বিবেক আছে। আমবা বাহ্য জগতে জীবন ধাৰণ কৰি, এই জন্তু আমাদের ব্যবহাৰকেও মেনে চলতে হয়। কিছু নিয়ন্ত্ৰণ হয়, দমনও হয়, ওষুধও দেওয়া হয়। কিন্তু অধ্যাত্মেব চৰ্চাব সময় এসব কথা বলতে কোন সঙ্কোচ হওয়া উচিত নয়। কাৰণ এ শুধু ব্যবহাৰেব কথা, অধ্যাত্মেব কোন কথা নয়। অধ্যাত্মেব কথাৰ মূল পৰ্যন্ত যেন পৌঁছই।

সমস্ত সমস্তাব মূল—বাগ এবং দ্বেষ। প্রচলিত ভাবাব বলা যায়—হিংসা। পৰিগ্ৰহই বল, অ-ব্ৰহ্মচৰ্যই বল, চুৰিই বল আৰ মিথ্যাভাষণই বল—এসব কিছুকেই আমাদের আচাৰ্যগণ হিংসা বলে স্বীকাৰ কৰেছেন। উলটো দিক থেকে দেখলে বলা যায় অহিংসা ছাড়া কোন মহাত্মত হয় না। দুটি কথাৰ মধ্যে ছনিষাব সব কিছু এসে যায়—হিংসা এবং অহিংসা। অহিংসা কি? বাগ-দ্বেষ প্ৰভৃতিকে উৎপন্ন হতে না দেওয়াৰ নাম অহিংসা। আপনি অহিংসাৰ কথা, অহিংসাৰ ঘটনা হিংসাৰ সঙ্গ এক কৰে দেখবেন না। ঘটনাৰ শেষ কৰে ফেলাব চেষ্টাও কৰবেন না। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণকে লক্ষ্য ককন। যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হয় প্ৰকৃতপক্ষে সেই হল জাগ্ৰত থাকাব সময়।

প্ৰেক্ষা ধ্যানেব সূত্ৰ হল—অপ্ৰমাদ ও জাগৰুৰতা। কি বিষয়ে জাগৰুৰতা? অতীভেব সম্বন্ধে জাগৰুৰ থাকাব কোন প্ৰয়োজন নেই। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জাগৰুৰ থাকাব কোন প্ৰয়োজন নেই। বৰ্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগ্ৰত থাক। বৰ্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগৰুৰ থাকাব তাৎপৰ্য : যে কোন বীজ পাওয়া গেলে তা বৰ্তমান ক্ষণেই বপন কৰতে হবে। পৰে ফল আসবে, পৰিণাম আসবে, মহীকহ জেগে উঠবে। সে বৃক্ষকে

আপনি উপডাতে পাবেন না। আপনি বলাগম বোধ কৰতে পাবেন না। আপনি শুধু লক্ষ্য কৰন, বীজ বপন কৰা হযেছে কিংবা হয নি। বৰ্তমান কালৰ যে ক্ষণে বীজ উণ্ট হযেছে সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমবা জাগৰুক থাকব। সেটি বাগেব তথা দ্বেষেব ক্ষণ। ঐ বাগেব ও দ্বেষেব বীজ যে মুহূৰ্তে বপন কৰা হয সেই মুহূৰ্তে আমি যদি জাগৰুক না থাকি তবে পৰিণাম-বিষয়ে সজাগ থাকাব কোন অৰ্থ হৰে না। অধ্যাত্মেব সূত্ৰ থেকে তাব যে এক বড় বহুস্ত্ৰ প্ৰতিপন্ন কৰা হযেছে সেটা হল—বাগেব তথা দ্বেষেব ক্ষণ হল হিংসাৰ ক্ষণ। অ-বাগ ও অ-দ্বেষেব ক্ষণ অহিংসাৰ ক্ষণ।

বহু বিচিত্ৰ ঘটনা ঘটে থাকে। মনেব মধ্যে কোন বিকল্প চিন্তা উঠিল, এক বিচাৰ মনে এল। তাকে উপেক্ষা কৰ। তাব পৰিণাম এই হৰে যে, ঐ বীজ যখন উণ্ট হৰে এক ঐ বীজ যখন বড় হৰে, অৰ্থাৎ বৃক্ষে পৰিণত হৰে তখন নিশ্চিতভাবে নিজেব পৰিণাম নিষে আসবে। আমবা যেন দুনিয়াৰ ঘটনাবলী দেখি। পঞ্চাশ-ষাট বছৰ পৰ্যন্ত যে যশস্বী থেকেছে, বাব জীৱনেব গূৰ্ব অংশ তেজস্বিতা ও বশেব আলোকে উদ্ভাসিত হযেছে, সে যখন জীৱনেব উত্তৰাংশে পৌছয় তখন তাব পতন হয, সে বিনাশ প্ৰাপ্ত হয। এ বকল কেমন কৰে সম্ভব হয ভেবে আমবা আশ্চৰ্য হই। যে লোক পঞ্চাশ-ষাট বৎসৰ যশস্বী এবং তেজস্বী জীৱন যাপন কৰেছে তাব জীৱনেব পৰেব দিক কেমন কৰে পতনেব দিকে যেতে পাৰে? আমবা সাধাৰণত এব ব্যাখ্যা কৰতে পাৰি না। কিন্তু ঐ বকল ঘটনাৰ পেছনে কোন কাৰণ অবগুই আছে। কিন্তু আমবা যদি মনেব গভীৰতাৰ এ বিষয়ে সূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা কৰি তবে এই তথ্য স্পষ্ট হৰে, যে বীজ বপন কৰা হযেছিল, তাৰ প্ৰাৰ্থনিত কৰা হয নি, এখন তা বৃক্ষে পৰিণত হযেছে, তাব কলে শেষেব ঘটনা ঘটেছে।

মনে বাগ এবং দ্বেষেব যে সংস্কাৰ উৎপন্ন হয তাকে ধুয়ে পৰিষ্কাৰ কৰে ফেলা, পৰিবৰ্তন কৰা তাব প্ৰাৰ্থনিত। এই প্ৰাৰ্থনিত কৰলে আব ঐ সব সংস্কাৰ উপজব কৰবে না। বীজকে নষ্ট কৰে দিলে তা

থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে না। প্রাশস্তিত না কবলে বীজ অঙ্কুৰিত হওম্বাৰ
এবং বেড়ে উঠাৰ সুযোগ পাবে। কালে কালে তা বৃক্ষে পৰিণত হবে,
তাৰ শিকড় ছড়িয়ে পড়বে। তখন তাকে আৰ বশ কৰাৰ উপায় থাকে
না। তাৰ যে বৰ্দ্ধদায়ক ফল তা আমাদেব ভোগ কৰতে হয়। কিন্তু
আমবা ঘটনাকে মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কৰি না, পবন্ত অন্তবকে
মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কৰি।

অধ্যাত্মেব অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বহুশ্য এই যে, বাগেব এবং দ্বেষেব বীজ
যে ক্ষণে উগ্ৰ হয় সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমাদেব জাগৰুক থাকতে হয়।

আমবা অহিংস। আমবা অত্যন্ত স্থূলভাবে মেনে নিযেছি যে,
কাউকে না মাৰাৰ নাম অহিংসা। কিন্তু বাগ ও দ্বেষেব বীজ যদি মনেব
ভেতবে উগ্ৰ হয় তবে কি কবে অহিংসা হবে? ব্যবহাবেব জগতেব
কথা তো ঠিকই। কোন লোক যদি কাউকে হত্যা না কবে তবে সে
আইনেব কবলে পড়বে না। আইন তাকে অভিযুক্ত কৰবে না, তাকে
বিবক্ত কৰবে না, কেননা সে এমন কোন কাজ কৰছে না যাতে সে
আইনেব আওতাৰ মধ্যে আসে। আইনেব সূত্ৰ—কাজ। এমন কাজ
বা আইনেব গণ্ডিৰ মধ্যে আসে। অধ্যাত্মেব সূত্ৰ—অধ্যবসায়। কাজ
হোক ছাই না হোক অধ্যবসায় মাত্ৰ দাৰিদ্ধ হয়ে যায়। এই বকম
অধ্যবসায়, সঙ্কল্প, বিচাৰ তথা পৰিণাম হিংসাৰূপান। ঐ বকম ভাব
মনে এলে আপনি যদি কিছু না কবেন তবে আপনি হিংসাৰ বন্ধনে
আবদ্ধ হন। আপনি নিজেৰে এভাবে প্ৰস্তুত কৰতে পাবেন—আমি
তো কোন কিছু কৰি নি, তবে আমি ঐ ঘটনাৰ জন্ত দায়ী হব কেন?
অধ্যাত্ম এ কথা স্বীকাৰ কৰে না আপনি ক্ৰিয়া-ৰূপে কিছু কবেন নি।
সে এই নিৰ্ণয়ে পৌছতে চায় যে, আপনি ঐ কপ চিন্তা কৰেছেন কিংবা
কবেন নি। ঐ বকম চিন্তাৰূপ ক্ৰিয়া কৰেছেন কিংবা কবেন নি।
চিন্তাৰ আধাবে, পৰিণাম এবং অধ্যবসাবেব আধাবে অধ্যাত্মেব সমস্ত
বিচাৰ হব, আইনেব সমস্ত বিচাৰ হয় কাৰ্যেব আধাবে। যদি আমবা
এই কথা ঠিকমত বুঝতে পাৰি তবে জাগৰুৰতাৰ ক্ষেত্ৰ মুক্ত হয়ে যায়,

জাগৰুৱাব নীমা বেঙে যায়। আমাৰ আমবা মূল সম্বন্ধে যতটো জাগৰুৱা হৈ পৰিণাম সম্বন্ধে ততটো জাগৰুৱা হৈ না। যখন আমাদেৱ মন প্ৰমাদ দ্বাৰা কিছুটা আচ্ছন্ন হয় তখন আমাদেৱ জাগৰুৱা পৰিস্থিতি তথা পৰিণামেৰ ওপৰে নিৰুদ্ধ হয়। আমবা ভাবতে থাকি—ও আমাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰেছে, ও আমাৰ সন্ধে এই বকম ব্যবহাৰ কৰেছে, ও আমাকে অপমান কৰেছে। আমাদেৱ সমস্ত চিন্তা বাহ্য জগতেৰ দিকে যায়। আমবা চিন্তা কৰে দেখি না এতে বাগ ও ছেবেৰ মুহূৰ্ত্ত কি ভাবে উজ্জীৱিত হয়। অৰ্থাৎ আমবা অধ্যাত্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইবেৰ বিচাবেৰ দিকে চলে যাই।

ভগবান মহাবীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সূত্র দিযেছেন—সমস্ত দায়িত্ব আত্মাৰ। তিনি কখনও বলেন নি যে আত্মা ছাড়া নান্নবেৰ কোন শক্তি বা মিত্ৰ আছে। তিনি বলেছেন, আত্মাই নান্নবেৰ মিত্ৰ। কিন্তু মিত্ৰেৰ খোঁজ কেউ কৰে না। তিনি কখনও বলেন নি, অন্য কেউ তোমাদেৰ বন্ধনদশাৰ নিয়ে যায়। ঐ বন্ধন এবং বন্ধনমুক্তিৰ দায়িত্ব, ঐ পুণ্য এবং পাপেৰ দায়িত্ব, ঐ সুখ ও দুঃখেৰ দায়িত্ব—এ সমস্ত দায়িত্ব আত্মাৰ। সব কিছু কৰ্মেৰ কৰ্তা আত্মা। সব কিছু দায়িত্ব আমাদেৰ ওপৰে গ্ৰস্ত, অধ্যাত্মেৰ এই গভীৰ তথ্যে কি আমবা পৌছনোৰ চেষ্টা কৰি? আমবা হামেশাই প্ৰত্যেক ব্যাপাৰেৰ দায়িত্ব অন্তেৰ ওপৰে আৰোপ কৰি এবং যখন অন্তেৰ ওপৰে দায়িত্ব আৰোপ কৰি না তখন আমাদেৰ মন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আমবা এখানে সেখানে খোঁজ কৰি অমুক এ বকম কৰেছে, অমুক ঐ বকম কৰেছে। ঐ বকম কৰে আমবা নিজেদেৰ হালকা বোধ কৰি, আব ভাবি এ বকম কাজই চলেছে। কিন্তু অধ্যাত্মেৰ বহুস্ত এ থেকে ভিন্ন। অধ্যাত্মেৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য : কেউ কাৰও জন্তু দায়ী নয়। আপনাদেৰ আত্মাৰ, আপনাদেৰ অধ্যবসায়েৰ সমস্ত কিছু ঘটনাৰ জন্তু চূড়ান্ত দায়িত্ব।

আমি আপনাদেৰ কাছে অধ্যাত্মেৰ বহুস্ত বিষয়ে দু-তিনি বকম আলোচনা উপস্থিত কৰেছি। ঐ আলোচনাৰ জন্তু অনেক বিস্তাৰ

প্ৰযোজন। কিন্তু আমি তা সংক্ষেপে বিবৃত কৰেছি। যদি এই দু-তিন বহুস্তৰ উদঘাটন আমাদেব মনে হওয়া সম্ভবপব হয়, আমাদেব জীবনে হওয়া সম্ভব হয়, তবে আব কোন বহুস্তৰব সন্ধানেব প্ৰযোজন নেই। আজ আমি যে সব আলোচনা কৰেছি সেই সব বহুস্তৰব সন্ধান সকলে কৰে। আমাদেব তীৰ্থঙ্কবগণ, আমাদেব আচাৰ্যগণ ঐ সব তত্ত্বেব খোঁজ কৰেছেন। তাঁদেব বাণীব সাবাংশ আমি আপনাদেব কাছে বিবৃত কৰেছি।

আপনাবা একটু একটু শ্রবণ বাখবেন। এই সব বহুস্তৰব ওপৰে আমাদেব ধ্যান কেন্দ্ৰিত হোক, আব নতুন নতুন বহুস্তৰব সন্ধানেব জগ্ৰ ব্যাকুলতা, ভাবনা এক শ্রদ্ধা আপনাদেব মনে জেগে উঠুক। আমাব মনে হয় আমাদেব পুৰুষকাব যদি এই দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, তবে এই সংসাবে ত্ৰৈলোক্যকাবী লোক বহু শাবীৰিক ব্যাধি এক মানসিক সংকট থেকে বাঁচতে পাবে এক কচ্ছপেব স্নানিত্তি অনুসৰণ কৰে এ বকম খোল তৈবি কৰতে পাবে যে, সমস্ত আক্ৰমণ থেকে বেঁচে সে নিজেকে স্নানিত্ত মনে কৰতে পাবে।

অধ্যাত্ম ও ব্যবহার

কোন কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কৰা আবশ্যক। বিনা প্রয়োজনে মূৰ্খ ব্যক্তিও কোন কাজে প্রবৃত্ত হয় না। এ জন্ত প্রয়োজন কি, তা স্পষ্ট কৰে প্রকাশ কৰতে হয়। প্রাচীন কালে গ্রন্থবচনাব প্রাবল্বে মঙ্গলাচরণ কৰা হত এবং উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ কি তা বলা হতো। এখনও সেবকম কৰা আবশ্যক। আমবা বা কবতে যাচ্ছি, তাব উদ্দেশ্য পৰিশুট কবতে হবে। যদি আত্ম-সাধনা, ধ্যান বা সমাধিব জন্ত প্রচেষ্টা কবতে চাই তবে সেগুলিব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। কেন আমবা এই বকম চেষ্টা কবব? এই প্রকাব প্রচেষ্টাব দ্বাবা আমবা কি হতে চাই?

দু বকঃ স্থিতি আছে। এক স্থিতি হল ‘হযেছে’, আব অপবটি হল ‘হতে যাচ্ছে’। ‘কি হযেছে’ তা প্রকৃতিবাদী দর্শন, বর্ণন ও নিকপণ কবে। কিন্তু আচাব শাস্ত্র বা আচাব বিজ্ঞানেব প্রতিপাত্ত হল ‘কি হতে চাই?’ বেখানে মূলেব প্রশ্ন ওঠে, সেখানে হওয়ার ব্যাপাবে জিজ্ঞাসা আসে ‘কি হতে চাই?’ প্রতিটি ব্যক্তিব পক্ষে কি হওয়া উচিত? সমাজেব কি হওয়া উচিত? বেখানে হওয়ার কথা আসে, সেখানে মূল্য-বোধেব বিকাশ হয়, আচাব শাস্ত্রেব বিকাশ হয়। হওয়ার কথাব সঙ্গে

‘আমাকে কি হতে হবে’—এই প্রশ্ন স্বভাবতই জড়িত থাকে। ‘কেন হতে চাই’—এই বিষয়েও ধাবণা স্পষ্ট হয়ে বাব।

জৈন আগমে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়—‘সংজ্ঞাপযুক্ত’ এবং ‘নো-সংজ্ঞাপযুক্ত’। চেতনা দুই প্রকাৰেব হয়—সংজ্ঞাপযুক্ত চেতনা, আৰ নো-সংজ্ঞাপযুক্ত চেতনা। চেতনাতে যখন সংজ্ঞা থাকে তখন তাকে সংজ্ঞাপযুক্ত চেতনা বলে, আৰ চেতনা যখন সংজ্ঞাকে অতিক্রম কৰে তখন তা হয় নো-সংজ্ঞাপযুক্ত চেতনা। বীতবাগ নো-সংজ্ঞাপযুক্ত, তাৰ ক্ষেত্রে বা তাৰ চেতনাতে কোন সংজ্ঞা থাকে না। বীতবাগ সংজ্ঞাতীত চেতনাৰ অৰ্থ হল—বিশুদ্ধ চেতনা, কেবল চেতনা। যে চেতনাৰ সঙ্গে সংজ্ঞা মিশ্রিত থাকে, যে চেতনা সংজ্ঞাৰ দ্বাৰা প্রভাবিত হয়, যে চেতনা সংবেদনাত্মক হয়—তাকে সংজ্ঞাপযুক্ত চেতনা বলা বায। সংজ্ঞা দশ প্রকাৰ, যথা—

- | | |
|-------------------|-----------------|
| ১। আহাব সংজ্ঞা | ৬। মান সংজ্ঞা |
| ২। ভয় সংজ্ঞা | ৭। মায়া সংজ্ঞা |
| ৩। মৈথুন সংজ্ঞা | ৮। লোভ সংজ্ঞা |
| ৪। পৰিগ্রহ সংজ্ঞা | ৯। লোক সংজ্ঞা |
| ৫। ক্রোধ সংজ্ঞা | ১০। গুণ সংজ্ঞা |

আমাদেব সাধনাৰ একমাত্র উদ্দেশ্য হল চেতনা থেকে এইসব সংজ্ঞাকে বহিষ্কৃত কৰা, অৰ্থাৎ বীতবাগ হয়ে বাওৱা। এই আমাদেব অধ্যাত্ম-সাধনাৰ উদ্দেশ্য। চেতনাৰ সাথে যে সংবেদন যুক্ত আছে, যে সংজ্ঞা জড়িত আছে, তাদেব নিৰ্মূল কৰা—এই আমাদেব স্পষ্ট লক্ষ্য। এই কাজেৰ দ্বাৰা কোন চমকপ্রদ শক্তি অৰ্জন কৰা আমাদেব উদ্দেশ্য নহ, উদ্দেশ্য কেবল নিজেৰ চেতনাকে সংশোধন ও পৰিমাৰ্জন কৰা—পৰিষ্কাৰ কৰা। যখন ব্যক্তিৰ চৰিত্র পৰিমাৰ্জিত ও পৰিষ্কৃত হয়, তখন তাৰ বিকাশ আৰম্ভ হয়ে বায। তবে কি আমবা আহাব কৰব না ? আহাব-সংজ্ঞাকে সমাপ্ত কৰাৰ অৰ্থ কি এই ? নিশ্চয়ই নহ। শবীৰ থাকতে এটা সম্ভবই নহ যে আমবা আহাব কৰব না। আহাব না কবলে

সাধনাব সামৰ্থ্যও থাকবে না। সাধনাব জন্ত শৰীৰ যদি প্ৰয়োজনীয় হয়, তবে শৰীৰেৰ জন্ত আহাবও প্ৰয়োজনীয়। আহাব ত্যাগ কৰা সম্ভব নহয়, কিন্তু আহাবেৰ প্ৰতি আসক্তি বা বাসনা ত্যাগ কৰা সম্ভব।

এই সব সংজ্ঞাব মध्ये এমন কিছু আছে যাতে নিৰ্মল জলে খানিক কাদা মিশে যায়। জল স্বভাবতই নিৰ্মল, কিন্তু তাতে ধূলা পড়লে, আৰ্জনা জমলে, তা মৰা হয় যেন। চেতনা স্বভাবতই শুদ্ধ, কিন্তু তাতে বিভিন্ন সংজ্ঞা এসে যুক্ত হয়, কলে তা বিকৃত হয় যেন।

ময়লা জল পৰিষ্কাৰ কৰা যায়। পৰিষ্কাৰ কৰাৰ অনেক পদ্ধতি প্ৰচলিত আছে। প্ৰাচীন কালে ঐ বকম অনেক পদ্ধতি ছিল। ময়লা জল নিৰ্মল হতে পাৰে। জল স্বভাবত স্বচ্ছ ও নিৰ্মল। তাৰ নিৰ্মলতা একেবাৰে নষ্ট কৰা যায় না। যে আৰ্জনা জলে মিশেছে তা দূৰ কৰা যায়। আৰ্জনা দূৰ কৰে দিলেই জল আগেৰ মত নিৰ্মল হয় যেন।

আমাদেৰ চেতনা নিৰ্মল। তাৰ নিৰ্মলতাৰ সমাপ্তি বা বিনাশ নেই। তবে চেতনাব এই অবস্থাস্থব ঘটতে পাৰে যে, যখন তাতে সংজ্ঞাব আৰ্জনা এসে জোটে, সংবেদনেৰ মালিন্য এসে লাগে, তখন তা মলিন ও অপৰিচ্ছন্ন হয় যেন। তখন চেতনা আবৃত হয় যেন, তাৰ স্বচ্ছতা আব থাকে না। যেমন ময়লাৰ আবৃত হলে দৰ্পণ অন্ধ হয় যেন। তখন তাৰ প্ৰতিবিম্ব গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা কমে যায় বা একেবাৰে লোপ পায়। কিন্তু ঐ দৰ্পণকে পৰিষ্কাৰ কৰলেই তাৰ ক্ষমতা আৰাব প্ৰকট হয়, তা প্ৰতিবিম্ব গ্ৰহণ কৰতে সক্ষম হয়।

সংজ্ঞাব সম্পৰ্শে চেতনা ধোঁয়াটে ও অস্পষ্ট হয় যেন, মলিন হয় যেন। চেতনাকে নিৰ্মল কৰা, তাকে ভাব প্ৰবৃত্ত অবস্থায় এনে কেবল চেতনাৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা—এই হল আমাদেৰ সাধনাব উদ্দেশ্য।

সাধনাব বহুত হল কেবল জ্ঞান। তা এখনও লাভ কৰা সম্ভব। কেবলজ্ঞান অৰ্থাৎ কোবা জ্ঞান শুধু জ্ঞানই, তাৰ মধ্যে সংবেদনেৰ সম্পৰ্শ নেই। আপনি ইচ্ছা কৰলেই এব অভ্যাস কৰতে পাবেন। আপনি কেবলজ্ঞানেৰ অবস্থায় এসে কেবলজ্ঞানী হয়ে যেতে পাবেন।

কেবলজ্ঞানকে সাধনাৰ অস্তিম স্তব, সাধনাৰ চৰম লক্ষ্য বলা হয়; আৰাব কেবলজ্ঞান সাধনাৰ প্ৰথম চৰণও বটে। যতক্ষণ কেবল জ্ঞানেৰ অভ্যাস না হ'বে ততক্ষণ সাধনাৰ ক্ষেত্ৰে অগ্ৰসৰ হওঁৱাৰ অধিকাৰ পাওঁবা যাৰে না। সাধনাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰবেশ কৰা আমাদেব পক্ষে তখনই সম্ভব হ'বে যখন আমবা কেবলজ্ঞান অভ্যাস কৰতে ব্ৰতী হই। বা আদিত্তে, অন্তেও তাই। আদিত্তে যে কেবলজ্ঞান সাধন, অন্তে সেই কেবলজ্ঞান নিজেই সাধ্য।

উপাদান উপাদানই থাকে। উপাদানেৰ মধ্য প্ৰথমে বা হ'ব, অন্তেও তাই থাকে। কোন পাৰ্থক্য হ'ব না। আমাদেব চেতনা যদি কেবল চেতনা না হ'ব তৰে আমবা কখনও কেবলজ্ঞান প্ৰাপ্ত হ'ব না। কেবলজ্ঞান তখনই প্ৰাপ্ত হওঁৱা যায় যখন আমবা প্ৰথম ক্ষণেই তাৰে প্ৰাপ্ত কৰে নিতে পাৰি। প্ৰথম ক্ষণেৰ কেবলজ্ঞানই অস্তিম ক্ষণেৰ কেবলজ্ঞান ৰূপে দেখা দেৱ। সাধনাৰ প্ৰথম ক্ষণেই যদি কেবলজ্ঞানেৰ সন্ধান না মেলে তৰে সাধনাৰ কোন ক্ষণেই—তা লক্ষ বংসৰ-ব্যাপী সাধনা হোক না কেন—কেবলজ্ঞান লাভ কৰা যাৰে না। সাধনাৰ প্ৰথম ক্ষণেই তাৰে লাভ কৰতে হ'বে, তৰেই অস্তিম ক্ষণে তাৰে লাভ কৰতে পাৰব।

বুস্তকাৰ এৰটি ঘড়া বানাল। ঐ ঘড়া যদি প্ৰথম ক্ষণেই কেটে না যায় তৰে আৰ কখনও কাটবে না। এৰটি শিশু জন্মাল। সে যদি প্ৰথম ক্ষণেই মৰে না বাব তৰে আৰ কখনও সে মৰবে না। সে অমৰ হ'য়ে গেল, কখনও সে মৰবে না। বাব প্ৰথম ক্ষণে বিনাশ ঘটে নি, তাৰ আৰ কখনও বিনাশ ঘটবে না। প্ৰথম ক্ষণেই বাব সন্মাপ্তি ঘটে নি, কখনও তাৰ সন্মাপ্তি ঘটানো যাৰে না। প্ৰথম ক্ষণেই যদি কেবলজ্ঞান না হ'ব, তৰে আৰ কখনও কেবলজ্ঞান হ'বে না। বাস্তবিক পক্ষে কেবলজ্ঞান হল কোবা জ্ঞান। এই জ্ঞানেৰ সঙ্গ সৰ্ববদন মিশ্ৰিত নেই। যখন আমবা সাধনাৰ এৰকম স্তব প্ৰাপ্ত হ'ব তখন আমবা কেবলজ্ঞানেৰ স্থিতি পৰ্যন্ত পৌছতে পাৰব।

প্রাণকে সংবেদন-শূন্য কৰা, সংজ্ঞাৰ প্ৰভাৱ থেকৈ মুক্ত কৰা, যোগ-সংযোগ থেকৈ মুক্ত কৰা—এই হল আমাদেৱ সাধনাৰ উদ্দেশ্য। প্ৰশ্ন হ'তে পাৰে, এমন কৰা কি কৰে সম্ভৱ হ'তে পাৰে? এই বিষয়ে আমি কিছু বিচাৰ কৰাৰ চাই।

বোগ-সংযোগ থেকৈ মুক্ত হওঁতাৰ জন্ম লোকোত্তৰ চিন্তা গঠন কৰাৰে হয়। আমাদেৱ চিন্তা দুই প্ৰকাৰে—লৌকিক চিন্তা, আৰু লোকোত্তৰ চিন্তা। যে চিন্তা সংজ্ঞাৰ ফাঁদে পড়ে, সংবেদনাৰ সঙ্গ জড়িত হ'ব গৈছে, তাই হল লৌকিক চিন্তা। যে চিন্তা পূৰ্বোক্ত দশটি সংজ্ঞাকেই অতিক্ৰম কৰে—তাদেৱ বন্ধন থেকৈ মুক্ত হ'ব—তাই হল লোকোত্তৰ চিন্তা। যিনি লোকোত্তৰ চিন্তা লাভ কৰে, তিনি নো-সংজ্ঞাপূৰ্ণ হ'ব গৈছে। একই শক্তি দুই ক্ষেত্ৰেই কাজ কৰে। যে উৰ্জা, যে প্ৰাণ ও যে শক্তি লৌকিক চিন্তাৰ কাজ কৰে, সেই উৰ্জা, সেই প্ৰাণ ও সেই শক্তি লোকোত্তৰ চিন্তাও কাজ কৰে।

শৰীৰেৰে ছটি মুখ্য কেন্দ্ৰ আছে। তাদেৱ একাটি কাম-কেন্দ্ৰ, অপৰটি জ্ঞান-কেন্দ্ৰ। নাভিৰ নিচে যে স্থান তা কাম-কেন্দ্ৰ বা বাসনা-কেন্দ্ৰ। নস্তিক হল জ্ঞান-কেন্দ্ৰ। আমাদেৱ শৰীৰে উৰ্জাৰ একই প্ৰবাহ আছে। যে স্থানে মন বাবে উৰ্জাও সেই স্থানে যাবে, প্ৰাণও সেই স্থানে যাবে। যদি আমাদেৱ মন, আমাদেৱ চিন্তন কাম-কেন্দ্ৰেৰ দিবে অধিক পৰিমাণে আকৃষ্ট হ'ব, হ'বে ঐ কেন্দ্ৰেৰ বল ও শক্তি বাঢ়বে, ঐ কেন্দ্ৰ সযুগ্ম হ'তে থাকবে। প্ৰকৃতিৰ এই অমোঘ নিয়ম যে, যা কিছু সিঞ্চন লাভ কৰে তাই পুষ্ট হ'বে। যা সিঞ্চন পায়না তা শুকিয়ে যায়, নষ্ট হ'বে যায়। যা সিঞ্চন পায় তা বাড়ে ও সযুগ্ম হ'ব। আমাদেৱ উৰ্জাৰ সিঞ্চন যে কেন্দ্ৰ লাভ কৰে সে কেন্দ্ৰ অবশ্যই পুষ্ট হ'বে, বাঢ়বে এবং সযুগ্ম হ'বে, তা সে কাম-কেন্দ্ৰই হ'ব বা জ্ঞান-কেন্দ্ৰই হ'ব। যদি এই সিঞ্চন নিচেৰ দিকে, কাম কেন্দ্ৰেৰ দিকে, যায়, তৰে আমাদেৱ উৰ্জাৰ প্ৰবাহ ঐ দিকেই ঘূৰে যাবে। আমাদেৱ সমস্ত প্ৰাণশক্তি ঐ দিকেই প্ৰবাহিত হ'তে আবদ্ধ কৰে। কলে কাম-কেন্দ্ৰ বলবান হ'তে

থাকবে, আব জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হয়ে পড়বে। এই হল লৌকিক চিন্তেব প্রক্রিয়া। লৌকিক চিন্তেব কাজই হল, সর্বদা কামনা কে পুষ্ট কবা, সেচন দিষে কাম-কেন্দ্র কে বলবান কবা। আমবা ভালকপেই এটা জানি যে, আমাদের জীবনে কামনা ব আকর্ষণ যতটা প্রবল আব কোন আকর্ষণই ততটা প্রবল নয়। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ঐ আকর্ষণ নিবস্তব স্থায়ী। ক্রোধেব আবেগ কখনও কখনও হয়, লোভেব চেতনাও কখনও কখনও প্রকাশ পায়, কিন্তু কামেব চেতনা নিবস্তর থাকে। যখন আমাদের চেতনা কাম-কেন্দ্রেব দিকে অধিক পবিমাণে প্রবাহিত থাকে, তখন সহজেই জ্ঞান-কেন্দ্রেব শক্তি ক্ষীণ হতে আবস্ত কবে। সাধনা ব দ্বাবা এই অবস্থাব পবিবর্তন কবতে হবে। যে সাধক নিজেব জ্ঞানেব বিকাশ চায়, নিজেব শক্তি ব অভিব্যক্তি চায়, নির্মলতা চায়, তাকে অবশ্টই চেতনা ব প্রবাহ কে ঙলটাতে হবে, ধোবাতে হবে। অর্থাৎ তাকে ওপবেব দিকে মন কে তুলে আনতে হবে।

ওপবে দেখে—ওপবেব দিকে তাকাও। এব এই অর্থ কবা যেতে পাবে যে, মোক্ষেব দিকে তাকাও। কিন্তু মোক্ষ অনেক দূবে। অত দূবে আমবা কেন যাব ? কাছে যা আছে, তাই আমবা দেখব, কিন্তু মনেব গতি ফেবাব মস্তিষ্কেব দিকে। গতিকে এভাবে বদলে দেব। প্রাণধাবাব প্রবাহ কে ঘুরিয়ে দেব, তাব গতিকে বদলে দেব। তাকে ওপবেব দিকে, জ্ঞান-কেন্দ্রেব দিকে, চালিত কবব। তখন জ্ঞান-কেন্দ্র প্রাণধাবা থেকে সিঞ্চন পাবে। সিঞ্চন পেলেই জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হবে, আমাদের সাধনা সহজেই সফলতা ব দিকে অগ্রসব হবে। জ্ঞানকেন্দ্র তখনই পুষ্ট হয় যখন আমাদের উর্জা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রবাহিত হয়। উর্জাব এই যে উর্ধ্বগতি, তাকেই কুণ্ডলিনী ব জাগরণ বলা যায়, বিশিষ্ট জ্ঞানেব উপলব্ধি বলা যায় বা ঐ বকম অশ্রু কিছুও বলা যায়। জ্ঞানেব সকল কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে। আবাব শক্তি ব সমস্ত শ্রোতও ঐ মস্তিষ্কে আছে।

শবীব শাস্ত্রেব দিক দিষে দেখলে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কই সমস্ত শবীব-তন্ত্রেব সঞ্চালন কবে। পায়ে একটা ছোট কাঁটা ফুটল, ফলে

পায়ে ব্যথা হল, কাঁটা যে ফুটেছে তাব অনুভব হল। আব অমনিই হাত এগিয়ে এল পায়েৰ সাহায্যে। কিন্তু কেন এমন হল? কাঁটা ফুটলেই আমাদের নাড়ি-মণ্ডল বা নাড়ি-সংস্থান সক্রিয় হয়ে ওঠে, আব মস্তিষ্ক পৰ্বম্ব এই সংবাদ পৌঁছে দেব যে, পায়ে কাঁটা ফুটেছে। মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ আদেশ দেব, কাঁটা বেব কবে দাও। এই আদেশ হাত পৰ্বম্ব আসে, আব তখন হাতেব আঙ্গুল এগিয়ে এসে পায়েব কাঁটা বেব কবে দেব। এই সমস্ত সঞ্চালনই মস্তিষ্ক থেকে হচ্ছে। ওটাই সঞ্চালনেব মুখ্য কেন্দ্র। মস্তিষ্কেব ওপৰ ধ্যান যতই কেন্দ্রিত হবে, মস্তিষ্কেব বিকাশ ততই ঘটতে থাকবে। আমবা তার খুব কম অংশেৰ বিকাশই কবতে পেবেছি। এব কাবণও স্পষ্ট। আমাদের যতটা শক্তি আছে, আমাদের যতটা ক্ষয়োপশম ক্ষমতা আছে, তা আমবা কাজে লাগাতে পাবি না। আমাদের ক্ষয়োপশম ক্ষমতাব সামান্য অংশই কাজে লাগে, বাকিটা পড়েই থাকে।

বিজ্ঞানেব ভাষা বলা যায যে, মস্তিষ্কেব যত ক্ষমতা আছে তাব ব্যবহাৰ আমবা কবতে পাবি না। ক্ষমতাব শতকবা সামান্য অংশই আমবা ব্যবহাৰ কবতে সমর্থ হই। তাব কাবণ মস্তিষ্কেব যে প্রকোষ্ঠ-গুলি খুললে অতিবিস্তৃত চেতনা আমাদের কাজে আসতে পারে, সেই প্রকোষ্ঠগুলি খোলাব কোন প্রয়াসই আমবা কবি না। আমাদের এই অসামর্থ্যেব হেতু এই যে, আমাদের চেতনাব সকল প্রবাহ নিচেব দিকেই চলেছে। সেজন্য সাধনাব এক মহৎ উদ্দেশ্য হল কাম-কেন্দ্রেব দিকে প্রবাহিত মনেব ধাবাকে, কাম-কেন্দ্রেৰ দিকে প্রবাহিত মনেব উৰ্জাকে, মোড় ঘূৰিয়ে ওপবেৰ দিকে নিয়ে যাওয়া। এটি একটি শ্রেষ্ঠ সাধনা।

আমাদের মনে নানা সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। আহাবেব সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়, মৈথুনেব সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়। এদেব উৎপত্তিব কি কাবণ? শাস্ত্রে প্রত্যেক সংজ্ঞাব উৎপত্তিব চাব চাবটি কাবণ আছে বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে একটি কাবণ খুবই গুরুত্বপূৰ্ণ। সেই কাবণ হল—স্মৃতি। বাব বাব আহাবেব স্মৃতি, বাব বাব ভাষেব স্মৃতি, বাব বাব মৈথুনেব স্মৃতি, বাব বাব

কামেব স্মৃতি মনে উদয় হচ্ছে, আব সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব সংজ্ঞা উত্তেজিত হয়ে উঠছে, উদ্বেল হয়ে যাচ্ছে। বাব বাব স্মরণ কবা, বাব বাব চর্চা কবা, বাব বাব আপনাব প্রাণশক্তিকে সংজ্ঞাব দিকে প্রবাহিত কবে দেওয়া—এই হল সংজ্ঞাব উদ্দীপনের পথ। সংজ্ঞা উদ্দীপ্ত হওয়াব কাবণ ঘটেছে, আমবা চেতমাকে তাব দিকে নিয়ে গিয়েছি, তাই তাব উদ্বেল হয়ে ওঠাব স্মরণ মিলেছে। যদি চেত না তাব দিকে না যেত তবে তাব উদ্বেল হওয়াব কাবণ ঘটত না। এক্সন্ড মহর্ষিগণ গভীৰ চিন্তা কবে বলেছেন, সাধক যেন ‘বিকথা’ না কবে। এ অতি গুঢ় তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। সাধক চৰ্চা কবতে পাবে, কিন্তু তাব ‘বিকথা’ কবা উচিত হবে না। কাবণ তাব মন যদি বিকথায় আসক্ত হয় তবে তাবা সমস্ত প্রাণ-ধাবাই ঐদিকে প্রবাহিত হতে আবিস্ত কববে। তাহলে সাধনাব ক্রম স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে জন্ম উৰ্জাকে কোন দিকে বইয়ে দিতে হবে, সে বিষয়ে আমাদেব ধ্যানকে কেন্দ্ৰিত কবতে হবে।

সাধনাব দৃষ্টিতে জাগবণেব সূত্র খুবই গুরুত্বপূৰ্ণ। জাগবণেব অর্থ হল—প্রবহমান উৰ্জাব প্রতি জাগবততা। অর্থাৎ, উৰ্জাব প্রবাহ কোন দিকে চলেছে? যদি প্রবাহ নিচেব দিকে চলতে থাকে, তবে তাব মোড ঘূৰিয়ে তাকে ওপবেব দিকে নিয়ে যাওয়া।

সংজ্ঞা দশটি। তাদেব মধ্যে আটটি সংজ্ঞাব অর্থ স্পষ্ট। যথা—আহাব সংজ্ঞা, ভয় সংজ্ঞা, মৈথুন সংজ্ঞা, পবিগ্রহ সংজ্ঞা, ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা আব লাভ সংজ্ঞা। এগুলি সহজেই বোঝা যায়। বাকি দুইটি সংজ্ঞা লোক সংজ্ঞা আব ওধ সংজ্ঞা। এদেব সম্বন্ধে কিছু জানা দবকাব।

‘লোক’ শব্দেব অনেক অর্থ আছে। তাদেব মধ্যে এক অর্থ, শবীব। স্মৃতবাং লোক সংজ্ঞাব অর্থ দাঁড়াল, দেহাসক্তি। কেবল মানুষেব নয়, প্রত্যেক প্রাণীবই দেহাসক্তি থাকে। শবীবেব প্রতি তাব নিবিড় সম্বন্ধ থাকে। প্রত্যেক প্রাণীই শবীবকে বাঁচাতে প্রযত্ন কবে। কিন্তু সাধকেব কাছে শবীব বাঁচানোব প্রশ্নই মুখ্য নয়। শবীবকে ঠিকমত বক্ষা কবা।

আবশ্যক বাটে। কিন্তু তা মুখ্য উদ্দেশ্য নহ। তাকে প্রথম স্থান দেওয়া যায় না, দ্বিতীয় স্থান হয়ত দেওয়া যায়।

লোক-সংজ্ঞাব আব এক অর্থ, লৌকিক মান্যতাব ধাবণা দিযে মগজ ভবে দেওয়া। অনেক বকম মান্যতা মাখায় ঢুকিযেছি। সে জ্ঞাত চেতনাৰ বিকৃতি প্রবল হয়েছে। এখানে একটা ছোট কথা বলি। লোক-প্রচলিত বিশ্বাস অনুসাবে আমবা ধবেই নিযেছি যে, স্বভাবকে বদলান যায় না। এই ধাবণাই আমাদের দৃঢ় হয়েছে। বলে, আমাদের চেতনাৰ এক ছিত্র হয়েছে, আব ছিত্রপথে বিৰ প্রবেশ কবে চেতনাৰ সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখন আমবা কিছু কবতেই আব সক্ষম নই, কাৰণ আমাদের দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে যে, স্বভাব বদল কবা সম্ভব নব। সে জ্ঞানই একটা গভীৰ অর্থপূৰ্ণ কথা মনে বাখতে হয়—কোন বিষয়ে ধাবণা কবাৰ পূৰ্বে সেই বিষয়েৰ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে হয়। কাৰণ যে ধাবণা একবাৰ হয়ে যায়, তা আব ছাড়তে চায় না, আমবা ঐ ধাবণাৰ দ্বাৰা আবদ্ধ হয়ে যায়। চেতনাৰ সমস্ত প্রবাব তখন বিপৰীতমুখী হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূৰ্ণ প্রশ্নেৰ বিষয় হল—সংকল্পেৰ স্বতন্ত্ৰতা বা স্বাধীনতা। আমবা কি সংকল্প কবাৰ ব্যাপারে স্বাধীন? এই প্রশ্ন নিযে ভাবতীৰ্য ও পাশ্চাত্য দৰ্শনে যথেষ্ট চিন্তন ও মনন কবা হয়েছে।

পশ্চিমে তিন প্রকাৰ মতবাদ চলিত আছে, বথা—

১। নিযতিবাদ।

২। আত্মবাদ।

৩। আত্ম-নিযতিবাদ।

প্রথম বাদ—নিযতিবাদ। নিযতিবাদী মনে কবে যে মানুষ যন্তবৎ। যে বকম পৰিস্থিতি হয়, যে বকম বাতাবৰণ হয়, মানুষকে তদনুসাবেই কাজ কবতে হয়। সে সৰ্বদাই যন্তবৎ পৰিচালিত হয়। মানুষেৰ নিজেৰ কোন স্বাধীন সংকল্প নেই। এই হল নিযতিবাদী ধাবা।

দ্বিতীয় হল আত্মবাদী ধাবা। ঐ মতবাদ অনুসাবে সংকল্প কবাৰ

বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা আছে। মানুষ পবিত্রত্বের দাস নয়, সে পবিত্রত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

তৃতীয় হল আত্ম-নিয়তিবাদী ধারা। আত্ম-নিয়তিবাদী মত এই যে, নিয়তি সত্য হতে পারে, কিন্তু আমাদের পবিত্রত্বের নিয়তি কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা পূর্ণভাবেই স্বাধীন, সর্বদাই স্বাধীন।

আমরা কি সংকল্প কবাব ব্যাপারে পবিত্রত্বের দাস? আমরা কি যন্ত্রের তুল্য? আমরা কি পবিত্রত্বের দাস? অথবা, আমরা কি পূর্ণভাবে স্বাধীন? কোন পবিত্রত্বই কি আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না?

আমরা যদি যন্ত্রবৎ হই, আর সমস্ত ব্যাপারই যদি নিয়তির দ্বারা সঞ্চালিত হয়, তবে আমাদের বুঝতে হবে যে, স্বভাব বদল করা সম্ভব হবে না। যদি আমাদের স্বভাব নিয়ত হয়, তবে তাকে বদলানোর জন্য কোন সংকল্প বা পুরুষার্থের প্রয়োজন আমাদের থাকে না। আমাদের সকল প্রযত্নই ব্যর্থ হবে।

কিন্তু আমি এ কথা স্বীকার করি না। আমি মনি যে স্বভাবকে বদলানো যায়। সংজ্ঞাপূর্ণ চেতনাকে নো-সংজ্ঞাপূর্ণ করে নেওয়া যায়। সকল সংজ্ঞাই পবিত্রত্বের দ্বারা যায়। যখন এ সব কিছুই হতে পারে, তখন ‘স্বভাবকে বদলানো যায় না’—এই কথাটি আপনা আপনি অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। স্বভাব বদলায়, স্বভাবকে বদলানো যায়।

আমি এটা মনি যে আত্মা কিছু অন্তর্নিহিত বিশেষত্ব আছে। বাহ্য পবিত্রত্ব বা বাতাবরণ কিছু প্রভাব বিস্তার করতে পারে বটে, কিন্তু আত্মা অন্তর্নিহিত শক্তি এতই প্রবল যে, যখন তা জাগ্রত হয় তখন বাহ্য প্রভাব শূন্য হয়ে যায়, নির্মূল হয়ে যায়—তাব অন্তিম পর্যন্ত থাকে না।

আমরা বাহ্যের দ্বারা তখনই প্রভাবিত হই যখন আমাদের কবায় সংজ্ঞা প্রবল হয়। এক শ্রেণীর সংজ্ঞাকে কবায় সংজ্ঞা বলে। এই

এই শ্রেণীতে চাবটি সংজ্ঞা আছে—ক্ৰোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মায়া সংজ্ঞা, এবং লোভ সংজ্ঞা। এই চাব সংজ্ঞাব সাধাবণ নাম কষায সংজ্ঞা। যখন এদেব প্রাবল্য হয় তখন আমাদেব ওপব বাহু পবিস্থিতিব প্রভাব এসে পড়ে, আব যখন এবা প্রবল থাকে না তখন বাহু পবিস্থিতিব প্রভাব তীব্র হয় না। ঐ প্রভাব তখন ক্ষীণ হয়ে যায়। আগমে এই তথ্য এই ভাবে বোঝানো হয়েছে। এক দেওয়ালে দুটি মাটিব গোলা ছুঁড়ে মাঝা হল। একটি গোলা ছিল ভিজ়ে মাটিব, আব একটি ছিল শুকনো মাটিব। যেটি ভিজ়ে ছিল সেটি দেওয়ালে আটকে গেল, আব যেটি শুকনো ছিল সেটি নিচে মাটিতে পড়ে গেল। ভিজ়ে আটকে গেল, আব শুকনো নিচে ঝবে পড়ল। যদি দেওয়াল ভিজ়ে হয় তবে অবশুই তাতে ধুলো লেগে ঝবে। যদি তা শুকনো হয় তবে ধুলো নিচে ঝবে পড়বে, তাতে লেগে থাকবে না। কষায চেতনা যেন ভিজ়ে। ঐ চেতনা যখন প্রবল হয় তখন বাহু পবিস্থিতি প্রবলৰূপে প্রভাব বিস্তার কবে, আব যখন তা প্রবল থাকে না তখন বাহু বাতাৰবণও প্রভাব দেখাতে পাবে না। আকাশ সৰ্বদা আকাশই থাকে। তাৰে কিছুই প্রভাবিত কৰতে পাবে না। বৃষ্টি হোক, শিলাপাত হোক, জাঁধি আশুক, তুফান চলুক, বিদ্যুৎ চমক দিক, আবও যা কিছু হোক—আকাশ যেমন ছিল তেমনই থাকে। আকাশ বৃষ্টিতে ভেজে না, শিলাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয় না, জাঁধাবে ধোঁয়াটে হয় না, বিদ্যুতে জ্বলে ওঠে না। বোজ়েব তেজ় যতই হোক না কেন, আকাশ কখনও গবম হয় না। যত ববকই পড়ুন না কেন, আকাশ কখনও ঠাণ্ডা হয় না।

চেতনা যদি বিস্তুদ্ধ হয় তবে বাইবে যা কিছু ঘটুক না কেন, ব্যক্তিব ওপব কোন প্রভাব পড়ে না। চেতনাতে সংজ্ঞাব লোপ পড়েছে, তাই তাতে বাইবেব ব্যাপাবেব ছাপ পড়ে—বাইবেব ব্যাপাব তাতে আটকে ঝায়। তখন উদ্বেজনা বাড়তে থাকে।

এই তথ্য আমাদেব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে, মাছতাৰ ওপব নির্ভব কবে আমবা যেন নিজেদেব ধাবণাগুলি গড়ে না তুলি। এই লোক

সংজ্ঞাকেও আমাদের ছাড়তে হবে।

সংজ্ঞাকে যদি একটিমাত্র শব্দের দ্বাৰা বুঝতে চাই, তবে সেই শব্দ হবে—মূৰ্ছা। যেমন আমাদের ভয়েৰ মূৰ্ছা, কামেৰ মূৰ্ছা, কৰায়েৰ মূৰ্ছা, পৰিগ্ৰহেৰ মূৰ্ছা ভাঙতে হয়, তেমনই আমাদেৰ লোক মূৰ্ছা, লৌকিক ধাৰণাৰ মূৰ্ছা ভাঙতে হবে। এই মূৰ্ছা প্ৰবল হয়। যত দিন এই মূৰ্ছা দূৰ না হবে, ততদিন অগ্ৰ সমস্ত মূৰ্ছাকে ভাঙাব প্ৰয়োজন সিদ্ধ হবে না। আমবা নিজেৰ মাগ্ৰতাৰ জালে জড়িয়ে পড়েছি। যাৰ চিন্তাশক্তি কম সে অতি শীঘ্ৰেই এই জালে জড়িয়ে পড়ে। এই বিপদেৰ ঘাঁটি পাৰ হতে হবে, লোক সংজ্ঞাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটতে হবে।

আব এক সংজ্ঞা আছে—ওখ সংজ্ঞা, অৰ্থাৎ সামূহিক চেতনা বা প্ৰবাহপাতী চেতনা। লোকে বলছে—‘ভয়েৰ কাৰণ কি? সৰাব যা ঘটছে আমাদেৰ অবশ্যই তাই ঘটবে।’ এই হল প্ৰবাহবাহী চেতনা। এক প্ৰবাহেৰ সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিলাম, আব সেই সুযোগে নিজেৰ মন্দ আচৰণকে প্ৰবাহবাহী চেতনাৰ দ্বাৰা সংৰক্ষণ কৰলাম। ‘যা সৰাব ভাগ্যে ঘটে তাই আমাব ভাগ্যে ঘটবে, ভাবনাৰ কোন কাৰণ নেই’—এই বকম চিন্তা কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক চেতনা। আমবা যখন এই চেতনাৰ জালে আবদ্ধ হই তখন বেবিষে আসা খুবই কঠিন হয়।

এই মূৰ্ছাকে ভাঙতে না পাবলে আমবা সাধনাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰবেশ কৰতেই পাবৰ না। এটা খুবই আবশ্যক যে এই মূৰ্ছা ত্যাগ কৰে আমবা নিজেৰ ব্যক্তিত্ব গঠন কৰি, অৰ্থাৎ শুদ্ধ চেতনা নিৰ্মাণ কৰি।

ব্যবহাৰিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্ৰেৰ এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন—‘আমাকে একটা শিশু দাও, আব বল, তুমি তাকে কি বানাতে চাও। তুমি চাও তো আমি তাকে ডাকাত বানিয়ে দেব, তুমি চাও তো আমি তাকে মহাত্মা বানিয়ে দেব। যেমন চাও, তেমন বানাব। কাৰণ আমি পৰিস্থিতিকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰতে পাৰি, আব এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰই ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰ গঠন নিৰ্ভৰ কৰে, ব্যক্তি ভাল বা মন্দ হয়ে গড়ে উঠে।’

এ বকম ঘোষণা লোকেৰ কাছে অদ্ভুত মনে হতে পাবে। তবে

শুধু আশ্চৰ্যজনক নহ, এ ঘোষণা মুখদায়কও বটে। যদি কোন ব্যক্তিব হাতে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে, সে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে লোককে যেমন ইচ্ছা তেমনই বানাতে পাবে, তৰে সংসাৰে পৰমাত্মা কল্পনা কৰাব স্থূলই আৰু থাকে না। পৰমাত্মাকে মানাব কোন আবশ্যকতাই থাকে না, কাৰণ এ বৈজ্ঞানিক তো স্বয়ং পৰমাত্মা বনে গিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক তো ঘোষণা কৰসেন। লোকেও তা শুনল। কিন্তু কিছুই হল না। মানুহ বানানো সম্ভব হল না। কেবল বাহ্য পৰিস্থিতিব সাহায্যে মানুহ গড়াৰ কথা যখন ওঠে তখন আমবা এই সত্য ভুলে যাই যে, যদি কোন মানুহেৰ স্বকীয় কোন বৈশিষ্ট্যই না থাকে তৰে সে মানুহ মানুহই নহ। সে চেতনাবান প্ৰাণীই নহ। সে যজ্ঞ মাত্ৰ।

এও আমাদেব বুঝতে হৰে যে, যদি কোন সাধক ঘোষণা কৰেন তাঁৰ কাছে কোন শিশুকে বাখলে তিনি যেমন চাওয়া যাবে তেমন কৰেই তাঁকে মানুহ কৰে দেবেন, তৰে তিনি অসম্ভব কথা বলছেন। এ খুবই কঠিন ব্যাপাৰ, কাৰণ পৰিস্থিতিব দ্বাৰা যেমন ব্যক্তিকে গড়া যায় না, তেমনই কেবল সাধনাৰ দ্বাৰাও সে কাজ কৰা সম্ভব হয় না। আমাদেব দেখতে হৰে কোন ব্যক্তিব কতটা আন্তৰিক ক্ষমতা আছে, অৰ্থাৎ কাৰ কতটা ক্ষয়োপশম ক্ষমতা আছে। এই এক কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমাদেব দেখতে হৰে কোন ব্যক্তি সাধনাৰ কতখানি অবসৰ লাভ কৰছে, কি প্ৰকাৰ বাতাবৰণ আৰু পৰিস্থিতিব মध्ये কালাতিপাত কৰছে। একদিকে আন্তৰিক ক্ষমতা, অন্যদিকে বাতাবৰণ ও পৰিস্থিতি— এই উভয়েৰ উপযুক্ত সংযোগ হলেই চেতনা নিৰ্মলীকৰণেৰ কাজ অগ্ৰসৰ হতে পাবে। এই দুটিব কোন একটিব ক্ৰটি থাকলে, প্ৰযত্ন কৰা সন্দেহও সফলতা হৰে না। যদি এই তথ্য মনে বেখে চলি তৰে সাধনাৰ প্ৰতি, সাধনাৰ উদ্দেশ্যেৰ প্ৰতি, আমাদেব দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হৰে না এবং আমবাও ধীবে ধীবে অগ্ৰসৰ হতে পাব।

ধ্যায় যদি স্পষ্ট না হয়, শক্তি যদি অল্প হয়, অথচ মনে যদি অনেক কিছু কৰাব চিন্তা থাকে, তা হলে সম্ভবত মাৰপথেই বিভ্রান্ত হৰে

যুবে বেড়াতে হবে।

একটা শুল্কৰ কাহিনী আছে। এক শেখৰ দুই ছেলে ছিল। শেঠ ভাবল, কাকে আমাব উত্তৰাধিকাৰী কৰি। সে পৰীক্ষা কৰাব ইচ্ছা কৰল। তাৰ প্ৰচুৰ বিস্ত ছিল। সে দুই ছেলেকেই পাঁচ লাখ কৰে টাকা দিবে বলল, 'যাও, আমি তোমাকে টাকা দিলাম। বাজ্যেৰ প্ৰত্যেক শহৰে একটা কৰে পাকা বাড়ি বানাও, আৰ তিন মাসেৰ মধ্যেই আমাকে খবৰ দিও। ছেলেবা চলে গেল। ঐ বাজ্যে অনেক শহৰ ছিল। সময় পূৰ্ণ হল। তিন মাস কেটে গেল।

এক ছেলে ফিৰে এল। তাকে শ্ৰান্ত-শ্ৰান্ত ও দুৰ্বল দেখাছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা কৰল—'পাকা বাড়ি বানিয়েছ ?' ছেলে বলল—'কয়েকটি শহৰে বানিয়েছি। কি কৰে সব শহৰে বানাব ? আপনি যে টাকা দিয়েছিলেন তা তো তিন-চাৰটি পাকা বাড়ি কৰতেই ব্যয় হয়ে গিয়েছে।'

অপৰ ছেলেটিও ফিৰে এল। তাকে খুব প্ৰসন্ন দেখাছিল। শেঠ জিজ্ঞাসা কৰল—'কতগুলি পাকা বাড়ি বানিয়েছ ?' সে বলল—'বাবা, সব শহৰেই পাকা বাড়ি কৰেছি।' তাই শুনে শেঠ জিজ্ঞাসা কৰল—'কত ব্যয় হল ?' ছেলে বলল—'ব্যয় কিছুই হয় নি। পাঁচ লাখ টাকা খৰাই আছে।' শেষ জিজ্ঞাসা কৰল—'তা হলে কি কৰে কৰনে ?' তখন ছেলে উত্তৰ কৰল—'সব শহৰেই আমি মিত্ৰ কৰেছি। এমন গভীৰ মিত্ৰতা কৰেছি যে, মিত্ৰদেব সব বাড়িই আমাব নিজেৰ বাড়ি হয়ে গিয়েছে। যখন ইচ্ছা তখনই সেই সব বাড়িতে যেতে পাৰি।'

এই কাহিনী থেকে আমবা এই বুঝি যে, শক্তিৰ ব্যবহাৰ আমবা কৰতে পাৰি, কিন্তু তাৰ আগে আমাদেব শক্তি কতখানি তা ওজন কৰে বুঝতে হবে, এক কি ভাবে ঐ শক্তিৰ ব্যবহাৰ হবে তাও ভাবতে হবে। যদি নিজেৰ শক্তিৰ পৰিমাণ সম্বন্ধে সঠিক বোধ থাকে তবে প্ৰত্যেক স্থানেই পাকা বাড়ি কৰা সম্ভব হতে পাৰে। আৰ শক্তিৰ যদি ঠিক আন্দাজ কৰতে না পাৰি, নিৰ্ণয় কৰতে না পাৰি, তবে সামান্য কয়টি পাকা বাড়ি বানাতেই আমাদেব ধন হুৰিযে যাবে।

শরীর ও তার বিশিষ্ট কেন্দ্র

আমাদের উপর, মধ্য ও নিচ—এই তিন মুখ্য ভাগ আছে। এই তিন ভাগেই শক্তির স্রোত প্রচ্ছন্ন আছে। শরীরশাস্ত্রজ্ঞগণ শরীরকে এক বিশেষ কোণ থেকে দেখেছেন। সেই কোণ সর্ববিদিত। কিন্তু যোগাচার্যগণ শরীরকে আব এক কোণ থেকে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন—শরীরে কতগুলি মুখ্য কেন্দ্র, চৈতন্য-কেন্দ্র, জ্ঞান-কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত কবতে পাবলে, সক্রিয় কবতে পাবলে, শক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়, আব শক্তির বিশেষ অনুভব হতে আবমুদ্র কবে। ভগবান মহাবীর আচার্যগণ সূত্রে বলেছেন—‘আয়তচক্ষু লোকবিপদসী’, ‘লোগসূ অহে ভাগ জ্ঞানই, উভ্চ ভাগ জ্ঞানই, তিবিয় ভাগ জ্ঞানই’—যে আয়তচক্ষু হয়, সংযতচক্ষু হয়, বে লোকদর্শী হয়, যার উন্মীলিত-চক্ষু এক বিন্দুতে স্থির থাকে, সেই লোকদর্শী উর্ধ্বলোক, মধ্যলোক, অধোলোক—তিন লোকই দেখতে পায়।

আমাদের শরীরই লোক। বস্তুকে পুরুষের মাধ্যমে বা লোকেব মাধ্যমে বোঝানো প্রাচীন পদ্ধতি। জৈন পবম্পর্ষাব লোককে বোঝানোর জন্য লোক-পুরুষের কল্পনা কবা হয়েছে। পুরুষের সাথে লোকেব তুলনা কবা হয়েছে। পুরুষের শরীরের তিন ভাগ আছে—উর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ

ও অধোভাগ। সেই বকম লোকেবও তিন ভাগ হয়—উর্ধ্বভাগ, মধ্যভাগ ও অধোভাগ। এখানে লোকেব অর্থ—শবীৰ, পুৰুষ-শবীৰ। পুৰুষ-শবীৰেব তিন ভাগেব ওপৰই ধ্যান কৰা যায়। ভগবান মহাবীৰ-শবীৰেব তিন ভাগেব ওপৰই ধ্যান কৰতেন। প্ৰথম ভাগ হল—ৰূপাল, মস্তিষ্কেব ওপৰ অংশ, মুখ্য মস্তিষ্ক—এই ভাগই হল ধ্যানেব মুখ্য কেন্দ্ৰ, শক্তিৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ। দ্বিতীয় ভাগ হল ভ্ৰুকুটি বা অজ্ঞাচক্ৰ। তৃতীয় ভাগ বিশুদ্ধি চক্ৰ, যা কণ্ঠমণিৰ স্থান। এ ছাড়া চতুৰ্থ ভাগ আছে—মনঃচক্ৰ। আমাদেব গলাৰ সোজা নিচে নাভিৰ বাব আঙ্গুল ওপৰে যে স্থান আছে, তাই হল মনঃচক্ৰ। জৈন পৰম্পৰায় এই প্ৰসঙ্গে ‘কচক প্ৰদেশেব’ কথা বলা হয়েছে। এই প্ৰদেশ এমন যে এব ওপৰ কোন আবৰণ নেই, তা নিৰাবৰণ। এ যদি অনাবৃত না থাকে তৰে চৈতন্ত্বেব হেৰুৱেব হয়ে যায়। জীৱ আব জীৱ থাকতে সমৰ্থ হয় না। যোগেব আচাৰ্যগণ মনঃচক্ৰেব আটটি দল স্বীকাৰ কৰেছেন। এই দিক থেকে কচক প্ৰদেশেব সঙ্গে এব তুলনা কৰা হয়েছে। এই হল মনঃচক্ৰ। এব থেকে অল্প দূৰে হৃদয়েব যে স্থান তাও গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই স্থান আমাদেব উৰ্ধ্ব শবীৰেব চৈতন্ত্বেব এক বিশেষ কেন্দ্ৰ।

মধ্য শবীৰেব মুখ্য কেন্দ্ৰ—নাভি। নাভি শক্তিশালী কেন্দ্ৰ। নাভি আব তাৰ দু দিকেব ভাগই খুবই শক্তিশালী।

আমাদেব শবীৰেব অধোভাগে অনেক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ আছে। মেকদণ্ডেব নিচে যে বাঁক (‘কাৰ্ভ’) আছে, মেকদণ্ড যেখানে শেষ হয়, সেখানে যে মাংসপিণ্ড আছে, তাকে কুণ্ডলিনীৰ স্থান বলা হয়। সেখানেই প্ৰাণধাৰা উৎপন্ন হয়, বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই স্থান জেনা-বেটেৰেব কাজ কৰে, এখান থেকেই সমস্ত শবীৰে বিদ্যুৎ সবববাহ হয়। এই স্থান মেকদণ্ডেব অন্তিম প্ৰান্ত। তাৰ পৰে আসে জননেন্দ্ৰিয়েব স্থান, আব তাৰও পৰে পায়েব আঙ্গুল। অধো শবীৰেব—অধোলোকেব—এণ্ডুলিই মুখ্য স্থান।

শবীৰে এই সবই চেতনাৰ মুখ্য কেন্দ্ৰ। আমাদেব কোন্ কেন্দ্ৰকে

জাগ্রত কবতে হবে, সক্রিয় কবতে হবে। তা নির্ভব কববে আমাদেব
 লক্ষ্যেব ওপব। প্রশ্ন হবে, কেন্দ্রেবে জাগ্রত কবাব পদ্ধতি কি ? এক
 সবল পদ্ধতি হল, আপনি যে কেন্দ্রেবে জাগ্রত কবতে চান, সক্রিয় কবতে
 চান, তাব ওপব মনকে একাগ্র ককন। মন যতই একাগ্র হবে ততই
 ঐ কেন্দ্রে জাগ্রত হবে, সক্রিয় হয়ে উঠবে। যে ব্যক্তি বাব বাব বাসনাব
 কথা চিন্তা কবে, তাব বাসনা-কেন্দ্রে। জননেন্দ্রিয়েব স্থান সক্রিয় হয়ে
 যাবে। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ কবতে চায়, সে যদি তাব সমগ্র মন
 মস্তিষ্কেব মধ্যভাগে একাগ্র কবে তবে তাব জ্ঞান-কেন্দ্রে সক্রিয় হয়ে
 যাবে। যে ব্যক্তি পবিত্রতা লাভ কবতে চায়, পবিত্র হতে চায়, সে
 বিশুদ্ধি-চক্রেব ওপব মনকে বাবে বাবে একাগ্র ককক। এব বলে
 বাসনাব সংস্কাব দ্বীণ হবে, আব পবিত্রতা আসতে থাকবে। যে প্রাতিভ
 জ্ঞান চায়, কি ঘটতে যাচ্ছে তা আগেই জেনে নিতে চায়, সে আপন
 মন আত্মাচক্রেব ওপব কেন্দ্রিত ককক। ঘটনাব পূর্বাভাস পাওয়া
 সম্ভব হবে। আমাদেব এবকম ভিন্ন ভিন্ন প্রযোজন থাকতে পাবে।
 এটা সত্য যে, যাব প্রতি আমবা বেশি মনোযোগ দেব, তা আমাদেব
 প্রতি অনুকূল হয়ে যাবে। আমবা লৌকিক ব্যবহাবেও সর্বদা অনুভব
 কবেছি যে, যে ব্যক্তিকে আমবা বেশি পছন্দ কবি, যাব সম্বন্ধে আমবা
 ভাল ভাব পোষণ কবি, যাকে আমবা বেশি ভালবাসি ও স্নেহ কবি,
 যার সঙ্গে সর্বদা সম্বন্ধ বাধতে চেষ্টা কবি, সেই ব্যক্তি সহজেই আমাদেব
 হয়ে যায় ও আমাদেব প্রত্যেক ইচ্ছা পালন কবতে যত্নবান হয়। সেই
 ভাবে যে জ্ঞানতত্ত্বে আমবা প্রশিক্ষিত কবি তা নিশ্চিতকপে আমাদেব
 আদেশ পালন কবে। সেই জ্ঞানতত্ত্ব আমাদেব আদেশ পালন কবে না,
 যাব সঙ্গে আমাদেব সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি, যাকে আমবা প্রশিক্ষিত
 কবি নি বা যাব সঙ্গে আমাদেব মন সংযুক্ত হয় নি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা
 বা মানসিক চিকিৎসাব একটা মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যদি তোমাব অস্ত্র
 ঠিকমত কাজ না কবে তবে বাব বাব অস্ত্রেব ওপব মন কেন্দ্রিত কব ও
 তাকে আদেশ দাও তা যেন ঠিকমত কাজ কবে। অল্প সময়েব মধ্যেই

অল্পেব মধ্যে যে জ্ঞানতত্ত্ব আছে তা তোমাব আদেশ মেনে নেবে ও ঠিক কাজ কবতে আবস্ত কবে। যখন আমবা জ্ঞানতত্ত্বগুলিকে উপেক্ষা কবি তখন তাবাও উদাসীন থাকে ও কোন সহযোগিতা কবে না। যখন আমবা তাদের ওপব সাপেক্ষ হই, তাদের অপেক্ষা বাখি, তখন তাবাও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমাদের অপেক্ষিত কাজ কবতে তৎপব হয়। এ সবই আমাদের উপেক্ষা আব অপেক্ষাব ওপব নির্ভব কবে। জ্ঞানতত্ত্বব শক্তিব বা সহযোগিতাব কোন ন্যূনতা হয় না। যে ব্যক্তি প্রাণশক্তি বা তৈজসকে প্রবল কবতে চায় সে ব্যক্তিকে মেকদণ্ডেব নিচে অবস্থিত মাংসপিণ্ডেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত কবতে হবে। প্রাণধাবাব প্রবলতা সাধনেব পক্ষে ঐ স্থান খুবই উপযুক্ত।

এখন আমি নিচেব দিকে বাব। পায়েব বুডো আঙ্গুলেবও যথেষ্ট মূল্য আছে। সেখানে প্রাণেব সীমা। যে প্রাণেব প্রবাহ নাসাগ্র থেকে চলতে আবস্ত কবে তা পায়েব বুডো আঙ্গুলে এসে সমাপ্ত হয়। যে ব্যক্তিব মনে আপনাব শক্তি ও বীর্যকে সুবক্ষিত কবাব চিন্তা আছে, সে যেন পায়েব বুডো আঙ্গুলে ধ্যান কেন্দ্রিত কবে। যোগে এক প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট আছে। যে ব্যক্তি বীর্যদোষগ্রস্ত, তাব সম্বন্ধে বলা হবোছে, সে যেন সবলভাবে শয়ন কবে এবং শাষিত অবস্থায় শবীবকে একটু ওপবেব দিকে তুলে পায়েব বুডো আঙ্গুলেব ওপব মনকে একাগ্র কবে, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কবে। এই মুদ্রায দুই-এক মিনিট থাকতে হয়। দিন কয়েক এই মুদ্রা অভ্যাস কবলেই বোগমুক্ত হবে।

এই কটি মুখ্য কেন্দ্র, যেখানে মনকে নিযোজিত কবলে আমবা লাভবান হতে পাবি। আধুনিক শবীবশাস্ত্রে কতকগুলি নতুন গ্রন্থিব, নতুন গ্ল্যান্ডেব, উল্লেখ কবা হযেছে। সেগুলিও আমাদের বুঝতে হবে, সেগুলি থেকেও যথাসম্ভব লাভ আদায় কবতে হবে।

আমাদের শবীবেব চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, কমল আছে। যোগেব ভাষায় আমবা শুনি, আমাদের শবীবে ছয়টি চক্র আছে, সাত-আটটি গ্রন্থি আছে, আব হৃদয-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতি

কমল আছে। শৰীৰ শাস্ত্ৰেৰ দৃষ্টিতেও কতকগুলি গ্ৰন্থি গ্ৰন্থিপাদিত হৈছে, কতকগুলি কমলও নিৰ্দিষ্ট হৈছে। তবে, এ সব শব্দ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰতে পাবে, তাই এগুলি আমাদেব বুঝতে হবে। এই যে সব কেন্দ্ৰ নিৰ্দিষ্ট আছে—মুখ্য কেন্দ্ৰ আছে, সেখানে প্ৰাণতন্ত্ৰ অনেকটা জড়িয়ে পড়েছে, এঁকে-বোঁকে গিয়েছে। প্ৰাণেৰ খাবা সেখানে সোজা চলতে পাবে না, তাকে ঘূৰে যেতে হয়, চেপ্টা কৰে যেতে হয়। সেজগ্ৰহী এগুলিকে ‘গ্ৰন্থি’ বলা হৈছে। জট-পাকানো পথ বলে গুদেৰ গ্ৰন্থি বলা হৈছে, চক্ৰ বলা হৈছে। এব উদ্দেশ্য এই বোঝানো যে, সেখানে গতি চক্ৰাকাৰ ও স্বৰ্ণমান, সহজ বা সবল নয়। সেজগ্ৰ ‘চক্ৰ’ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ‘কমল’ শব্দটি প্ৰতীকাত্মক। কমল এমন বিচিত্ৰ বস্তু যা বিকশিত হয়, আৰাৰ শুকিয়ে সঙ্কুচিত হৈছে বাৰ। বাৰ সঙ্কোচ ও বিস্তাৰ আছে, যাতে সঙ্কোচ ও বিকাশেৰ শক্তি আছে, তাকেই কমল বলা যায়। এখানে কপক অৰ্থে ‘কমল’ শব্দেৰ প্ৰয়োগ। এব অভিপ্ৰায় এই যে, যদি আপনাবা এ সব ধ্যান কেন্দ্ৰেৰ ওপৰ ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰে এগুলিকে সক্ৰিয় কৰে তোলেন, তবে এগুলি সহজ ও সবল হৈছে বাবে, এব আপনাদেৱ প্ৰাণখাবা সোজা পথে প্ৰবাহিত হওযাৰ সুযোগ পাবে। আৰ যদি আপনাবা এ কেন্দ্ৰগুলিকে উপেক্ষা কৰেন, তাদেৱ ওপৰ ধ্যান কেন্দ্ৰিত না কৰেন, তবে তাবা সবল হৈছে না, সঙ্কুচিতই থাকবে এব তাৰ বলে আপনাদেৱ প্ৰাণখাবা সোজা বাস্তা না পোৱে এঁকে-বোঁকে চলাব চেপ্টা কৰতে বাধ্য হৈছে।

এখন এই তিনিটি কথাই স্পষ্ট হল যে, আমাদেৱ শৰীৰে গ্ৰন্থি আছে, চক্ৰ আছে, কমল আছে। কমলেৰ মত কিছু দেখতে না পোৱে আধুনিক কালেৰ ডাক্তাৰ বলেন—‘আমবা গোটা শৰীৰটাই কেটে-কুটে দেখেছি, শৰীৰেৰ প্ৰতিটা অণুই বিশ্লেষণ কৰেছি, কিন্তু কোথায়, কমলেৰ তো দেখা পাই নি। কোথায় আঙা চক্ৰ, কোথায় বিস্কন্ধ চক্ৰ ইত্যাদি—কই, এসব কিছুই তো দেখা যায় নি।’ স্বীকাৰ কৰতেই হবে, ডাক্তাৰ এ বকম কিছু দেখতে পান নি। তবে, আঙা চক্ৰ থাক বা না থাক,

বিশুদ্ধি চক্রে থাক বা না থাক, এখন যে ‘পিনিয়াল’ আব ঐ বকম অনেক গ্রন্থি—অনেক ‘গ্ল্যান্ড’—সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে, তুলনাত্মক দৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখলে ধোঁগশাস্ত্রের প্রতিপাদন ও শবীবশাস্ত্রের প্রতিপাদনের মধ্যে যে বিশেষ ভেদ আছে এমন বোধ হবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, আমরা মনকে কোথায় লাগাব ? ধ্যানকে কোথায় কেন্দ্রিত করব ? এব উত্তর আপনাদের ওপবই নির্ভব কবে। আপনাদের লক্ষ্য কি ? আপনাবা কি চান ? আপনাদের প্রাপ্তিব বিষয় কি ? যদি ধ্যানের নির্মলতা সাধন আপনাদের লক্ষ্য হয়, তবে আপনাদের ধ্যান-কেন্দ্রের ওপব ধ্যান কবতে হবে। আচার্যগণ কিছু কিছু ব্যবস্থা দিখেছেন। আমরা ‘ণমো অবহং তাং’—এব ধ্যান কোথায় কবব ? অর্হতের ধ্যান কোথায় কবা উচিত ? তাঁবা বলেছেন, শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান-কেন্দ্র, সেটাই অর্হৎ ধ্যানের স্থান।

কেন্দ্রগুলি স্কুলভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত—জ্ঞান-কেন্দ্র আব বাসনা-কেন্দ্র। যখন আমাদের প্রাণধাবা তথা মনের গতি নিচের দিকে যায়, তখন বাসনা-কেন্দ্র সক্রিয় হয়, তীব্র হয় ও জাগ্রত হয়। জ্ঞান-কেন্দ্র দুর্বল হয়ে যায়। আবার যখন আমাদের প্রাণধাবাব—তথা মনের—গতি ওপবের দিকে ওঠে, তখন আমাদের জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিয় হয়, তীব্র হয়-ও জাগ্রত হয়। বাসনা-কেন্দ্র ক্লীণ হয়ে যায়। অর্হতের স্থান হল—মস্তিষ্ক। যদি আমরা মস্তিষ্কে অর্হতের ধ্যান কবি, তবে আমরা জেনে বা না জেনে জ্ঞান-কেন্দ্রের জাগবণ কবতে থাকি। জ্ঞান-কেন্দ্র জাগ্রত হয়ে যাবেই। এই হল জ্ঞান-কেন্দ্রকে সক্রিয় কবাব উপায়। আচার্যবা বলেছেন—অর্হতের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত বর্ণের ধ্যানও কব। মস্তিষ্কের বে অগ্রভাগ, সেখানে এক বকম পদার্থ আছে। তাব বঙ মেটে—খানিকটা হলদে, খানিকটা সাদা। সেখানে শ্বেতবর্ণের (ধূসরের) ধ্যান লাভপ্রদ। তাতে সেখানকার পবমাণুগুলি সহজ শক্তি প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক আপনা-আপনি শক্তিশালী হয়ে যায়। আমাদের জ্ঞান-কেন্দ্রের তন্তুগুলি সক্রিয় হয়ে জেগে ওঠে।

‘গমো সিদ্ধাংশ’—এব ধ্যানের স্থান ললাট—আজ্ঞাচক্র। এব বর্ণ—
 রক্ত। আজ্ঞাচক্র আমাদের সমস্ত সক্রিয়তাকে উৎপন্ন কৰে। শবীবের
 ওপৰ নিয়ন্ত্ৰণ বাধা—জ্ঞানাত্মক নিয়ন্ত্ৰণ বাধা—এই চক্ৰের প্রধান কাজ।
 লাল বৰ্ণ প্ৰচুৰ উদ্ভেজনা, সক্রিয়তা ও গতি উৎপাদন কৰে। যে ব্যক্তি
 দীৰ্ঘকাল ধৰে লাল বৰ্ণেৰে ধ্যান কৰে তাৰ বিপদও হতে পাৰে। লাল বৰ্ণ
 থেকে অতিবিক্ত উষ্ণা উৎপন্ন হয়। তাতে বিপদের সৃষ্টি হতে পাৰে।
 ব্ৰহ্মের সমস্ত সক্রিয়তাই লাল বৰ্ণেৰে কাৰণে।

এখন প্ৰশ্ন, ‘গমো আয়বিবাংশ’—এব ধ্যান কোথায় কৰব ? আচাৰ্য
 আচাৰেৰ প্ৰতীক। আচাৰেৰ অৰ্থ—পবিত্ৰতা। পবিত্ৰতাৰ স্থান হল,
 গলাৰ পাশ। সেখানে যদি আমবা ধ্যান কেন্দ্ৰিত কৰি তো আমাদেৰ
 আচাৰেৰে ভাবনা সহজেই আসবে, আমাদেৰ পবিত্ৰতা জাগ্ৰত হবে।
 সেখানে আমাদেৰ হৃদয়ে বৰ্ণেৰে ধ্যান কৰতে হবে। পীত বৰ্ণ ভাবনাকে
 বেগবতী কৰে। ‘অ্যানাটমি’ শাস্ত্ৰ অনুসাবে, শবীবের আভ্যন্তৰীণ শ্ৰাব
 সৰ্দি, গৰ্মি প্ৰভৃতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যাব শবীবের শ্ৰাব কম হয়, সে ব্যক্তি
 অসমৰ্থেই বুড়ো হয়ে যায়, ক্ষীণ হয়ে যায়। তাৰ শবীবের উপচয় বন্ধ
 হয়ে যায়। যাব শবীবে শ্ৰাব যথোচিত হয়, তাৰ শবীবের সুসমঞ্জস
 বিকাশ হয়। এই শ্ৰাবই আমাদেৰ শবীবের ওপৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে,
 আমাদেৰ প্ৰস্থিগুলিৰ নিৰামক তত্ত্বই এই শ্ৰাব। পীত বৰ্ণেৰে সজ্জ, ‘গমো
 আয়বিবাংশ’—এব ধ্যান এই নিৰ্দিষ্ট স্থানে কৰতে হয়। পীত বৰ্ণ সদ্-
 ভাব ও আচাৰেৰ পুষ্টিসাধক হয়। যে ব্যক্তি পীত বৰ্ণেৰে ধ্যান কৰে সে
 ব্যক্তি যেমন জ্ঞানেৰে বিকাশ সাধন কৰে, তেমনই পবিত্ৰ ভাবনাৰ
 বিকাশেৰেও পোষকতা কৰে। আপনাবা দেখবেন যে, পবিত্ৰ ভাবনাৰ
 প্ৰতীক ৰূপে যেখানে বৰ্ণেৰে নিৰ্বাচন কৰা হয়েছে সেখানেই পীত বৰ্ণকে
 গুৰুত্ব দেওয়া হয়েছে—পীত বৰ্ণকে মুখ্য স্থান দেওয়া হয়েছে।

‘গমো উপজ্ঞায়াংশ’—এই উপাধ্যায়েৰে ধ্যান কৰাব স্থান—মনঃ-
 চক্ৰ। কেউ কেউ মনে কবেন, এই ধ্যানের স্থান—হৃদয়। এ নিষে
 অনেক মীমাংসা হয়েছে। মোট কথা, এটা হৃদয়-স্থানেৰে ব্যাপাব নয়,

এব স্থান মনঃচক্ৰ। মনঃচক্ৰেৰ ওপৰ উপাধ্যায়েৰ ধ্যান কৰতে হয়। প্ৰাচীনকালে একে হৃদয়-চক্ৰ বলে মানা হতো। উপাধ্যায়েৰ ধ্যান নীল বৰ্ণেৰ সঙ্গ কৰতে হয়। নীল বৰ্ণ খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আপনাদেব মনে উদ্ভেজনা হযেছে, জটিলতা হযেছে। আপনাবা ঐ উদ্ভেজনা ও জটিলতাকে প্রশমন কৰতে নিজদেব অসমৰ্থ বোধ কৰেছেন। ঐ অবস্থায় আপনাবা বিশ মিনিট ধৰে নীল আকাশেৰ দিকে তাকিষে থাকুন। অবশ্য ঐ সময়েৰ আকাশ যেন স্বচ্ছ ও নিবাবৰণ থাকে। আকাশ দেখতে থাকলে অল্প সময়েৰ মধ্যেই আপনাব মনেৰ উদ্ভেজনা কমে যাবে, চিন্তা মিটে যাবে, জটিলতা হ্ৰাস পাবে। নীল বৰ্ণেৰ প্ৰধান কাজ—মনকে শান্ত কৰা, উদ্ভেজনাকে কমিষে দেওয়া। বোগী যখন খুবই উদ্ভেজিত হয়, যখন তাৰ ঘুম কিছুতেই আসে না, তখন তাকে নীল বঙেৰ জল পান কৰানো হয়। এতেই তাৰ উদ্ভেজনা কমে—ঘুম আসতে থাকে। বোগীৰ ছটকটানি ও কষ্টেৰ উপশম হয়।

‘গমো লোএ গব্, সাছগং’। মুনিৰ স্থান—চৰণ। পায়েৰ অঙ্গুষ্ঠেৰ স্থানেৰ খুব মহত্ব আছে। সেখানকাৰ বৰ্ণ—কৃষ্ণ, অৰ্থাৎ কালো। কালো বৰ্ণেৰ নিজস্ব এক অৰ্থ আছে। এব থেকে অবশোৰণেৰ ক্ষমতা হয়, বাৰ ফলে বাইবেৰ কোন প্ৰভাব ভেতৰে যেতে পাবে না।

এই হল পাঁচটি স্থান ও পাঁচটি বৰ্ণ। যে আচাৰ্যবা এই স্থান ও বৰ্ণগুলিৰ ব্যাখ্যা কৰেছেন, তাঁবা শবীবেৰ গঠনপ্ৰণালীৰ সঙ্গ সম্পূৰ্ণ পৰিচিত ছিলেন। তাঁব জ্ঞানতেন, কোন্ স্থানে কোন্ বৰ্ণেৰ ওপৰে ধ্যান কৰলে কোন শক্তি জাগ্ৰত হয়। স্থান ও বৰ্ণেৰ পৰিকল্পনা এই ভিত্তিতে কৰা হযেছিল যে সেখানে কেন্দ্ৰ সক্ৰিয় হতে পাবে ও তাৰ শক্তিৰ বিকাশ হতে পাবে। আপনাবা স্মৰণ বাখবেন এ সবই মত-বাদেৰ কথা, বিজ্ঞানেৰ বখাও বটে। শবীবেৰ কেন্দ্ৰগুলি বিভাবে জাগ্ৰত কৰা যায়, সে বিষয়ে জৈন আচাৰ্যবা নিজদেব ভক্তিৰে এই সব পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক চিন্তা কৰেছেন।

জৈন পৰম্পৰায় ‘এগ পোগ্‌গল নিৰিট্‌ট্‌দিট্‌ট্‌’ আৰ ‘নাসাগ্‌গ

নিবিচ্ছিন্নদিটি'—এক গুদগলেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব বা নাসাগ্ৰেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব কথা এসে যায়। প্রশ্ন হতে পাবে, নাসাগ্ৰেব ওপবই দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবতে হবে কেন ? যে কোন স্থানেই তো দৃষ্টিকে স্থিব কবা যায়। আসলে, তাৎপর্যটা কি ? দৃষ্টিকে কেন ভ্রুকুটিব ওপব স্থিব কবব ? অন্ততঃ তো স্থিব কবতে পারি। উত্তবে বলতে হবে, এ সবেব পেছনেই গভীৰ অৰ্থ আছে, বহুস্ত আছে। অমুক স্থানেব ওপব কেন্দ্রিত হলে, অমুক অমুক তন্তু সক্রিয় হয়, জাগ্রত হয়। শবীবের দিক থেকে দেখলেও, এইসব স্থানেব মহত্ব আছে। আধ্যাত্মিক বা যোগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সব স্থানেব মহত্ব আবও ভাল কবে বোঝা যায়। শবীবশাস্ত্ৰেব দৃষ্টি দৈহিক স্বাস্থ্যতেই সীমিত। জ্ঞানেব বিকাশ কবা, পবিত্রতাৰ বিকাশ কবা—এগুলি যোগেব দৃষ্টিকোণ থেকে কবণীয় কাজ। শবীবের অমুক অমুক স্থানকে জাগ্রত কবলে জ্ঞান বাড়ে, পবিত্রতা আসে—এই দৃষ্টি যোগ-শাস্ত্রীয়, শবীবশাস্ত্রীয় নয। শবীব অস্থি, মাংস, মজ্জা দিয়ে গঠিত—কেবল এই দৃষ্টিতেই আমবা শবীবকে দেখব না। দেখাব আব একটা কোণও আছে। মজ্জা একটি খাতু, কিন্তু তাব কাজ কি ? শবীবশাস্ত্রজ্ঞ এই প্রশ্নেব উত্তব দেবেন। জ্ঞানেব কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক জ্ঞান ও ক্রিয়া—দুটিকেই নিয়ন্ত্ৰণ কবে। এখানে গৃষ্ঠবজ্জুও মস্তিষ্কেব সহায়তা কবে। এই বিষয়ে শবীবশাস্ত্রজ্ঞেবা অনেক বিচাব কবেছেন। যাঁবা ডাক্তাবি পডছেন, ডাক্তাব হছেন, তাঁবা এই সব কথা সূক্ষ্মভাবেই জ্ঞানেন। কিন্তু মস্তিষ্কেব অতিবিস্তৃত অস্ত্র কেন্দ্রকে সহযোগীৰূপে বিকশিত কবলে আমাদেব ভাবপক্ষ, জ্ঞানপক্ষ ও ক্রিয়াপক্ষেব কোন কোন চেষ্টা সফল হয়ে ওঠে—তা এঁদেব জ্ঞানাব বিষয় নয। অবশ্য আজকাল তাঁবাও এই ক্ষেত্ৰ নিবে কাজ কবতে আবন্ত কবেছেন। আগে তো এই ক্ষেত্ৰ তাঁদেব পক্ষে একেবাবে অববন্ধ ছিল।

আমি সূক্ষ্ম শবীবের কথা ছেড়ে দিযেছি। ঐ শবীবকে সক্রিয় কবাব উপায়ও আছে। এখানে সে বিষয়েব আলোচনা কবব না।

শুল শবীবেব সঙ্গে আমাদেব নিকট সম্বন্ধ । কি উপায়ে ঐ শবীবেব
মুখ্য কেন্দ্ৰগুলিকে সক্ৰিয় কৰা যায়, তাব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবলাম ।
যদি আমবা এই বিষয়ে মনোযোগ দিই তবে নিজেদেব ভাবনা অনুসাৰে
অমুক অমুক কেন্দ্ৰকে সক্ৰিয় কৰে লাভবান হতে পাবব ।

রাজগড় শিবির

(৭ জুন, ১৯৭৩—১৭ জুন, ১৯৭৩)

হিমার শিবির

(২ অক্টোবর, ১৯৭৩—৯ অক্টোবর, ১৯৭৩)

শরীর বোধের অপেক্ষা

সেদিন ছিল দীপাবলী। এক ব্যক্তি আসছিল। বাস্তায় আর এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর দেখা হল। দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে আসছ ?' প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিল, 'বাজার থেকে।' 'কি এনেছ বাজার থেকে ?' 'দীপ এনেছি।' প্রথম ব্যক্তির হাতে দীপ ছিল, অর্থাৎ মাটির এক আকারবিশেষ ছিল। কিন্তু মাটির তো দীপ হয় না। দীপ তাকেই বলে যা প্রকাশমান—যার আলো আছে, দীপ্তি আছে। যা প্রকাশমান নয়, তা দীপ নয়। অথচ ওই মাটির পাত্র ছাড়া কেবল সলতে আলো দেয় না, দীপ হয় না। যখন মাটির পাত্রে তেল ভরা হয়, সলতে তেলে জ্বলে, তখনই দীপ্তি হয়। পাত্র ছাড়া কেবল সলতে বা কেবল তেল কিছু করতে পারে না, সলতে ও তেল একত্রেও কিছু করতে পারে না। আধাবই যেন স্বয়ং দীপ হয়ে গেল। তাই সাধারণ লোকের ভাষায়, সলতে দীপ নয়, যা তাব আধাব তাই দীপ।

আমাদের ঠিক এই বকম অবস্থা। আমাদের চেতনার প্রকাশ আমাদের শরীরেই প্রকট হয়। শরীর বাদ দিয়ে চৈতন্য প্রকট হতে পারে না। সেজন্য শরীরও আত্মা হয়ে যায়। প্রাচীন সাহিত্যে চেতনাকে

আত্মা বলা হয়েছে, আবার শরীরকেও আত্মা বলা হয়েছে। চৈতন্যের যোগ আছে বলেই শরীরকে আত্মা বলা হয়েছে। আত্মাকে পুঙ্গলও বলা হয়েছে। শরীর তো পৌদগলিক, তাকেও আত্মা বলা হয়েছে। এখানে আমি ভেদ-বিজ্ঞানের দিক থেকে কথা বলছি। আত্মা ও পবনাত্মা অভিন্ন, কিন্তু তাদের ভিন্ন মনে করা হয়েছে। আত্মা আব শরীর ভিন্ন, কিন্তু তাদের অভিন্ন মনে করা হয়েছে। এব কাষণ এই যে, শরীরের শক্তি আব আত্মার শক্তি—এই দুই শক্তির মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে। শরীরের শক্তি ছাড়া আত্মার শক্তি কার্যকর হয় না। আবার আত্মার শক্তি ছাড়া শরীরের যন্ত্র সঞ্চালিত হতে পারে না। যেমন আগেই বলেছি, দাঁপের যদি পাত্র না থাকে তবে আলো পাওয়া যাবে না। বাল্ব নেই, কেবল বৈদ্যুতিক কার্বেট আছে, তাতে আলো হলে না। অভিব্যক্ত হওয়ার জন্য আলোর না দীপ্তির এক আবরণ প্রয়োজন। শরীর বিনা চৈতন্যের প্রকাশ অভিব্যক্ত হতে পারে না। চোখের গোলক যদি ঠিক না থাকে তবে লোকে দেখতে পায় না। চোপই যে দেখে, তা নয়। চোখ অভিব্যক্তির এক মাধ্যম মাত্র। কিন্তু গোলক ছাড়া চোখ দেখতে পায় না। চোখ আব তার গোলক—এই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অতি গভীর।

আমরা যখন সাধনার কথা মনে বেখে চিন্তা কবি, তখন শরীরকে অনেক অভিশাপ দিই, গাল দিই। তবে শরীর যদি গালির যোগ্য হয় তবে প্রশংসার যোগ্যও বটে। যদি শরীর না থাকত তবে আমাদের এই জগৎও বস্তুহীন হতো। কোন কিছুই ব্যক্ত হতো না, সারা জগৎ অব্যক্তই থেকে যেত। সাধনার দৃষ্টিতেও শরীরের মধ্যেই গুরুত্ব আছে। শরীর নষ্ট বটে, কিন্তু সমস্ত শক্তিকে শরীরই অভিব্যক্তি দেয় ও আমাদের নামনে উপস্থাপিত করে। আপনাবা বা দেখছেন কেবল সেটাই শরীর নয়, সেটা স্থূল শরীর মাত্র। সেই শরীরও শক্তিশালী, কিন্তু অল্প যেসব শরীর আছে তাদের সঙ্গে তুলনায় কম শক্তিশালী। সেই সব অল্প শরীর হল—সূক্ষ্ম শরীর। নাস্তিকবাও এই শরীরের মধ্যে আত্মার

সন্ধান কৰতে চেষ্টা কৰেহেঁ। বাজা প্ৰদেশী চোৰেৰ শৰীৰ টুকৰো
 টুকৰো কৰে কেটে আত্মাৰ সন্ধান কৰেহেঁ। কিন্তু আত্মাৰ দেখা
 মেলেনি। আজকেৰ বৈজ্ঞানিকবাও স্কুল শৰীৰকে মুখ্য মনে কৰে আত্মাৰ
 সন্ধান ব্যাপ্ত হায়েহেঁ। তাঁৰা মৃত্যুৰ পূৰ্বে জীৱন্ত শৰীৰেৰ ওজন
 নিষেহেঁ, আৰাৰ মৃত্যুৰ পৰে মৃত শৰীৰেৰ ওজন নিষেহেঁ। তাঁদেৰ
 উদ্দেশ্য, দুই শৰীৰেৰ ওজনেৰ মধ্য কোন পাৰ্থক্য হয় কিনা, তা নিৰ্ধাৰণ
 কৰা। যদি ওজন কম যায়, বুঝতে হৰে কোন বস্তু শৰীৰ থেকে বেৰ
 হায়ে গিয়েহেঁ। আৰ সেটাই হৰে আত্মা। যদি দুই ক্ষেত্ৰে ওজনেৰ
 কোন পাৰ্থক্য না হয়, বুঝতে হৰে কিছুই বেৰ হায়ে যায় নি। যা আগে
 ছিল এখনও তাই আছে। এই ধৰনেৰ অনেক পৰীক্ষাই কৰা হায়েহেঁ।
 কিন্তু এ সবই খুৰ স্কুল ব্যাপাৰ। আত্মা এখন কোথাৰ ? এখন যা
 দেখছি তা তো স্কুল শৰীৰ। সেটা প্ৰথম দৰজা মাত্ৰ। তাৰ আগে
 আছে সূক্ষ্ম শৰীৰ। সূক্ষ্ম শৰীৰ দু প্ৰকাৰ—বৈক্ৰিয় আৰ আহাৰক।
 এৰা স্কুল শৰীৰ অপেক্ষা সূক্ষ্ম। বৈক্ৰিয় শৰীৰেৰ ক্ৰিয়া নানা ৰূপে
 প্ৰকট হয়। আমাদেৰ স্কুল শৰীৰেৰ ক্ৰিয়া একই, অৰ্থাৎ তা এক ৰূপেই
 দেখা যায়। স্কুল শৰীৰ ৰূপ বদল কৰতে পাৰে না। কিন্তু বৈক্ৰিয়
 শৰীৰেৰ এমন শক্তি আছে যে তা নানা ভাবে ৰূপ বদল কৰতে পাৰে।
 যদি আবশ্যক হয় তো এই শৰীৰ একটা পদ্বকুলেৰ সমান হতে পাৰে,
 আৰাৰ প্ৰয়োজন হলে বিষুকুমাৰেৰ মত লক্ষ্যোজন বিস্তৃত ৰূপ
 ধাৰণ কৰতে পাৰে। প্ৰয়োজন থাকলে না আৰাৰ পশু-পক্ষীৰ ৰূপও
 ধাৰণ কৰতে পাৰে। এই সূক্ষ্ম শৰীৰ এইভাবে নানা ৰূপ ধাৰণ
 কৰতে সমৰ্থ।

আৰ এক আছে আহাৰক শৰীৰ। এই শৰীৰও সূক্ষ্ম। এই
 শৰীৰ বিচাৰে—অৰ্থাৎ চিন্তা ভাবনাৰ—সুৰাহক। আমাৰ মনে চিন্তা
 হল, অমুক ব্যক্তিৰ সঙ্গ মিলতে হৰে, অমুক ব্যক্তিৰ সঙ্গ কথাবাৰ্তা
 বলতে হৰে। কিন্তু সে ব্যক্তি এখানে নেই, অনেক দূৰে কোথাও
 আছে। কি কৰে তাৰ সঙ্গ আমাৰ মিলন হৰে ? কি কৰে কথাবাৰ্তা

হবে ? এই অবস্থায় সংকল্পনাত্মকই এক সূক্ষ্ম শবীবের নির্মাণ হবে বার। এই শবীবের সংস্থান ছোট হয়। ছোট. খুবই ছোট। খাবণাত্মক ক্ষুদ্র। এই শবীর হাজাব নাইলেব দুরূহ এক মুহূর্তে পাব হয়ে আমার ইচ্ছিতে ব্যক্তির কাছে পৌঁছে যায়। তাব কাছে আমার প্রাণ বাখে, আবাব উদ্ভবও নেয়, তাব পরে বিবে এনে আমার শবীবে প্রবেশ করে সন্যাহিত হয়ে বার। এই সন্যস্ত ক্রিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়ে বার যে, ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পাবে না সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কত সময় লেগেছে। এই হল আহ্বারক শবীবের কাজ। এই শবীর বিচারেব—চিন্তা-ভাবনাব—সংবাহক। চিন্তা বহন করে নিয়ে বার, আবাব চিন্তা বহন করে বিবে আসে।

এল আগে আবও ছুটি সূক্ষ্মতর শরীর আছে। তাদের একটি তৈজস শরীর, অপবটি কার্মণ শরীর। সবসুদ্ব শবীবের তিনটি ‘গ্রুপ’ হয়ে গেল :

স্থূল শরীর—ঔদ্যাবিক শরীর—হাড়-মাংসেব শরীর।

সূক্ষ্ম শরীর—বৈক্রিয় শরীর—নানাকপ গ্রহণে সন্নিব শরীর।

আহ্বারক শরীর—বিচার-সংবাহক শরীর।

সূক্ষ্মতর শরীর—তৈজস শরীর—তাপনয় শরীর।

কার্মণ শরীর—কর্মনয় শরীর।

তৈজস শরীর হল তাপনয় শরীর। এই শরীর আমাদের উষ্ণ, সক্রিয়তা আর শক্তি সঞ্চালক। এই শরীর যদি না থাকত, তবে উষ্ণ উৎপন্ন হতো না, পাচন ক্রিয়া হতো না, রক্তেব সঞ্চাবণও হতো না। এই তৈজস শরীরই আমাদের স্থূল শরীরেব যাবতীয় ক্রিয়া সঞ্চালন কবছে। স্থূল শরীরে যে শক্তি আছে তার সবচেয়ে বড় ভাণ্ডারই হল তৈজস শরীর। যাব তৈজস শরীর নন্দ হয়, তাব অগ্নিমান্দ্য হয়, সন্যস্ত ক্রিয়াতেই নন্দতা লক্ষিত হয়। অগ্নি তাঁর হলেই সন্যস্ত ক্রিয়াতে দীব্রতা আসে। আধুনিক বিজ্ঞানে এই তথ্য ভাল করেই ধাবণা কবা হয়েছে। ডঃ প্লাহাক প্রতিপাদন কবছেন যে, পূর্বেব তৈজস আমাদের আহ্বারের পূর্তি কবে।

সূৰ্য্যেৰ তাপ আমাদেৰ খাওঁৱেৰ পূৰ্বক । যদি সূৰ্য্যেৰ তাপ না মেলে আমবা কেবল খাওঁৱেৰ সাহায্যে বেঁচে থাকতে পাৰি না । এই বিষয়ে মাইকেল ও তাঁৰ কৰজ্ঞন সহকাৰী ইদুব নিয়ে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰে দেখেছেন । তাঁৰা আঠাবোটি ইদুব বেছে নেন । তাদেৰ মথ্যে বাবোটিকে এমন আহাব দিলেন যাতে সুষম খাওঁৱেৰ সব উপাদানই ছিল, কিন্তু ক্যালসিয়াম ও ফস-ফৰাসেৰ অভাব ছিল । খাওঁৱে প্ৰযোজনীয় পূৰ্বো উপাদান না থাকায় ইদুবগুলি বোগগ্ৰস্ত হুযে গেল । তাদেৰ অন্ধকাৰ ঘৰে বাখা হুযেছিল । তাঁৰা বোগগ্ৰস্ত হুণ্ডায তাদেৰ সূৰ্য্যেৰ তাপে বাখা হল । দু-একদিনেৰ মধ্যেই তাঁৰা সুস্থ হুযে গেল, যদিও তাদেৰ খাওঁৱে অপূৰ্ণই বহিল ।

দ্বিতীয় দলেৰ ই'দুবগুলিকেও অপূৰ্ণ খাওঁৱে দেওয়া হল । তাঁৰাও বোগগ্ৰস্ত হুযে গেল । কিন্তু এবাৰ তাদেৰ সূৰ্য্যেৰ তাপে ছাড়া হল না । তাঁৰা অন্ধকাৰ ঘৰেই বহিল । কিন্তু তাদেৰ যে খাওঁৱে দেওয়া হুছিল তা দেওয়াৰ আগে অনেকক্ষণ বোজে বাখা হল । দুই-চাব দিনেৰ মধ্যেই ই'দুবগুলি সুস্থ হুযে গেল । এই সব অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তাৰ এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, সূৰ্য্যেৰ তাপ কেবল খাওঁৱেৰ পাক কৰে না, ঐ তাপ নিজেই খাওঁৱে এক আহাবেৰ পৰিপূৰ্বক । সূৰ্য্যেৰ তেজ না পেলে বনস্পতিৰ বিকাশ হব না । মনুষ্য শৰীৰেৰও বিকাশ হব না, আৰ ভুক্ত দ্ৰব্যেৰ পৰিপাকও হব না । এই বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰসঙ্গে মনে এক চিন্তা আসছে । জৈন পৰম্পৰায় মুনিদেৰ আতাপনা নেওয়াৰ কথা সৰ্বজনবিদিত । অনেক মুনি আতাপনা নিতেন । তাঁৰা কযেক ঘণ্টা ধৰে সূৰ্য্যেৰ তাপ নিতেন । তাঁৰা পূৰ্বো দু দিন বা পূৰ্বো তিন দিন আহাব না কৰে থাকতেন । তাঁদেৰ ক্ষিমে কমে যেত । তাঁৰা এই বহুস্থ জ্ঞানতেন, সে জগুই এই ক্ৰিয়াতে ব্ৰতী হতেন । আতাপনা তিন প্ৰকাৰেৰ হতে পাৰে—জঘন্য, মধ্যম আৰ উৎকৃষ্ট । মুনি তাঁৰ শাৰীৰিক শক্তি অনুসাৰে ব্ৰত নিতেন । স্থূল উপকৰণেৰ দ্বাৰা ভোজনেৰ যে পূৰ্তি হতো, সূৰ্য্যেৰ তাপ থেকে সহজেই সেই পূৰ্তি হব । সূৰ্য্যেৰ তাপ থেকেই মুনি পূৰ্বো ভোজন পেতেন । আতপ সেৱন কৰাৰ সময়ে মুনি পৰিধানে

কেবল একটি নেটি কাপড় বাখতেন, দেহেব অধিকাংশ অংশই বোঁজে অনাবৃত বাখতেন। সমস্ত বোমকূপ দিষে সূৰ্যেব বশি শবীবে প্রবিষ্ট হতো, আৰ তা অনেক কেন্দ্ৰকে সক্রিয় কৰে তুলত। আজকাল লোকে শবীবেব ওপৰ পোষাকেব বোৰা চাপায়, সে বোৰা ভেদ কৰে হাওষাও যায না, আলোও যায না। ফলে শবীব তাপ আৰ আলো পায না।

সূৰ্যেব তাপ আমাদেব আহাবেব খাঞ্চেব পুৰ্তি কেবল তখনই কৰতে পাৰে যখন তৈজস সক্রিয় থাকে। তৈজস নিষ্ক্রিয় থাকলে সূৰ্যেব আতপ কাৰ্যকৰ হয় না। আমাদেব তৈজস শবীবেব শক্তি ছাগ্ৰত হওয়া দৰকাৰ। তৈজস শবীবেব দুটি কাৰ্য আছে—

১। শবীব-তন্ত্ৰেব সঞ্চালন।

২। অন্নগ্ৰহ আৰ নিগ্ৰহ বা উপঘাত।

আমবা জ্ঞানি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি সুপ্ৰসন্ন দৃষ্টিতে কোন সভাব দিকে তাকান তো সভাস্থ প্ৰত্যেক ব্যক্তিই অপূৰ্ব আনন্দ বোধ কৰে ও নিজেৰে ধন্য মনে কৰে। প্ৰসন্নতা-ভবা দৃষ্টিতে কাবো কিছু মেলে না। ওই বিশিষ্ট ব্যক্তি কাউকে কিছু দেওয়াৰ চেষ্টাও কৰেন না—তবুও প্ৰত্যেক ব্যক্তি মনে কৰে সে পূৰ্ণকাম হয়ে গিয়েছে, তাকে খুবই কৃপা কৰা হয়েছে। যেন অমৃত বৰ্ষণ হয়ে গিয়েছে। ‘ভবত বাহুবলী’ মহাকাব্যে কবি পুণ্যকুশল লিখেছেন—‘নৃপাঃ প্ৰসীদন্তি দৃশৈব নো গিবা’—বাজাবা দৃষ্টিব দ্বাবাই প্ৰসন্নতা বৰ্ষণ কৰেন, বাণীব দ্বাবা নয়। তাঁবা এমন দৃষ্টি নিষ্কপ কৰেন যে, সামনে বাবা থাকে তাবা আপনা-আপনি অন্নগ্ৰহীত হয়েছে বলে মনে কৰে। কেমন কৰে এই অন্নগ্ৰহ তাঁদেব দৃষ্টি থেকে কৰে পড়ে? দৃষ্টি থেকেই কৰে, কিন্তু আসলে এই অন্নগ্ৰহ চোখে নেই। তা আছে তৈজস শবীবে। ঐ বকম ব্যক্তিদেব তৈজস শবীব এতই অন্নগ্ৰাহক, প্ৰভাবশালী আৰ তীব্ৰ হয় যে, তাঁবা যে দিকেই দৃষ্টিপাত কৰেন সে দিকেই লোকে অন্নভব কৰে যেন তাবা স্নানাত হয়েছে।

তৈজস শবীবেব দ্বিতীয় কাৰ্য হল—নিগ্ৰহ কৰা, উপঘাত কৰা।

তৈজস শবীবের নিগ্রহ কবাব বা উপঘাত কবাব প্রবল ক্ষমতাও থাকে।
 ঐ ক্ষমতা এমন যে, একবার যদি ঐ ক্ষমতাব অধিকারী কোন দিকে ত্রুব
 দৃষ্টিপাত করেন, তবে হাজাব হাজাব লোক ভয়ে কঁপে ওঠে। এই
 বকম উপঘাতক শক্তির প্রকাশ আমবাও দেখেছি। এভাবে তৈজস
 শবীর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ কবতে সমর্থ হয়।

কার্মণ শবীর সূক্ষ্মতম শবীর। এটা কর্ম-শবীর, অন্ত সব শবীবেরই
 মূল আধার। এই শবীর আছে বলেই তৈজস শবীর আছে, বৈক্রিয়
 আব আহাবক শবীর আছে, স্থূল ঔদাবিক শবীর আছে। যদি এই
 শবীর না থাকে, কোন শবীরই থাকবে না। স্থূল শবীর মৃত্যুব পবেই
 ছেড়ে যায়, কার্মণ কিন্তু তা নয়। যখন কার্বো কার্মণ শবীর ছেড়ে যায়
 তখন আমবা বলি—তার মোক্ষ হল, সে মুক্ত হয়ে গেল। কার্মণ
 শবীবের বিচ্ছেদ একবারই হয়, স্থূল শবীবের বিচ্ছেদ বাব বাব হয়।

একটা ছোট ঘটনাব কথা বলি। একবার মাছি আব পিঁপড়ের
 মধ্যে বিবাদ হল। মাছি পিঁপড়েকে বলল—‘তুই কোথায় কোথায়
 যেতে পাবিস ? তোব গতিব তো সীমা আছে। আব দেখ, আমি সব
 জায়গায় যেতে পাবি। যেখানে ভগবানের ভোগ লাগাচ্ছে সেখানেও
 যেতে পাবি। আমাব চলাফেরাব কোন বাধা নেই।’ পিঁপড়ে বলল—
 ‘বাওয়া এক কথা, আব নিমন্ত্রণ পেয়ে যাওয়া আব এক কথা। তুমি
 যেখানেই যাও সেখানেই তোমাকে উড়িয়ে দেয়, মেবে দেয়, গাল দেয়।’

ওই মাছিব দশাই আমাদের শবীবের। যতবাবই আমবা শবীর
 ছাড়ি, ততবাবই আবাব শবীর এসে জ্বোটে। কার্মণ শবীর কিন্তু এমন
 নয়। এই শবীর সহজে ছাড়ে না। কিন্তু একবার যদি ছেড়ে যায়
 তো চিবকালের মত ছাড়ে। এই শবীর—ভাবনাব শবীর, বাসনাব
 শবীর, সংস্কাবের শবীর। এই শবীর থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন।

স্থূল শবীবের সঙ্গেই আমাদের কাজ। সাধনাব উদ্দেশ্য হল, আমবা
 স্থূল শবীবের শক্তিকে জাগ্রত কবব, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শবীবের শক্তিকেও
 সক্রিয় কবব। স্থূল ও সূক্ষ্ম—উভয় শবীর থেকেই আমবা লাভবান হব।

মনোবিজ্ঞান চেতন মন আৰু অবচেতন মন—এই দুই প্ৰকাৰ মনৰ প্ৰতিপাদন কৰেছে। চেতন মনে যত শক্তি আছে, অবচেতন মনে তাৰ অনন্ত গুণ শক্তি আছে। চেতন মন চতুৰ। অবচেতন মন সবল, কিন্তু অনন্ত শক্তিব ভাণ্ডাৰ। এ কাজ কৰতে হ'ব, ও কাজ ব'ব নহ'ব না—আপনাৰ এ সব কথা চেতন মন স্তনৰে বঢ়ে, কিন্তু ক'বাব বেলাত তা সেই কাজই কৰবে যে কাজ তাৰ আগে ভাল লগেছে। অবচেতন মন সে বকম নহয়। অবচেতন মনকে আপনি যা বলবেন তা যদি ঐ মন ধাৰণা কৰে নিতে পাবে, তৰে ঐ মন সেই কাজই কৰবে যে কাজ তাকে কৰতে বলবেন। এই যে চেতন মন আৰু অবচেতন মনৰ পাৰ্থক্য, তা স্কুল শৰীৰ ও সূক্ষ্ম শৰীৰৰ পাৰ্থক্যও বঢ়ে। স্কুল শৰীৰৰ শক্তিকে যদি এক পয়সা মনে ক'বা যায় তেন্তে সূক্ষ্ম শৰীৰৰ শক্তিকে বলতে হ'ব নিবানবহুই পয়সা। এত পাৰ্থক্য দুই শৰীৰৰ মध्ये। সূক্ষ্ম শৰীৰকে জাগ্ৰত ক'বাব অৰ্থ হল—বিদ্যুৎ ভাণ্ডাৰ নিৰ্মাণ ক'বা। কিন্তু আমাদেৰ চলতে হ'বে স্কুল শৰীৰকে নিয়েই। আমাদেৰ শক্তিকে প্ৰকট ক'বাব প্ৰথম উপায় এই স্কুল শৰীৰ। সাধনাৰ দৃষ্টিতে এই শৰীৰ মূল্যবান। আঁবাৰ অনেক উচ্চ দৃষ্টি দিযে আমবা শৰীৰকে বহিষ্কাৰ কৰেছি, কাৰণ শৰীৰই আমাদেৰ বাসনাৰ দিকে প্ৰেৰিত কৰে। আমাদেৰ সাহিত্যিকবাও জিভকে, চোখকে হাজাৰ বকমেৰ গাল দিযেছেন, ভাল-মন্দ বলেছেন। কোন কোন সাধক বলেছেন, চোখকে ফুঁড়ে দেওযাই খুব বড় সাধনা, কাৰণ চোখই বিকৃতিৰ শক্তিমান মাধ্যম। চোখকে না ফুঁড়লে সাধনা সম্ভব হয় না। তাঁবা বাস্তবিকই চোখ ফুঁড়তেন, আৰু চিবকালেৰ জন্তু অন্ধ হ'যে যেতেন।

সাধনাৰ জন্তু শৰীৰৰ উপযোগিতা কি ? শৰীৰৰ দুই মুখ্য ভাগ—মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ু। মস্তিষ্ক সমস্ত শৰীৰতন্ত্ৰৰ নিয়ামক আৰু সঞ্চালক। চোখ দেখে। কিন্তু দৰ্শন শক্তি আছে মস্তিষ্কে। কান শোনে। কিন্তু শ্ৰবণশক্তি থাকে মস্তিষ্কে। সমস্ত জ্ঞানৰ গ্ৰাহক ও সঞ্চালক সংস্থান হল মস্তিষ্ক। সকল স্মৃতিই সেখানে সংগৃহীত থাকে। মস্তিষ্ককে জাগ্ৰত

কবাই স্মৃতিকোষকে জাগ্রত করা। আমাদের মস্তিষ্ক অতিশয় শক্তিশালী। সেখানে শতকোটি কোষ আছে, আব সেই সব কোষে অসংখ্য সংস্কার, অসংখ্য স্মৃতি সংগৃহীত আছে। অবধান বিচা স্মৃতিকোষেবই এক চমৎকারী প্রকাশ।

নন্দীশূত্রে মতিজ্ঞান সহজে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে তার বারটি প্রকার-ভেদ নির্দিষ্ট কবা হয়েছে—বহুগ্রাহী, ক্ষিপ্রগ্রাহী ইত্যাদি। ঐগুলি সমস্ত মস্তিষ্কেব শক্তির দ্যোতক। তবে ঐগুলিব বিবেচনা সময়-সাপেক্ষ। আজ একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে স্থূল শরীরেব শক্তির বিষয়ে আমাদের পুরো জ্ঞান থাকা দরকার। আমাদের শরীরে মস্তিষ্ক, পৃষ্ঠবজ্জু, কণ্ঠ, জকুটি, তালু, নাসাগ্র, নাভি, মূলবন্ধের স্থান ও পাখের বুড়ো আঙ্গুল—এগুলি মুখ্য কেন্দ্র। এগুলিকে জানা আবশ্যক। এদেব দ্বারা আমরা স্থূল শরীরকে জাগ্রত কবব, আব ঐ শরীরের যে সব শক্তি আছে তাদের থেকে লাভবান হব। একথা বলা যায় যে, আমাদের স্থূল শরীরেব সমগ্র শক্তির লক্ষ ভাগেব মধ্যে কেবল দু-চারটি ভাগই আমরা বর্তমানে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছি, বাকি সব ভাগই সুবৃণ্ড বয়ে গিয়েছে, জাগ্রত হব নি। কিন্তু ঐই সুবৃণ্ড শক্তির বোধ আমাদের হওয়া চাই।

ধর্ম ঐই কথা বলেছে, অধ্যাত্মশাস্ত্র ঐই নির্দেশ দিয়েছে, সাধনা ঐই শিখিয়েছে যে—তুমি অনন্ত শক্তিব স্রোত, তুমি নিজের শক্তি-সম্পদকে দেখ, বোধ আব অনুভব কর, বুখাই তুমি ভিখাবিব মত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কেন তুমি ভিক্ষা চেবে মরছ। অবশ্য ঐই জ্ঞান কেবল তখনই হতে পারে যখন আমাদের শরীর সহজে পূর্ণ বোধ হয়েছে। তাই আমরা শরীরকে উপেক্ষা করব না; শরীরেব কাছে আমাদের যেমন প্রত্যাশা, তার অনুকূপ সম্মান ও আদব আমরা শরীরকে দেব।

প্রাণ ও তার কার্যক্ষেত্র

সাধারণ জৈন বিজ্ঞার্থীও জানে আমাদের শরীরে দশটি প্রাণ আছে। সে তাদের পারিভাষিক নাম ও বিশেষ বিশেষ কার্যও জানে। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই অহিংসার আধারে স্থাপিত। হিংসা বোঝাতে একটি শব্দ আছে—প্রাণাতিপাত। প্রাণের বিনিয়োজন করা—হিংসা। প্রাণী, প্রাণ ও প্রাণের বিনিয়োজন—এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। প্রাণী তাকেই বলি যে প্রাণকে ধারণ করে আছে। প্রাণ না থাকলে আত্মাও প্রাণী হতে পারত না। আত্মার যে প্রাণীর অবস্থা, তা প্রাণধারার কারণেই হয়েছে। প্রাণ জীবনের মুখ্য কেন্দ্র। আমাদের বুঝতে হবে, সাধনার দৃষ্টিতে প্রাণের কি মূল্য আছে। প্রাণ একটি ধারা, শক্তির এক প্রবাহ। ঐ প্রবাহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রয়েছে। তার দ্বারাই জীবনের সঞ্চালন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দশটি নয়, প্রাণধারা একই। কিন্তু তা বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে, সেজন্য অনেক হয়ে যায়। প্রাণের মুখ্য কেন্দ্র দশটি, সেজন্য প্রাণ দশটি বলা হয়। যে জীব মাত্র এক ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে, যে জীব পাঁচ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে। এ রকম স্থলে প্রাণের সংখ্যার পার্থক্য হয় বটে, কিন্তু প্রাণশক্তির পার্থক্য হয় না।

প্রাণের দশটি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা বলি শরীরে দশটি প্রাণ আছে, তাৎপর্য এই যে, শরীরে এমন দশটি কেন্দ্র আছে যেখান থেকে প্রাণশক্তি সঞ্চালিত হতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়, মন, বচন, কারা, শ্বাস-প্রশ্বাস আর আয়ুষ্—এই দশটি প্রাণ। এই দশ প্রাণের স্থান কোথায় কোথায়? যে প্রাণের দ্বারা নিজের কেন্দ্রগুলিতে শক্তি যোগায় তাব অবস্থানই বা কোথায়, তার 'সেন্টার' কোথায়? দশ প্রাণকেই শক্তি দেওয়াব কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। মস্তিষ্কে সমস্ত শক্তিই কেন্দ্রিত। লক্ষ্য করুন, আপনার শ্বাসের এক কেন্দ্র আছে, জ্ঞানের এক কেন্দ্র আছে, খাসের এক কেন্দ্র আছে, চিন্তন ও সংবেদনা প্রভৃতির এক কেন্দ্র আছে; কিন্তু ঐ সব কেন্দ্রই মস্তিষ্কে অবস্থিত। এব এই অর্থ যে, আমাদের ছয়টি পর্বাণ্ডির কেন্দ্রই আমাদের মস্তিষ্কে আছে। পর্বাণ্ডিগুলি পৌদালিক রচনা। পর্বাণ্ডি একটি সংস্থান, তাতে ক্ষমতা আছে। তার কেন্দ্রে যখন প্রাণের ধারা সঞ্চালিত হয়, তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন পর্বাণ্ডি প্রাণের রূপ ধারণ করে। একজ্ঞ আমরা মানি যে পর্বাণ্ডি কারণ, আর প্রাণ কার্য। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। মূল প্রাণ কি? এই প্রশ্ন জটিল। এক আছে প্রাণবায়ু, আর এক আছে প্রাণ। দুটি কিন্তু একই বস্তু নয়। অনেক সময়েই আমরা প্রাণবায়ুকেই প্রাণ বলে মনে করেছি। আসলে কিন্তু ঐ দুটি পৃথক, এক নয়। যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি তা সম্পূর্ণ প্রাণ নয়। যখন আমরা শ্বাস নিই তখন আমরা প্রাণকে টেনে নিই না, যখন আমরা শ্বাস ছাড়ি তখন আমরা প্রাণকে ছাড়ি না। যখন আমরা প্রাণাশ্বাস করি তখন আমরা প্রাণের আশ্বাস, অর্থাৎ নিয়মন করি না, আমবা প্রাণবায়ুর আশ্বাস করি। এই যে এত শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া—এ সবই বায়ুর কাজ, প্রাণের কাজ নয়। আমাদের প্রাণ তো এক জুস্ফ ধাবা, বা আমাদের ভেতরে থেকে সমস্ত কার্য সঞ্চালিত করে। প্রাণ আসছে আত্মশক্তি থেকে, তৈজস শরীরের রূপে। প্রাণবায়ুর চেতনার সঙ্গে সোজানুজি সম্বন্ধ হয় না, প্রাণ কিন্তু চেতনার সঙ্গে সোজা সম্বন্ধে জড়িত।

আমাদের তৈজস শরীর সমস্ত উদ্ভা উৎপাদন করে। জীবনের সঙ্গে ঐ শবীরের নিকট সম্বন্ধ, স্থূল শরীরের সম্বন্ধ নিকট নয়। এক দিকে জীবের তৈজসশক্তি আব এক দিকে চৈতন্য, যখন এই দুই দিকের সংযোগ হয়, তখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। প্রাণে চৈতন্যের প্রবাহ আছে, প্রাণবায়ুতে চেতনার প্রবাহ নেই। প্রাণকে এক যৌগিক শক্তি বলতে হয়।

আমাদের শরীরে এক বিশেষ কেন্দ্র আছে। যে স্থানে সুবুনার নিম্নস্থ প্রান্তভাগ শেষ হয় তার নিচেই সেই কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রটি প্রাণশক্তির উৎপাদক। প্রাণশক্তিকে প্রকটিত করার ও তাকে সঞ্চাৰিত করার মুখ্য কেন্দ্রই ঐটি। প্রাণশক্তি সুবুনা দিয়ে বিভিন্ন মার্গে সঞ্চাৰিত হয় ও মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছয়। প্রাণশক্তি ওপব থেকে নিচের দিকে যায় না, নিচ থেকে ওপরের দিকে যায়। ঐ শক্তি নিচ থেকে যত বেশি ওপবেব দিকে যাবে, মানুষের শবীব ও মন ততই সুস্থ থাকবে। প্রাণশক্তির প্রবাহ যতই কম হবে মানুষ ততই শবীর ও মনে কষ্ট হয়ে যাবে।

কর্মকাব ভজ্ঞা চালায়। তাতে হাওবা হয় এবং আগুন জলে ওঠে। এক দিকে ভজ্ঞা দিবে হাওবা বেব হয়, অন্যদিকে আগুন জলে। হাওবা আর আগুন এক নয়। অথচ হাওরাব যত তেজ হবে, আগুনেরও তত তেজ হবে। ঠিক এইভাবেই প্রাণবায়ু প্রাণকে উত্তেজিত করে, সহায়তা দেয়। আমরা যে মাত্রায় প্রাণবায়ু (অক্সিজেন) নেব, সেই মাত্রায় প্রাণ বিপুল হবে, সক্রিয় হবে। যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো প্রাণে উত্তেজনা বা সক্রিয়তা আসবে না। শরীর শাস্ত্রের দিক থেকে এর কারণ এই যে, আমাদের শরীরে রক্ত-সঞ্চালন হৃৎপিণ্ডের দ্বারা হয়, তবে ঐ রক্ত ফুসফুসে এসে তারপরে সার্বা শবীরে যায়। হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস—এই দুটি আমাদের রক্ত-সঞ্চালনের মুখ্য যন্ত্র। ফুসফুসে যে রক্তের শোধন হয় তাব জন্ত ইন্ধন চাই। ঐ ইন্ধনই হল প্রাণবায়ু-অক্সিজেন। যদি প্রাণবায়ু ঠিকমত মেলে, তবে অশুদ্ধ বায়ুকে শুদ্ধ

কবে কার্বন প্রভৃতি শরীর থেকে বের করে দেওয়া যাবে, আর শুদ্ধ রক্ত ভেতরে প্রবাহিত হবে। আব যদি প্রাণবায়ু না মেলে তো রক্ত বিকৃতই থাকবে, আব তাব ফলে সারা শরীরেই বিকৃতি দেখা দেবে। প্রাণবায়ু বস্ত-শুদ্ধি উপায়, আব শুদ্ধ বস্তুকে সাবা শরীরে প্রাণবায়ুই গতি দেয়। প্রাণেব সঙ্গে তাব সম্বন্ধ গভীর। প্রাণবায়ু রক্তের মাধ্যমে প্রাণকে উত্তেজিত করে, সক্রিয় কবে। একটা ছোট গাছ যদি জলেব পর্যাপ্ত সেচন পায় তবে তা সবুজ পাতায় পূর্ণ হয়ে বেড়ে ওঠে। সেই বকম, প্রাণবায়ু পর্যাপ্ত সেচন পেলে প্রাণের ছোট গাছটিও পাতার সমাবোহে বেড়ে ওঠে। পুৰো সেচ না পেলে ছোট গাছ শুকিয়ে যায়। সেই বকম, মানুষও নিপ্রাণ ও নিক্রিয় হয়ে যায়।

যেখানে প্রাণবায়ু পৌঁছতে পারে না সেখানে বস্তুর শোধন হয় না, আব শোধনেব অভাবে দূষিত পদার্থ জন্মতে থাকে। যে প্রাণায়াম জানে সে সবার আগে এই বিষয়ে প্রয়ত্ন করে, কিভাবে বেশি বায়ু ফুসফুসে পৌঁছে দেওয়া যায়। কিভাবে শ্বাসকে দীর্ঘ করা যায়।

প্রাণবায়ুকে ঠিকমত নেওয়ার সাধনই হল—প্রাণায়াম। যে প্রাণায়াম জানে না, সে পুৰো মাত্রাব প্রাণবায়ু গ্রহণ কবতে সক্ষম হয় না। তিনটি ব্যাপার এখানে জড়িত—প্রাণ, প্রাণবায়ু আর প্রাণায়াম। প্রাণায়াম ছাড়া প্রাণবায়ুর সম্যক গ্রহণ হয় না, আবার প্রাণবায়ু ছাড়া প্রাণেব সম্যক উদ্দীপন হয় না। সবশেষে আমি প্রাণায়ামের কথা বলছি। প্রাণায়াম এক সাধন। এই সাধন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এব সম্যক জ্ঞান না থাকলে প্রাণবায়ুকে জানা সম্ভব হয় না। যোগেব আচার্যবা এই বিষয়ে যা কিছু লিখে গিয়েছেন আজকের বিজ্ঞান তাব সঙ্গে একমত হতে চলেছে।

আমি প্রাণ থেকে আবিস্কৃত করেছিলাম, তারপরে প্রাণবায়ুর কথা বলেছিলাম, এখন প্রাণায়ামে এসে পৌঁছেছি। এবার উল্টো পথে যাত্রা শুরু করছি। আমি প্রাণায়াম থেকে আবিস্কৃত কবছি। আমাদের প্রাণায়ামেব অভ্যাস উপযুক্ত হওয়া দরকাব। তাহলে প্রাণবায়ু স্বয়ং

প্রসাধিত হবে। প্রাণবায়ুকে কি মাত্রায় নেওয়া দরকার, প্রাণবায়ু কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে—এসব বিষয়েরও জ্ঞান থাকা চাই। প্রাণবায়ু ঠিকমত নিতে পারলে প্রাণকে সক্রিয় করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে। প্রাণশক্তিকে আশ্রয় করে যোগী ব্যক্তি বিচিত্র বাজকর্ম করে দেখাতে পারেন। তৈজস শরীরেব অম্লগ্রহ ও নিগ্রহ করাও ক্ষমতা আছে। তৈজসশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নির্ধাতন করতে পারেন, বিনষ্ট করতে পাবেন, মারতে পারেন—আবাব অনেক রকম অম্লগ্রহও করতে পারেন, দিতেও পারেন। ঐ রকম ব্যক্তির দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে। এ সবই আসলে প্রাণশক্তির ক্রিয়া; প্রাণের সম্বন্ধ আছে তৈজসের সঙ্গে। এসব ক্রিয়া তখনই হয়, যখন প্রাণায়াম থেকে প্রাপ্ত প্রাণবায়ুর অগ্নি প্রাণকে এতটা উদ্দীপ্ত করে—প্রাণকে এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত করে—যে, প্রাণের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকটিত হবে যায়। সুতরাং এদিক থেকে প্রাণায়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

প্রাণেব সমস্ত কেন্দ্র মস্তিষ্কে, কিন্তু প্রাণধারার ছুটি পথ হতে পারে। একটি পথ বাইরে, আর একটি পথ ভেতরে। বাইরের পথই আগের পথ। এই পথ দিয়ে গেলে প্রাণশক্তি আমাদের শরীর-তন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। আমাদের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তা এর থেকেই উৎপন্ন হয়। তা অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দেয় না। এই পথে প্রবাহমান প্রাণশক্তি আমাদের দশটি প্রাণ-কেন্দ্রকে সক্রিয় করে, আর আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ভাল রেখে চলে। যখন আমরা প্রাণশক্তিব প্রবাহকে এই পথ থেকে অপর পথে ঘুরিয়ে দিই, তখন ভিন্ন প্রকারের শক্তির উৎপত্তি হয়।

প্রাণধারা প্রবাহিত হওয়ার ভেতরের পথকে বলা হয়—মহাবীহি। এই শব্দ আচার্যগণ থেকে এসেছে—‘পণ্যা বীরা মহাবীহি’। জানি না সূত্রকার কি অভিপ্রায়ে এই শব্দ ব্যবহার করেছেন, জানি না ব্যাখ্যাকারদের অভিপ্রায়ই বা কি। কিন্তু এই রকম মনে হয় যে, এই সূত্র প্রাণধারাকে পৃষ্টরজ্জু দিয়ে উর্ব্বগামী কবে দেওয়ার সূত্র। এর

অর্থ যে বীর হয়, তাকে মহাপথ দিবে চলতে হয়। ‘ইঠযোগ প্রদীপিকা’ শ্রুত্মার এক পৰ্বায়বাচী নাম ‘মহাপথ’। অনুমান করি, মহাবীথি আর মহাপথ একই কথা। বীর সেই ব্যক্তিই, যে মহাবীথি ধরে চলতে পারে। শ্রুত্মার পথ দিবে যাওয়া সতিই বীরের কাজ। সাধারণ মানুষ এ পথে চলতে পারে না। শ্রুত্মার পথ দিলে প্রবহমান প্রাণধারা শ্রুত্মার কোণে যে শক্তি আছে তাকে সংগ্রহ করে নেয় ও অধিকতর শক্তিশালী হয়ে যায়। প্রাণধারার এই ছুটি পথ—একটি অগ্রগামী বা বাইরের, অপরটি পৃষ্ঠরঞ্জুগামী বা ভেতরের।

যে সাধক প্রাণাযাম করে, প্রাণবায়ুর মর্ম বোঝে, সেই সাধক প্রাণবায়ুকে উত্তেজিত করতে পারে। আবার কুস্তক কবে শ্রুত্মা মার্গে ধাকা লাগায়, আর প্রাণকে ওপরে নিয়ে যায়। প্রাণ যতই জ্ঞান-কেন্দ্র পর্যন্ত, সহস্রার পর্যন্ত পৌছয়, ততই আমাদের বৌদ্ধিক ও আন্তরিক বিকাশ হয়। প্রাণধারা যদি মনের সঙ্গে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তবে ভাবাবেগ আর কামনা-বাসনায় আমরা ভরে উঠি। প্রাণ আর মনের সম্বন্ধ অতি গভীর। প্রাণধারা নিম্নগামী হলে মনও নিম্নগামী হয়, প্রাণধারা উর্ধ্বগামী হলে মনও উর্ধ্বগামী হয়। আবার মন নিম্নগামী হলে প্রাণধারাও নিম্নগামী হয়, মন উর্ধ্বগামী হলে প্রাণধারাও উর্ধ্বগামী হয়। একজন্ম মন ও প্রাণ উভয়কেই উর্ধ্বগামী অবস্থায় রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

১৮

আহার অতাহার

আমাদের জীবনের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির আধাবই হল শরীর, আব শরীরের আধাব—আহার বা ভোজন। আহার ছাড়া শরীর চলে না, আবার শরীর ছাড়া কর্ম-প্রবৃত্তি হয় না। এই যে আঙ্গুল হেলাচ্ছি, এ কাজও আহাব ছাড়া সম্ভব হয় না। আহার গ্রহণ না করে চিন্তা করা যায় না, কথা বলা যায় না, শ্বাস নেওয়া যায় না। আপনাবা মনে করবেন না যে, পাঁচ ঘণ্টা আগে আমি যে আহার করেছিলাম তাবই শক্তিতে এখন আঙ্গুল নাড়ছি। এখন যদি আঙ্গুল হেলাই, বুঝতে হবে এখনই আহার পেয়ে সে কাজ করতে পাবছি। এখন যে আমি কথা বলে যাচ্ছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই বলতে পারছি। এখন যে আমি চিন্তা কবছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহাব পাচ্ছি বলেই করতে পাবছি। শরীরের প্রবৃত্তি যে ক্ষণে হয়, তার পূর্বক্ষেণেই আমাদের আহার নিতে হয়। আহার নেওয়ার পরেই আমাদের প্রবৃত্তি হতে পারে। ‘আহাব’ শব্দের অর্থ—বাইরে থেকে নেওয়া। বাইরে থেকে কিছু না নিয়ে কোন প্রবৃত্তিই হতে পারে না।

গৌতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করলেন—‘ভাস্তে। এক সমর্থ মুনি আছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক রূপ নির্মাণ করেন। বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োগ

করেন। তিনি নিজের থেকেই নানা কণা সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি
কি আহার না নিয়ে, পুষ্কল গ্রহণ না করে, এসব করতে পারেন ?

মহারীর বক্তাবলী—গৌতম! মূনি খুবই শক্তিশালী, কিন্তু বহু
পুষ্কল না নিয়ে তিনি এসব করতে পারেন না। তিনি বাইরে থেকে
আহার নিজেই এসব করছেন।

অতি স্বীকার করি আগমাব। আহার সহজ আনার এসব কথা
পুত্রাপুত্রি বুঝতে পারতেন না। ন পারত কারণে আছে। অমাত্যের
মুখ নিয়ে যাওয়া বহু বে বহু তাকুই কেবল আমরা আহার বলে
ননি, অহ কোন আহার অমাত্যের আহার বলেই মনে হয় না। কিন্তু
প্রকৃত অত্যা অহ বসম। মুখ নিয়ে যাওয়া হয় যে পদার্থ তা
অমাত্যের বহু শক্তি দেয়, তা'ব থেকে অধিক শক্তি দেয় অহ অনেক
তত্ত্ব, ব আমরা আহার ক'পই গ্রহণ করে থাকি। আহারের অর্থ—
নেওয়া টেনে নেওয়া, আহরণ করে নেওয়া। আমরা মুখ নিয়ে নিই।
কিন্তু কতকটা স'মালোচনা দ্বারা, অ'ব খুব বেশি হলে লক্ষ-বিশ
বার। কিন্তু এসবই ক'ব কথা, মূঢ় তব্ব এই যে, আমরা প্রতিদুই
আহার নিয়ে থাকি, অ'ব ঐ আহার ছাড়া, অমাত্যের জীবন চল না।
জৈন পবিত্রাব এই আহারের সূত্র—'ব্রহ্ম আহার'। যে আহার
মুখ নিয়ে নেওয়া হয় তা 'করন আহার', অ'ব যে আহার শরীরের
প্রতি রোমন্থন নিয়ে নেওয়া হয় তা 'রোমন আহার'। বাস্তবিক পক্ষে,
এই বিচার প্রকরণে আহারই অমাত্যের জীবনের আধারভূত আহার।
এই আহার ছাড়া জীবন চল না। মুখ নিয়ে কিছু না থেকেও আমরা
ত্রিশ, চত্বিশ, পঞ্চাশ বৎসর বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু 'রোমন আহার'
ছাড়া বেঁচে থাকতে পারব না।

প্রথম আহার 'করন আহার', দ্বিতীয় আহার 'রোমন আহার'।
আবার তৃতীয় প্রকরণে আহারও আছে, হাতক বলে 'মনা আহার' বা
'মানসিক আহার', এই আহারের জহু শরীরের প্রয়োজন নেই, করন
বা রোমনের প্রয়োজন নেই, রোমনও প্রয়োজন নেই। মন সাক্ষর করা

হল, আর অমনি পূর্ণ আহার হয়ে গেল। এই হল মনোভক্ষী আহার, মানসিক আহার। সুতরাং আহাব হল তিন রকমের—কবল আহাব, রোম আহার আব মনো আহাব। সমগ্র আহার আমাদের শরীরকে নতুন স্বরূপ প্রদান করে, আর আমাদের আহার সম্বন্ধে স্থূল ধারণা দূর করে। আজ আহার বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। তার ফলে মানুষ অনেক অস্বস্তিতে ভুগছে। কাবণ, সবাই বুঝে নিয়েছে যে, মুখ দিয়ে যা খাওয়া হয় তা শরীর ধারণের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই পর্যাপ্ততার ধারণা কিন্তু ভুল। আজ ‘সংতুলিত আহার’ অর্থাৎ সুস্বাদু বা সুসমঞ্জস আহার, কথাটি বহুল প্রচলিত। সংতুলিত আহাবের অর্থ, —সেই আহার, যাতে সব তত্ত্বই সংতুলিত মাত্রায় বিद्यমান থাকে। আহারশাস্ত্রবিদের এই অভিমত। যোগশাস্ত্রজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ভিন্ন। তাঁদের মতে সংতুলিত আহাব তাকেই বলা যায়, যাতে এই চারটি তত্ত্বই পাওয়া যায়—যথা, খাদ্য, তেল, বায়ু আর প্রকাশ অর্থাৎ সূর্যের তাপ। শবীষশাস্ত্রীরা যে সংতুলিত আহাবে কথ্য বলেন তার পবিত্র মধ্যে আছে শুধু খাদ্য আর তেল, অর্থাৎ চাবটি তত্ত্বের মধ্যে তাতে আছে প্রথম দুটি তত্ত্ব, কিন্তু শেষ দুটি তত্ত্ব নেই। আমি বলব সেই আহার সংতুলিত হতে পারে না, যাতে বায়ু আর প্রকাশের (বৌদ্ধের) কোন স্থান নেই। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, খাদ্য আর তেলেই তো ক্ষুধা উপশম হয়, জঠরাগ্নি শান্ত হয়, তবে বায়ু আর বৌদ্ধের প্রয়োজন কি? ওগুলি দিয়ে কি পেট ভরবে? আর যদি ওগুলিতেই পেট ভরে, তবে তো বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, আজকের সব অভাবই মিটে গেল। কথাটা ঠিকই বটে। আমি এমন বলব না যে, আপনারা পূর্ণভাবে বিশ্বাস করুন ওগুলিতে পেট ভরে। তবে আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে আমার সব কথা শোনার পরে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, ওগুলিতেও পেট সত্যিই ভরে।

আমি প্রথমে বৌদ্ধের কথা বলছি। রোজ বা প্রকাশ আমরা

সূর্যের কাছ থেকে পাই। আমাদের শরীরের ভিটামিন ‘ডি’-বিশেষ আবশ্যকতা আছে। এই ভিটামিন ‘ডি’ সূর্যের রশ্মি থেকে যত ভালভাবে পাওয়া যায় অত্ৰ কোন উৎস থেকে তত ভালভাবে পাওয়া যায় না। আমাদের শরীরের চামড়ার আশপাশে এমন এক দ্রব্য থাকে যার ওপরে সূর্যের রশ্মি পড়লেই ভিটামিন ‘ডি’ স্বতই উৎপন্ন হয়। সূর্যের বশ্মি ভিটামিন ‘ডি’-র পূর্তি কবে। শরীরের ওপর পতিত সূর্যের রশ্মি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসেরও পূর্তি কবে। এই দুটি দ্রব্যই শরীরের পক্ষে আবশ্যক। প্রাকৃতিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভিমত-যে, মাহুঘের প্রতিদিন কিছু সময় জঙ্গলে গিয়ে বহুদীন হয়ে থাকা উচিত, নগ্ন হয়ে বোরা উচিত ও সূর্যেব তাপ সেবন করা উচিত। এতে শরীরেব অনেক অভাব পূর্ণ হয়। সাধনার ক্রম অনুসারে নগ্নতার স্থান ছিল, নগ্নতা অনাবশ্যক ছিল না বা মূর্ত্তাব পরিচায়ক ছিল না। নগ্নতা খুবই আবশ্যক ছিল, এবং অনেক বিচার-বিবেচনা কবেই তার স্থান নির্ধারণ করা হয়েছিল। শারীরিক আর মানসিক সাধনার দিক থেকে নগ্ন থাকার যে লাভ হতো, সবত্র থাকায় সে লাভ হতো না। উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে স্পষ্ট ভাবার উল্লিখিত হয়েছে, নগ্নতা (প্রতিবাপতা) থেকে লঘুতা হয়, লঘুতা থেকে অপ্রমাদ, জিতেল্লিযতা, বিপুলতপঃ প্রভৃতি লাভ হয়।

এখন শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিষয়টি বিবেচনা করি। নির্বস্ত্র থাকলে সূর্যকিরণ আমার সাবা শরীরে পড়তে পারে। ঐ রৌদ্র আমার আহারের পূর্তি করে। বিজ্ঞানেবও এই অভিমত। রৌদ্র খাত্তের পূরক তত্ত্ব। যে ব্যক্তি আতাপনা নেয়, রৌদ্র সেবন করে, তার আহাবের মাত্রাও কমে যায়। আতাপনা সম্বন্ধে যত তথ্য জ্ঞেন সাহিত্যে পাওয়া যায় অত্ৰ তা পাওয়া যায় না। ঐ সাহিত্যে বলা হয়েছে, যে আতাপনা নেয় তার আহারের মাত্রা—আহারের আবশ্যকতা কমে যায়। সে অধিক ভোজন কবতেই পাবে না, কারণ তার আহারের অনেক আবশ্যকতাই বৌদ্র থেকে মিটে যায়। আতাপনার

মূল্য কত, আত্মপন্যাব মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ। তা আমবা ভুলেই গিয়েছি। আজকের আহাবশাস্ত্রবিদেরাও স্বীকার করেন, যে ব্যক্তি বৌদ্ধ ও বাহু থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনে। তাঁরা বলেন—জঙ্গলে চলে যাও, সমস্ত কাপড় বেলে দাও, নেটি বাখারও প্রয়োজন নেই। মাটির ওপর শুয়ে পড়, শরীর যদি বৌদ্ধে জ্বল যায়, জ্বলতে দাও—কোন ক্ষতি হবে না। যদি জ্বলন থেকে বাঁচতে চাও তো শরীরের ওপর একটা পাতলা কাপড়ের আবরণ রাখ। এই হল আত্মপন্যাব ক্রিয়া। একে হঠাৎযোগের ক্রিয়া মনে করা সূর্য্যত। এটা জীবনধারণের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া।

এখন আমি বাহু সহজে বিচার করব আমরা যা খাই, তাতে প্রাণবাহুর যোগ না থাকলে তাব মূল্য কম হয়ে যায়। যে পুর্বোমাত্রায় প্রাণবাহু নেয় না, তার বেশি মাত্রায় আহাব নেওয়ার আবশ্যক হয়। যে পুর্বোমাত্রায় প্রাণবাহু গ্রহণ করে, তাব আহারের মাত্রা কমে যায়।

যদি এই বিষয় সহজে আমরা গভীরভাবে চিন্তা কবি তাহলে বুঝতে পারি যে, আমাদের শরীরে প্রধানত চারটি তত্ত্ব আছে—পৃথী, জল, অগ্নি আর বায়ু। শরীরের এই চারটিই প্রয়োজন আছে। এগুলি ঠিকমত যোগাতে হবে। খনিজ দ্রব্যের রূপ পৃথীতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। আমাদের শরীরের জল লৌহ আবশ্যক, সীসা আবশ্যক, বোপ্য আবশ্যক, স্বর্ণ আবশ্যক—অনেক ধাতুই আবশ্যক। আমবা দুধ পান করি—দুধের মধ্যে অত্র আছে। আমবা জিবা খাই—জিবার মধ্যে লৌহ আছে। মাড়হুগ উৎকৃষ্ট বোপ্য থাকে। আমবা শাকসব্জি খাই, তাতে অনেক মূল্যবান খনিজ থাকে। মানুষ স্বর্ণভস্ম, রক্ততলস্ম, লৌহ ভস্ম ইত্যাদি ঔষধ রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উপযোগী হয় না, তাব বেশিভাগই বুখা চলে যায়। সেক্ষত্বে বলা হয়, প্রয়োজনীয় খনিজগুলি ভস্মরূপে না নিয়ে স্থানাবিক আহাব থেকে নেওয়ার চেষ্টা কর। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে এসেছে। যেমন খনি থেকে পাওয়া খনিজ আমাদের দেহের সঙ্গে একবস হয় না, তেমনি গাছপালা

থেকে পাওয়া খনিজও পুৰোপরি একবস হব না। এর থেকে যদি আমবা মানসিক আহাৰ কাপে, কেবল মানসিক সংকল্পেব ছাৰা, কোন দ্ৰব্য বিকশিত করে নিতে পাৰি, তবে তা সহজেই আমাদের সঙ্গে একবস হয়ে যায়। এই তথ্য প্রয়োগ করে দেখতে হয়, তবে প্রয়োগ দৌৰ্দ্ধকাল-সাপেক্ষ হতে পাৰে। মনোভঙ্গী আহাৰের ব্যাপাব খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ, খুবই সূক্ষ্ম। তবে সংকল্পের দ্বাৰা বিকশিত কৰাব শক্তি অৰ্জন করতে পাৰলে আমরা মন থেকেই অনেক ভয়ের পূৰ্ণ কবতে পাৰি। মনেব দ্বাৰা পূৰ্ণ করা যদি কঠিন হয়, তবে আমরা সহজতর পথে বায়ুর দ্বাৰা পূৰ্ণ কৰাব চেষ্টা করব।

ভগবতী সূত্রে বলা হয়েছে, মানুষ ছয় দিক থেকে আহাৰ গ্রহণ করে। পূৰ্ব, পশ্চিম, উত্তৰ, দক্ষিণ, উৰ্ব্ব আৰ অধঃ—এই ছয় দিক থেকেই মানুষ আহাৰ পায়। আজ একথা কেবল পাঠের বিষয়কাপে গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধান আৰ চৰ্চাব অভাবে আমবা এ কথাব অৰ্থ আজ বুঝতে পাৰি না। কেন, আমবা কি পায়ের দিক থেকেও আহাৰ সংগ্রহ করি না? নিশ্চয়ই কবি। বলা হয়েছে—যখন হেঁটে বেড়াবে, খালি পায়ে হাঁট। আবার সড়ক দিয়ে হেঁট না, মাটির ওপর হাঁট। যদি সড়ক—বিশেষত পাকা সড়ক—আর জুতো দিয়ে ব্যবধান রচনা কর, তবে পৃথী থেকে সাক্ষাৎ যে আহাৰ মেলে, তা আর পাৰে না। খালি পায়ে মাটির ওপর ঘূরে বেড়ালে পৃথী থেকে সমস্ত তত্ত্ব টেনে নেওয়া যায়। আমরা নিজেদের মাথাকেও কাজে লাগাতে পাৰি। সৌর মণ্ডল থেকে প্রাণশক্তির উদ্ভেজক যে তত্ত্বটি বিকীৰ্ণ হচ্ছে তা আমরা মাথা দিয়ে দেহের মধ্যে টেনে নিতে পাৰি। এর থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন দিকে মাথা বেখে শুলে কি কি লাভ হয়—এই সম্বন্ধে যে তথ্য প্রচলিত আছে, তাব মধ্যেও সারবত্তা আছে। এতদিন তো আমরা এই তথ্যকে কেবল লোক-প্রসিদ্ধি বা অন্ধাভুতবৰণ বলে মনে করেছি। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষার পরে এই তথ্য সত্য বলে নির্ণীত হয়েছে। ফরাসী ভাষ্যার শোৰাব খাটের মাথার

দিক পরিবর্তন করে অনেক রোগীর চিকিৎসা কবেছেন এবং এই পদ্ধতিতে রোগমুক্তি কবতে আশাভীত সাকল্য লাভ করেছেন। এর বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। সৌরমণ্ডল থেকে যে প্রবাহ আসছে তা আমার মাথাকে আকর্ষণ করে ও নিজের দিকে টেনে নেয়। যে প্রবাহের দিকে মাথা থাকে, সেই প্রবাহের তত্বই মাথার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। এজন্য এই পদ্ধতিবিশেষ স্তম্ভক্য আছে।

• হারের অর্থ কেবল খাওয়াই নয়। প্রকৃত অর্থ নেওয়া, টেনে নেওয়া, আহরণ করে নেওয়া। মুখ দিয়ে, পা দিয়ে, নাক দিয়ে, মাথা দিয়ে, পা দিয়ে, চাই কি সারা শরীর দিয়ে আমরা যা কিছু বাইরে থেকে গ্রহণ করছি, তা সবই আহার।

এভাবে আমরা ওপব থেকে, নিচ থেকে, আশপাশ থেকে, ডাইনে থেকে, বাঁয়ে থেকে আহার নিয়ে থাকি। আমরা সব দিক থেকেই, সব বিদিক থেকেই, আহার নিয়ে থাকি। বায়ুর আহার আমরা বায়ুর মাধ্যমেই পাই। বায়ু থেকে লভ্য আহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখব যে, গাছপালা আহার করে আমরা যে তত্ত্ব সংগ্রহ কবি কেবল বায়ুর থেকেই তা আমরা লাভ করতে পারি। কারণ বায়ুমণ্ডলে সব তত্ত্বের পরমাণুই জমা আছে।

আরও দুটি বিষয় আছে। বিষয় দুটি অবশ্য সংতুলিত আহারের শ্রেণীতে পড়ে না, কিন্তু ঐ আহারের পরিপূরক হিসেবে তাদের উল্লেখ করা আবশ্যিক। বিষয় দুটি—উপবাস আর মানসিক প্রসন্নতা। এদের বাদ দিলে, আহাব অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। আপনারা আহার করবেন অথচ উপবাস কবেন না, অনাহারে থাকা অভ্যাস করবেন না—সে ক্ষেত্রে আহার কষ্টের কারণ হতে পারে, জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা আহার কবলাম ক্ষুধার সমস্যা সমাধান করার জন্য, অথচ সেই আহার থেকে অনেক সমস্যার উৎপত্তি হল। যে লোক কেবল আহার করে, উপবাস করে না, সে উপবাসের মর্ম বুঝতে পারে না। ফলে সে আহারজনিত সমস্যার প্রতিকার করতে পারে না। প্রকৃত

তথ্য এই যে, আহাৰেৰ সঙ্গে অনাহাৰেৰ ও উপবাসেৰ যোগ একান্ত
আৱশ্যক। এক্ষেত্ৰে উপবাসেৰ অৰ্থ একেবাৰে না খাওৱাও হতে পাৰে,
আবাৰ আহাবেৰ মাত্ৰা কমিয়ে দেওৱাও হতে পাৰে।

আহাবেৰ সময় মনকে চিন্তামুক্ত ৰাখলে পাচন ক্ৰিয়া ভাল হয়।
প্ৰসন্নতাৰ অৰ্থ হৰ্ষ নয়। শোক যেমন একটা আবেশ, হৰ্ষও তেমনি
এক আবেশ। প্ৰসন্নতা আবেশ নয়। প্ৰসন্নতা চিন্তেৰ নিৰ্মলতা।
যেমন প্ৰসন্ন আকাশেৰ অৰ্থ নিৰ্মল আকাশ, মেঘ-মুক্ত আকাশ।
যে চিন্ত হৰ্ষ, ভয়, শোক প্ৰভৃতি আবেশেৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত নয়, সেই
চিন্ত প্ৰসন্ন। সেই চিন্তেৰ বৃত্তিগুলি শাস্ত। যে আহাৰ কৰছে,
তাকে কেবল আহাবেৰ কাজেই মগ্ন থাকতে হয়। সে জ্ঞাত চিন্তেৰ
প্ৰসন্নতাও ভোজনেৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ তত্ত্ব।

ভাবনা

নদীর অপর তট সামনে। এক ব্যক্তি ঐ তটে ঘেঁষে চারু। নদী গভীর, অথচ সে সাঁতার জানে না। তাকে অবশ্রুই নৌকায় বসে অপর তটের দিকে যেতে হবে। অপর তটে বাগ্‌রার সাহন বা উপরু হল— নৌকো। নৌকো ছাড়া সেখানে পৌঁছনো বাবে না। আমরা যে তটে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে সন্তুষ্ট বোধ করছি না। সামনে যে তট ঘেঁষে পালছি সেখানে যেতে চাই। কিন্তু বাগ্‌রা সহজ নয়, অনেক অন্ধুবিধে আছে। নদী যেমন গভীর তাহে পাল্লো হেঁটে আমরা ওপার যেতে পাবব না। আমাদের নৌকো চাই। সেই নৌকোই হল—ভাবনা। ভাবনার সাহায্য নিয়ে, ভাবনার নৌকায় বসে, দুবে যে তট দেখা যাচ্ছে সেখানে পৌঁছব। এমন তটই থাকতে পারে না যেখানে ভাবনার নৌকায় চড়ে পৌঁছনো বাবে না। এই হল ভাবনার প্রয়োজন, ভাবনার মহত্ব।

প্রশ্ন এই যে, ভাবনা কি? কোন বিচার বা চিন্তা বারবার মনে আলোড়ন কবাই ভাবনা। ধ্যানের তিন অঙ্গ—ধারণা, ধ্যান আর সমাধি। এই হল মহর্ষি পতঞ্জলি-কৃত বিভাগ। আমরা বলি—ভাবনা, ধ্যান আর সমাধি। ধারণা আর ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ধারণার কাজ হল, মনকে কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা। বিষয়টি তখন ধ্যেয় হয়। ধারণা পুষ্ট হলে ধ্যান হয়ে যায়। ধ্যান পুষ্ট হলে সামাজিক সমাধি হয়ে যায়। একই ধ্যানের—একই বিষয়ের—তিন রূপ হল : প্রথমে এক রূপ, মধ্যে আর এক রূপ ও শেষে আরও এক রূপ। এই হল ধারণা বা ভাবনার স্বরূপ। ভাবনাব অর্থ—সবিসয় ধ্যান। এটাই ভাবনার পাবিত্যমিক নাম। যখনই আপনাদের মনে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, আপনাবা কোন বস্তুকে ধ্যেয় বলে নির্বাচন করে নেন, তখনই আপনারা সবিসয় ধ্যান করেন—আর তাকেই ভাবনা বলাও যায়। ভাবনা, সবিসয় ধ্যান আর জপ—এগুলির মধ্যে কোন ভেদ নেই, তিনটিই এক। তবে, এত্যেকের উপযোগিতা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্যের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। জপের অর্থ এই যে, যা জপা, যার জপ করা হচ্ছে—সেই জপ্য বস্তুর প্রতি জপকারী ব্যক্তির তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওয়া। ভাবনার অর্থ—ভাব্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওয়া। ধারণার অর্থও একই—যার ধারণা করা হচ্ছে তার প্রতি তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওয়া। সবিসয় ধ্যানও তাই। বিষয়ের প্রতি বা ধ্যেয়ের প্রতি তন্ময় ও একাগ্র হয়ে যাওয়াই সবিসয় ধ্যান। জপ, ভাবনা, ধারণা আর সবিসয় ধ্যান—এই চারটি শব্দই একই পর্যায়ের। এদের মধ্যে তাৎপর্যের ভেদ নাই, আছে কেবল নামের ভেদ।

ভাবনা নোকোর মত। ভগবান মহাবীর বলেছেন—যে ব্যক্তির আত্মা ভাবনা-বোগের দ্বারা বিস্তৃত হয়েছে, সে যেন জলে নৌকো পেয়েছে। যে যখনই চায় ওপাবে পৌঁছতে পারে। এখন, এই নৌকো কি করে ব্যবহার করা যায়—এই প্রশ্ন থেকে যায়। ভাবনার দ্বারা ভাবিত হওয়া আবশ্যিক। আপনারা ভাবিত না হওয়া পর্যন্ত সেই স্থিতিতে পৌঁছতে পারবেন না। আগমে ‘ভাবিতান্না’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ভাবিতান্না হতে না পারলে লক্ষ্য বস্তুর প্রাপ্তি হয় না। ভাবিতান্না হলে পারে, যা হতে হবে তা-ই হওয়া যায়।

ভাবনা ২৪১

এ সবই একাগ্রতার বিষয়জনক ফল। আমরা যা হতে চাই, তাই হুটে যায়, মনকে যে কপে বদলাতে চাই মন সেই কপেই বদলায়। মন কেবল এক আকারের নয়, তাব অসংখ্য পর্যায় আছে। মন ভিন্ন ভিন্ন আকারে বদলাতে পারে। আমরা যেমন চাই তেমন আকাবই মন গ্রহণ কবতে শুরু করে। এটা মনের নিজস্ব বিশেষত্ব। তন্ময়তা ও একাগ্রতার সঙ্গে আমরা যা ভাবনা কবি তা অবশ্যই হতে থাকে। এ বিষয়ে কখনও অন্তথা হয় না। তবে, একাগ্রতা ও স্থিরতার প্রয়োজন। মন যখন বদলায় তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীবও বদলায়।

ফরাসী দেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আমেরিকার এক যুবক সেই দেশে এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেছিল। ঐ পরিবারের সঙ্গে তার গাঢ় সম্পর্ক হল। ঐ পরিবারে এক বয়স্কা বস্তা ছিল, তার সঙ্গে যুবকের প্রণয় হল। কিন্তু বিয়ের প্রশ্ন উঠলে যুবক বলল—‘আমি তো এখনই বিয়ে কবতে পারব না। যতদিন আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারি ততদিন পত্নীর ভার বহন করতে পারব না। আমি আর্থিক দিক থেকে স্বাধীন হয়ে বিবাহ করব।’ কথ্যটি এই কথা মেনে নিল। যুবক আমেরিকায় চলে গেল, যুবতী দেশেই বইল। কিন্তু যুবতীর মনে এক চিন্তা এল, ‘পাঁচ-সাত বছর পবে যখন যুবক আমাকে বিয়ে করতে আসবে, তখন হয়ত আমার রূপ ও রঙ বিবর্ণ হয়ে যাবে, আমার যৌবনে ভাটা পড়বে। সে প্রতিদিন ভাবনা আবদ্ধ করল। সে এক আয়নার সামনে দাঁড়াত আর চিন্তা করত—‘আমি আজ যেমন আছি, তেমনি থাকব।’ এই ভাবনায় সে তন্ময় হয়ে যেত। এইভাবে পনের বছর কেটে গেল। এদিকে যুবক নিজের পায়ে দাঁড়াল, তার আর্থিক অবস্থা ভাল হল। সে আত্মনির্ভর হয়ে গেল। তার মনে যুবতীর স্মৃতি অল্পক্ষণ জাগ্রত ছিল। সে ফরাসী দেশে চলে এল। কিন্তু অল্প অনেক রকম চিন্তাও তার মনে এল। সে ভাবল, যুবতীর অবস্থা কেমন হবে? সে কেমন আছে? তার রূপ-যৌবনই

বা কেমন ? যা হোক, সে যুবতীর সঙ্গে মিলিত হল। সে দেখল তার শবীরেব লাবণ্য, তাব সৌন্দর্য ও কমনীয়তা, পনের বছর আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। ভিলমাত্র পার্থক্য হয় নি। সে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হল। ছুজনেই সুখী হল। এই হল ভাবনার আশ্চর্যজনক ক্ষমতার এক উদাহরণ।

একেই ভাবনা-যোগ বলে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভাবনার নিজেকে ভাবিত কবে, সে সেই প্রকারেই পরিবর্তিত হবে যাব। ভাবনার এই রকম কত প্রয়োগই যে পৃথিবীতে হয়ে থাকে, তা কে জানে। জৈন পবম্পরার ভাবনা-যোগকে বিশেষ মহত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনারা তাব আধ্যাত্মিক মূল্য দেবেন কি না দেবেন আপনারাই জানেন, কিন্তু এই তথ্য স্পষ্ট যে ভাবনাকে আশ্রয় কবে মানুষ নিজেকে গড়তে ও ভাঙ্গতে পারে।

জাপানের ধ্যান সম্প্রদায় (জেন সম্প্রদায়) ভাবনার অনেক রকম প্রয়োগ করে। তাদের কেউ হয়তো আখড়ায় নেমে ভয়ঙ্কর নির্ভুর ঝাঁড়েব সঙ্গে লড়াই কবে। সে খালি হাতে আখড়ায় নামে। তার কাছে কোন অস্ত্রই থাকে না, লাঠি পর্যন্ত থাকে না। ঝাঁড় দৌড়ে সামনে এসে যাব। সে তাকে লাল নিশান দেখায়। লাল কাপড় দেখলেই ঝাঁড় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে যাব। সে তখন অতি বেগে তার দিকে ছুটে যায় ও তাকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ কবে। কিন্তু নিতান্ত ক্লশকায সাধকও ভাবনা ও সংকল্পের শক্তিতে সেই ঝাঁড়কে পবাস্ত কবে মাটিতে আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। তার ভাবনাব রূপ হয় এ রকম—‘আমি ঝাঁড়ের সঙ্গে লড়ব। আমি নিশ্চয়ই ঝাঁড়কে পবাস্ত করব।’ এই ভাবনার সাহায্যে সে এমন শক্তি অর্জন কবে যে, সে ঐ ভয়ঙ্কর, উত্তেজিত আক্রমণকারী ঝাঁড়কে শাস্ত কবে দেয়, যেন তাকে ছাগল বানিয়ে দেয। ভাবনার এ রকম প্রয়োগ আজও হয়ে থাকে। কেবল অতীতেই হয়ত হতো, একথা ঠিক নয়। আজও কিছু লোক এ রকম প্রয়োগ করে থাকে।

এক মঠ ছিল। সেই মঠে ছোট বড় অনেক সাধক সাধনাব অভ্যাস করত। সেখানে এক মল্লযুদ্ধের (কুস্তিবি) আয়োজন করা হল। দুই পালোয়ানকে আমন্ত্রণ করা হল। তাদের একজন ছিল পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, অপব জন কম শক্তিশালী। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলিষ্ঠ পালোয়ান কম-জোবী পালোয়ানকে চিৎ করে দিল। সাধকদের মনে এক চিন্তার উদয় হল। তারা দুর্বল পালোয়ানকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করল। কথজন সাধক চোখ বন্ধ করে এই ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেল যে, এই পালোয়ানের জয় চাই। কিছু সময় গেল। সবলে দেখতে পেল, দুর্বল পালোয়ান বলিষ্ঠ পালোয়ানকে মাটিতে ফেলে দিল ও তার বুকে চেপে বসল।

ভাবনা অস্ত্র ব্যক্তি পর্ষস্ত পৌছতে পারে, অস্ত্র ব্যক্তির ওপবেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অপরের বিপদের শাস্তি আনা ও রোগেব প্রতিকার করা, অপরের হৃদয়েব পরিবর্তন কবা বা চিন্তাধাবার পরিবর্তন করা—এ সবই ভাবনার প্রয়োগ। ভাবনার দ্বারা এ সবই কবা যায়। ভাবনার মাধ্যমে নিজেব পবিবর্তন, অস্ত্রের পবিবর্তন, আশপাশের ব্যক্তির পরিবর্তন, এমন কি সমস্ত বাতাববণেব পরিবর্তন করা সম্ভব। এক ব্যক্তির শরীব দুর্বল, তাব শরীব সুস্থ করার জন্ত ভাবনা কবা যায়। এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক দুর্বল, তার মস্তিষ্ক সবল করার জন্ত ভাবনা করা যায়। এক ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষীণ, হৃদয় দুর্বল, চিন্তা অপবিত্র—তার সব কিছু সুস্থ ও স্বাভাবিক করার জন্ত ভাবনা করা যায়। অসংখ্য প্রকারের ভাবনা হতে পারে। আজকের চিকিৎসকবা—বিশেষত জার্মান দেশের চিকিৎসকবা—রোগীকে ঔষধ না দিয়ে ‘অটো সাজেসন’ (Auto suggestion) দ্বাবা আবোগ্য করতে চেষ্টা করেন। তাঁবা বলেন—‘জঙ্গলে চলে যাও। সেখানে এক গাছের নিচে বসে সমাধিস্থ হয়ে যাও, আব নিজেকে বোঝাও—আমি সুস্থ আছি, আমি সুস্থ হযে যাচ্ছি।’ এই চিকিৎসকবা মনে করেন, এই পদ্ধতিতে রোগী রোগমুক্ত হয়ে স্বাস্থ্য ফিবে পায।

এ সবই সামান্য কথা। যখন আমরা সাধনার দৃষ্টিতে বিচার কবি তখন আমবা বুঝতে পারি যে, কি প্রকার ভাবনা আমাদের কবতে হবে—তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জৈন পরম্পরায ভাবনা সম্বন্ধে অনেক বিচাব করা হয়েছে। সব ধর্মেই ভাবনা সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে, তবে জৈন সাহিত্যে এই বিষয়ের উল্লেখ অনেক বেশি। ভাবনা প্রধানত এই চাব প্রকাবের—

১। জ্ঞান ভাবনা।

২। চারিত্র ভাবনা।

৩। ভপ ভাবনা।

৪। বৈবাগ্য ভাবনা।

যে ব্যক্তি সাধনাব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবছে, তাকে সবার আগে জ্ঞান ভাবনার দ্বারা নিজেকে ভাবিত করতে হয়। ভাবনার অর্থ বিচাব বা চিন্তার পুনবাবুত্তি নয়, বিচাবেব স্থাপন ও দৃটীকবণই ভাবনার অর্থ। অভ্যাসকালে বিচারকে পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করতে হয়। বিচারের পুনবাবুত্তি আব বিচারের স্থিরীকবণ—এই দুটি ব্যাপারেবই আবশ্যকতা আছে। যদি আপনারা একই বিষয়ের বাব বার আবুত্তি করেন, তবে তা ভাবনায় পরিণত হয়। আপনি তার দ্বারা ভাবিত হবেন, আর ঠিক তদনুসারে কাজ কববেন। এক ব্যক্তি দিনে দশ-পনবো বাব দরজা খোলে আর বদ্ধ কবে। কলে সে ঐ ক্রিযাব দ্বারা ভাবিত হয়ে যায়, প্রভাবিত হয়ে যায়। যখনই সে ঘরে প্রবেশ করে তখনই—দবকাব থাকুক বা না থাকুক—তার মন ঐ ক্রিয়ার দিকেই হয়। সে দরজা খুলুক বা না খুলুক, তার স্মৃতি কিন্তু ঐ ক্রিযাতেই সংলগ্ন হয়। কারণ সে ঐ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়েছে। ছ ভাবেই ব্যক্তি প্রভাবিত হতে পাবে, বিচার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, আবাব কার্যের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পাবে। বিচার ও কার্যের পুনবাবুত্তি—এই দুটি ভাবনার মূল।

প্রশ্ন উঠবে, ভাবনার দ্বারা আমরা কি করে আমাদের পরিবর্তন

করব ? প্রক্রিয়া এই প্রকাব—আপনাব প্রথমে ধ্যেয় কি, তা নির্বাচন করুন। আপনারা স্থির ককন আপনারা কি হতে চান বা কি করতে চান। আপনারা কবি হতে চান, কি দার্শনিক হতে চান, কি লেখক হতে চান, কি সাহিত্যিক হতে চান—যা চান তাই হতে পারেন। বা আপনাদের হতে হবে তা-ই আপনাদের ধ্যেয়। এবার, যাকে ধ্যেয় করেছেন তাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্ত আপনাবা ভাবনা অভ্যাস করুন। প্রগ্ন করতে পারেন, অভ্যাস কখন করব, কেমন কবে কবব ? আপনাবা নির্জন স্থানে চলে যান। শরীরকে শিথিল করে বসুন, মনকেও শিথিল ককন। মনে কোন উত্তেজনা রাখবেন না, আকুল-ব্যাকুল হবেন না। এটা প্রারম্ভিক স্থিতি মাত্র, কিন্তু এটা প্রয়োজন। বা আপনারা ধ্যেয় বলে পছন্দ করেছেন তাকে স্থূল মন থেকে হটিয়ে অবচেতন মনে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত আপনাদের ‘হওয়ার’ ভাবনা সফল হবে না। আপনারা বলতে পাবেন—‘ঐ রকম ভাবনা তো অনেক করেছি, কিন্তু সফল হই নি।’ অসফলতার কারণ, আপনাদের কোথাও বোঝার ভুল হয়েছে। ভাবনার তাৎপর্য হল, চেতন মনকে ভুলিয়ে দিয়ে অবচেতন মনকে জাগ্রত করা। চেতন মনের চিন্তাকে অবচেতন মনের কাছে গচ্ছিত রেখে অবচেতন মনেই তাকে স্থাপন করে দেওয়া—এই হল ভাবনা, ভাবনার অভ্যাস। তা দিন আপনাদের কথা অবচেতন মন পর্যন্ত পৌঁছবে না, ততদিন হাজার-দশ হাজার বার প্রয়ত্ন করলেও, শব্দের আবৃত্তি করলেও, সফলতা মিলবে না। সফলতা লাভ করতে হলে আপনাদের শরীরকে বিসর্জন দিতে হবে, অর্থাৎ শরীরকে একেবারে শিথিল করে দিতে হবে ও চেতন মনকে শাস্ত করতে হবে। তাব পবে আপনাবা ধ্যেয়ের আবৃত্তি করতে থাকুন—প্রথমে কিছুটা নিম্ন কণ্ঠে, পরে উচ্চ-কণ্ঠে আবৃত্তি ককন। এই ক্রম দশ মিনিট ধবে চলবে। তার চেয়ে কম সময়ে সফলতা অসম্ভব। প্রতিদিন এই ক্রম অল্পসারে আবৃত্তি ককন। স্মরণ রাখবেন, কখনও

যেন ক্রমভঙ্গ না হয়। আপনারা ধ্যেয়কে অনুসরণ কবে আচরণ করুন। নিশ্চিতভাবেই আপনাবা লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সময় কম বা বেশি লাগতে পারে, কিন্তু লক্ষ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত। কোন ব্যক্তিই ভাবনা ছাড়া প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না, ধ্যানের উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হতে পারে না। শারীরিক, বৌদ্ধিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ববিধ বিকাশের ক্ষেত্রে ভাবনার সর্বাধিক মহত্ব আছে।

যে কোন লক্ষ্য পূরণ করতেই অনেক বকম উপক্রম করতে হয়। মনে করুন, আমরা নির্মোহ হতে চাই। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে আমাদের সব মোহজনক বস্তুকে ছাড়তে হবে। যে বস্তু মোহ উৎপন্ন করে, মনকে মূঢ় করে, তাকে সবিয়ে দিতে হবে। ধ্যেয়ের অর্থই হল ভাবনা।

অধ্যাত্মের সাধনা

এক ব্যক্তি বিচারকের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল—‘সত্য কি? জাস্টিস্ বা কি?’ বিচারক উত্তর দিলেন—‘আমি যা বলি তাই জাস্টিস্। তুমি যে তা মান না, সেটাই সত্য।’

আমরা সংসারে সত্য আর জাস্টিস চক্রে পড়ে পাই। ধর্মের সকল পথই সত্যকে খোঁজার জগ্ন। আদিকাল থেকে মানুষ সত্যের খোঁজ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাস্টিসও চলেছে। ঐ রকমই চলবে। জাস্টিস যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলত তবে ধর্মের আজ কোন অপেক্ষাই থাকত না। কিন্তু যেমন যেমন ধর্মের বিস্তার হয়েছে, তেমন তেমন জাস্টিসও বিস্তার হয়েছে। সত্যকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যেই আমরা ধর্ম আর অধ্যাত্মের চর্চা করি। মানুষ সোনার মূল্য করতে পারে, কিন্তু মাটির মূল্য করতে পারে না। কারণ মাটি এত সহজলভ্য যে প্রত্যেক ব্যক্তি তা অনায়াসে পেতে পারে। তবে প্রকৃত সত্য এই যে, সোনার তুলনায় মাটির মূল্য হাজার গুণ বেশি। সোনা মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে, মাটি যে কত হত্যাপথবাত্মীকে রক্ষা করেছে তা কে জানে। তবুও মাটির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, কারণ মাটি সহজেই পুণ্ডিত। আমরা কৃষ্টির মূল্যায়ন করি, কারণ আমরা জানি

কুটি আমাদের জীবন। পরন্তু যে প্রাণ সত্যই আমাদের জীবন তার মূল্যাহীন আমবা কখনও কবি না। অথচ প্রাণই আমাদের সকল স্বাস্থ্য। সাধনার পদ্ধতি মূল্যাহীনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেখানে মতভেদেব প্রশ্ন থাকে সেখানে হাজার সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। লোকে বলে, এত সম্প্রদায় না থাকুক। আমি এই ভাবে চিন্তা করি যে, হাজার সম্প্রদায়ই হোক—প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সম্প্রদায় হোক। কেবল অধ্যাত্মই এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে সম্প্রদায় ভেদ হয় না। সাধনা আর অধ্যাত্মের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়-ভেদ নেই। সাধনার পথে সবচেয়ে বড় যোগ হল ধ্যান। ধ্যানের অর্থই নির্বিকল্পতা, যেখানে কোন বিকল্প নেই, বিবাদ নেই। এখানে মতবাদের প্রশ্নই ওঠে না। সাধনার মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কান বন্ধ হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে যায়—সে ক্ষেত্রে বিবাদেব প্রশ্ন উঠবে কি কবে? আমাদের যে নৈতিকতার পুঞ্জি আছে তাব প্রকৃত পশ্চাৎপট—অধ্যাত্ম। অধ্যাত্মের আধাবেই নৈতিকতা বিকশিত হতে পারে। আজ আমাদের সমস্ত ধ্যানই শরীর-কেন্দ্রিত হয়ে গিয়েছে। মন কিন্তু মূল। অথচ সেই মনকে আমরা উপেক্ষা করে চলেছি। মনই সেই তত্ত্ব, যা আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

একদিন মহাত্মা বুদ্ধ ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে এক শিষ্য ছিল। সে প্রশ্ন করল—‘ভগ্নে! ধ্যানেব শক্তি কি, আমি জানতে ইচ্ছা করি।’ বুদ্ধ স্তনলেন। কিন্তু উত্তর দিলেন না। পথে এক কুয়ো পড়ল। এক পিপাসার্ত পথিক সেখানে এল। কুয়ের পাশে দড়ি-বাঁধা এক বালতি ছিল। পথিক বালতিটি কুয়োব নামিয়ে দড়ি টেনে তুলল। বালতি ওপরে চলে এল, কিন্তু বালতিতে জল ছিল না, ওটা ছিল খালি। পথিক আবার বালতি কুয়োব নামাল, টেনে তুলল। কিন্তু এবাবেও দেখা গেল বালতি খালি। পথিকেব পিপাসার জল জুটল না। আসলে বালতির নিচে ছিদ্র ছিল, ফলে জনপূর্ণ বালতি ওপরে আসতে আসতেই খালি হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধ আরও এগিয়ে গেলেন। আবার এক কুয়ো দেখা গেল, তার পাশেও দড়ি-বাঁধা বালতি ছিল। এক পিপাসার্ত পথিক এল। বালতি দিয়ে জল টেনে তুলল। জল পান করল। তার পিপাসার শান্তি হল।

বুদ্ধ শিষ্যকে বললেন—‘বৎস ! তুমি জ্ঞানতে চাও ধ্যানের শক্তি কি ? ধ্যানের শক্তি এইভাবে বর্ণনা করা যায়—যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, সে খালিই থেকে যায়, কখনও ভরে ওঠে না। তার ছিদ্র থেকে যায়। সে কখনও পূর্ণ হতে পারে না। যা কিছু তার ভেতরে আসে, তা সবই ছিদ্রপথে বেরিয়ে যায়। যে ধ্যান করে, তাব ভেতরে যা প্রবেশ করে, তা হাজার গুণে বাড়ে।’ এই হল ধ্যানের শক্তি—ধ্যানের মহত্ব। আমার শরীরের, আমার মস্তিষ্কের কত শক্তিই না আছে। তাদের বিকাশ করার পথ—সাধনা। সাধনা ছাড়া তারা বিকশিত হয় না। সমস্ত সাধনার পথই শক্তি-বিকাশের পথ।

ইন্দ্রিয় সংযম

এক কবি ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ছিলেন। তাঁর বাস ছিল আমেরিকায। তাঁর নাম ছিল 'ইউনকো'। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল, আব দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টির তেজ প্রবল ছিল। কবিকে থামতে হল। তাঁর কাছে এক স্থলিখিত ডায়েরি ছিল, যাতে তিনি অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর কোন এক স্থানে বাগবা দরকার ছিল, অথচ বৃষ্টিতে ডায়েরি ভিজ্ঞ যেতে পারে বলে তাঁর ভয় হল। পাশেই এক দোকান ছিল, এক বুড়ো দোকানদার সেখানে বসে ছিল। তিনি তাঁর হাতে ডায়েরিটা দিবে বললেন—‘দেখ, আমি তোমার কাছে এই ডায়েরি দিলাম। তুমি এটা ভাল করে রাখবে। কাল ফেবার পথে নিয়ে যাব। বৃষ্টি এসেছে। আমার কাছে ছাতা পর্যন্ত নেই। ডায়েরিটা ভিজ্ঞ যাবে, তাই তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। তুমি কিন্তু সাবধানে রেখ।’ দোকানদার ডায়েরিটা নিয়ে বেথে দিল।

পরের দিন কবি তাঁর ডায়েরি নেওয়ার জন্ত দোকানে এলেন। তিনি দেখলেন দোকানদার ডায়েরি থেকে পাতা ছিঁড়েছে, আব তা দিবে গ্রাহকদের পুরিয়া বেঁধে দিচ্ছে। অবাক হয়ে তিনি দোকানদারকে বললেন, ‘আরে! এ কি করছ? ডায়েরিটা এভাবে কেন নষ্ট করছ?’

স্বদ্ধ বলল—‘ক্ষমা ককন, আমাব ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি বড় ভুলো স্বভাবের। আমার স্মরণই ছিল না এটা আপনাব ডায়েরি। তবে ব্যস্ত হবেন না। আমি এর ফালতু পাতাই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি আপনি লিখে শেষ কবেছেন সেগুলিই ছিঁড়েছি। যে পাতাগুলি সাদা, যেগুলিতে কিছুই লেখা হয়নি, সে পাতাগুলি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না।’

দোকানদাব তাব নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এ কথা বলছিল। সে এই ভেবেই তুষ্ট ছিল যে, সাদা পাতা একটাও ছেঁড়েনি। কবির মনে কি ভাব হল—কে কল্পনা করবে? কবির কাছে সাদা পাতার চেয়ে লেখা পাতার মূল্য অনেক বেশি ছিল। সেই পাতাগুলিতে তিনি অনেক নতুন কবিতা লিখেছিলেন। হয়ত সেই কবিতাগুলি এতই উৎকৃষ্ট ছিল যে তাঁকে তা যশের শিখরে পৌঁছে দিতে পারত। তিনি খালি পাতা দিয়ে কি কববেন?

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারেও ঐ বকস ঘটনা ঘটছে। এক ইন্দ্রিয় হবত খালি পাতাব মতই আছে, আর এক ইন্দ্রিয় লেখা পাতার মত হয়ে গিয়েছে। কোনটিকে আমরা বেশি মূল্য দেব? আমাদের ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যে রাগ-দ্বেষের ধারা বয়ে চলে, তার থেকে ইন্দ্রিয়ের ওপব রাগের অঙ্কন পড়ে, দ্বেষের অঙ্কনও পড়ে। ক্রমে অনন্ত অঙ্কন ইন্দ্রিয়কে ছেয়ে ফেলে।

যে লোক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে চিন্তা করে, জানার চেষ্টা কবে, পরস্পবাগত সংসাবকে লক্ষ্য করে বা ইন্দ্রিয়কে অধিক মর্যাদা দেয়, সে ভাবে যত কিছু অঙ্কন পড়েছে, সবই বহুমূল্য। যদি তা শেষ হয়ে যায়, সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। অঙ্কন মুছে গেলে সবই মুছে যাবে। ইন্দ্রিয় যে সুখ এনে দেয়, সে সুখ যদি না থাকে, তবে কি-ই বা অবশিষ্ট বইল? এই শ্রেণীব লোক চায়, রাগ-দ্বেষের ধারায় এতকাল যা কিছু লিখিত হয়েছে, বা কিছু অঙ্কিত হয়েছে, তা চিবকালই অক্ষুণ্ণ থাকুক। এই এক দৃষ্টিকোণ বটে।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ পূর্বোক্ত দোকানদারের। তার বিচারে সাদা পাতাই কাজে লাগে, লেখা পাতা অকেজো। খালি পাতার মূল্য আছে, কারণ তাব ওপর লেখা যেতে পারে। লেখা পাতার মূল্য নেই, কারণ সে পাতা ভরে লেখা তো হয়েই গিয়েছে, আব নতুন কিছু তো তাতে লেখা যাবে না। এটা কিন্তু এক মহত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ। অবশ্য কবিতা পক্ষে প্রিয় হবে না, ইন্দ্রিয়বাদের কাছে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় হয় না। কিন্তু সাধকের পক্ষে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় ও মনোজ্ঞ। খালি পাতাই কার্যোপযোগী, অর্থাৎ পাতা খালিই রাখব, খালি কবে নেব। তাব ওপর কখনও কিছু লিখব না। তাকে খালি থাকতেই দেব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের খাবার সঙ্গে যে বাগ-ধ্বষের খারা চলে, সেই বাগ-ধ্বষের খাবাকে রুদ্ধ করব, অবলুপ্ত করব। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা হলে খালিই থাকবে। তাব সঙ্গে বাগ-ধ্বষ জুড়ে দেব না, তার ওপর কোন অঙ্কনই পড়তে দেব না। একেই বলে ইন্দ্রিয়-সংযম।

ছুটি মত আছে। মত দুটি সম্বন্ধে ভাবভীর যোগী ও সাধক-সম্প্রদায় বহুল আলোচনা করেছেন।

কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিও না। চোখ দিয়ে দেখো না, চোখ বন্ধ রাখ। কান দিয়ে শুনো না, কানে তুলে কি কর্ক চুকিয়ে দাও। নাক দিয়ে জ্ঞান নিও না, নাক বন্ধ কবে রাখ। জিভ দিয়ে স্বাদ নিও না, সরস খাদ্য কখন গ্রহণ করো না—রসহীন, স্বাদহীন জব্যই আহার কর—যাতে রস না আসে। কিন্তু সহজেই প্রশ্ন হয়, এসব কি সম্ভব? রাত্রি-দিন কি চোখ বৃঁজে থাকা সম্ভব হয়? যাব দেখার শক্তি আছে, দৃষ্টি আছে, সে যদি চোখকে কাজে না লাগায় তো পবিত্রতা কি হবে? শোনার ক্ষমতা কান। কান বন্ধ কবে রাখলাম, কিছুই শুনলাম না, তাতে কি বড় উপলব্ধি হবে? আর, কখনও কিছু শুনব না—এ রকম সম্ভবও নয়।

আর এক মত আছে। কোন কোন সাধক বলেন, ইন্দ্রিয়দের নিজ নিজ কাজ আছে। তারা সেই কাজ করুক। চোখ, কান, নাক, জিভ

—প্রত্যেককে কাজে লাগাও। দেখ, শোন, জ্ঞান নাও, স্বাদ নাও, স্পর্শ কব—সব কিছুই কর। কিন্তু সেই সঙ্গে যে বাগ-দ্বেষেব ধারা উপস্থিত হয়, তাকে তোমার ইন্দ্রিয়ের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দিও না। সেই ধারা যেন পৃথক ভাবেই চলে। তা হলে কোন বিপদ হবে না।

এই হল দুই মত। এক, বিষয়কে নিবোধ কবা; আর এক, বাগ-দ্বেষকে নিরোধ করা। এক, ইন্দ্রিয়ের কাছ থেকে কোন কাজই না নেওয়া; আর এক, ইন্দ্রিয়ের কাজ থেকে কাজ নিয়েও তার সঙ্গে বাগ-দ্বেষকে যুক্ত হতে না দেওয়ার। মত দুটি ভিন্ন ভিন্ন। এখন চিন্তার বিষয়, সাধনার দৃষ্টিতে কোনটি আদরণীয়? ইন্দ্রিয়ের কাজ না নেওয়াই ভাল, না বাগ-দ্বেষেব সংযোগ বন্ধ কবাই ভাল? কেউ বলবেন প্রথমটি ভাল, আবার কেউ বলবেন দ্বিতীয়টি ভাল। আমি কিন্তু বলতে পাবব না প্রথমটি ভাল কি দ্বিতীয়টি ভাল। দুটিবই নিজ নিজ স্থান আছে, মহত্ব আছে।

এক ঘটনা মনে আসছে। এক ব্যক্তি এক সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা কবল—‘মোক্ষ-প্রাপ্তির জন্ত কি ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক?’ সাধু উত্তর দিলেন—‘ঘর ছাড়া মোটেই দরকার নয়। যদি আবশ্যক হতো তো জনক হবে থেকেই কি করে বিদেহ হলেন? আদর্শ গৃহ থেকে ভবত কি করে কৈবল্য প্রাপ্ত হলেন? ভগবান ঋষভের মাতা মকদেবার কি কবে মোক্ষ মিলল? মকদেবা সাধ্বী হয়ে যান নি, ভরত গৃহত্যাগী হন নি, জনক রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হন নি। তবুও মকদেবা মুক্ত হয়ে গেলেন, ভরত কেবলী হলেন, আব জনক বিদেহ হয়ে গেলেন।’

কিছু দিন পরে আর এক ব্যক্তি ঐ সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা কবলেন, ‘মহাবাজ। মোক্ষের জন্ত ঘর-সংসার ছাড়া আবশ্যক নয় কি?’ সাধু বললেন, ‘খুবই আবশ্যক, নিতান্তই জরুরী। যদি সংসার ত্যাগ না করেও মোক্ষ মেলে, তবে শুকদেব যে রকম সন্ন্যাসী ছিলেন সে রকম সন্ন্যাসীও জন্ম হয় কি করে? জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক নির্বিশেষে আমাদের ভারতীয় পরম্পরায হাজার হাজার সন্ন্যাসী হয়েছেন, মূনি হয়েছেন,

ভিক্ষু হয়েছেন, তাঁরা সন্ন্যাসী হলেন কেন? কেন তাঁরা ঘর ছেড়ে এসে সাধনা করছেন? মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ নিতান্ত আবশ্যক।’

একবার এই দুই ব্যক্তি কোন স্থানে একত্র হল। একজন বলল, ‘মহাবাজ বলেছেন মোক্ষলাভ করার জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়।’ দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, ‘এ তুমি মিথ্যা বলছ। আমি ঐ সাধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন, মোক্ষ লাভ করার জন্য ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক।’

এই ভাবে দুজনের মধ্যে বিবাদ হল। দুজনেই নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত সত্যিই বলছিল। যাক, বিবাদ বেড়েই গেল, কোন সমাধান হল না। তখন তারা দুজনে সেই সাধুর কাছে গেল। তাঁকে, বলল ‘মহাবাজ। আপনিই আমাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছেন। আমরা আপনাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনি উত্তর দিয়েছেন দুটি। আর ঐ উত্তর দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ। এব সমাধান কি?’

সাধু বললেন—‘তোমরা দুজনেই বোকা। আমার অভিপ্রায় বুঝতে পার নি।’ তারপর প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন করে সাধু বললেন—‘দেখ, ঘর ছাড়ার মত মনোবৃত্তি তোমার ছিল না। তুমি সত্যিই ঘর ছেড়ে সাধনা করতে চাও নি। সেজন্যই আমি বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়। তুমি ঘরে থেকেই সাধনা করতে পার। দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোবৃত্তি ঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল, সেজন্য আমি তাকে বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক। আমি তাকে কি করে বলব, তুমি হবেই থাক? তোমার মনোভাবনা যে দিকে ছিল সেদিকেই আমি তোমাকে প্রেরিত করেছি। আর ওর মনোভাবনা যেদিকে ছিল সেদিকেই আমি ওকে প্রেরিত করেছি। ওকে সে দিকেই যেতে বলেছি। এতে অসুবিধে কি হল?’

এই এক ঘটনা। আমরা সব ক্ষেত্রে বলতে পারব না যে ঘর ছাড়াই ভাল, আবার এ ও বলতে পারব না যে ঘর না ছাড়াই ভাল। যার যেমন

যোগ্যতা, যেমন ক্ষমতা, যেমন প্রস্তুতি, যেমন মনোবৃত্তি, তাকে তদনুসারে তার পথেই চলতে দেওয়া উচিত।

কেউ কেউ বলেন, চোখ বন্ধ করে বসে না থাকলে কাপের প্রতি যে আকর্ষণ আছে তা কখনও মিটবে না। কাপের প্রতি যে আসক্তি আছে তার এমনই নিবৃত্তি হবে না। সেজ্জন্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই দু-চাব ঘণ্টা চোখ বন্ধ কবে বসে থাকা উচিত। কেবল এরকম করলেই চক্ষু-সংযম সম্ভব হতে পারে।

আবার কেউ কেউ বলেন—এটা দুর্বলতা, এটা ক্লীবতা। বরং আমাদের প্রযত্ন করতে হবে যে, কপ দেখেও আমাদের মনে যেন আকর্ষণের উপস্থিতি না হয়, বিকারের ভাব যেন না জাগে। চোখের কাজই দেখা। তবে, দেখার সঙ্গে আমরা রাগ-দ্বেষ্ট চেষ্টনা যেন না জুড়ে দিই, তা-ই হবে আমাদের সাধনা। আমাদের মনে যেন প্রিয়তা-অপ্রিয়তার ভাব, ভালমন্দের ভাব প্রবেশ না করে।

আমি বলি, প্রথমটি এক পথ, দ্বিতীয়টি আর এক পথ। দ্বিতীয়টি শ্রেষ্ঠ আর প্রথমটি অপকৃষ্ট, কিংবা প্রথমটি শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীয়টি অপকৃষ্ট—এমন বলা যায় না। দুটিই পথ। যার যেমন রুচি সে তেমন পথে চলবে। এক পথ আর এক পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এমন কথা অর্থ হয় না। আসল কথা, ব্যক্তির রুচি, যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি? দুটি পথই আছে, তার যে কোন একটিকে ধরে লক্ষ্যে পৌঁছনো যেতে পারে।

যদি কোন ব্যক্তির এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয়ে থাকে যে, সে চোখ খোলা রাখলেও তার মনে প্রিয়-অপ্রিয় বা রাগ-দ্বেষ্টের ভাব উদ্ভিত হয় না, তাব পক্ষে চোখ বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজনই হয় না। চোখ বন্ধ রাখা তারই পক্ষে প্রয়োজন বার এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয় নি, এবং ফলে যে মনে উদীয়মান প্রিয়তা-অপ্রিয়তার বা রাগ-দ্বেষ্টের ভাবকে রোধ করতে অক্ষম।

মুখের ওপর গর্দা রাখার প্রথা আগে চলিত ছিল, এখনও আছে।

প্রশ্ন হতে পারে, পর্দা কে রাখবে—স্ত্রী না পুরুষ ? এমন কথা নয় যে, স্ত্রী-ই পর্দা রাখবে, পুরুষ রাখবে না। পর্দা সে-ই রাখবে যার দৃষ্টি নির্বিকার নয়, যাব দৃষ্টি সংযত নয়, তা সে স্ত্রীই হোক আব পুরুষ হোক। চোখ বন্ধ করে রাখা চোখের ওপর পর্দা রাখাব মতই। ইচ্ছা হয় চোখ বন্ধ রাখা, ইচ্ছা হয় চোখের ওপর কাপড়ের আবরণ রাখা—ছুই একই কথা। পর্দা আবরণ মাত্র। যার এমন ক্ষমতা হয়েছে যে, তাব দৃষ্টিতে বিকার আসে না, রূপ-অরূপেব প্রতি রাগ-দ্বेष হয় না, তার ক্ষেত্রে পর্দার কোন আবশ্যকতা থাকে না। তাব চোখ বন্ধ করে সাধনা করার আবশ্যকতাও নেই।

এক পথ—ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিবোধ। আর এক পথ—বাগ-দ্বেষের ধারা অববোধ। এই দুটিব সংযুক্ত নাম—ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা। প্রতিসংলীনতাব অর্থ—নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাওয়া। ইন্দ্রিয়-প্রতিসংলীনতা হল—চেতনাব মধ্যে ইন্দ্রিয়েব লীন হয়ে যাওয়া।

ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা জেনে রেখেছি—চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে কিন্তু ব্যাপার তা নয়। বাস্তবে ঐ রকম কোন ভাগ নেই। জ্ঞানের ধারা একই। তা ভাগে ভাগে বিভক্ত নয়। আমাদের ব্যবহারের সুবিধের জগুই আমরা বিভাগ করনা কবে নিষেছি।

জৈন পরম্পরায় চব্বিশ প্রকাব ‘লন্ধি’-র উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে এক লন্ধি হল—সংভিন্নশ্রোতোলন্ধি। যে সাধক যোগীর এটা উপলব্ধ হয়ে যায়, যে সাধক সাধনার দ্বারা চেতনাব বিকাশ অত্যুচ্চ স্তরে নিয়ে যান, সেই সাধক যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ কবিষে নিতে পারেন। তিনি চোখ দিয়ে শুনতে পারেন, কান দিয়ে দেখতে পাবেন—আঙ্গুল দিয়েও দেখতে পাবেন, শুনতে পারেন। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ের কাজের কোন বিভাজন নেই। যে কোন ইন্দ্রিয়ই সব ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানধারা এক ও অবিভাজ্য।

‘সংভিন্নশ্রোতোলঙ্কি’ কথাটির শব্দার্থ হল—যে শ্রোত আছে, তার সমস্তই ভিন্ন হয়ে যায়, খুলে যায়। ফলে এমন অবস্থা আব থাকে না যে, কান দিয়েই শুনতে হবে বা চোখ দিয়েই দেখতে হবে। তখন যে কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই শোনা যায় বা দেখা যায়।

আজ বিজ্ঞানেব দ্বারাও এই তত্ত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেবল কানের দ্বারাই শুনতে হবে—এমন কোন বিধান নেই। কেবল অভ্যাসেব দ্বারাই আমরা এমন অবস্থায় পৌঁছেছি, যেখানে কানের মাধ্যম ছাড়া আমরা শুনতেই সক্ষম হই না। তা না হলে, শোনার শক্তি হযত দাঁতেই অধিক পরিমাণে থাকত। আপনারা চোখ দিয়ে নয়, আঙ্গুল দিয়েই হযত দেখতে পাবতেন। রুশ দেশে রোজা কুলেশোবা নামে এক জ্বীলোক আছেন। তাঁর আঙ্গুলে অদ্ভুত ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে। চোখে পড়ি বেঁধে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যেই পুস্তক পড়তে পারেন। আঙ্গুল পাতাব ওপর বোলান, আব পড়ে যান। যে কোন জিনিস তাঁর কাছে আনলে তিনি তার ওপব ডান হাতের আঙ্গুল ফেরান আর বলে দেন ঐ জিনিসের ওপব কি লেখা আছে বা কি ছাপানো আছে। তাঁব আঙ্গুল আয়নাব পিছনেও দেখতে পায। তিনি কোন বস্তুকে স্পর্শ না করেও তার পবিচয় বলে দিতে পারেন। অবশ্য অন্ধও পুস্তক পড়ে, তবে সে উঁচু করে প্রস্তুত অক্ষরই পড়তে পারে। ঐ রকম অক্ষব পড়ার বিড়া আযন্ত কবার জ্ঞাত তাকে পূর্বে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। সে সাধাবণ পুস্তক পড়তে পারে না। কিন্তু ঐ কশীষ জ্বীলোক সাধারণ পুস্তকই আঙ্গুলের মাধ্যমে পড়তে পারেন।

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এই বে বিভাজন—অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে শুনতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে রসাস্বাদ করতে হবে, ইত্যাদি—তা আমাদের নিরন্তর অভ্যাসের কাবণেই হয়েছে। কিন্তু এই বিভাগ যথার্থ নয়। যার চেতনা বিকশিত হবে যায় তার ক্ষেত্রে এই বিভাগ আর থাকে না।

আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তির মিষ্টায়ের প্রতি অনুরাগ আছে,

আবার কাবও ঐ মিষ্টানের প্রতি দ্বেষ বা ঘৃণা আছে। কেউ কেউ এক বস্তু পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ অন্য বস্তু পছন্দ কবে। কোন ব্যক্তির যদি এক বস্তুব প্রতি অনুভাব থাকে তো অন্য ব্যক্তির ঐ বস্তুর প্রতি দ্বেষ থাকে। ইন্দ্রিয়গুলি যেন রাগ-দ্বেষকে বন্টন করে দিয়েছে। কিন্তু বাগ-দ্বেষ কি বন্টন করা যায়, খণ্ড খণ্ড করা যায়? আমি বুঝি, এমন করা যায় না। বাগ-দ্বেষের একই ধাবা। আমাদের চেতনাব ধারাও এক। অনেক বকম পার্থক্যও যে দেখা যায়, তা কেবল অভ্যাসেব কাবণে, বাতাবরণেব কারণে আব সংস্কারের কাবণে। এক বিশেষ পবিস্থিতিতে যে বকম অভ্যাস, বাতাবরণ আর সংস্কার গড়ে ওঠে, তাই সমস্ত বিভাগেব বা পার্থক্যের সৃষ্টি করে।

কাবও রসাস্বাদনেব শক্তি প্রবল হয়, কাবও শ্রবণশক্তি প্রবল হয়, আবার কারও দর্শনশক্তি প্রবল হয়। রাগ-দ্বেষের ধারা এক হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন রুচির যে সৃষ্টি হয়, তাব মূল কারণই সংস্কারেব বিকাশ—বিভিন্ন সংস্কারেব বিকাশ। আমবা কোন এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করি, অত্যন্ত অত্যন্ত হয়ে বাই। এটা ‘স্পেশালাইজেশনের’ কথা। কোন ইন্দ্রিয়ের যদি কোন বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক হয়, তবে বাগ-দ্বেষেব ধাবা সেদিকেই প্রবাহিত হতে আবস্ত করে।

চাবের জল ক্ষেতে জল নেওয়ার যে ব্যবস্থা কবা হয়, তা আপনাবা লক্ষ্য করে থাকবেন। বড় খাল থেকে ছোট ছোট নালা কেটে সমস্ত ক্ষেতে জল নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব নালা দিয়ে জল নেওয়ার আবশ্যকতা থাকে না, চাবী কখনও কখনও সেই সব নালায় মুখ মাটির বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে। তখন জল আর সেসব বিভিন্ন নালা দিয়ে ছড়িয়ে না পড়ে এক দিকেই চলে। যে জল ভিন্ন ভিন্ন নালাতে বন্টিত হয়ে প্রবাহিত ছিল, সেই জল এখন এক ধারাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির স্থিতি ঠিক এই বকম। রাগ-দ্বেষের ধারা সব ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই চলছিল, এখন আমরা কতকগুলি

ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ কবে সেই ধাবাকে একই ইন্দ্রিয়ের দিকে প্রবাহিত করে দিলাম। এখন সমস্ত প্রবাহ পূর্ণবেগে এক দিকেই চলল। এবার আমাদের সংস্কার বলবান হতে আরম্ভ করল।

আমাদের সমস্ত শরীরে রক্তের সঞ্চার আছে, সমস্ত অবয়বেই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু আমি যখন শরীরেব কোন এক বিন্দুতে ধ্যান কেন্দ্রিত করে সংকল্প করি যে ঐ বিন্দুতে রক্তের প্রবাহ অধিক হোক, তখন সত্যিই বক্তৃথার সেখানে অধিক মাত্রায় প্রবাহিত হতে আবিস্ত করবে। প্রাণধারা সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে। প্রাণধারার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের ধারাও এসে যাবে। এই ভাবে যে দিকে আমার মন যাবে, সংকল্প যাবে, প্রাণধারাও সেদিকেই যাবে। রাগ-দ্বেষের ধারাও সেদিকে প্রবাহিত হতে আবিস্ত কববে। ফলে, সংস্কার বলবান ও পুষ্ট হতে থাকবে। বাগ-দ্বেষের ধারার মধ্যে কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। চেতনার ধারাব মধ্যেও ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। আমরা সংকল্পের দ্বারা ঐ ধারাকে গতি ও পুষ্টি দিয়ে ভেদের সৃষ্টি কবি।

আমরা যদি ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করতে চাই তো ইন্দ্রিয়-বিষয়ের নিরোধ আর রাগ-দ্বেষের ধারার নিরোধ—এই দুই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের একটা বোঝাপড়া কবে নিতে হবে।

সকলেব ইন্দ্রিয়-অভ্যাস এক রকম নয়। কারও চক্ষু-ইন্দ্রিয় প্রবল। কাবও শ্রোত্র-ইন্দ্রিয় প্রবল, আবার কারও রসনা-ইন্দ্রিয় প্রবল। কারও জ্ঞান-ইন্দ্রিয় প্রবল হল তো অস্ত্র কারও স্পর্শ-ইন্দ্রিয় প্রবল। ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করার পূর্বে ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্ণয় কবতে হবে, কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি—কোন বিষয়ের প্রতি—তার আসক্তি প্রবল। এইভাবে নির্ণয় কবার পবে, তাকে নির্ণীত ইন্দ্রিয়কে সংযম করার পথে অগ্রসর হতে হবে। এই সংযম অভ্যাস এই ভাবে কবতে হবে—যে ইন্দ্রিয়ের আসক্তি প্রবল, সেই ইন্দ্রিয়ের দিকে রাগ-দ্বেষের ধাবাকে যেতে না দেওয়ার অভ্যাস কবতে হবে। সর্বদা অবহিত থেকে নিরন্তর অভ্যাস চালিয়ে যেতে হবে। সাফল্য কতটা হচ্ছে, সে বিষয়ে সকালে

ও সক্ষ্যায় আত্ম-নিরীক্ষণ কবতে হবে। এই ষথেষ্ট। আর কিছু কবাব আবশ্যকতা হবে না। এতটা জাগরকতা এসে গেলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ খুলে যাবে। কেবল সাধনার দৃষ্টিতে নয়, জীবনের দৃষ্টিতেও ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। স্বাস্থ্য, ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুর জন্তই ইন্দ্রিয়-সংযমেব প্রয়োজন আছে।

প্রাচীনকালে এমন উল্লেখ দেখা যায় যে, রাজাদেব পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম অত্যন্ত আবশ্যক। যে রাজা ইন্দ্রিয়-সংযমে অপটু, তাঁর পক্ষে ষথার্থভাবে রাজ্যপালন সম্ভবই নয়। ইন্দ্রিয়-লোলুপ রাজা কি করে বৃহৎ সাম্রাজ্য চালনা কববেন? যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হল, তখন তখন হয়ত রাজা অন্তঃপুবে বিলাস-ব্যাসনে ডুবে আছেন। তাহলে রাজ্য রক্ষা কেমন করে হবে? রাজার পক্ষে সংযত-ইন্দ্রিয় হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সমাজে যারা প্রধান ব্যক্তি তাঁদের পক্ষে ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আবশ্যক। যে অত্যধিক ইন্দ্রিয়-চর্চা কবে সে নিজের জীবনই নষ্ট করে ফেলে। দিন রকম অবস্থা হতে পারে—যোগ, অযোগ আর অভিযোগ। মহর্ষি চরকের অভিমত, যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের যোগ অর্থাৎ ব্যবহার না করে, ইন্দ্রিয়ের কাজ গ্রহণ না করে, তাব ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিয় তার কাজ কবা বন্ধ করে দেয়। আপনার চোখের ব্যবহাব বন্ধ যদি কবে দেন তো চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে। সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেই এই এক নিয়ম। আপনারা হাত ডাঁজ করে বাধুন, কিছু দিন পরে দেখবেন হাতকে আব সোজা করতে পারছেন না—তাব নমনীয়তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অযোগ বা অব্যবহারে যেমন শক্তি নষ্ট হয়, অভিযোগ বা অত্যধিক ব্যবহারে শক্তি তেমনই নষ্ট হয়। সেজন্য বলতে হয়, ‘যোগই’ উত্তম পথ। ইন্দ্রিয়ের ষথার্থ ব্যবহার হওয়া চাই। ইন্দ্রিয়ের কাজ গ্রহণ কবলাম, তারপরে বিশ্রাম করলাম। যতটা কাজ, ততটা বিশ্রাম। যতটা কাজ গ্রহণ করা দবকার ততটা কাজই গ্রহণ করলাম—তার অধিক বা অল্প নয়। এই হল যোগ। এটাই আযুর্বেদের অভিমত,

অর্থাৎ স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া অভিমত। এর তাৎপর্য এই যে, চোখের কাছ থেকে দেখাব কাজ নেওয়া চোখের অসংযম নয়। কানের কাছ থেকে শোনার কাজ নেওয়া কানের অসংযম নয়। অসংযম তখনই হয়, যখন এদেব সঙ্গে বাগ-দেব জুড়ে দেওয়া হয়। ইন্দ্রিয় সংযমের প্রকৃত অর্থ হল—আপনারা ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ককন, কিন্তু সেই জ্ঞান যেন বিস্তৃত জ্ঞান হয়—তাব সঙ্গে যেন আর কিছু জুড়ে না দেওয়া হয়। বিস্তৃত জলই যেন প্রবাহিত হয়, তার সঙ্গে যেন কোন আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ যুক্ত না হয়। একেই ইন্দ্রিয়-সংযম বলে। জল প্রবাহিত হবে, না এক জায়গায় পড়ে থাকবে—সেটা আমাদের চিন্তার বিষয় নয়। জল প্রবাহকারার চলতে পাবে অথবা এক জায়গায় স্থিতি থাকতে পারে। আমাদের কেবল এই চিন্তাই হবে, জলের সঙ্গে যেন আবর্জনাও না চলে, ধুলো-বালি যেন না মেশে। এই ব্যবস্থা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। এর জন্য যদি আমাদের কোন নালা বন্ধ কবে দিতে হয় তো তা বন্ধ করতে হবে। যদি কোন নালা ওপর থেকে ঢাকতে হয়, যাতে কোন আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ তাতে না ঢোকে, তবে তাই করতে হবে। মূল কথা—জল যেন পরিষ্কার থাকে, তার স্বচ্ছতা যেন নষ্ট না হয়। এই হল ইন্দ্রিয়-সংযম। যদি আমরা এই বিষয়ে সতর্ক থাকি যে, কোনক্রমেই যেন আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যাপারের সঙ্গে বাগ-দেবের ধারার সংযোগ না ঘটে, তাহলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ স্বতঃই প্রশস্ত হবে বাবে।

ইন্দ্রিয়-অসংযমেব ফল সঙ্গে সঙ্গেই মেলে। এক ব্যক্তি একদিন এত অধিক পরিমাণে ভোজন করল যে সেদিন সন্ধ্যায়, বা তাবপবে দুই-একদিন ধবে, তাব ভোজন করার প্রয়োজনই রইল না। সে একবাবে গলা পর্যন্ত ভোজন কবল। তাব ফল সে তৎক্ষণাৎ পেল। পরিণামেব জন্ম তাকে পরেব জন্ম পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে হল না। প্রায়ই খবরের কাগজে পড়া যায়—অমুক শহরে একশ লোক মদ পান করে মারা গিয়েছে। ঐ মদ বিবাক্ত ছিল। তার ফল তখনই

ভূগতে হল। আমাদের সব হিসেব-নিকেশ বর্তমান কালেই হয়ে চলেছে।

আমাদের ভেতরে এমন এক ‘কম্পিউটার’ আছে যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব বাখে, গণনা করে। সমস্ত হিসেবই আমাদের ভেতবে হচ্ছে।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী। কিন্তু তার ধনী হওয়ার মূলে আছে কুটিল ও কপট প্রচেষ্টা। সে অন্যকে ঠকায, ধান্দা দেয, ভেজাল চালায়, চুরি কবে। ধন তার হাতে জুপীকৃত হল। আমবা তাকে বহু মান দিলাম, কারণ সে ধনী। বাইরে থেকে তাকে খুবই প্রসন্ন দেখাবে। এবার তার ভেতরে উঁকি দিবে দেখুন। তাকে বড়ই হুখী বলে মনে হবে। তাব আত্মা কাঁদছে। সংসারে তাব অনেক ছিড়। তাব ছেলে তার কথা শোনে না, তার স্ত্রী তাব ওপর সন্তুষ্ট নয়। তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছে। হৃচ্চিন্তাব তার প্রতি মুহূর্ত কাটছে। কুটিলতা কপটতার পবিণাম তাকে এখানেই ভোগ করতে হচ্ছে। তার ধন আছে, কিন্তু সুখ নেই, আশ্বতোষ নেই, শান্তি নেই।

পরিণামের এই সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশ ভেতবে ভেতবে হয়েই চলেছে। আমরা প্রত্যক্ষভাবে তা দেখতে পাই না। ওটা স্বভা-চালিত ব্যবস্থা।

মার্কস বলেছেন, বাদ, প্রতিবাদ আর সমবাদ—এই তিনটি এক সঙ্গে চলে। বাদের সঙ্গেই প্রতিবাদেব উৎপত্তি হয়। বাদ যে কোন পদ্ধতিতেই হোক—প্রতিবাদ অবশ্যই হবে। সংঘর্ষ অবশ্যই হবে। আমরা মনে কবি, এই প্রতিবাদ বা সংঘর্ষ আজই উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু এ ধাবণা ভুল। প্রতিবাদেব উৎপত্তি সেই দিনই হয়েছিল, যেদিন বাদ উৎপন্ন হয়েছিল। শিশু যে দিন জন্মায়, যে ক্ষণ তাকে জন্ম দেয়, সেই দিন-ক্ষণ মৃত্যুর প্রাবন্তেরও সূচনা কবে। শিশুর মৃত্যুর প্রারম্ভ হয়ে যায়। আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি বাট বছর হয়ে মারা গিয়েছে, অমুক ব্যক্তি আশি বছরে পৌছে মারা গিয়েছে। তা কিন্তু ভুল। যে ব্যক্তি বাট কি আশি বছর বেঁচে থাকতে পারে, সে কখনই মরতে পারে না। সে মৃত্যুর অতীত হয়ে যায়। যে শিশু নতুন জীবন পেয়ে

দু দিন না মরে বেঁচে থাকতে পারে, সে আর কখন মরে না ; সে অমর হয়ে যায়। আসলে কিন্তু এ রকম হয় না। এই জগতে চিরকাল বেঁচে থাকার ব্যবস্থা নেই। প্রাণী যে দিনে যে ক্ষণে জন্মায় সেই দিন সেই ক্ষণ থেকে মরতেও আরম্ভ করে। সে প্রতি ক্ষণেই মরে, তাই আমরা একদিন বলতে পারি—সে মরে গিয়েছে। একটা ঘড়া পড়ে আছে। আমরা একটা পাথর ছুঁড়ে মারলাম, ঘড়াটা ফেটে গেল। আমরা লাঠি দিয়ে ঘড়াকে আঘাত করলাম, ঘড়াটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। আমরা বললাম—‘ঘড়াটা একটু আগেই অখণ্ড ছিল, এখন ফেটে গেল, ভেঙ্গে গেল।’ সত্যিই কি ঘড়াটা এখনই ফেটে গেল ? না, তা নয়। ঘড়াটা প্রতি ক্ষণেই ফাটছিল, তাই এখন ফেটে গেল। যখনই ঘড়াটা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যখনই ঘড়াটা বানানো হয়েছিল তখনই যদি সেটা না ফাটত, তবে পাথর বা লাঠির মাঘে কখনই সেটা ফাটত না। ঘড়া চিরস্থায়ী হবে বেত, কখনই বিনষ্ট হতো না। এই ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক বাদের সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রত্যেক জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, প্রত্যেক অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব, সংযুক্ত আছে।

বাদেব প্রতিবাদ আসে, তারপরে আসে সমবাদ। সমবাদীর অর্থ হচ্ছে—পুষ্টি প্রদানকারী। সমবাদী পুরাতন ব্যবস্থার পবিত্ব আনে, নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। একটি তথ্য এই যে, আমাদের ভেতরে যে ক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। কোন ব্যক্তি উত্তম আহার কবছে। সে ভাবছে, আজ অমৃত আহাব করলাম। কিন্তু সেই অমৃতের সঙ্গে কি বিবেক মাত্রাও নেই ? অবশ্যই আছে। কেউ দুধকে অমৃত ভাবে, কেউ শাক-সবজিকে। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও অমৃতের সঙ্গে বিবেক মাত্রা মিশ্রিত আছে। দুধে বিষ আছে, শাক-সবজিতেও বিষ আছে। এমন কোন খাদ্য নেই যা কেবলই অমৃত, বিষের সম্পর্কশূন্য। আবার এমন খাদ্যও নেই যা কেবলই বিষ, অমৃতের সম্পর্কশূন্য। অমৃত ও বিষ এক সঙ্গেই থাকে। যেখানেই জীবনের ক্রিয়া হয়, সেখানেই মরণের প্রতিক্রিয়া হয়। জন্ম যদি এক

ক্রিয়া হয় তো মৃত্যু তার প্রতিক্রিয়া। স্বাস্থ্যকে যদি ক্রিয়া বলা যায়, রোগকে বলতে হয় প্রতিক্রিয়া। উভয়কে আলাদা করা যায় না, তবে মাত্রা-ভেদ অনুসারে আমরা এদের আলাদা-আলাদা করেই নিই। ধনী ব্যক্তির ধনের মাত্রা দেখে আমরা বলি, এ ব্যক্তি এত পাপ করেছে এত উন্নতি করেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি আমরা তার অন্তরের অবস্থা দেখি, তার সুখ দেখি, তার শাস্তি দেখি, তবে হয়ত বলব যে, সে লোকসানে ডুবে গিয়েছে। ধন হয়েছে তো কি হয়েছে? সে না পেয়েছে শাস্তি, না পেয়েছে সুখ, না পেয়েছে প্রসন্নতা। কাবণ, হিসেব যে এক সঙ্গেই চলে। পরলোকের কথা ছেড়েই দিন। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ইহলোকে, বর্তমান কালেই হচ্ছে। প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার, পবিণাম প্রদান করার, হিসেব-নিকেশ নিষ্পন্ন করার যে অব্যর্থ ‘কমপিউটার’—তা আমাদের ভেতরেই আছে। এর জন্ত কোন বাহ্য সত্তাকে আমন্ত্রণ জানানাব আবশ্যকতা নেই।

অপ্রমাদ

এক লোক তার সারা দিনের করণীয় কাজ একটি কাগজে লিখে রাখত। একদিন সে তার নিয়ম অনুসারে সেই দিনের কাজ কাগজে লিখে রাখল। তারপব কাজের সময় যখন এল তখন সে কাগজখানি এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কাগজ আব খুঁজে পেল না। এমন সময় তার এক বন্ধু সেখানে এল। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘এ তুমি কি কবছ?’ সে বলল, ‘আমি মনে করতে পারছি না, এখন আমাব কোন্ কাজ করার কথা।’ বন্ধু বলল, ‘কেন, তুমি তো কাগজে লিখে রেখেছ। কাগজ উঠিয়ে দেখে নাও না।’ সে বলল, ‘কাগজটা যে কোথায় বেখেছি তা ভুলে গেছি। মনে করতে পারছি না। কাগজই তো খুঁজছি।’

কাজের কথা শ্রবণ রাখার জন্ত কাগজ, আবার কাগজের কথা শ্রবণ রাখার জন্ত তৃতীয় কোন মাধ্যম দরকার। ভুলো স্বভাব এমনই যে, কেবল কাগজে কাজ চলে না, সেই কাগজ সামলে রাখার ব্যবস্থাও দরকাব। এ তো বড় সমস্যা। কিন্তু কেন এমন হয়? এমন হওয়ার কাবণ—প্রমাদ। প্রমাদেব অর্থ—বিস্মৃতি। ‘কি’, ‘কি প্রকারে’, ‘কেন’—এসব কিছুব বোধ আমাদেব থাকে না। আমরা সবই ভুলে বাই।

২৬৬ মনের জয়ই জয়

জীবনে অপ্রমাদ নিত্য আবশ্যক। কিন্তু না ভুললেও কাজ চলে না; ভোলাও আবশ্যক। মানুষ নেশা কবে—মদ খায়, ভাঙ খায়। কিন্তু তার পবিপত্তি কি? মদ বা ভাঙ কোন সুস্বাদু পদার্থ নয়। তবুও মানুষ লোলুপ হয়ে তা সেবন করে। এর কারণ কি হতে পারে? যারা মদ খায় তাঁরাও বলে, মদ খাওয়ার সময় মুখ বিকৃত হয়—মদেব গন্ধ অসহ্য লাগে। খেতে সুস্বাদু নয়, অথচ আমাদের খেতেই হয়, না খেলে চলে না—এরও অবশ্য একটা কারণ আছে। সেই কারণ হল—মানুষ একলা থাকতে চায়। নেশা তাকে ভুলিয়ে দেয়।

আমাদের সামনে দুটি দিক আছে। এক দিক সম্পর্কে, আর এক দিক একাকীত্বের। ব্যক্তির সম্পর্ক হয় পরিবারের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে, সামাজিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও এই সব প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের সঙ্গে। গ্রামের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। অনেক প্রযোজনে, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক শ্রেণী ও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হয়। কেবল প্রাণীদের সঙ্গেই যে সম্পর্ক হয় তা নয়, শরীরের সঙ্গে, পোষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে, ঘর-বাড়ির সঙ্গে ও আরও অনেক বস্তুর সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। যে ভাবে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, ঠিক সে ভাবেই বস্তুব সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ভাবনার সঙ্গেও সম্পর্ক হয়। এ সবই সম্পর্ক। একদিকে ব্যক্তি একাকী, অপব দিকে তার এই প্রকার সম্পর্কের বহুলতা। সম্পর্ক চিন্তা উৎপন্ন করে। যত সম্পর্ক, তত চিন্তা। সম্পর্ক থেকে চিন্তা বাড়ে। চিন্তা বাড়লে মনে হয় ছুঃখও বাড়ছে। বস্তুত, ছুঃখ কি? আমি তো মনে কবি, সম্পর্কই ছুঃখ। ছুঃখের অর্থই হল, কোন না কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক। সম্পর্ক হয়েছে কি ছুঃখও হয়েছে, সম্পর্ক নেই তো ছুঃখও নেই। সম্পর্ককে ছেড়ে ছুঃখের বহননাও কবা যায় না। এক ব্যক্তি শান্ত হয়ে অবস্থান করছে। তার মন শান্ত, চিন্তা-ভাবনাও শান্ত। ইঠাৎ সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল,

যে তার প্রতি অমুকুল নয়, কিন্তু প্রতিকূল, যে তার অপ্রিয়, যে অতীতে তাকে ঠকিয়েছে বা অপমানিত করেছে। তাকে দেখা মাত্রই শাস্ত ব্যক্তিব শাস্তি ভঙ্গ হল। তার মন ফ্রোষে ভাবে উঠল। সে অশাস্ত হয়ে গেল, দুঃখী হয়ে গেল। তার এই দুঃখের হেতু কি? সম্পর্কই হেতু। দুঃখের অর্থই হল সম্পর্ক, আর সম্পর্কের অর্থই হল দুঃখ বা চিন্তা। কোন ব্যক্তি সব সময় চিন্তিত হয়ে থাকতে পারে না। যখন সে চিন্তিত থাকে তখন তাব মনে অস্থিরতা আসে, ব্যাকুলতা আসে, উদ্বেজনা আসে। এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা তাকে একলা হয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে বা বাধ্য করে—যেন তাকে বলে, ‘তুমি একলা হয়ে যাও, তাহলে কোন চিন্তা থাকবে না, কোন ব্যাকুলতা থাকবে না।’

বোধ হয়, চিন্তামুক্তির জন্যই মাদক দ্রব্যের ব্যবহারেব প্রচলন হয়েছিল। লোকে চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, সম্পর্কে ছিন্ন করাব জন্য, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নেশা করে, মাদক বস্তুর প্রয়োগ করে। যখনই কেউ মত্ত পান করে, তখনই সে একলা হয়ে যায়, তাব সব সম্পর্ক টুটে যায়, বাইরের কোন বোধ আর থাকে না। সে অনুভব করতে আরম্ভ করে, সে একলা হয়ে গিয়েছে, আর এই একলা হওয়াতেই বড় সুখ। মত্তপান করার মধ্যে সত্যিই কোন সুখ থাকতে পারে না। আসলে মত্তপান একাকীত্বের একটা নিমিত্ত মাত্র। এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে খ্রেষ্ট সুখই হল—একাকীত্ব। কিন্তু লোকে একলা হতে পারে না, কারণ সে এত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছে আর সেই সব সম্পর্কের দরুন চিন্তা-সূত্রের জঙ্গল এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে, সে নিজেকে আর আলাগা কবতে পারে না—পৃথক করে নিতে পারে না। তার এমন ক্ষমতা নেই যে সে ঝটকায় জাল ছিঁড়ে বের হতে পারে। সে তো ধ্যানের প্রয়োগ জানে না, সে যে ধ্যানের অভ্যাস করে নি। সে ধ্যানের দ্বারা আপনাকে একলা করার, সম্পর্কে ছিন্ন করার, কৌশল আয়ত্ত করে নি; তাই সে মদিরা ও

অত্যাশ্রয় মাদক বস্তুর সাহায্য নিয়ে আপনার একাকীত্বের অনুভব করার চেষ্টা করে। লোকে মনোরঞ্জনের বিষয় পোল রসবোধ কবে, কিন্তু কেন? সে কেন সিনেমায যায়, সার্কাস দেখে, নাট্যাভিনয় দেখে, বেড়াতে যায়, পিকনিক করে? এ সবেরই কিন্তু ঐ এক হেতু। সে ভাবে, সাবানিন ভো অফিসেব কাজে, কি দোকানে বসে কার্টন—এখন চল, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেওয়া যাক—চিন্তায তো ডুবে আছি, চল, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকি যাক। সে এইভাবে সারা দিনেব শ্রম ও সকল চিন্তাকে ভুলতে চায়, বিস্মৃত হতে চায়। তার এই চেষ্টার দ্বারা সে কিছু সময়ের জন্য সকল সম্পর্ক থেকে, ও সেই সঙ্গে সকল চিন্তা থেকে, মুক্ত হয়।

মানব সমাজের সব চেয়ে বড় সমস্যা, সম্পর্ক-জনিত চিন্তা। বাইরে থেকে যখন এত চিন্তা এসে ঝড়িয়ে ফেলে, তখন বুঝতে হবে কোথাও না কোথাও তার উৎপত্তি আছে। তার উৎপত্তি স্থল—স্ব-বিস্মৃতি, অর্থাৎ নিজেকে নিজের ভুলে যাওয়া। যখন আপনি দ্বিতীয় কিছুই রাখতে থাকেন, তখন আপনি নিজেকে ভুলতে বাধ্য হন। আপনি নিজেকে না ভুললে অন্য কিছুই স্থিতি রাখতে পারবেন না, আবার অন্য সব কিছুই স্থিতি বিসর্জন না দিলে নিজের স্থিতি রাখতে পারবেন না। নিজের বিস্মৃতি না ঘটলে পরের স্থিতি থাকে না; আবার পরের বিস্মৃতি না হলে, নিজের স্থিতি থাকে না। হয় আপনি নিজেকে ভুলবেন নয়তো পরকে ভুলবেন। হয় বাহ্য সম্পর্কে কম করতে হবে, ছিঁড়ে ফেলাতে হবে, নয়তো আপনার নিজের সঙ্গে আপনার সম্পর্কেই ছিঁড়তে হবে, নিজের সম্পর্ক-স্বত্বকেই কাটতে হবে। এর অর্থ হল, আপনাকে আপনার যে একত্ব ছিল, আপনাকে আপনার একাকীত্বের যে অনুভব ছিল—তা ফেলে দিয়ে, সেখানে বাইরের সঙ্গে অল্পস্পর্ক বোজন করা। এরই নাম—আত্ম-বিস্মৃতি। বাহ্য সম্পর্কেই আত্ম-বিস্মৃতির কাণ্ড। যে লোক দ্বিতীয় কিছু সত্ত্বদ্বয়ে জাগরূপ হয়, সাবধান হয়, সে নিজের সত্ত্বদ্বয়ে সুপ্তবৎ হয়ে যায়, অসাবধান হয়ে যায়।

সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীসের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। একদিন পথে যেতে তিনি সামনে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। সে ছিল এথেন্সের এক প্রসিদ্ধ মন্তপ। সক্রেটিস দেখলেন সে ব্যক্তি নেশায চুর হয়ে আছে, কোন মতে টলমল করতে করতে চলেছে। তিনি তাকে বললেন, ‘সামলে চল, খানাখন্দে পড়ে যাবে।’ মন্তপ সে কথা শুনল, সে তো নেশায চুর হয়ে আছে। সে বলল, ‘আরে মহাত্মা! আমাকে কি শেখাচ্ছ? টলমল কবে চলেছি তো কি হয়েছে? খানায় যদি পড়ি, তাতেই বা কি হয়েছে? কাপড় যদি নোরা হয়—হলই বা, আবার খুঁষে নেব। আমি মন্তপ, আমি নেশাখোর—সারা শহর তা জানে। বা কিছু হোক, তার জন্য আমার চিন্তা নেই। কিন্তু তুমি মহাত্মা ব্যক্তি। তুমি সামলে চল। তুমি যদি টলতে টলতে খানায় পড়, তোমার একূল ওকূল ছকূল যাবে। খুব সামলে চল, যেন পা পিছলে না যায়। আমাকে আর কেন জ্ঞান দিতে বাচ্ছ?’

এই হল এক দার্শনিক আর এক মন্তপের মধ্যে কথাবার্তা। মন্তপ এক বড় রহস্যের উদ্ঘাটন করেছে, এক সার কথা শুনিযেছে। তাব তাৎপর্য হল—যে মন্তপ, যে নিজেকে ভুলেছে, যে একাকীত্বের আশাব নেশা করেছে, সে যদি টলমল করে, তার পা যদি পিছলে যায়, তবে কোন ক্ষতি বা দুঃখের কারণ হয় না। কিন্তু যে সাধক, যে আপনাকে আপনাব মধ্যে পাওয়ার জন্য সাধনা করছে, যে একাকীত্বের সাধনায় রত আছে, তাকে তাব নিজের চিন্তা নিয়েই থাকতে হয়, পরের চিন্তা করতে হয় না। সে জন্য মন্তপ সক্রেটিসকে বলেছিল—‘তুমি নিজের চিন্তা কর, আমার চিন্তা ছেড়ে দাও। তুমি যদি পিছলে পড়, তোমাব পবিত্রতা নষ্ট হবে, তা কখনও আব ফিরে পাবে না। তুমি আর নির্মল থাকবে না। তুমি আত্ম-বিস্মৃতির গর্তে পড়ে যাবে।’

এই যে আত্ম-স্মৃতির কথা, জাগরকতা আব সাবধানতার কথা—এগুলি বাস্তবিক পক্ষে সাবধানতাব মহান সূত্র। এগুলিই হল—অপ্রমাদ। আমি একলা আছি, এই বিচাব-সূত্রকে আত্মসাৎ করে

নেওয়া খুবই বড় সাধনা। এই সূত্র যখন আত্মগত হবে, তখন ব্যক্তি সকল সংকট ও দুর্ভোগ পাব হয়ে যাবে, সকল ঝগড়া ও সমস্যা অতীত হয়ে যাবে। এই সব সমস্যা বৈয়ক্তিক, সামাজিক বা জাগতিক হতে পারে। যে ব্যক্তি আপনার মধ্যে আপনার একাকীত্ব অনুভব করে সে এই সব সমস্যাই পার হয়ে যার। কিন্তু যাব একাকীত্বের অনুভব নেই, সে আর এই সব সমস্যা পার হতে পাবে না। আর বেহেতু সে সমস্যার পাব পায় না, সেহেতু তার মদ চাই, ভাঙ চাই, বিড়ি-সিগারেট চাই, আবও নানা রকমের মাদক বস্তু চাই। এগুলি সবই তার কাছে বিশ্ব্তির মাধ্যম। যে আপনা-আপনি একলা হওয়াব রহস্য অবগত হয় নি, উপায় উদ্ভাবন করতে পাবে নি— সে এই সব বাহ্য সাধনাকেই নিজের করে নেয়। কিন্তু এই সব বাহ্য সাধন উপকারেব বদলে অপকারই কবে। এদের থেকে ক্ষতিই হয়।

অপ্রমাদ আত্ম-স্বত্তির এক শক্তিমুক্ত সাধনা। এর অর্থ হল— আপনাতে আপন একাকীত্বের অনুভব করার অভ্যাস। এটা সাধনার পরম সূত্র তো বটেই, ব্যবহারেরও এটা মহান সূত্র। এ ছাড়া ব্যবহারিক জীবন সুখী ও আনন্দময় হয় না। আপনি যতদিন আপনাতে আপন একাকীত্ব অনুভব কবতে সমর্থ না হবেন ততদিন চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন না। আমি কথাটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। ধরুন, এক পরিবার আছে। সেই পরিবারে পিতা মনে করে, পুত্রের ওপর তাব অধিকার আছে; স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ওপর তাব অধিকার আছে। সম্পর্ক আছে বলেই পিতা আপন দায়িত্ব বোধ করে, আব মনে করে পুত্রের ওপর তার অধিকার আছে। স্বামীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, দায়িত্বের সেখানে চিন্তা নিশ্চয়ই উৎপন্ন হবে। এখন হযেছে কি, পিতা একদিন বসে আছে, তাব খুব পেপাসা হযেছে, অথচ ছেলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে আসে নি। আগের দিন যে সময়ে বাপকে জল খাইয়েছিল আজ সেই সময়ে জল নিয়ে আসে নি। পিতা অমনি ভাবতে আরম্ভ

করলেন, ছেলের আমার দিকে মন নেই। সে খাওয়ার জল আনল না। এই বকম চিন্তাই পিতাব মনে উৎপন্ন হল। কিন্তু কেন হল? ছেলের পক্ষে এটা কি খুবই জরুরী যে, সে জলেব গেলাস হাতে নিয়ে আসবে? আচ্ছা, জরুরীই বটে, কর্তব্য তো বটেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে সে ভুলে গিয়েছে, ঠিক সময়ে তার কথাটা মনে হয় নি। পিতার পক্ষে কি নিতান্তই এটা দরকার যে সে এই ব্যাপারটা নিয়ে এতটা ভাবতে থাকবে, নিজেকে এতটা ছুঁখী বোধ করবে? সত্যিই তার এত চিন্তাতুর হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও সে চিন্তাতুর হয়, কারণ তার একাকীত্বের অনুভব নেই।

একাধিক স্তরে আমাদের জীবন চলে। তাদের এক স্তরে আমরা অনুভব করি, আমাদের পরিবারে অনেক সদস্য আছে—চল্লিশ কি পঞ্চাশ জন সদস্য আছে। কিন্তু তাতে একটা অনুবিধা হতে পারে। আমরা যদি কেবল বাইরে থেকে মনে করি যে আমরা পঞ্চাশ জন, তবে সব ঠিকই আছে। কিন্তু যদি আমরা ভেতর থেকেও ভাবতে থাকি—আমরা পঞ্চাশজন, আমরা একলা নই, তবে অনেক সমস্যা উৎপত্তি হবে।

আমাদের অনুভূতি দুই স্তরেই হওয়া দরকার। এক ব্যবহারের স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয় আমরা একলা নই, আমরা পঞ্চাশজন আছি। আর এক যথার্থতার স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হয় যে আমরা প্রত্যেকে একলা, আমাদের আর কেউ নেই। যদি এই দুই অনুভূতি এক সঙ্গে চলে তবে কোন সমস্যা বা অনুবিধা হয় না। কিন্তু যখন আমাদের অনুভূতি একাকী হয়, তখন প্রচুর সমস্যা দেখা দেয়। যখন কোন ব্যক্তি ব্যবহারেব স্তরের সঙ্গে যথার্থতার স্তরকে মিশিয়ে ফেলে, তখন বিপদ হয়। যতক্ষণ সে জানে ব্যবহারের দিক থেকে সে পঞ্চাশ, কিন্তু যথার্থতার দিক থেকে সে এক—সে একলা, ততক্ষণ কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু যখনই সে মনে করে যেহেতু ব্যবহারে সে পঞ্চাশ, সেহেতু যথার্থই সে পঞ্চাশ,

সে একলা নয়, তখনই নানা সমস্যা এসে যায়। আজ পিতা বৃদ্ধ হয়েছে, অর্থোপার্জনে অসমর্থ হয়েছে। পবিবাবেব যে স্বার্থ তার দ্বাৰা সাধিত হতো, তা বন্ধ হয়েছে। এমন অবস্থায় তার প্রতি পরিবারের লোকদেব উপেক্ষা আসতে পারে। তারা তাঁব কথাকে আর তেমন গুরুত্ব দেয় না। তখন সে ভাবতে থাকে, 'আরে, এ কি ব্যাপাব। বিশ বছর আগে আমার সারা পবিবার আমার ইশারায় চলত, আমি জ্রুকুটি কবলে সকলে ভয়ে কাঁপত, একবাব ডাকলে সকলে আমার সামনে এসে হাতজোড় করে দাঁডাত। আব আজ কেউ আমার কথা শোনে না। আদর করা নূবে থাকুক, ছোট-বড় সকলে আমাকে তিরস্কাব করে, আমাকে উপেক্ষা করে।' এইসব ভেবে বৃদ্ধ হৃথী হয়ে যায়, চিন্তাতুর হয়ে যায়। একদিকে তার বিশ বছব আগেকাব স্মৃতি কাজ করছে, অত্র দিকে তাব বর্তমান পবিস্থিতি। যখনই সে তাব আগেকার পবিস্থিতি বর্তমানের সঙ্গে জুড়তে চেষ্টা করে, তখনই তাব হৃথের অবধি থাকে না। তাব মনে হয়, 'এই কি বেঁচে থাকা? কি হয়ে গেল? হুনিষাই বদলে গেল, না বুগ পালটে গেল?'

এটা আমাব কল্পনামাত্র নয়। অনেক লোকেরই এই রকম পবিস্থিতি, এই রকম অনুভব। নিজেব প্রমাদেব জ্ঞাই লোকে হৃথী হয়। সে যদি যথার্থতার দিক থেকে প্রমাদী না হত, তবে বর্তমান পবিস্থিতিতে সে হৃথ বোধ কবত না। তার প্রমাদ এই যে, যা কেবল ব্যবহারের বেলায় সত্য, তাকেই সে যথার্থ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এই ভুলই তার হৃথের কাবণ হয়েছে। ব্যবহারের সত্য এই যে, পিতার প্রতি পুত্রের কি কথা, নূবেব লোকও 'যে আজ্ঞা' বলে উপস্থিত হয়, আদেশ মানে, আদর দেখায়, চোখেব ইশারায় গুঠে-বসে। যেমনি স্বার্থের বন্ধন টুটে যায়, তেমনি পবিস্থিতির সম্পূর্ণ পবিবর্তন হয়ে যায়। সব কিছুই বদলে যায়। এখন আমাদের যদি স্পষ্ট অনুভূতি থাকত, জীবনেব প্রতি অপ্রমত্ততা থাকত, জাগবকতা থাকত, তবে আমরা স্পষ্টই অনুভব করতাম যে, আগে আমাদের যে ভূমিকা ছিল, সেখানে

আমরা অল্প অনেকের জন্ত ছিলাম, আব সেজন্য তখনকার ব্যবহার ছিল এক রকম ; আর এখন আমাদের যে ভূমিকা, সেখানে আমরা অল্প কারও জন্ত নয়, কেবল নিজের জন্ত, সুতরাং এখনকার ব্যবহার হবে অল্প বকম। দুই ব্যবহারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ হবে, আকাশ-পাতাল ফারাক হবে। এই যে আমরা মনে করছি ‘এটা আমার’—এর মূলেই আছে আমাদের আত্মা সম্বন্ধে বিন্দুটি। তুমি কি করে ভাবতে পার, এটা তোমার নিজস্ব ? কখনও নিজস্ব কিছু হয় না। বস্তুত এই বিপবীত অল্পভূতি হওয়া চাই যে, আমি একলা, আমি কেবল আমিই, আমার কেউ নেই। এটাই স্বার্থ, এটাই প্রকৃত সত্য। এই আমাব পবিসার, এই আমার পত্নী, এই আমার পুত্র, এই আমার ভাই, এই আমার মিত্র—এসবই আমাদের ব্যবহারের ভূমি। ব্যবহারের ভূমিতেই ব্যবহারের বোধ থাকে, ব্যবহারের অল্পভূতি থাকে, সম্পর্কের বোধ থাকে। কিন্তু যখন চরম ও পরম সত্যের প্রশ্ন ওঠে, তখনই অল্পভূতি হয় যে প্রকৃতপক্ষে আমি একলা, আমার কেউ নেই, আমিও কারও নই। যদি কারও এই অল্পভূতি তীব্র হয়, তবে তার বয়স বাট হোক, সন্তর হোক, পরিবারের লোকেরা তাকে উপেক্ষা ককক—কোন কিছুতেই সে আর দুঃখী বোধ করবে না, চিন্তাপীড়িত হবে না। সে তখন ভাবে, ‘আমি যখন অস্ত্রের কাজে লাগতাম তখন পরিবারের লোকেরা আমাব খাতির করত, বন্ধুরা পরামর্শ নিত। আজ তো আমি অল্প কারও জন্তই নই, তবে ওরাই বা আমাকে খাতির করবে কেন ? আর ওদেব খাতির আমি চাইও না।’ এই চিন্তাই তার দুঃখ মোচন করবে।

তেরাপন্থ সংঘে এক সন্ত ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মগনলালজী স্বামী। তাঁকে মন্ত্রী-মুনি বলা হত। তাঁর জীবনী পড়লে মনে হয়, তাঁর মত বুদ্ধিমান, বিবেকী, তৎপর ও অধ্যাত্মরত ব্যক্তি অতি বিরল। তাঁর সন্তর-আশি বয়স হয়েছিল, কোন মুনি বদি তাঁকে জলপান করাতেন, তবে খুবই ভাল, যদি না করাতেন, তবে তাও কিছু

থাবাপ নয়। আমি তাঁকে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখিনি। যখন কোন মুনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে বলতেন, ‘ক্ষমা করুন, আমাব ভুল হবে গিয়েছে, অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে জলপান কবাত্তে পাবি নি’; তখন মন্ত্রী-মুনি উত্তর করতেন, ‘ভুল হয়েছ ত্তে কি হয়েছ, এমন কিছু মারাত্মক ভুল ত্তে নয়। আমার যদি পিপাসা পেত, সামনে যাকে দেখতাম ত্তাব কাছ থেকে জল চেয়ে নিতাম। ত্তা সম্ভব না হলে, এটা সামান্ত কষ্ট মনে করে সহ্য কবে যেতাম। ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয়।’ এই বকমই ছিল তাঁর কথা। এব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি ছিলেন নিজের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া আত্মসমাহিত ব্যক্তি। তিনি এই বকম মনে করতেন যে, কেউ যদি কাবও জন্ত কিছু করে ত্তা নিজ গুণেই কবে। এমন নয় যে তার ঞ্ণ আছে, যা ত্তাকে শোধ কবতেই হবে। এই বকম অনুভূতি সেই ব্যক্তিরই হতে পারে যে বাস্তবিকই অনুভব করেছে যে, সে একলা। যে একাকীত্বের এই সূত্র আবিষ্কার করেছে, জীবন-যাপনের এই কৌশল আয়ত্ত করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি জীবনের অধিকারী হয়েছে। যে এই সূত্র আবিষ্কার কবতে পারে নি, সে অজ্ঞের মধ্যে হাজার দোষ দেখতে পায়। সে সর্বদা অনুযোগ করে, ‘ও এটা করে নি, ও এই বকম করেছে, ও ঐ বকম কবেছে’—ইত্যাদি। তার অভিযোগেব অন্ত থাকে না। অভিযোগেব ত্তাব ত্তখনই আসে যখন ব্যক্তির আত্ম-বিস্মৃতি হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন নিজেকে ভুলে যায়।

অপ্রমাদের সূত্র হল—আত্ম-স্মৃতি অর্থাৎ নিজের নিজেকে স্মরণ রাখা, এই ধারণাকে পুষ্ট কবা যে, আমি একলা আছি—‘একোহম্’। একদা ভাবনার যে সংস্কার আমাদের মধ্যে আছে, ত্তাকে দৃঢ় করতে হবে। এই ভাবনা পুষ্ট হলে আত্ম-স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রবেশ কবা যায়, অপ্রমত্ত থাকার অভ্যাস হয়। এখানে আর একটা ব্যাপার বুঝতে হবে। ‘আত্মার স্মৃতি’ বলে ঠিক কোন কথা হয় না। আত্মা ত্তো আমাদের

স্বভাব, আমাদের স্বরূপ। স্বভাবের স্মৃতি তাবই হতে পারে, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছি। স্বভাব বিস্মৃত হতে পারি না, স্মৃতরাং তাব স্মৃতিও সম্ভব নয়। এ কথা সত্যি বলেই মানতে হবে। প্রকৃত তথ্য এই যে, আমরা এক ব্যবধান রচনা করে বসেছি; আর এই ব্যবধানের দরুণ ভুলেই গিয়েছি, আমরা কে বা কি। আমরা বাহ্য বস্তুর ওপর, অনাস্বীয় বিষয়ের ওপর, আত্মীয়তা আরোপ করি, অথচ নিজের আত্মার দিকে দৃষ্টি দিই না। এই যে বাহ্য বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক—এটাই প্রমাদের বড় কারণ। বাহ্য বস্তুব সঙ্গে সম্পর্ক হ্রাস করাই অপ্রমাদেব সাধন। আমাদের অজ্ঞানেব কারণে, ভুল দৃষ্টিকোণের কারণে, মতিভ্রমের কাবণে, মানসিক বাচিক ও কার্যিক চঞ্চলতার কারণে, প্রমাদ উৎপন্ন হয়। নিজাও প্রমাদের হেতু হতে পারে। নিজার সময়ে ব্যক্তি নিজেকে বিস্মৃত হয়। নিজায় যে অবস্থা হয় তার সঙ্গে নেশার অবস্থা খুব বেশি পার্থক্য নেই। দুই অবস্থাতেই আত্ম-বিস্মৃতি হয়। নিজা ভুলে যাওয়ার অবস্থা। কিন্তু তাও প্রমাদ, প্রমাদের হেতু ও প্রমাদেব উৎপাদক। এই কাবণে সাধনেব জন্ত সাধকের নিজা জয় কবা দরকার। নিজাবিজয় সাধনার আবশ্যকীয় অঙ্গ। ইন্দ্রিয়ের লোলুপতাও প্রমাদের কাবণ, সেজন্ত ইন্দ্রিয় সংযম সাধনাব অঙ্গ। ইন্দ্রিয়-সংযম সাধককে অপ্রমত্ততার দিকে নিয়ে যায়। যতক্ষণ অপ্রমাদের সাধনা করা না হয়, ততদিন অধ্যাত্মের অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই যায় না। অপ্রমাদ সাধনার এক সশস্ত্র সূত্র। প্রমাদ হল ভয়, অপ্রমাদ অভয়। ভগবান মহাবীর বলেছেন, ‘সব্বও পমত্তস্ স ভয়’—প্রমাদীর চার দিকই ভয় ঘিরে থাকে। সর্বত্রই তার পক্ষে ভয় আব ভয়, এক ক্ষণের জন্তও সে অভয়েব দশা পায় না। তাব প্রতি ক্ষণই ভয়ের মধ্যে কাটে। সকলের মধ্যেই সে অবিখ্যাসেব গন্ধ পায়। আপন ধন-ভাণ্ডারের চাবি কাউকেই দেয় না, তাব মনে ভয় থাকে কেউ হস্ত তার ধন নিয়ে পালিয়ে যাবে। নিজেব ছেলেকেও সে চাবি দেবে না, কাবণ তার ভয় আছে যে, ছেলে ধন-ভাণ্ডারেব

চাৰি পেৰে গৈলে তাকে আঁৰ মানবে না, তাকে তোষাকা কৰে না। সে তাৰ জীকেও চাৰি দেবে না, কাৰণ সে ভাববে, চাৰি দিলে মা ও ছেলে দুজনে মিলে তাৰ দুৰ্দ্দশা ঘটাবে, তাকে একেবারে হেনস্থা কৰে ছাড়বে। সুতৰা অস্তিম কাল পৰ্যন্ত সে কাৰও হাতে চাৰি ছাড়বে না, কাৰণ তাৰ যে ভয় থাকবে। এই ভয়ই প্ৰমাদ।

কেউ কেউ একেই জাগৰুৱকতা বলে। কিন্তু গভীৰ ভাবে চিন্তা কৰলে দেখা যায় এই জাগৰুৱকতাৰ পশ্চাতে ভয়ই ক্ৰিয়া কৰছে। এৱ পৰে এৱা আমাৰ সঙ্গে কেমন আচৰণ কৰবে, এই ৱকম ভয়-মিশ্ৰিত চিন্তা যদি না থাকত, তবে এই প্ৰকাৰ জাগৃতিও আসত না। এই জাগৃতিৰ কাৰণই যে ভয়। কখনও কখনও আমি এবকম ঘৰে বাস কৰেছি, যে ঘৰেৰ আলমাবিতে লাখ টাকার টাকার মাল পড়ে থাকে। সে ঘৰে কোন পাহাবাদার নেই, চৌকিদার নেই, কেবল আমিই আছি। বাড়ির মালিক সুখে নিদ্রা যাচ্ছে। সে ভেগে নেই, কাৰণ তার এই ভয় নেই যে, মুনি তার ঘন বেব কৰে নেবে। তাৰ মনে কোন ভয় নেই, তাই সে ভেগে থাকে না, সুখেই নিদ্রা যায়। যেখানে ভয় নেই, সেখানে পৱম নিশ্চিন্ততা।

এক আশ্চৰ্য এই যে, লোকে এই ভেবে চলে যে, তারা পঞ্চাশ জন কি একশ জন—যেন তাবা এই পঞ্চাশ কি একশ জন মিলে একই ব্যক্তি। অথচ তাদের প্ৰত্যেকেব মনেই অপব প্ৰতিটির জন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকোষ্ঠ আছে। কোন ব্যক্তিই অপৱ ব্যক্তিকে মনের সব কথা খুলে বলে না, কাউকে কিছুটা বলে, অপৱ কাউকে আৱ কিছুটা, এই ৱকম। যে কোন পৱিবাৱেব কৰ্তাই সেই পৱিবাৱেব কোন সদন্তকে পৱিবাৱ-সংক্ৰান্ত সব খুঁটিনাটি বিষয় জানায় না, কাউকে খানিকটা জানায়, আব কাউকে আৱ খানিকটা জানায়—কিন্তু কাউকেই সবটা জানায় না। তাব মনে ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকোষ্ঠ আছে, সেখানে পৃথক পৃথক ভয়ও আছে। মূলে এ সবৱই উৎপত্তিস্থল ভয়। ভয় হলে জাগতে হয়, ভয় না থাকলে জাগাৱ প্ৰযোজন হয়

না। এই ভয় আবার উৎপন্ন হয় বাহ্য সম্পর্ক থেকে। বাহ্য সম্পর্ককেই নিজের বলে মেনে নিয়েছি, তাই ভয় হয়—পাছে সেই সম্পর্ক টুটে যায়। এই ভয়েব জগতই নানা প্রকার প্রমাদ এসে উপস্থিত হয়।

এই বকম অবস্থায় অপ্রমাদের উপায় হল, একাকীত্বের অনুভূতি। অবশ্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন ব্যক্তি ব্যবহারের ভূমিতে বাস করতে পারে না। আমি একথা বলছি না যে, ব্যবহারকে তুলে দিতে হবে। তা কোন ব্যক্তি করতে পারে না। ব্যবহার ত্যাগ করে কোন ব্যক্তি জীবন ধারণ করতে পারে না। সংসার ত্যাগ চলবে না। এই সব কথায় ব্যবহার বন্ধ হবে না, বরং আরও মধুর হবে উঠবে। বাস্তবিকই যদি আপনি আপনার মধ্যে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে পারেন তবে অনেক কঠিন অবস্থা থেকে বেঁচে যাবেন। আপনাকে চিন্তা আর দুঃখের শিকার হতে হবে না। অশ্রুত ব্যবহার দেখে আপনি জড়িয়ে পড়বেন না, বা ছুঁখী হবেন না। তখন আপনার নিজের ব্যবহার অশ্রুত কাছে মধুর লাগবে। আপনার মস্তিষ্কে তখন যে চিন্তা-শূন্য ক্রিয়ানীল হবে তা হল—আমি একলা। যখন কোন সমস্যা আপনার সামনে আসবে তখন এই চিন্তাশূন্য ধরেই সমাহিত থাকবেন। সমস্যা আপনাকে পীড়িত করবে না। যে সমস্যা বোল আনা ছিল, তা এক আনা মাত্র হবে যাবে। তা আপনি ব্যবহারের ভূমিতে সমাধান করে নিতে পারবেন। যদি একাকীত্বের এই আলম্বন-শূন্য আপনার কাছে না থাকে, তবে ছোট সমস্যাও বড় বলে মনে হবে। সহজে তার সমাধান হবে না। বস্তুত অপ্রমাদের সাধনা কি ব্যক্তিগত জীবন, কি ব্যবহারিক জীবন—দুই ক্ষেত্রেই সমান ভাবে লাভপ্রদ ; দুই ক্ষেত্রেই তা সমস্যার সমাধান হতে সক্ষম। এই সাধনা সমস্যা মোচন করে, আবার আমাদের এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতেও সাহায্য করে।

আমরা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হই, আবার সম্পর্ক থেকে পালিয়ে যাই, সম্পর্ক এড়িয়ে যাই। যুক্ত হওয়া আর পালিয়ে যাওয়া—এই দুই ব্যাপারই ঠিক। জুড়ে যাওয়া ভাল, ভেগে যাওয়াও ভাল। সমূহের

মধ্যে থাকাও ভাল, একলা থাকাও ভাল। এদের মধ্যে কোন একটাই কেবল ঠিক, এমন বলা যাবে না। কারণ আমাদের ব্যবহারেব জীবন যাপন করতেই হয়। আমাদের ব্যবহারের একটা স্তর আছে—যেখানে আমাদের শরীর থাকে, আমাদের জীবন থাকে। সে স্তর আমাদের আবশ্যিক তো বটেই। আমাদের রুটি খেতে হয়, কাপড় পরতে হয়, ঘর বানাতে হয়, ঘরে থাকতে হয়—এ সবই তো আমাদের অপরিহার্য। এই পবিত্রস্থিতিতে আমবা সম্পর্ক ত্যাগ করতে সমর্থ হব কি করে? সব সম্পর্কের সাহায্যই আমাদের নিতে হবে। কিন্তু যখনই আমরা বাস্তবিকতার জগতে বাস কবি, প্রকৃত সত্যেব জগতে বাস কবি, যথার্থতার জগতে বাস কবি, তখনই আমবা প্রত্যেকে একলাই বাস করি। তখন আমাদের একলাই থাকতে হবে। অশুখার অনেক কঠিন ভার আমাদের বহন করতে হবে। এব কোন বিকল্প নেই।

আশ্চর্য ভিক্ষু ভাবি স্মরণ একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘গণের মধ্যে থেকেও তুমি একলা থাক।’ কথাটা স্ব-বিবোধী বলে মনে হতে পারে। শাসনের অধীন থাকব, সমূহের মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—এ কেমন করে সম্ভব? হয় সমূহের মধ্যে থাকতে হবে, নয় একলা থাকতে হবে। একই সঙ্গে তো দু ভাবেই থাকা যায় না। কথাটার মধ্যেই যে বিরোধ আছে। অসংখ্য সাধু-সাধবীর মধ্যে থাকব, আবার একলাও থাকব—কথাটা স্ব-বিবোধী তো বটেই। কিন্তু সেরকম মনে হলেও, কথাটার সত্যিই কোন বিবোধ নেই। তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, তুমি সংঘে থাক, তোমার সেবা অপর সাধুকে দাও, আবার আবশ্যিক হলে তার কাছ থেকে সেবা নাও। তুমি তার সহযোগিতা কর, আর প্রয়োজনে তার সহযোগিতা প্রার্থনা কব। তুমি লোককে বোঝাও, উপদেশ দাও, তাদের কাছ থেকে যা নেওয়ার আছে, তা নাও। কিন্তু কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বেধো না, কাবও সঙ্গে দল বেধো না।

গণ মে' রহ' নির্দাৰ অকলো,
কিণ, শূ' হী নহী' বাঁধু' কীলো ।

‘আমি গণে থেকেও একলা থাকব, কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধব না, কাবও সঙ্গে দল বাঁধব না ।’ এই কথাৰ তাৎপৰ্য, সহযোগেৰ স্তৰে ভূমি একলাই থাক । আৰ যদি কেবল সমূহেৰ মধ্যেই থেকে যাও, সংগঠনেৰ মধ্যেই থেকে যাও, তবে তোমাৰ সাধনাও শেষ হয়ে যাবে । কেবল সংগঠনেৰ ভাৱ, সংগঠনেৰ চিন্তা যদি তোমাৰ মাথায় থাকে তো তোমাৰ সাধনাৰ সমাপ্তি ঘটবে । তোমাকে সাধনাও করতে হবে, আৰ তোমাৰ আবশ্যকতা-পূৰ্ত্তিৰ জন্তু সংগঠনকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে । এই দু দিক রক্ষা হলেই ব্যাপারটা সম্পূৰ্ণ হয় । কেবল একলা থাকাই সব নয়, আবার কেবল সংগঠনেৰ মধ্যে থাকোও সব নয় । তেমনি কেবল পরিবারেৰ মধ্যে থাকাই সব নয়, আবার কেবল একলা থাকোও সব নয় । যেখানে সুখ-সুবিধা, সহযোগ প্রভৃতি দেওয়া-নেওয়ার প্রশ্ন আছে, সেখানে ব্যক্তি পরিবারেৰ মধ্যেই থাকে, সম্পৰ্ক জোড়া দেয় আৰ অনেকৰ মধ্যেই বেঁচে থাকে । যেখানে স্বার্থভাৱ অহুত্তৰ কৰা প্রয়োজন, সম্পৰ্ক থেকে উৎপন্ন জটিল সমস্যাৰ সমাধান কৰা আবশ্যক, সেখানে একলা থাকতে হবে, একাকীষেৰ বোধ দৃঢ় করতে হবে । এই দুই ভাব এক সঙ্গে মিললে জীবন পৰিপূৰ্ণ ও অখণ্ডিত হয় । তখন আমরা আৰ এ পাড়েও জড়িয়ে যাব না, ও পাড়েও জড়িয়ে যাব না ; দুই ভৰ্টই পাৰ হয়ে চলে যাব ।

০

জ্ঞান ও সংবেদন

সংবেদন এবং অহং—উভয়ে সাথে সাথে চলে। রাজা শুনলেন নগবে এক শক্তিশালী সাধু এসেছেন। বড়ই বিচিত্র তাঁর কাঁধকলাপ। হাজার হাজার লোক আসছে যাচ্ছে। ঘরে ঘবে তাঁর যশোগান। রাজা তাঁর কাছে নিজের লোক পাঠিয়ে প্রার্থনা জানালেন সাধুজী যেন রাজাকে একবার দর্শন দেন। সন্ন্যাসী বললেন—‘আমি রাজার প্রাসাদে যেতে পাবব না, রাজা যদি দর্শন করতে চান তবে এখানে এসে তনুগ্রহ কবে দর্শন করুন।’ প্রকৃতপক্ষে ক্রোধ ছিল রাজার, সন্ন্যাসীব নয়। ক্ষুধিত লোকেরই ভোজ্যেব কাছে আসতে হয়। পিপাসা ছিল রাজার, সন্ন্যাসীর নয়। পিপাসিত লোককেই পানীয়েব কাছে আসতে হয়। তখন রাজা স্বয়ং সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। সন্ন্যাসী প্রাসাদে এক দিন থাকলেন, দুদিন থাকলেন, মাস ভোর থাকলেন। তিনি চলে যাবার নামও করেন না। রাজা ভাবলেন, ‘এ কেমন? আমি কোন্ আপদ ডেকে আনলাম? আমি তো ভেবেছিলাম বনবাসী লোক, দু-এক দিন প্রাসাদে থেকে চলে যাবেন। কিন্তু তিনি তো এখান থেকে চলে যাবার নামও করেন না।’ এক দিন রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন, ‘মহারাজ, চলুন আমরা বনে বেড়িয়ে আসি।’ সন্ন্যাসী এবং রাজা ভ্রমণ করতে বের হলেন। তাঁরা চলতে

চলতে নগর থেকে বহু দূর গেলেন। বাজা বললেন, ‘আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। এবাব চলুন প্রাসাদে দিকে ফিরে যাই।’ সন্ন্যাসী বললেন, ‘আব প্রাসাদে ফিরে যাব কেন ? আমি তো বনের দিকেই চলেছি।’ তখন রাজা বললেন, ‘মহাবাজ, আপনিও প্রাসাদে থাকতেন আব আমিও প্রাসাদে থাকতাম। তবে আপনার আর আমার মধ্যে প্রভেদ কি আছে ?’

সন্ন্যাসী বললেন, ‘আমি প্রাসাদে ছিলাম, কিন্তু আমাব মনের মধ্যে প্রাসাদ ছিল না, আর তুমি প্রাসাদে থাক, প্রাসাদ তোমাব অন্তর অধিকার করে আছে। তোমার আমার মধ্যে এই প্রভেদ। আমি বনে থাকলেও প্রাসাদে অবস্থান কবি, প্রাসাদে থাকলেও বনে বাস করি। আমি যখন বনে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি, যখন প্রাসাদে থাকি তখনও নিজের ভাবে নিমগ্ন থাকি। আমার মনে আমার অন্তরে প্রাসাদ ছিল না। প্রাসাদে বাস করা বা বনে বাস করা আমাব অন্তরের ব্যাপার নয়। আমার কাছে উভয়ই সমান। তোমার পক্ষে দুই-ই সমান নয়। তোমাব কাছে জঙ্গল জঙ্গল এবং প্রাসাদ প্রাসাদ বটে।’

সম্পত্তি থাকা বা না থাকা—উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। পার্থক্য কেবল অন্তরে, সম্পত্তির বোধ হওয়ায় এবং না হওয়ায়।

একবার গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা করেন—‘ভাস্তে, ছয় খণ্ডের অধিপতি চক্রবর্তী বাজা এক ক্ষুদ্র জন্তু উভয়ে কি সমান ?’

মহাবীর বললেন, ‘হ্যাঁ, উভয়ে সমান।’

‘ভাস্তে, আপনার কথায বড়ই আশ্চর্য বোধ করছি। দুই-ই সমান হতে পারে কি করে ? কোথায চক্রবর্তী সম্রাটের ঐশ্বর্য ও প্রভুত্ব আব কোথায ক্ষুদ্র প্রাণীব জীবন।’

‘গৌতম ! বাজচক্রবর্তীর মধ্যে যতটা আকাঙ্ক্ষা আছে প্রাণীর মধ্যেও ততটাই আকাঙ্ক্ষা আছে। ঐশ্বর্য বা প্রভুত্ব থাকা বা না থাকা আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আকর্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়েই সমান। যতটা

আকর্ষণ চক্রবর্তী সম্রাটে আছে ততটাই আকর্ষণ প্রাণীতে আছে।' উভয়ের মধ্যেই অবিরতি সম পরিমাণে বিদ্যমান। যেখানে উভয়ের অবিবর্তিত সমতা সেখানে উভয়ে সমতাপ্রাপ্ত হয়েছে।' কি গুট তাৎপর্য-পূর্ণ কথা। যখন সংবেদনা জাগ্রত হয় তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। যখন সংবেদনাব সংহরণ হয় তখন অন্তর্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন মনোব সংবেদন বৃদ্ধি পায় তখন অহং উৎপন্ন হয়। যদি মনে সংবেদন না থাকে তবে সম্পত্তি বা ঐশ্বর্যের পবিগ্রহ ঘটে না। যখন সম্পত্তিপবিগ্রহ ঘটে তখন মনে সংবেদনা জেগে উঠে।

দুটি ব্যাপার আছে—একটি জ্ঞানের ধাৰা, অপরটি সংবেদনা। আমবা যেন জ্ঞানের ধারাকে জ্ঞানোব ধাৰা কাপেই থাকতে দিই। আর চেতনার জ্যোতিবশ্বিকে যেন চেতনার জ্যোতিবশ্বি কাপেই সংবেকিত কবি। একেই বলে সাধনা, এরই নাম আত্মদর্শন। এরই নাম প্রকাশ। একেই আমাদের জ্ঞানতে হবে, মানতে হবে এবং এর মধ্যেই থাকতে হবে। তাতে কোনও অন্তবিধা বা বিঘ্ন হবে না।

যখনই জ্ঞানোব ধারা সংবেদনার গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে এসে পড়ে তখনই তা সংবেদনান্ন পরিণত হয়। তাতে ভাব এসে যায়, আর তা ভেতর থেকে বাইরেব দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরীক্ষযাত্রী যখন অন্তরীক্ষেব সীমার মধ্যে থাকে তখন সে ভারশূন্য। তখন সে কালের সীমাকেও লঙ্ঘন করে। কিন্তু যখন সে পৃথিবীর গুরুত্বাকর্ষণের সীমার মধ্যে চলে আসে তখন সে ভারি হয়ে যায় এবং কালের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। এই ভাবে যতক্ষণ আমাদের চেতনার ধারা, আমাদের জ্ঞানোব ধারা, বিশুদ্ধ কাপে প্রবাহিত হতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা সাধনা, তথা পবিত্রতা। যখনই তা হ্রদযাবেগেব গুরুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখনই বাসনা, লোভ, বঞ্চনা, মান প্রভৃতি সন্মুদয় দোষ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

সাধনার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি বিষয়ের ওপরে আমাদের ধ্যান

কেন্দ্রিত করা প্রয়োজন। প্রথম কথা হল, আমাদের চেতনাকে চেতনা-রূপেই থাকতে দেব। আর দ্বিতীয় কথা—আমরা চেতনাকে সংবেদনায় পরিণত হতে দেব না। চেতনাকে চেতনা রূপে সংরক্ষণের প্রধান উপায়—শুদ্ধ উপযোগ। জ্ঞানকে জ্ঞানরূপে জ্ঞান ও দেখা, সহজ আনন্দকে অম্লভব করা, অনন্ত শক্তিকে উপলব্ধি করা, এই চেতনাকে চেতনার পরিধির মধ্যে সংরক্ষণের রূপ। যেখানে রুগ্মিব পবিবর্তন ঘটে সেখানে চেতনারও পবিবর্তন ঘটে। তার মূল কারণ হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। চেতনার ওপরে হৃদয়াবেগের ভার পড়লে চেতনা আর চেতনা থাকে না। তা বিকৃত হয়ে যায়। আমাদের চেতনার স্থিতির রূপই আমাদের জাগরকতাব রূপ। সেই রূপই আমাদের সাধনার রূপ, তথা আমাদের আত্মদর্শনের রূপ। ঐ রূপ আমাদের চেতনাব অভিমুখী হওয়ার রূপ। যখন চেতনা হৃদয়াবেগ দ্বারা ভাবগ্ৰস্ত হয় তখন বাসনা, বন্ধনা তথা অহমের রূপ। তখন আমাদের সামনে সমস্তা এসে যায়। সংবেদনা সমস্তা উৎপাদন করে। ভয়, ঘৃণা, বাসনা, লোভ, আবেগ সবই এক একটি সমস্তা। এ সমস্ত সমস্তাব মূল—হৃদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। তার অভাব হলে সমস্তার অভাব হয়, এবং চেতনা চেতনা রূপে স্থিত হয়।

দুই স্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এক চেতনাব বিশুদ্ধ স্থিতি, চেতনার ভাবাবেগস্বলিত স্থিতি। সাধকের জাগরক থাকা প্রয়োজন। তার চেতনাকে চেতনার সীমাব মধ্যে থাকতে দিতে হবে। সেটাই সাধনা। ঐ হল আত্মার উপাসনা। যে লোক চেতনাকে চেতনা রূপে থাকতে দিতে পারে সে ভাবাবেগের গুরুত্বাকর্ষণ থেকে বাঁচতে পারে। সেই বাস্তবে আপনার লক্ষ্যব দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

জপ ও মৌনতা

ছটি লোক নদীৰ ধারে এল। তাবা নদী পার হতে চাষ। তারা দেখল নদীর কিনাবাষ একটি নৌকো আছে। একজন বলল—‘নাবিক তো নেই, কিন্তু নৌকো পড়ে আছে। কাজেই আমরা নদী পার হতে পারব।’ দ্বিতীয় জন বলল—‘এরকম হওয়া সম্ভব নয়। নদী পার হতে হলে কেবল নৌকো থাকলেই যথেষ্ট নয়। নাবিকও চাই, দাঁড়ও চাই, নৌকো চালনার কৌশলও জানা চাই। এইসব হলে তবে নদী পার হওয়া সম্ভব হয়।’ প্রথমজন বলল, ‘এ বকম কি করে হতে পারে? জীবন-ভোর শুনছি নদী পার হতে হলে নৌকোয় চড়ে পার হও। নৌকো পড়ে আছে। অম্ম কোন বস্তুর কি আবশ্যকতা আছে?’ দ্বিতীয় লোকটি তাকে বোঝাল, কিন্তু সে তার কথা মানল না। সে নৌকো পাড় থেকে খুলল, তাতে একাই বসল। জলেব এক ঢেউ এসে লাগল, আর নৌকো এগিষে চলল। নৌকো নদী পার হওয়ার উপায়, কিন্তু আজ ঐ যাত্রীব পক্ষে নৌকো তাব ডোবার কারণ হল। যে পার হওয়ার উপায়, সে কখনও কখনও ডোবার কাবণ হতে পারে। বাস্তবে যে পার করতে পাবে এবং যে ডোবাতে পারে—তুই ভিন্ন নয়, একই হয়ে থাকে। যে তারক,

সে-ই নিমজ্জক আর যে নিমজ্জক, সে-ই তাবক। বাস্তবে এ দুটি স্বতন্ত্র নয়। তাদের প্রভেদ সংযোগেব প্রভেদ। নৌকো চলল, লোকটি শান্তভাবে বসে থাকল। জলেব খুব তোড় ছিল, শ্রোত প্রবল ছিল। নৌকোটি টলমল কবে চলতে লাগল। কিছু দূর বাওঁবাওঁ পরে নৌকোটি উলটে গেল। আরোহী জলে ডুবে গেল।

নৌকো নদী পার করে দেয়, একথা ঠিকই বটে। কিন্তু তাব অর্থ এই নয় যে শুধু নৌকো, একলা নৌকোই, নদী পার করে দেয়। তার সাথে অজ্ঞ কোন কোন জিনিসের প্রয়োজন আছে। যে লোক এক অংশ আঁকড়ে ধরে কিন্তু অজ্ঞাত অংশকে উপেক্ষা করে, তার পক্ষে পাবপারকারী ডুবন্ত হয়ে যায়।

ঠিক এই রকম ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে থাকে। আমরা জানি, ওড়াব বড় মজ। আমরা জানি, অহম মহত্বপূর্ণ মজ। ‘নমো অবহত্তাং’ বড় মজ। এই মজ জপ করলে সর্ব কর্মে সিদ্ধিলাভ হয়। একথা ঠিক। তেমনি সত্য যেমন নৌকোষ উঠে বসলেই নদীর অপর পারে পৌঁছানো যায়, এ কথা সত্য। মজ জপ করে সর্ব বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করবে। এ কথা যথার্থ। কিন্তু শুধু মজকে গ্রহণ করে, তাকে বছরের পর বছর জপ কবতে লাগলে, অথচ কিছু হল না, কিছুই অমুভব হল না, কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হল না। এই রকম পরিস্থিতিতে লোকে বলে থাকে—এত বছর ধরে জপ করলাম, জপেব মালা ঘোরালাম, কিন্তু কই চমকপ্রদ কিছু তো ঘটল না। কোন কিছুই লাভ হল না। অর্থাৎ এ নৌকো পার হওয়াব উপায় নয়। মনে হয় এব প্রচেষ্টা ডুবিয়ে দেওয়াব, এবং সে চেষ্টায় অনেকটা সফল হয়েছে। কেউ কেউ বলে—এতদিন ধরে আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে মালা ঘোবালাম আর মজ জপ করলাম, অমুক অমুক অনুষ্ঠান করলাম, কিন্তু মনে হল কিছুই ফল হচ্ছে না। তাই আমরা মালা ঘোরানো, মজ জপ কবা সব ছেড়ে দিয়েছি। মনে আব ঐ সবের ওপরে কোন বিশ্বাস নেই। তার অর্থ এই যে, ঐসব লোক মাঝ দবিষায়

এসে ডুবে যাচ্ছে। এ রকম কেন হয়? ঐ বকম হওয়াব কাবণ হল আমরা সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানি না, আয়ত্ত করাব চেষ্টা কবি না। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে, আয়ত্ত কবতে হবে। মস্তের মধ্যে শক্তি আছে একথা ঠিক। মস্ত ভরাতে পাবে, কিন্তু সব কিছুই মস্তেব দ্বারা হবে, এমন হয় না। তার সঙ্গে অস্ত্র আবও কিছু চাই। সবার আগে আপনি এই কথা চিন্তা করে দেখুন মস্তের সঙ্গে আপনাব মনের সংযোগ হয়েছে কিনা। আপনি তো মস্ত জগ করে যাচ্ছেন, কিন্তু মস্তের সঙ্গে আপনাব মনের যদি সংযোগ না হয়ে থাকে তবে কোন ফল লাভ হবে না। অর্থাৎ নদী পাব হওয়াব আগে, নৌকোয বসার আগে, আপনাকে দেখতে হবে নৌকোয নাবিক আছে কিনা। নাবিকও নেই আব আপনি নিজেও চালাতে জানেন না, সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় নৌকো আপনাকে পাব কবতে পারবে না। মাঝ দবিষায় নিষে গিয়ে আপনাকে ডুবিয়ে দেবে। মস্তে শক্তি আছে এ কথা স্বার্থ, কিন্তু আপনার মন যদি তাতে সংযুক্ত না হয়, যদি মনের সঙ্গে তাব কোন সংযোগ না ষটে, যদি মন ভায় দিকে চালিত না হয়, সে মস্ত মনকে চালিত না করে বিভ্রান্ত করবে। আমাদের সম্পূর্ণ তত্ত্ব জানতে হবে। প্রথম তত্ত্ব হল, মনকে সংযুক্ত কর। মনোযোগ না করে যে কাজ কবা যায় তা সম্পূর্ণ হয় না, অর্ধসমাপ্ত থেকে যায়। যে লোক থাকে তার মন যদি ঋণ্ডয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হয় তবে তাব ঋণ্ডা অসমাপ্ত থেকে যায়। যে লোক চলছে তাব মন যদি চলার সঙ্গে সংযুক্ত না হয় তবে তাব চলা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে অর্ধেক মন নিষে চলে, সম্পূর্ণ মন নিষে নয়। আপনি এই বিষয়ে চিন্তা করে দেখুন। আপনি কি সম্পূর্ণ মন দিষে খান? কখনই নয়। কখনও কি এমন হয় যে ঋণ্ডাব সময়ে আপনি খান, আব কিছুই করেন না? চিন্তা করেন না, কিছু বলেন না বা ইঙ্গিত করেন না? আপনাব মন কি সম্পূর্ণ ঋপে ঋণ্ডাতে লেগে থাকে? না, কখনই না।

খেতে খেতে আপনি অসহ্য কাজ করেন। কোথা থেকে কোথায় চলে যান। কত যাত্রাই করেন। কত বকম কল্পনা করে করেন। কত বকম পবিত্রকল্পনা করেন। আপনি গুবো মন দিয়ে খান না, অর্ধেক মন দিয়ে খান। এব তাৎপর্য এই যে, মনেব এক কোণ খাওয়ার কাজে যুক্ত থাকে, আব তার হাজার কোণায় আলাদা আলাদা কাজ হতে থাকে। চলার ব্যাপাবেও সম্পূর্ণ মন চলাব মধ্যে থাকে না। আপনি যখন চলেন তখন আপনাব মনের এক ভাগ চলার সঙ্গে সহযোগিতা করে, চলাতে সংযুক্ত থাকে। আর তার বাকি হাজার ভাগ কে জানে কোথায় উড়ে বেড়ায়। মস্ত জপেবও একই ব্যাপাব। সম্পূর্ণ মন দিয়ে মস্ত জপ কই হয় ? মনেব এক ভাগ মস্ত জপের সঙ্গে লেগে থাকে, আব অবশিষ্ট হাজার ভাগ অন্ত্রান্ত নানা বকম কল্পনায় ব্যস্ত থাকে।

এক শ্রাবক ভাই বলেন যে যখন আমি অন্ত্রান্ত কাজ কবতে থাকি তখন আমার মন সাধাবগত সেই সব কাজে সংলগ্ন থাকে। কিন্তু যখন মালা ঘুরিবে জপ করতে থাকি তখন ছনিয়ার যত কল্পনা-চূর্বীর গতিতে মনের মধ্যে আসতে থাকে। এসব কল্পনা মনেব মধ্যে ভিড় করে।

সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করে আমবা কোন কাজ করতে পাবি না। সাধনার ব্যাপারে ঐ তো আমাদের বাটতি। সাধনার অর্থ কি ? সাধনা থেকে আপনারা আর কিছু শিখুন বা না শিখুন, এটা অন্তত শিখে রাখবেন, যে কাজই কবতে হবে সেই কাজই সম্পূর্ণ মন দিয়ে কবা উচিত, সমগ্রতাব সঙ্গে কবা উচিত, অর্থাৎ ঐ কাজে মনকে সমগ্র রাপে নিয়োগ করা কর্তব্য। মনকে এমন ভাবে নিয়োগ করা প্রয়োজন যাতে মনেব সমস্ত অংশ ঐ কাজে পবিপূর্ণ হয়ে যায়। মনেব কোন কোণা যেন শূন্য না থাকে, যাতে তা থেকে অপসরণ কবাব কোনও অবসর না থাকে। তাব সামনে যদি কোন শূন্য স্থান না থাকে তো বেচারী পালাবে কোথায় ? এই পবিস্থিতি

যদি প্রাজ্ঞ হওয়া যায় তাহলে সাধনাৰ সাফল্য লাভ হয়। আপনি একে সাধনাৰ প্রাথমিক বহুস্ত বা অন্তিম সাফল্য যাই বলুন এই হল সাধনাৰ একমাত্র বহুস্ত। এব তাৎপর্য এই যে সাধনা দ্বাৰা মনকে এ বকম প্রশিক্ষিত কৰতে হবে যে, তাকে যে কাজে আমবা লাগাতে চাইব সে সেই কাজেই লেগে যাবে। আমবা যে কাজে তাকে লাগাতে না চাইব সে কাজে সে লিপ্ত হবে না। যদি মনেব ওপৰে এতটা প্রভুত্ব স্থাপিত হয় তাহলে আৰ কোন সমস্যা উৎপন্ন হবে না। পবন্তু আমবা নিজেদেব মনেব মালিক হয়ে নাব। আমবা বা চাই তাই কবতে পাবব, যেমন কৰে চাই তেমনি কৰে কবতে পাবব। আমাদেব মন এমন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত যে আমবা তা গুণে শেষ কবতে পাবি না। এই খণ্ডিত মনই মানব জাতিব সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভগবান মহাবীৰ বলেছেন, ‘অনেগদিস্তে খলু অয় পুৰিসে’—মানুহ অনেক মন সম্পন্ন, সে একমনা নয়। তাব অনেক মন। ঐ মন অনেক ভাবে খণ্ডিত। এই জন্তু মানুহ কোন বিষয় পূৰো মন দিয়ে চিন্তা কবতে পাবে না। যদি সে সম্পূর্ণ মন দিয়ে চিন্তা কবতে লেগে যায় তবে নির্ঘাৎ তাব নৌকো নদী পাৰ হতে পাববে, তা ভিন্ন এ কাজ কৰা সম্ভব নয়।

সবাব আগে দেখুন মস্তেব সাথে মনেব সংযোগ হয়েছে কিনা। মনেব সমগ্র শক্তি মস্তেব সঙ্গে আছে কি নেই। মস্ত আৰ মন চুটি ভিন্ন জিনিস।

তৃতীয় প্রশ্ন, আপনি মস্তেব অর্থ জেনেছেন কিনা। মস্তেব অর্থ জানা অভ্যন্ত প্রযোজন। যদি আপনি মস্তেব অর্থ না জেনে থাকেন তাহলে আপনি যা কবতে চান তা কবতে পাববেন না। যা হতে চান তা ঘটান সম্ভব হবে না।

পৰিবৰ্তনই চিবন্তন সত্য। কোনও বস্তু শাশ্বত নয়, চিবন্তব্যী নয়। সব পৰিণামশীল। পৰিবৰ্তনই সত্য। সব জিনিসই বদলায়। পবমানু নষ্ট হয় না। যা আকাৰ বা সংস্থান বা রূপ তা স্থায়ী হতে পাবে না। সবই পৰিবৰ্তনশীল। সব কিছুই বদলায়। মানুহও বদলে যায়।

কেবল আত্মা শাস্ত। তাব কোন পৰিবৰ্তন নহৈ। মানুহ বদলায়। সেইজন্ত মানুহ বা হতে চাহ সে তা হতে পাবে। সেই কাপেই সে বদলে যেতে পাবে। তাব বা সঙ্কল্প হব সেই কাপে সে বদলে যাবে। মানুহ জীবনৰ প্ৰথম ঋণ থেকে বদলাতে শুক কৰেছে। প্ৰতি মুহূৰ্তে সে বদলাছে। পৰিবৰ্তনৰ ক্ৰম বন্ধ হয় না। তাব কলে মানুহেৰ সঙ্কল্পেৰ অনুৰূপ পৰিবৰ্তন হয়। আৰ যদি সঙ্কল্প না থাকে তবে অল্প যে কোন কাপে বদলায়। সঙ্কল্প থাকলে সঙ্কল্প অনুযায়ী পৰিণতি ঘটে।

আমাদেৰ শৰীৰে যেসৰ কোষ আছে সেগুলি তাব সংগঠনকাৰী মূল উপাদান। তাদেৰ দ্বাৰা শৰীৰ নিৰ্মিত হয়। তাদেৰ সংখ্যা অনেক। আমাদেৰ শৰীৰে বাট হাজাৰ অৰ্বুদ কোষ আছে। আমাদেৰ মস্তিষ্কে প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰে এক কোটি কোষ আছে। শৰীৰেৰ কোষ প্ৰতি মুহূৰ্তে নষ্ট হচ্ছে, প্ৰতি মুহূৰ্তে নতুন কোষ উৎপাদিত হচ্ছে। হাজাৰ হাজাৰ কোষ লোপ পাচ্ছে, আৰাব হাজাৰ হাজাৰ কোষ নতুন জন্মাচ্ছে। পুনো কোষ ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়, নতুন কোষ সৃষ্টি হয়। এই পৰিবৰ্তন-চক্ৰ নিবন্তৰ আৰম্ভিত হচ্ছে। বয়স অনুসাবে মানুহেৰ শৰীৰেৰ কোষগুলি যখন অতিশয় ক্ষীণ হয় এবং নতুন কোষ খুব কম জন্মে, তখন শৰীৰ ক্ষীণ হয়, মস্তিষ্ক ক্ৰমশঃ দুৰ্বল হয়, ইন্দ্ৰিয়সমূহ নিস্তেজ হয়, মস্তিষ্কেৰ নিয়ন্ত্ৰণ শিথিল হয়ে পড়ে। জোযান মানুহ নিজেৰ শৰীৰ, নিজেৰ মনকে যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে নিৰক্ষিত কৰতে পাবে। কিন্তু বুড়ো মানুহেৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাব ক্ষমতা ক্ষীণ ও শিথিল হয়ে যায়। তাব কাৰণ বাট বা সম্ভব বছৰ বয়সে মানুহেৰ মস্তিষ্কেৰ ক্ষমতা শতকৰা দশ ভাগ হ্ৰাসপ্ৰাপ্ত হয়। এত কোষেৰ ধ্বংস হয় যে মস্তিষ্কেৰ ক্ষমতা কমে যায়। এই হল মানুহেৰ শৰীৰেৰ ভেতৰকাৰ অবশ্যস্বাৰী পৰিবৰ্তন-চক্ৰ। আমবা একটা চিতা জ্বলতে দেখে ভয় পোয়ে বাই। বলে উঠি, ‘গুৰে। চিতা জ্বলছে, মৃতদেহ গুড়ছে।’ আমবা যদি নিজেদেৰ ভেতৰে তাকাই তবে দেখতে পাব, এক নম, হাজাৰ চিতা নিবন্তৰ জ্বলছে। হাজাৰ হাজাৰ কোষেৰ মৃত্যু হচ্ছে, হাজাৰ হাজাৰ কোষেৰ জন্ম হচ্ছে।

জন্ম এবং মৃত্যু—দুই-ই এক সাথে চলেছে। একটি দিকে শ্মশান, তো অন্য দিকে প্রসূতিগৃহ। এক দিকে চিতা সাজানো হচ্ছে, মৃত্যুদহ পুড়ছে। অন্য দিকে নতুন নতুন চেহারা জন্মাচ্ছে, সূর্যকিরণের প্রথম স্পর্শ পাচ্ছে। বিচিত্র এই শব্দ। আমরা কেবল বাইরে থেকে একে দেখি। বাইরে থেকে আমরা শ্মশানও দেখছি, প্রসূতিগৃহও দেখছি। সজ্জাজাত শিশুকেও দেখছি, মৃত্যুকবলিত স্বপ্নকেও দেখছি। সব কিছুই বাইরে থেকে দেখছি, কিন্তু ভেতর থেকে কিছুই দেখছি না। ভেতরে এক পবিবর্তনের চক্র চলেছে। সমস্ত কিছু অনববত বদলে যাচ্ছে। তবুও কি আপনার কোন পবিবর্তন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। ভেতরে প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষ চলেছে। জন্ম এবং মৃত্যুর কাজ, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কাজ অবিরাম চলেছে। এ সবই স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে। যদি আপনি সঙ্কল্প করেন তবে এই চক্রের পবিবর্তন ঘটাতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যা হতে চান তাই হতে পারেন। এসব কিছুই ঘটে প্রাণের স্তরে।

দুই বস্তু আছে—আত্মা আর প্রাণ। এক আত্মশক্তি, অপর প্রাণশক্তি। এক হল প্রাণবল, অপর হল আত্মবল। আমাদের লক্ষ্য—আত্মোপলব্ধি। আমরা আত্মার মূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে চাই, আত্মাকে পেতে চাই, মূল চেতনা পর্যন্ত পৌঁছতে চাই। এই হল আমাদের মূল লক্ষ্য। এব আগে আসে প্রাণ। প্রাণের স্থান এব আগে। আত্মা পর্যন্ত কে পৌঁছতে পারে? যে প্রাণবান, যে শক্তিশালী, সে-ই শুধু আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যাব ইচ্ছাশক্তি প্রবল সে আত্মা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যাব মনোবল তথা সঙ্কল্পবল দীণ, যাব ইচ্ছাশক্তি তথা প্রাণশক্তি দীণ, যে বীৰ্যহীন সে কখনও আত্মাকে লাভ করতে সমর্থ হয় না। আত্মাকে লাভ করার জন্য প্রাণকে শক্তিশালী করা বিশেষ প্রয়োজন। যা জগতের স্তর তাই প্রাণের স্তরে চলনশীল লোকের চলাব পথ। তা প্রাণকে শক্তিশালী করে। প্রাণ আমাদের বিদ্যুৎশক্তি। সব প্রাণীর মধ্যেই এই শক্তি আছে। এমন কোন

প্ৰাণী নেই যাব মध्ये এই শক্তি অনুপস্থিত। আমাদেব সমস্ত সক্রিয়তা চঞ্চলতা, উন্মেষ ও নিমেষ, কথা ও চিন্তা, গতি ও দীপ্তি, তথা আকৰ্ষণ— এ সমস্তই প্ৰাণেব আধাবে ঘটে, বিদ্যুৎশক্তিৰ আধাবে ঘটে। বিদ্যুৎ-শক্তি এ সমস্ত ক্ৰিয়া সম্পাদন কৰে। আমাদেব শৰীৰে এই বিদ্যুৎ মজুত আছে। তাকে আমবা তৈজস শৰীৰ বলতে পাৰি, প্ৰাণ বলতে পাৰি। বিদ্যুৎ বৃদ্ধি কৰাব অৰ্থ, মনোবল বৃদ্ধি কৰা। যাব বিদ্যুৎ তীব্ৰ হয় তাব মনোবল বৃদ্ধি পায়। যাব বিদ্যুৎ ক্ষীণ হয় তাব মনোবল হ্ৰাস পায়।

‘মানুৰেব ব্ৰহ্মচৰ্য পালন কৰা বাঞ্ছনীয়’—এটা কেবল কথাৰ কথা নহ। এব পেছনে মস্ত বড় বহুস্ত আছে। আমাদেব ভেতৰে একটি বিদ্যুতেব প্ৰতিষ্ঠান বা পাণ্ডৰাব হাউস আছে। তাব অবস্থিতি পৃষ্ঠবজ্জ্বৰ অন্তিম বিন্দুতে। পৃষ্ঠবজ্জ্ব যেখানে হয় সেখানে একটি কেন্দ্ৰ আছে। পেছনেব দিকে কোমৰেব কাছে এই কেন্দ্ৰ অবস্থিত। সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। সেটি একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্ৰ বিশেষ। যে ব্যক্তিৰ বিদ্যুৎশক্তি উৰ্ব্বৰগামী হয় অৰ্থাৎ ওপৰেব দিকে উঠতে থাকে সে বিপুল শক্তিৰ অধিকাৰী হয়। ব্ৰহ্মচৰ্যেব সাধনা দ্বাৰা লোকে নিজেব ওজ্জ্বলতাকে উৰ্ব্বৰগামী কৰে মস্তিষ্ক পৰ্যন্ত নিয়ে যায়। তাব শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাব প্ৰাণ শক্তিশালী হয়। তাব মনোবল দৃঢ় হয় এবং ব্যক্তিৰ পৰাক্ৰম এতটো ক্ষুবিত হয় যে সে যা কল্পনা কৰে তাই সিদ্ধ হয়। প্ৰাণ গেলেও কখনও সে তাব সঙ্গত থেকে চ্যুত হয় না। যাব প্ৰাণধাৰা কামনা ও বাসনাৰ ফলে নিচেব দিকে প্ৰবাহিত হতে থাকে তাব মনোবল বমে যায়, চেতনা ক্ষীণ হয়, সঙ্গত ভঙ্গ হয়, মন নিবাশৰ ভবে যায়। পদে পদে পদাঙ্কলন ঘটে, কোন ক্ষেত্ৰে এগিষে যেতে পাৰে না। এই কাৰণে ব্ৰহ্মচৰ্য, বাক্যেব সংযম, মনেব সংযম এবং একাগ্ৰতাৰ সাধনা, এ সমস্তই প্ৰাণশক্তিকে উৰ্ব্বৰগামী কৰাব উপায়। এতে মনোবল বৃদ্ধি পাব এবং ষৈৰ্য দৃঢ় হয়। এ অধ্যাত্ম নহ, কিন্তু অধ্যাত্মতে পৌছাব উপায়। ঠিক নৌকোৰ মত। এ সবই

নৌকো বিশেষ। এটা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে পৌঁছাবার উপায় মাত্র। আমাদের গতি কোন্ দিকে? এই সাধনাব মাধ্যমে আমরা যেখানে পৌঁছতে চাই সেখানেই পৌঁছতে পাবি। সঙ্কল্প কবলাম, আব অধ্যাত্মেব সাধনা হয়ে গেল—ব্যাপাবটা ঠিক এ বকম নয়। বে ব্যক্তি লক্ষ্য স্থিব কবতে পাবে, লক্ষ্য স্থিব কবতে জানে, সে-ই শুধু সংকল্প কবাব অধিকারী। শিকারী যে লক্ষ্য সন্ধান কবে তাতে তাব সঙ্কল্প কবতে এবং একাগ্র হতে হয়। শিকারীব কি একাগ্রতাব অভাব হয়? লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতাব অংশ গ্রহণকারীব কি একাগ্রতাব অভাব হয়? তাহেব একাগ্রতাব অভাব হয় না। সম্পূর্ণ একাগ্রতা হলে তবে লক্ষ্য-বস্ততে তীব লাগতে পাবে। যোদ্ধাহেবও সঙ্কল্প প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চার্চিল সঙ্কল্পেব প্রতীকস্বরূপ ‘ভি’ চিহ্ন দিহেছিলেন। তিনি প্রত্যেক যোদ্ধাহে বলেছিলেন, ‘ভি’-কে আগনি সর্বদা মনে বাখবেন। আমবা জিতব।’ ঐ ‘ভি’ জেতাব দৃঢ় সঙ্কল্পেব চিহ্ন। সৈনিকেব যতটা দৃঢ় সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা হতে পাবে তন্ত লোকেব তা হতে পাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পাবে এই সঙ্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা কি আত্মোপলব্ধি? তা কি অধ্যাত্ম? তা নয়। ওটা উপায় মাত্র। সঙ্কল্প, ইচ্ছাশক্তি, প্রাণশক্তি, মনোবল, একাগ্রতা—এ সবই এক একটি উপায়। এখন এই সাধনকে আমি কোন্ দিকে নিবে যাচ্ছি, কোন্ দিকে প্রবাহিত কবছি সেটা উদ্দেশ্যেব ওপবে নির্ভব কবে। আত্মাব দিকে এগিয়ে যাওয়াব জন্যও এব ব্যবহাব হতে পাবে। আত্মাব অভিমুখে এব প্রয়োগ হতে পাবে। এ সাধন মাত্র, অর্থাৎ উপায় বা উপকরণ মাত্র। আপনি তাকে কোন্ দিকে প্রয়োগ কববেন তা আপনাব উদ্দেশ্যেব ওপবে নির্ভব কবে।

জপও এক সাধন। তা সাধন বা উপায়, সাধনাব উদ্দেশ্য বা সাধ্য নয়। জপ প্রাণশক্তিব এক প্রকাব প্রয়োগ মাত্র। এতে শব্দ এবং মন দুহেব সংযোগ হয়। শব্দ এবং মনেব সমুচিত যোগ হলে এক বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয়। আমরা কথা বলি। কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গে

বিদ্যাত্মক তবঙ্গ উৎপন্ন হয়। আমবা চিন্তা কবি। আমাদেব চিন্তাব
সাথে সাথে বিদ্যাত্মক তবঙ্গ উদ্ভব হয়। এই সব বিদ্যাত্মক-তবঙ্গ-ব
বিস্তারকৰ প্ৰভাব হয়।

বড়, শব্দ, মন এবং উচ্চারণ—এই চাব মুখ্য বস্তু। আমাব চিন্তন
তথা আমাব জীবনেব সঙ্গে বড়োব গভীৰ সম্বন্ধ। বড়ো দ্বাৰা চিকিৎসা-
পদ্ধতি আজও প্ৰচলিত আছে। ‘কালাব খেবাপি’ বা বৰ্ণ চিকিৎসা
এখনও চালু আছে। এক চিকিৎসা পদ্ধতিৰ নাম ‘কসমিক বে খেবাপি’
বা বিশ্বকিৰণ চিকিৎসা। এবও বড়োব সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। বড়ো এবং
সূৰ্যকিৰণ উভয়েৰ সাথে এৰ সম্বন্ধ আছে। সূৰ্যেৰ আলোৰ সঙ্গে এব
সম্বন্ধ। বড়ো আমাদেব শবীৰ এবং মনকে নানা ভাবে প্ৰভাবিত কৰে।
তাতে বোগ সাৰে, তা সে বোগ শাবীৰিক বা মানসিক যাই হোক।
মানসিক বোগেৰ চিকিৎসাতেও বড়োব বিশিষ্ট স্থান আছে। উন্মাদ
বোগেৰও বড়োব মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পাৰে। বড়োব সামান্য বিকৃতি
হলে মানুষ পাগল হযে যেতে পাৰে। বড়োৰ পুৰ্ণি হলে লোক সুস্থ হয়।
শবীৰে বড়োৰ ঘাটতি হলে অনেক বোগেৰ উৎপত্তি হয়। ‘কালাব
খেবাপি’ বা বৰ্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিৰ সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাণু খেকে
বোগেৰ উৎপত্তি হয় না। বড়োৰ ঘাটতি খেকেই বোগেৰ জন্ম হয়। যে
বড়োৰ ঘাটতি হযেছে তাকে পূৰণ কৰে দাও, বোগী সুস্থ হৰে, বোগ
নিবাময় হৰে। বোগ হওয়া বা না হওয়া, মানুষেৰ সুস্থ থাকা বা না
থাকা, সবই বড়োৰ আধাবে ঘটে।

আমাদেব চিন্তাব সাথেও বড়োব সম্বন্ধ আছে। যখন মানুষেৰ মন
কুচিন্তা বা অনিষ্টকৰ চিন্তায় পূৰ্ণ, যখন সে অন্তৰ্ভকৰ চিন্তা কৰে,
তখন ঐ সব চিন্তাব পৰমাণু কৃষ্ণ বৰ্ণ হয়। তাৰ লেণ্ডা বা কৰ্মবন্ধনেৰ
কাৰণ কৃষ্ণ বৰ্ণ হয়। যদি সে সৎ, হিতকাৰী বা শুভ চিন্তা কৰে
তবে তাৰ পুদগল হলুদ বড়োব হতে পাৰে, আৰাব লাল বা সাদাও হতে
পাৰে। তখন তেজোলেণ্ডা, পদ্ম লেণ্ডা বা শুক্ল লেণ্ডা হতে পাৰে।
অসৎ চিন্তাব পুদগলেৰ বৰ্ণ কালো, সৎ চিন্তাব পুদগলেৰ বৰ্ণ হলুদ, লাল

বা সাদা। চিন্তাব সঙ্গ বৰ্ণেব কত বড় সম্বন্ধ। যে বকম চিন্তা তাব সেই বকম বঙ।

শবীবেব সঙ্গ বঙেব গভীৰ সম্বন্ধ। প্ৰত্যেক লোকেব শবীবেব আশেপাশে বঙেব এক আভামণ্ডল আছে। তাতে অনেক বঙ হতে পাবে। কাবও আভামণ্ডলেব বঙ কালো, কাবও নীল, আবাব কাবও লাল বা সাদা হয়। আবাব কাবও নানা বঙেব আভামণ্ডল হতে পাবে। আপনাৰ চোখ সে বঙ দেখতে পায় না। কিন্তু তা অবশ্যই আছে। এমন কোন লোক নেই যাব চাবপাশে আভামণ্ডল নেই। মানুষেব আভামণ্ডলেব প্ৰভাব হয় তাব নিজেব ওপৰে। আবাব অন্তেব ওপৰেও প্ৰভাব হয়। আপনি কোন লোকেব কাছে গিয়ে বসেন। বনাব সঙ্গ সঙ্গ আপনাৰ মনে এক পৰিবৰ্তন হয়। আপনাৰ মনে হয় আপনি এক অপূৰ্ব শাস্তি অনুভব কৰেহেন। আপনাৰ মন আনন্দময় হয়, আব আপনাৰ অন্তৰেব অন্তঃস্থলে এক মধুৰ সঙ্গীত হতে থাকে। আপনি অন্য এক লোকেব কাছে গিয়ে বসেন। অকাৰণে আপনাৰ মন উদাস ও উদ্ভিগ্ন হৰে পড়ে। মনেব মধ্যো ক্ষোভ ও সম্ভাপেব উত্তৰ হয়। সেখান থেকে তাতাতাডি উঠে যাবাব ইচ্ছা হয়। এসব কেন হয় ? ভিন্ন ভিন্ন লোকেব পাশে বসলে ভিন্ন ভিন্ন বকম ভাবনা ছাৰা আমাদেব মন আক্ৰান্ত হয়। এ বকম কেন হয় এবং কি কৰে হয় ? এব কাৰণ হল, প্ৰত্যেক লোকেব নিজ নিজ আভামণ্ডল বা আভাবলয় আছে। সামনে যিনি বসে আছেন তাঁব আভামণ্ডল বা আভাবলয়েব যে বঙ তাব ছাৰা পাশে যে লোক বসে আছে সে প্ৰভাবিত হৰে। সে ইচ্ছা কৰক বা না কৰক, সে সেই বঙ ছাৰা প্ৰভাবিত হৰে। যে লোকেব আভামণ্ডল সাদা, লাল, নীল বা হলুদ বৰ্ণেব, তাব পাশে এসে বসলে মন শান্ত হৰে বাব। শান্তিতে অন্তৰ পূৰ্ণ হয়। যাব আভামণ্ডল বিকৃত, কৃষ্ণবৰ্ণ পুদ্গলে নিৰ্মিত, তাব কাছে এলে মন অকাৰণ দুষ্টিচিন্তাব ভাবে ওঠে, উদাস ভাব ও উদ্বেগে পূৰ্ণ হয়, আব মনেব মধ্যো ঈৰ্ষা-দ্বেষ-অসং ভাবনা আসতে থাকে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাব, বঙ আমাদেব প্ৰভাবিত

কৰে থাকে ।

এক হল বঙ, আৰু এক শব্দ । আমাদেৰ জীৱনে শব্দেৰ প্ৰভাৱ পড়ে । মনেৰ ওপৰেও শব্দেৰ প্ৰভাৱ হয় । শব্দেৰ স্থূল প্ৰভাৱেৰ সঙ্গত আমাদেৰ পৰিচয় আছে । একবাৰ স্বামী বিবেকানন্দকে এক ব্যক্তি বলেছিল, 'শব্দ নিৰ্ৱৰ্ণক । তাৰ প্ৰভাৱ বা অপ্ৰভাৱ বলে কিছু নেই । তা নিৰ্জীৱ পদাৰ্থ ।' বিবেকানন্দ শুনলেন, কিছুক্ষণ মৌন থেকে তিনি বললেন—'তুমি নিৰ্বোধ । বসে থাক ।' যানে একথা বললেন সে বেগে আগুন হয়ে গেল । তাৰ চেহাৰা বদলে গেল । তাৰ চোখ লাল হয়ে গেল । সে বলল—'আপনি এত বড় সাধু হয়ে আমাকে গাল দিলেন । কি কথা ব্যবহাৰ কৰছেন তাও ভেবে দেখলেন না ।' বিবেকানন্দ মুচকি হেসে বললেন—'তুমি এখনি বলছিলে, শব্দেৰ আৰাৱ কি প্ৰভাৱ । এখন নিজে এক 'নিৰ্বোধ' কথাটিতে এই পবিত্ৰাণ প্ৰভাৱিত ও ক্লুপ্ত হয়েছ ।'

শব্দেৰ ভেতৰে শক্তি আছে । তা মানুহকে প্ৰভাৱিত কৰে । আমি এতদৰ্শ তাৰ স্থূল প্ৰভাৱেৰ কথা বললাম । শব্দেৰ অনেক সূক্ষ্ম প্ৰভাৱ আছে । আজকাল শব্দেৰ দ্বাৰা চিন্তা হৰ্ষে থাকে । শব্দেৰ দ্বাৰা অপাৰেশন কৰা হয় । অপাৰেশনেৰ জন্তু কোন অস্ত্ৰেৰ প্ৰয়োজন হয় না । কোন উপকৰণেৰ প্ৰয়োজন হয় না । শব্দেৰ সূক্ষ্ম তৰঙ্গ আনে, আৰু তাৰ সাহায্যে চেৰা-ফাঁডাৰ কাজ হয় । শব্দেৰ দ্বাৰা, সূক্ষ্ম ধ্বনিৰ দ্বাৰা, কাপড় ধোলাই হয় । সূক্ষ্মতন ধ্বনিৰ দ্বাৰা হাঁৰা কাটা হয় । আগেকাৰ দিনে বলা হতো হীৰে দিৰে হীৰে কাটা হয় । এই সিদ্ধান্ত সবাই মানত । আজকাল সূক্ষ্ম ধ্বনিৰ সাহায্যে হীৰা কাটা হয় । যন্তু ঘূৰতে থাকে, ধ্বনিৰ সূক্ষ্ম তৰঙ্গ নিৰ্গত হতে থাকে এবং ক্ষণকালেৰ মধ্যে হীৰা কাটাৰ কাজ সম্পন্ন হয় । এই হল শব্দেৰ চমৎকাৰিতা । জপ এবং মন্ত্ৰেৰ চমৎকাৰিতা এৰ থেকেও বেশি ।

শব্দেৰ উচ্চাৰণ ছব বকম হতে পাৰে । কথা—হৃদয়, দীৰ্ঘ, শূণ্ড, সূক্ষ্ম, তাত্তি সূক্ষ্ম এবং পবন সূক্ষ্ম । মন্ত্ৰবিদ আচাৰ্যগণ বলেন, শব্দেৰ হৃদয়

উচ্চারণ পাপ নাশ করে। দীর্ঘ উচ্চারণে শ্রীবুদ্ধি ও শ্রী লাভ হয়, আব
 দ্রুত উচ্চারণে জ্ঞানবুদ্ধি হয়। আবও তিন প্রকার উচ্চারণ আছে—
 সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং পবন সূক্ষ্ম। 'ওগুলি শুভ সমাপ্তি আনে, ব্যক্তিব
 সঙ্গে ধ্যেযেব সংযোগ করে। আপনি দৃষ্টান্তস্বরূপ 'অর্হ' শব্দটি নিন।
 ঐ কথাটি আপনি উচ্চারণ করেন। তাব এক হ্রস্ব উচ্চারণ, এক দীর্ঘ
 উচ্চারণ হয়। আব আছে দ্রুত উচ্চারণ। আবাব সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম এবং
 পবন সূক্ষ্ম উচ্চারণও হয়। পবন সূক্ষ্ম এসে আপনি অনুভব করেন
 আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছেন, অর্হৎকে অনুভব করতে শুরু
 করেছেন। এই ছয় প্রকার উচ্চারণের প্রভাব বিভিন্ন বকম হয়।
 শব্দের ছয় প্রকার শক্তি আমাদের জানতে হবে। শব্দের অর্থ আব তাব
 উচ্চারণ জানতে হবে।

চতুর্থ বস্তু হল মন। মনের সঙ্গে শব্দের সংযোগ করতে হবে। যে
 শব্দ আমবা জপ করছি তাব সাথে মনের সংযোগ করতে হবে। এ
 সবেব সমুচিত সংযোগ হলে জপেব শক্তি উৎপন্ন হয়। কেবল নৌকো
 দিয়ে কাজ হবে না। কেবল মালা বোবালেই কোন কাজ হবে না।
 নৌকো দিয়ে নদী পার হতে হলে নৌকো ছাড়া আব কি কি জিনিস
 দরকার তা আমাদের জানতে হবে, বুঝতে হবে। জপেব সঙ্গে আব
 কি কি বস্তু প্রয়োজন তাও আমাদের বুঝতে হবে। 'গমো অবহস্তান'
 অতিশয় শক্তিশালী মন্ত্র—এ কথা খুবই সত্যি, কিন্তু তাব উচ্চারণ যদি
 ঠিক না হয় তবে ঐ মন্ত্র কি হবে ফল দেবে? তাব উচ্চারণ কি
 উদ্দেশ্যে কি বকম হওয়া উচিত তা যতদূর আমবা জানতে না পাবি
 সে পর্যন্ত আমাদের অন্তত ও দোষেব জন্ম আমবা মন্ত্র এবং জপ থেকে
 লাভবান হতে পাবি না, অথচ আমবা সমস্ত দোষ মন্ত্র ও জপেব ওপবে
 চাপিয়ে দিই। আমবা বলে বসি—'মন্ত্র থেকে কোন ফল হয় না।'
 শব্দের উচ্চারণেব দ্ব্যযকে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত জিনিস
 জপেব জন্ম অত্যন্ত আবশ্যক।

জপেব স্বরূপ কি? ধ্যেযেব সাথে এক হবে বাওয়া হল জপ।

মহৰ্ষি পতঞ্জলি চিন্তাবৃত্তিনিবোধকে ধ্যান বলে স্বীকাৰ কৰেছেন। চিন্তেৰ বৃত্তিসমূহেৰ নিবোধ ধ্যান। ধ্যানেৰ সম্বন্ধ চিন্তেৰ সঙ্গ। জৈন আচাৰ্য বলেছেন—‘‘ধ্যান ‘ত্ৰিবিধম্’, অৰ্থাৎ ধ্যান তিন প্ৰকাৰ—কাব্যিক ধ্যান, বাচিক ধ্যান এবং মানসিক ধ্যান। এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন পৰম্পৰা। শব্দীবেৰ শিথিলীকৰণ, শব্দীবেৰ স্থিৰতা, তাৰ নাম—কাব্যিক ধ্যান। বচনকে ধ্যেবেৰ সঙ্গ বোগ কৰা, বচন এবং ধ্যেৰ উভয়েৰ সমন্বয় ঘটানো, একত্ব সাধন কৰাৰ নাম বাচিক ধ্যান। বাচিক ধ্যান বচনেৰ মাধ্যমে হয়। বচনেৰ মাধ্যমে আমবা এমন একাগ্ৰতা প্ৰাপ্ত হই, ধ্যেৰ বস্তুতে এত লীন হব যাই যে আমবা এবং আমাদেৰ ধ্যেবেৰ মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।

আপনি ‘গমো অবহস্তাং’ এই মন্ত্ৰ জপ কৰেন, কিন্তু যত দিন ঐ মন্ত্ৰ আপনাৰ মস্তিষ্কে যথার্থ প্ৰতিষ্ঠিত না হব, আৰ যত দিন আপনাৰ এ বকম অল্পভূতি না হব যে, ‘আমি স্বয়ং অৰ্হতে পৰিণত হক্সি’ ততদিন পৰ্যন্ত ‘গমো অবহস্তাং’ এই মন্ত্ৰ থেকে আপনাৰ ফলপ্ৰাপ্তি হব না। হ্যাঁ, এটুকু লাভ অবশ্যই হব, উচ্চাৰণ দ্বাৰা যে তবঙ্গ উৎপন্ন হয় তাৰ দ্বাৰা প্ৰাণশক্তিৰ কিছু বিকাশ হব। কিন্তু জপেৰ দ্বাৰা আপনাৰা অৰ্হৎ ৰূপে যে পৰিণতি আনতে চেৰেছিলেন, যে পৰিণাম চেৰেছিলেন, তা সম্ভব হব না। এই বড় লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে আপনি সামান্য লাভ প্ৰাপ্ত হবেন। অনেক বাৰ এ বকম হয়—আমবা মহৎ ধ্যেযকে উদ্দেশ্য কৰে চলতে থাকি, মহৎ বস্তু সামনে বেখে চলতে থাকি, কিন্তু এব মধ্যে ছোটখাটো লাভ প্ৰাপ্ত হলে আমবা মনে কৰি আমাদেৰ উদ্দিষ্ট লাভ মিলেছে। এটা মন্ত্ৰ আশঙ্কাৰ কথা। বিকাশেৰ পথে এই বিপদেৰ আশঙ্কা। আমবা মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে চলতে থাকি। আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য, সেই আদৰ্শ নিয়ে আমবা চলি। মাঝখানে সামান্য কিছু পেয়ে বাই। তাকেই সব কিছু মনে কৰে আমবা এগিয়ে যাওঁবাৰ চেষ্টা ছেড়ে দিই। এই সামান্যতেই আমবা সন্তুষ্ট হব থাকি। এই সন্তোষ সমূহ আশঙ্কাৰ কাৰণ। আমাদেৰ সন্তুষ্ট হওয়া

উচিত নহ। পথ চলতে চলতে মিলে যাওয়া সাথীৰ মত এই সব ছোট-খাট পাণ্ডাগুলি আমাদেব সাধনাৰ পথে যাত্ৰাসহচৰ মাত্ৰ। এক সাথী মিলন। তাৰ সৰ্গে বাতৰোৰ পান্থশালাৰ থাকলাম, আলাপ কৰলাম, মনোবঞ্জন কৰলাম। যদি আমবা তাকে আমাদেব গন্তব্যস্থল মনে কৰে সেখানেই থেৰে যাই তৰে আমবা কোনদিনই আমাদেব উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছতে পাবৰ না। এই হল সাধনাৰ পথে বিবৰ বিপদ। এ সমস্তই প্ৰাণবিদ্ধাৰ খেলা, এৰা মধ্যপথে প্ৰাপ্ত সহযাত্ৰী মাত্ৰ। মধ্যপথে এসে আমাদেব সাথে এৰা মিলিত হয় এবং মনোবঞ্জন কৰে। কিন্তু ওগুলি আমাদেব অভীষ্ট প্ৰাপ্তি নহ।

আমাদেব ধ্যেয় হৰে অৰ্হতে পৰিণত হওয়া। অৰ্হৎ বাঁতবাগ বা নিবাসক্ৰ। যাৰ মধ্যে সনস্ত অৰ্হতা, ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা বিকশিত হয় সে-ই অৰ্হৎ হতে পাৰে। তাৰ মধ্যে অবিকশিত কোন কিছু থাকে না। এই আত্মোপলব্ধিৰ নাম—অৰ্হৎ। আমাদেবও অৰ্হৎ হতে হৰে। এই জন্তই আমবা ‘গমো অৰ্হস্তাং’ এই মন্ত্ৰ জপ কৰে থাকি। এই মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ আগে আমাদেব মনে এই ভাবনা, এই সঙ্কল্প হওয়া প্ৰয়োজন যে ‘আমি অৰ্হৎ, আমি অৰ্হৎ’। আৰ জপ কৰাৰ সময় আমাদেব মনে এই ধাবণা হওয়া প্ৰয়োজন যে ‘আমি অৰ্হতে পৰিণত হচ্ছি, আমি অৰ্হতে পৰিণত হচ্ছি।’ এই ধাবণা, এই ভাবনা কৰে নিতে হৰে। তাৰ পৰে আমবা ‘গমো অৰ্হস্তাং’ এই মন্ত্ৰ জপ কৰতে পাৰব। আমি অৰ্হৎকে নমস্কাৰ কৰছি না, আমি নিজেই অৰ্হতে পৰিণত হওয়াৰ পথে অগ্ৰসৰ হচ্ছি। অৰ্হতেৰ সম্পূৰ্ণ মূৰ্তিচিত্ৰ এমনভাবে আমাদেব মস্তিষ্কে স্থিৰভাবে প্ৰতিষ্ঠিত হৰে যাবে, আৰ তাৰ আশেপাশে আমাদেব ধ্বনি চলতে থাকবে এবং সেই শব্দ-তবজ বাস্তবে অৰ্হতেৰ ৰূপে আমাদেব পৰীয়েব পৰিবৰ্তন ঘটতে শুক কৰবে। আমি অৰ্হতেৰ ৰূপে বদলে যেতে থাকব আৰ কিছু দিনেৰ মধ্যেই জ্ঞানতে পাৰব যে বাগ, দ্বেব ও বাসনা কমে যাচ্ছে, অৰ্হতা জেগে উঠছে, শক্তিসমূহ বিকশিত হচ্ছে। তখন বুঝতে হৰে জপ সম্যক ভাবে হচ্ছে। সব

কিছু সামগ্রী পাওয়া গেছে। নৌকো আছে, নাবিক ও দাঁড়ি পাওয়া গেছে। সমস্ত উপকরণ পাওয়া গেছে। নৌকো ঠিক খেয়া পাব কবছে। যদি উপকরণের কোন ঘাটতি বা বিফলতা থাকে, এবং আপনি জপের দোষ দিতে থাকেন, তবে জপ আপনাকে পেছনে ফেলে চলে যাবে।

একাগ্রতা

যাঁবা সাধনা করেন তাঁঁবা ধ্যেয়কে কল্পনা কবে নিয়ে মনকে তাঁঁব সঙ্গে সংলগ্ন করেন। মনকে এমন দৃঢ়ভাবে তাঁঁব সঙ্গে সংযুক্ত করেন, যাতে ঐ সংযোগ কোনক্রমে শিথিল না হয়। যদি কখনও কখনও মন ধ্যেয় থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তাঁঁব সামনে কোন বিকল্প এসে যায়, তবে জাগরক সাধক মনকে তা থেকে বিচ্ছিন্ন কবে নিয়ে তাঁঁব সমগ্র শক্তিব দ্বাৰা ধ্যেয়কে দিকে চালিত করেন। তখন মন ধ্যেয়কে সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই ধাবাবাহিক জ্ঞান একই দিকে একই ধ্যেয়কে উদ্দেশ্যে চালিত হবে। সৰ্বদা নিববচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকবে। মধ্যপথে যদি কোনও ছেদ ঘটে তবে তখনই সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এই হল মনের সমাধি, এব নাম মনের একাগ্রতা। যখন এই একাগ্রতাৰ আমবা সিদ্ধ হয় তখন ঐ অবস্থায় স্থিতিকালে আমবা বিভিন্ন সূক্ষ্ম দৃশ্যের আভাস পাই। অনেক বকম সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে পাই। জ্যোতিৰ দর্শন হয়। সূক্ষ্ম লোকে বিচরণকারী আত্মার দর্শন মেলে। স্থূল জগতের অতীত অনেক প্রকার শব্দ শোনা যায়। স্থূল জগতের অতীত রূপ দেখা যায় এবং অনুভূতি লাভ হয়। আগাদের অনুভূতিৰ জগৎ বদলে যায়। এই বকম স্থিতিতে আনন্দের অনুভূতি হয়।

।বস্তু তা কোন উৎকৃষ্ট নকলতা নয়, ।বাবা চব্বম নামাধ নয়। তবে তা আত্মবিকাশের দিকে আমাদের এক পদক্ষেপ। সেখানে পৌঁছলে মন আব ফিরে আসতে চাইবে না। মন আব নিচে নেমে আসতে চাইবে না। এটা নিশ্চিত সত্য।

ঐ স্থিতি প্রাপ্ত হলে উৎক্রমণ হতে থাকে। আমাদের জীবনে পরিবর্তন ঘটেতে থাকে। ভক্ত কইদাস মস্ত বড় সাধু ছিলেন। জাতিতে তিনি ছিলেন চামাৰ। তিনি পবম আত্মজ্ঞানী সাধক ছিলেন। তিনি কাশীতে বাস কবতেন এবং নিজে নিজেই সাধনা কবতেন। তিনি ছোট এক ঝুপড়িতে থাকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিল এক ছোট একটি পবিবার ছিল। তিনি জুতো সেলাই কবতেন এবং তা থেকে যা পেতেন তাই দিয়ে তাঁর সংসার চলত। ঐ কাজ থেকে যখনই নিবৃত্ত হতেন তখনই সাধনায নিমগ্ন হয়ে যেতেন। একদিন এক সাধু কইদাসের সঙ্গে দেখা কবতে এলেন। তিনি কইদাসের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রসিদ্ধি সব্বদে অনেক কথা শুনেছিলেন। এসে তিনি দেখে ভাবলেন—‘আবে। ইনি এমন দবিত্র অবস্থায থাকেন। এত বড় সাধু, অথচ এত দবিত্র। এ ববম ফুটোফাটা ঝুপড়িতে থাকেন আব জুতো সেলাই কবেন। এঁর কাছে কিছুই নেই।’ তিনি কইদাসের সঙ্গে দেখা কবলেন। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম কবে বললেন—‘মহাবাজ। আমি আপনাকে কিছু ভেট দিতে এসেছি। আপনার অবস্থা দেখে আমাব প্রাণ কাঁদছে। আমি আপনাকে এই পবশ পাথব দিচ্ছি। আপনি এটি গ্রহণ ককন। আপনি এববম হীন অবস্থায় আব থাকবেন না, সচ্ছল অবস্থায় জীবনযাপন ককন।’ কইদাস বললেন—‘ভাই। আমাব পবশ পাথবেব কোন প্রয়োজন নেই। আমি বেশ ভাল অবস্থায় আছি। আমাব কোন অভাব নেই। জীবনধারণেব জ্ঞাত্র যা প্রয়োজন সে সবই আমাব আছে। আমাব মনে পূর্ণ সন্তোষ আছে। যাব মনে অসন্তোষ আছে তাকে ঐ পবশ পাথব দাও। আমি পূর্ণ সন্তুষ্ট। আমাব পবশ পাথবেব কোন প্রয়োজন নেই।’

সাধু পবশ পাথৰ তাঁকে দেওঘাৰ জন্তু আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰতে লাগলেন। কইদাসও ‘না, না’ কৰতে লাগলেন। তিনি নেবেন না, আৰু সাধুও পবশ পাথৰ তাঁকে না দিযে সেখান থেকে যাবেন না। দুজনৰ মध्ये অনেকক্ষণ ধৰে জেদাজেদি হতে থাকল। শেষমেৰ কইদাস বললেন—‘বেশ, তোমাৰ যখন এতই আগ্ৰহ তখন ঐ পবশ পাথৰ এই বুপডিৰ চালাৰ কোথাও গুঁজে বেখে যাও।’ সাধু চালাৰ পবশ পাথৰ গুঁজে দিযে চলে গেলেন।

কইদাসেৰ জীৱনেৰ ধাৰা ঠিকই চলতে থাকে। তাঁৰ লাগসাও ছিল না, আকাজক্ষাও ছিল না। জীৱনযাত্ৰাৰ জন্তু যা প্ৰয়োজন তা তাঁৰ ছিল। তাঁৰ কোনও অসন্তোষ ছিল না। তাঁৰ সামনে এমন কোন সমস্যা ছিল না যাৰ সমাধানেৰ জন্তু পবশ পাথৰ দৰকাৰ হবে। সতিহই কোন সমস্যা ছিল না। তিনি তো সেই জিনিস পেয়ে গিষেছিলেন যা পেলো পবশ পাথৰেৰ আৰু কোনও মূল্য থাকে না।

কয়েক মাস চলে গেল। সেই সাধু আৰাৰ কইদাসেৰ কুটিৰে ঘূৰে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন—এখন সন্ত কইদাসেৰ বাঙিতে কত আডম্বৰ দেখব। কত ঐশ্বৰ্য, কত সুন্দৰ প্ৰাসাদ, কত ৰাজকীয় আডম্বৰ দেখতে পাব। উনি তো সাধু হযেছেন, সন্ন্যাসী হযেছেন, কিন্তু ৰাজকীয় হালচালেৰ মোহ যায় নি। তিনি এসে দেখলেন সেই ফুটো-কাটা বুপডিহই আছে, আৰু ভক্ত কইদাস আগেৰ মত বসে জুতো সেলাই কৰছেন। ‘আবে। এ কি ? উনি কি পবশ পাথৰ ব্যবহাৰই কবেন নি। ব্যবহাৰ কৰলে আজ এই দশা থাকত না। জুতো সেলাই কৰাৰ অবস্থা থাকত না আজ। ইনি যেমন অবস্থায় ছিলেন ঠিক তেনে অবস্থায় এখনও আছেন।’

বিতৰ্কৰ বিষয়। যাঁৰ কাছে পবশ পাথৰ আছে তিনি কি এমন দাবিদ্ব্যৰ জীৱন যাপন কৰতে পাবেন ? যাঁৰ কাছে পবশ পাথৰ আছে তিনি কি জুতো সেলাইষেৰ ৰাজ কৰতে পাবেন ? যাঁৰ কাছে পবশ পাথৰ আছে তিনি কি সামান্য শুকনো কটি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পাবেন ?

কখনই তা সম্ভব নহ। লোকে তো পবশ পাথৰেৰ নামে লালাষিত হয়। কিন্তু যাঁৰ কাছে সেই পবশ পাথৰ আছে বা এক মুহূৰ্তে লোহাকে সোনা কৰতে পাৰে, যাঁৰ হাতে লোহাকে সোনা কৰাব শক্তি এসেছে, তিনি কি থেকে কি হয়ে যান। তাঁৰ মাটিতে পা পড়ে না, তিনি চলেন না, আকাশে ওড়েন। কেউ আবার এই বকম হয়।

কোন লোক এমনও হয় যে তাৰ পবশ পাথৰ মিলেছে, পবশ পাথৰ তাৰ সামনে পড়ে বয়েছে, কিন্তু তাৰ মনে চিন্তা আসে নি যে ‘আমি লোহাকে সোনা বানিয়ে নেব। পবশ পাথৰেৰ সাহায্যে আমি অনেক সম্পদ সংগ্ৰহ কৰব, উত্তম বাসগৃহ তৈৰি কৰে নেব, শৃঙ্খল বস্ত্ৰ পৰব’—এসব কিছুই সে স্বপ্নেও ভাবে নি। কইদাস কখনও ভাবেন নি, ‘পবশ পাথৰ পড়ে আছে, এখন আব আমাৰ জুতো সেলাই কৰাব দৰকাৰ কি আছে? যখন চাইব, একা যত চাইব সব কিছুই হতে পাৰবে।’ বৰং ভেবেছেন, ‘জুতো সেলাই থেকে আমি পৰম সন্তোষ অনুভব কৰছি। ভাঙ্গাচোৰা বুপড়িতে আমি পৰম সন্তোষ অনুভব কৰছি। শুকনো কটিতে পৰম আনন্দ আৰ আত্মতৃপ্তি অনুভব কৰছি। ফুটোকাটা বুপড়িতেই আমি সন্তুষ্ট আছি।’ এসবেৰ মূল কাৰণ কি। এই পৰম সন্তোষ কোথা এসেছে? তাৰ হেতু কি? এই পৰিবৰ্তন কেন আসে? যখন আমবা তাৰ কাৰণেৰ খোঁজ কৰি তখন জানতে পাবি যে ঐ পৰিবৰ্তন মানসিক সমাধিৰ স্তৰে হয়। ভক্ত কইদাস নিজেৰ মনকে সেই স্তৰে, সেই আনন্দেৰ ভূমিতে পৌঁছে দিবেছিলেৰ যেখানে পৌঁছলে সোনাৰ আনন্দ, উত্তম বাসগৃহ, উত্তম ভোজ ইত্যাদি সব কিছুৰ আনন্দ শেষ হয়ে যায়। সমস্ত আকৰ্ষণ শেষ হয়ে যায়। তাৰ আব মনে হয় না সেগুলি বড় জিনিস, বিশিষ্ট উপলব্ধি বা মূল্যবান বস্তু। তাৰ কাছে সমস্ত জাগতিক সম্পদেৰ মূল্য শেষ হয়ে যায়। এ কথা নিশ্চিত সত্য, জাগতিক বস্তুৰ মূল্য নিজেৰ কাছে শেষ হয়ে না গেলে কোন মানুষ ঐ বকম আচৰণ কৰতে পাৰে না। যতদিন তাৰ মনে পবশ পাথৰেৰ লোহাকে সোনা কৰবাৰ ক্ষমতা সম্বন্ধে মূল্যজ্ঞান

থাকবে, আব সোনা দিবে ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ কৰে অবস্থাপন্ন লোক হওঁয়াৰ মূল্যবোধ থাকবে, ততদিন সে এ বকম আচৰণ কৰতে পাবৰে না যে. সামনে পবশ পাথৰ পড়ে থাকলেও সে জুতে। সেলাই কৰবে, একটা শুকনো কটি খেৰে ফুৰাব নিৰুদ্ভি কৰবে। ঐ পৰিস্থিতিতে এ বকম হওঁবা সম্ভব নয়। ঐ বকম তখনই হতে পাবে যখন তাৰ চেয়েও বড় কোন আনন্দ লাভ তাৰ হয়। এই বকম এক ঘটনা ঘটেছিল। ১

এক ব্যক্তি এক সন্ন্যাসীৰ কাছে গিয়ে বলল—‘বাবা! আমাৰ খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দিন।’ সন্ন্যাসী বললেন—‘তোমাকে দেব এমন আমাৰ কি আছে। আমি তো সব কিছু ত্যাগ কৰেছি। তোমাকে কি দেব?’ লোকটি বলল—‘না, না, তা হৰে না। বড়ই আশা নিয়ে আপনাৰ কাছে এসেছি। নিবাশ হয়ে যিবে যাৰ না। কিছু না কিছু দিতেই হৰে।’ সে বড়ই জেদ কৰতে লাগল। সন্ন্যাসী ভাবলেন—‘বড়ই মুশকিল তো। আমাৰ কাছে এক দানাও খাদ্য নেই। এই বেচাৰিকে কি দেব? ও তো নিজেৰ জেদ ছাড়ৰে না দেখছি। কি কৰব?’ শেষমেশ সন্ন্যাসী বললেন—‘তাই! আমাৰ কাছে তো কিছু নেই। এই দিকে নদী আছে, তাৰ পাশে চলে যাও। আমি কালই ওখানে একটা পাথৰ ফেলে দিবেছি। ওটা পবশ পাথৰ। ওব ছোয়াৰ লোহা সোনা হয়। ঐ পাথৰ লোহাতে ছোঁয়াও, লোহা সোনা হয়ে যাবে। যাও, ঐ পাথৰ নিয়ে চলে যাও।’

পবশ পাথৰেৰ কথা শুনে লোকটি লালামিত হল। মন ভবিষ্যতেৰ কল্পনায় ভৰে উঠল। সে দৌড়তে দৌড়তে নদীৰ তীৰে গেল। পবশ পাথৰ দেখতে পেল। রোদে চকচক কৰছে। সে সেটা ভুলে নেওয়ার জন্ত হাত বাডাল। হঠাৎ অস্ত্র এক চিন্তা মাথায় আসতে তাৰ হাত মাঝপথে থেমে গেল। সে ভাবল, সন্ন্যাসী পবশ পাথৰ ফেলে দিল কেন? কেন ফেলে দিল? কোন লোক কি কখনও পবশ পাথৰ হাতে পেয়ে তা ফেলে দিতে পাবে? না, কখনও তা পাবে না। তবে কি এটা

নকল পবশ পাখব ? না, নকলও নয়। কিন্তু যদি আসলই হয় তবে সন্ন্যাসী এটাকে কেলে দিবেছেন কেন ? নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীব কাছে এব চেযেও বেশি দামী কোন বস্তু আছে, তাই তো তিনি এই কম মূল্যবান পাখব কেলে দিবেছেন। তাঁব কাছে যদি এব চেযে বেশি ভাল বস্তু থাকে তবে তিনি এই পবশ পাখব কখনও ছুঁড়ে বেলে দিতে পাবতেন না। সন্ন্যাসী তো আব সে বকম মূৰ্খ নন। সে কিবে এসে সন্ন্যাসীকে বলল—‘মহাবাজ। আমি পবশ পাখব চাই না।’ যে জিনিস পেবে আপনি পবশ পাখব কেলে দিয়েছেন আমাকে ‘সেই জিনিস দিন’ লোকটিব যুক্তি অতি সুন্দৰ।

এ কথা অত্যন্ত সত্যি যে পবশ পাখবেব চেযে বেশি মূল্যবান বস্তু না পেলে, হস্তগত না কবলে, কেউ পবশ পাখব ছুঁড়ে বেলে দিতে পারে না। তাব চেযে কোন মূল্যবান বস্তু পেলে তবে পবশ পাখবেব মূল্য শেষ হয়ে বায। আব তখন লোকে তা বেলে দিতে পারে। কইদাস পবশ পাখবেব চেযে অনেক বেশি মূল্যবান বস্তু আগেই পেযে গিয়েছিলেন বলে তাঁব পবশ পাখবেব ওপবে কোন আকৰ্ষণ ছিল না। কাজেই তাঁব মনেব আকৰ্ষণ তুচ্ছ বস্তুকে সবিয়ে দিবে মহৎ বস্তুব ওপবে কেন্দ্ৰিত হয়েছিল।

তেবাপছ ধৰ্মসঙ্ঘেব চতুৰ্থ আচার্য ছিলেন ত্ৰীমজ্জযাচার্য। তিনি মুনিৰ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এক বাব তিনি পালীতে এসেছিলেন। বাজ্জাবেব এক দোকানে তিনি অবস্থান কবলেন। তাঁব বয়স তখন খুব কম। সেখানে এক নটমণ্ডলী এসে উপস্থিত হল। তাবা দোকানটিব সামনেব ময়দানে তাদেব কাজ শুরু কবে দিল। বহু দৰ্শক সমাবেত হল। ‘নাটক আবম্ভ হল। এক ঘণ্টা ধবে অভিনব চলল, তাব পবে শেষ হয়ে গেল। দৰ্শকদেব মধ্যে একজন তাব সাথীকে বলল—‘তেবাপছ ধৰ্মসঙ্ঘেব ভিত্তি আবও একশ’ বছবেব জন্ম দাক্ষ দৃঢ় হয়ে গেল।’ ঐ লোকটি দ্বিজ্ঞাসা কবল—‘তুমি কি কবে সে কথা জানতে পাবলে ? কেমন কবে এ জ্ঞান লাভ হল ? কোন গল্প

কাঁদানোব তাল কবছ নাকি ?’ তখন প্ৰথম লোকটি বলল, ‘নাটক এক ঘণ্টা ধৰে চলল। নট বড সুন্দৰ অভিনয় কৰছিল। কিন্তু আমি নাটক একেবাবেই দেখি নি। আমি তো সামনেৰ দোকানে সমাসীন নবীন মুনিকে এক ঘণ্টা ধৰে দেখেছি। ঐ মূনি চোখ তুলেও এদিকে চেয়ে দেখেন নি। আমি এক দৃষ্টিতে ঐ মুনিকে দেখেছি। আমিও নাটক দেখি নি, আব ঐ মূনিও দেখেন নি। আমি ঐ মূনিৰ মানসিক একাগ্ৰতা দেখিছিলাম। যে সজ্জা এ বকম মূনি হয় সে সজ্জাৰ ভিত্তি দৃঢ় না হয়ে পাবে না।’

মূনিৰ এই বকম ভাবনা কি কৰে হল ? এই পৰিবৰ্তন কি কৰে এল ? এ বকম হওয়া কি স্বাভাবিক ? না, একেবাবেই না। প্ৰত্যেক লোকই এ বকম পৰিস্থিতিতে বস গ্ৰহণ কৰে। বুড়ো বা জোয়ান, বালক ব কিশোৰ, স্ত্ৰী বা পুৰুষ, বাই হোক না কেন, সব মানুহই আমোদ প্ৰমোদে বস পাৰ। সকলেৰ চোখই অভিনয় দেখাৰ জন্তু উৎসুক হয়। কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী এক মুহূৰ্তেৰ জন্তুও নাটকেৰ দিকে দৃষ্টিপাত কৰেন নি। কেন কৰেন নি ? তাৰ একটাই কাৰণ, যে ভূমিতে নাটক দেখা থকে আনন্দ পাওয়া যায় তিনি তা থকে অনেক ওপৰে উঠে গিয়েছিলেন। বাছ আনন্দেৰ স্ৰোত তাঁৰ মনকে আকৰ্ষণ কৰত না। তিনি তো অনেক বড নাটক দেখিছিলেন। কাজেই নটেৰ অভিনীত নাটক তাঁৰ কাছে অৰেক্সো এবং অনাবশ্যক বস্তুতে পৰিণত হৈছিল।

এটা সনাতন সত্য, কোন লোক শ্ৰেষ্ঠ বস্তু প্ৰাপ্ত হলে সামান্য বস্তুসমূহেৰ ওপৰে তাৰ আকৰ্ষণ কমে যায়। কোন লোক কটি খাচ্ছে। এমন সময় তাৰ সামনে মিষ্টি এসে গেল। সে কটি ছেড়ে মিষ্টি খেতে গুরু কৰে। তাৰ কাৰণ মিষ্টিৰ সজ্জা তুলনায় কটিৰ মূল্য কম। মিষ্টিৰ চেয়ে কটিৰ মূল্য কম হওয়াতে তাৰ কাছে কটিৰ আকৰ্ষণ কমে যায়, মিষ্টিৰ আকৰ্ষণ বেড়ে যায়। যে শ্ৰেষ্ঠ বস্তুৰ প্ৰতি আপনাৰ আকৰ্ষণ হয় তা অপকৃষ্ট বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ শেষ কৰে দেয়।

আমাদেৰ সজ্জাৰ এক সাধ ছিলেন সতীদাসজী। আচাৰ্য ভিক্ষু

যখন তাঁকে স্মরণ করতেন তখন যদি কেউ তাঁর কাছে গিয়ে বলত, 'স্বামীজি আপনাকে স্মরণ করেছেন, আপনাকে ডাকছেন,' তখন তিনি তাঁর দুই হাত জুড়ে যেত এবং ঐ অবস্থায় হাতে বা কিছু থাকত, তা মাটিতে পড়ে যেত এবং ভেঙ্গে যেত। হাতেব জিনিস মাটিতে বেখে তাব পবে কৃতাজ্জলি হবেন এ কথা তাঁব মনে থাকত না। তিনি স্বামীজিব আদেশ পাওষা মাত্র কৃতাজ্জলি হতেন। ঐই বকম কবা তাঁব স্বভাব হয়ে গিয়েছিল। আচার্যেব আজ্ঞাব প্রতি তাঁব এত আকর্ষণ ছিল যে তাব সামনে বা তাঁব হাতে জল, আহাৰ্যে পূৰ্ণ পাত্র বা কোন পুস্তক আছে, সে বোধ তাঁব থাকত না। তাঁব হাতে বা কিছু থাকত তা মাটিতে পড়ে যেত। তাঁর মন সেই ভূমিতে পৌঁছেছিল যেখানে আব সব আকর্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছে।

সাধনা মানুষেব মনকে এমন এক স্তবে নিয়ে যায় যেখানে পৌঁছলে মানুষ এক পবন ভূমিকা প্রাপ্ত হয়, তাব মনে এক বিশেষ আকর্ষণ উৎপন্ন হয়। এব মধ্যে আব সমস্ত আকর্ষণ মিশে যায়, শেষ হয়ে যায়। ঐ স্তব একাগ্রতাব ভূমিকা। তা মানসিক সমাধি, চিত্তেব-সমাধি। সে সাধক ঐই স্তবে পৌঁছেছে, সে অগণিত সমস্তা অতিক্রম করেছে। বস্তুজগতে যত অসন্তোষ, লালসা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা সংঘর্ষ উৎপন্ন হয় সব কিছু থেকে ঐ সাধক ছুটি পেয়ে যায়। সমস্ত সমস্তা লোপ পেয়ে যায়, সাধক তাদেব অতিক্রম করেন।

আমাদেব ধ্যেয উচ্চ হবে, আত্মাভিমুখ হবে। ধ্যেয নিম্ন স্তবেব হওয়া উচিত নয়। উচ্চ ধ্যেয এক নিচ ধ্যেয উভয় ক্ষেত্রেই একাগ্রতাব কার্যকাৰিতা আছে। তাব কার্যক্ষমতায় কোন বাধা হয় না। একাগ্রতা শক্তিস্বরূপ। এক ধাবায় প্রবহমান মনে তাব উৎপত্তি। মন এক ধাবায় ওপবেব দিকেও বয়ে যেতে পাবে, আবাব নিচেব দিকেও প্রবাহিত হতে পাবে। ঐ বকম এক ধাবায় প্রবাহিত হওয়া থেকেই একাগ্রতা উৎপন্ন হয়। তা থেকে উর্জা বা গুঞ্জশক্তি আসে। ঐ শক্তি নিজেব কেবামতি দেখাবে। কিন্তু যদি নিচ ধ্যেযেব ওপরে মনকে একাগ্র কবা

যাৰ তৰে নিম্ন স্তৰে শক্তিৰ বিক্ষোৰণ হ'বে। তা থেকে কোনই উপকাৰ হ'বে না। নিম্নগামী শক্তি চেতনাৰ প্ৰবাহকে নিচেৰ দিকে নিষে যাবে। যদি উচ্চ স্তৰেও ওপৰে মনকে একাগ্ৰতাৰে নিৰ্ব্যক্তি কৰা হয় তৰে শক্তিৰ বিক্ষোৰণ হ'বে উচ্চ স্তৰে। তা মনকে বিকশিত কৰে এক অনেক উপলব্ধিৰ বাহক হ'বে।

একটা কথা ভেবে দেখিবেন। একাগ্ৰতা খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তাৰও একটা সময়ৰ সীমা আছে। এ কথা আপনাদেৰ খেয়াল বাখা প্ৰয়োজন। আজ বীজ বপন কৰলেন, আব আজই বৃক্ষ তৈৰি হ'বে, এ অসম্ভব কথা। তাৰ জন্ত একটা সময়ৰ পৰিমাণ নিৰ্দিষ্ট আছে। ঠিক এই ভাবে একাগ্ৰতাৰ বললাভ কৰাৰ জন্ত একটা সময়ৰ পৰিমাণ ধাৰ্য আছে। আজ একাগ্ৰতাৰ অভ্যাস আৰম্ভ কৰলেন। পাঁচ, দশ বা বিশ মিনিট অভ্যাস কৰতে লাগলেন। বেশ ভাল অনুভূতি হ'তে থাকে, কিন্তু পূৰ্ণ বল লাভ হয় না। এখন বীজ অঙ্কুৰিত হওঁবাৰ অবস্থা। তা থেকে গাছেৰ চাৰা গছাতে সমৰ লাগবে। কাল পূৰ্ণ হলে তৰে বীজ থেকে বৃক্ষেৰ উৎপত্তি সম্ভব হ'বে। প্ৰথমেই তা সম্ভব হ'বে না। সেই বকম, আপনি যদি আপনাৰ মনকে স্তিমি কৰা ধৰে প্ৰবাহিত কৰতে পাবেন তৰে আপনাৰ বোধ হ'বে একাগ্ৰতায় আপনাৰ সিদ্ধিলাভ হ'বেহে। তখন তাতে বল বলতে আৰম্ভ কৰবে। আমাদেৰ সময়ৰ সীমাও বুজতে হ'বে।

প্ৰশ্ন হ'ছে, একাগ্ৰতা কি কৰে হ'বে? এ প্ৰশ্ন স্বাভাৱিক। মন চঞ্চল। সে এক ধাৰায় বহুতে চাৰ না, একদিক লক্ষ্য কৰে চলতে চাৰ না। মনেৰ চঞ্চল অবস্থায় একাগ্ৰতা প্ৰাপ্ত হওঁবা বাৰ না। মনকে এক ধাৰায় প্ৰবাহিত কৰা যেতে পাবে কি উপায়ে? এটা অনুভূত সত্য যে, মন যতক্ষণ সূক্ষ্মতা প্ৰাপ্ত না হয় ততক্ষণ তা এক দিকে প্ৰবাহিত হ'বে না। মনকে সূক্ষ্ম না কৰতে পাবলে আমবা তাকে খেয়েব ওপৰে এক ভাবে নিবদ্ধ কৰে বাখতে পাৰব না। এখন প্ৰশ্ন, মনকে কি ভাবে সূক্ষ্ম কৰা যায়? এব উত্তৰ : মনকে সূক্ষ্ম কৰাৰ যে উত্তম উপায়টি

আছে তা হল, স্বাসেব অভ্যাস। স্বাসেব ওপবে ধ্যানকে কেন্দ্রিত করা, মনকে নিয়োগ করা মনকে শৃঙ্খলিত করার নিষ্ঠুর উপায়। ঠোঁটেব ওপবে এবং নাকেব নিচে যেখানে স্বাসেব স্পর্শ অনুভূত হয় এবং ঘর্ষণ হয় সেখানে মনকে কেন্দ্রিত করা, ঐ স্পর্শবিন্দুতে মনকে স্থির ভাবে সংলগ্ন করা, নিশ্বাস এবং প্রশ্বাসকে অনুভব করা প্রয়োজন। তা থেকে শ্বাস দীর্ঘ এবং শৃঙ্খলিত হবে। ঐ প্রয়োগ যত পাবেন অভ্যাস ককন। যদি চান দশ-বিশ-ত্রিশ বা ষাট মিনিট কাল অভ্যাস ককন। তাতে কোন আপত্তি নেই।

ঐ বকম অভ্যাস-কালে আপনাব অনুভূতি হবে, অতীতের সমস্ত স্মৃতি, বর্তমানের সমুদয় চিন্তা ও ভবিষ্যতের বন্ধনাব ভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, একে একে ঐ সমস্ত ভাব নিচে নেমে যাচ্ছে এবং লঘুতা প্রাপ্ত হচ্ছে। যখন মন এভাবে হালকা হয়ে যাবে তখন তাকে যে দিকে চালিত করা যাবে সে দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরবে না। সেই দিকেই চলতে থাকবে। সুতরাং স্বাসেব দ্বারা, স্বাসেব প্রক্রিযাব অভ্যাস দ্বারা আমবা যেন মনকে হালকা কবি। মনকে হালকা কবে একদিকে দীর্ঘকালোব জ্ঞান চালিত কবলে একাগ্রতায সিদ্ধিলাভ হতে পারে এবং তা থেকে যে যে ফল পাওয়া সম্ভব তা সবই পাওয়া যেতে পারে।

সাধনার তিন পক্ষ

কিছু লোক অতীতে অনেক প্রয়োগ শেখায় এবং নিজেবাও সেগুলি আচরণ করে। তাবা বিশেষ শক্তিশালী সাধক। কিন্তু সাধাণ লোকেব পক্ষে এ বকম করা সম্ভব নয। তাব কাৰণ, কতকগুলি প্রয়োগ সব লোক আচরণ কবতে সমর্থ হবে না। তাবা যদি ঐ সমস্ত প্রয়োগ অভ্যাস কবতে বায় তবে বিশেষ ক্রেশকব অবস্থায় পড়বে। ঐ সমস্ত প্রয়োগ শক্তি এবং বিশেষ যোগ্যতাৰ ওপবে নির্ভর কবে। কিন্তু অনেক প্রয়োগ আছে যা সর্বসাধাণ অভ্যাস কবতে পাবে। প্রত্যেক লোকই সেগুলি আচরণ কবতে পাবে। সবাব পক্ষেই ঐ প্রয়োগগুলি আচরণ করা সম্ভব। আমি আগে থেকে এই বকম চিন্তা কবেছি যে আমবা এই শিবাবে একটি প্রয়োগ শিক্ষা কবব এবং পববর্তী শিবাব পর্যন্ত সেটি অভ্যাস কবব। তাবপবে আমবা অন্ত একটি প্রয়োগ নেব এবং সেটি তাব পবেব শিবাব পর্যন্ত আচরণ কবব। প্রত্যেক প্রয়োগ অন্তত ছব মাস কাল অভ্যাস করা উচিত। যদি অনুভূতি হয় তবে আরও দীর্ঘকাল আচরণ করা যেতে পাবে।

সাধনাৰ তিনটি অঙ্গ—অধ্যাত্ম, প্রাণ এক ব্যবহাব। আমাদেব কেবল প্রাণবিজ্ঞাব ওপবে নির্ভব কবলে চলবে না। আমাদেব মুখ্য ধ্যেয় অধ্যাত্ম বা আত্মিক বিকাশ। তা চৈতন্ত্য বিকাশেব পথে সবচেয়ে

উচু ভূমি।

সাধনাৰ দ্বিতীয় পক্ষ—প্ৰাণেৰ প্ৰয়োগ। এবও আবশ্যকতা আছে। আমাদেৰ প্ৰাণবল, মনোবল এবং শক্তিব বিকাশ ঘটোতে হবে যাতে অধ্যাত্ম পৰ্যন্ত পৌছনোৰ সুবিধে হয়।

সাধনাৰ তৃতীয় অঙ্গ—ব্যবহাৰ সম্বন্ধীয়। যদি অধ্যাত্মেৰ সাধনা তথা প্ৰাণেৰ সাধনা চলতে থাকে অথচ ব্যবহাৰেৰ কোন পৰিবৰ্তন না হয়, তবে তা মানুহেৰে ঠাট্টা-তামাশাৰ ব্যাপাৰ হ'বে দাঁড়াৰে। সাধনাৰ সাধে সাধে আমাদেৰ ব্যবহাৰেৰও পৰিবৰ্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধ্যাত্মেৰ বিকাশ হ'তে থাকলে ব্যবহাৰ আপনা থেকে বদলাতে থাকে, না বদলে পাবে না। অধিকন্তু সাধনাৰ বিকাশেৰ সঙ্গে সমান তালে ব্যবহাৰেৰও পৰিবৰ্তন হওয়া প্ৰয়োজন। ব্যবহাৰেৰ সাধনা অধ্যাত্ম সাধনাৰ পৰিপূৰক এবং সহযোগী প্ৰমাণিত হ'বে। আজ আমি এক প্ৰয়োগেৰ চৰ্চা কৰব।

অধ্যাত্মেৰ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি ছব মাস কাল অহং বিসৰ্জন কৰন। অহংকাৰ এবং মমকাৰ—এই দুই অধ্যাত্ম সাধনাৰ তথা চৈতন্য-বিকাশেৰ পথে অন্তৰায়। আপনি অহং বিসৰ্জনেৰ প্ৰয়োগ অভ্যাস কৰন।

প্ৰাণসাধনাৰ ব্যাপাৰে দুটি কথা আছে—এক দীৰ্ঘশ্বাস, আৰ এক সমতাল শ্বাস। আপনি এই দুয়েৰেই অভ্যাস কৰন। দীৰ্ঘ শ্বাস নিন। শ্বাস যত দীৰ্ঘ হ'বে, মনেৰ বিকাৰ তত কমি যাবে। ক্ৰোধ কমি যাবে। আবেগ কমি যাবে। শ্বাস যত ছোট হ'বে, মনেৰ বিকাৰ ততই বেছি হ'বে। যখন শ্বাস দীৰ্ঘ এবং পূৰ্বো হয় তখন তা আমাদেৰ ভেতৰকাৰ সব উদ্বেজনাৰ বস্তুকে নিষ্কাশিত কৰে। এ বক্স ঘটাৰ পেছনে এক বৈজ্ঞানিক কাৰণ আছে। ফুসফুসে বক্তেৰ শোধন হয়, হাৰ্ট বা হৃৎপিণ্ড সেই বস্তু শৰীৰেৰ মध्ये সঞ্চালিত কৰে।

হাৰ্ট থেকে সঞ্চালিত হ'বে বস্তু সাৰা শৰীৰে ছড়িয়ে পড়ে। সেই বক্তেৰ সঙ্গে সংস্কাৰ শৰীৰে প্ৰবাহিত হয়। বস্তু যত শুদ্ধ হ'বে, মন তত

শাস্তি হবে। আবেগ কমে যাবে। বস্তু যত দূষিত হবে, স্বভাব তত উদ্বেজনাপূর্ণ হবে, ক্রোধ তত বেশি হতে থাকবে। যখন আমরা দীর্ঘ শ্বাস নিই তখন ঐ শ্বাসেব সঙ্গে সব কার্বন, সব দূষিত বস্তু আমাদের শরীর থেকে বাইরে চলে যায়। ছোট শ্বাস নিলে সম্পূর্ণ অক্সিজেনও আমাদের শরীরেব ভেতরে প্রবেশ করে না, আব শরীরেব ভেতরে যে সমস্ত ময়লা জমেছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হয় না। এই জন্য মানুষেব স্বভাবেব পবিবর্তন হয় না। তাই দীর্ঘ শ্বাস অভ্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয় ব্যাপার হল, আমাদের সমতাল শ্বাস নিতে হবে। সঙ্গীতে যতক্ষণ তালেব সমতা না হয় ততক্ষণ সঙ্গীতেব আনন্দ পাওয়া যায় না। তালেব সমতা চাই। শ্বাসের ক্ষেত্রেও তালেব মূল্য আছে। শ্বাস সমতাল হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শ্বাস নিতে এক ছাড়তে যতটা সময় লেগেছে, দ্বিতীয়, তৃতীয় এক তাব পরবর্তী নিশ্বাসসমূহে ততটাই সময় লাগা বাঞ্ছনীয়। সময়েব কোন তফাৎ যেন না হয়। আমরা যখন চলি তখন যদি প্রথম পদক্ষেপ এক দিকে, দ্বিতীয় পদক্ষেপ আব এক দিকে, তৃতীয় পদক্ষেপ অন্য আব এক দিকে হয় তাহলে আমরা অগ্রসর হতে পাবি না। যখন আমাদের পদক্ষেপ একই দিকে একই ভাবে হয় তখন আমাদের অগ্রগতি হয়। শ্বাস সমতাল হওয়া প্রয়োজন। মনে করুন, প্রথম শ্বাস নিতে ও ছাড়তে আপনার বিশ সেকেন্ড লেগেছে। দ্বিতীয় এক তৃতীয় শ্বাসেও বিশ সেকেন্ড করে লাগা উচিত। এই হল সমতাল শ্বাস। এতে এমন এক লববদ্ধতাব সৃষ্টি হয় যে মানুষ সহজে ধ্যানেব স্থিতিতে পৌঁছে যায়। শান্তি আসে। আসনে বসে প্রয়োগ কবাই শুধু ধ্যান নয়। যখন আমাদের মন শান্ত থাকে, যখন আমাদের মনে কোন উদ্বেগ থাকে না তখনই আমাদের ধ্যানেব স্থিতি হয়। সমতাল শ্বাস থেকে এই অবস্থা আসে। প্রাণেব দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি দিক আছে—দীর্ঘশ্বাস এব সমতাল শ্বাস।

এব পরে তৃতীয় কথা—ব্যবহার সম্বন্ধে। ব্যবহারেব দৃষ্টিকোণ থেকে

সাধকেব কৰুণা অভ্যাস কৰা উচিত এবং তা আগামী অধিবেশন পর্যন্ত চলা প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তে আমাদের এ বিষয়ে জাগৰুকতা অভ্যাস কৰা দৰকাৰ। নিজেব ছেলোমেৰে, নিজেব পৰিবাব, নিজেব দাস-দাসী, সৰাব প্রতি কৰুণা প্রদৰ্শন কৰা আবশ্যক। কাবও সঙ্গৈ নিৰ্দয় ব্যবহাব কৰবেন না, নিৰ্দয় ভাব পোষণ কৰবেন না। যখনই মনে নিষ্ঠুৰ ভাব আসে আমবা তখনই যেন তা সামলে নিয়ে সদয় ভাব নিয়ে আসি। যদি আমাদের মনে কৰুণা আসে তবে জীবনের অনেক বিপত্তি মিটে বাবে। ক্রুবতাৰ কলে অনেক অনায়াস সংঘটিত হয়। লোকে ক্রুবতাৰ বশবৰ্তী হৰে অগ্ৰায় কাজ কৰে। যদি কৰুণা বিকশিত এবং অভ্যস্ত হয় তবে অনেক অস্বস্তিকৰ অবস্থাৰ সমাপ্তি ঘটে। জৈন-পবম্পৰায় এ কথা স্বীকৃত যে, মানুহেব মনে কৰুণা না থাকলে তাব সম্যক দৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। সম্যক দৃষ্টিব এক লক্ষণ—অনুকম্পা। যদি লোকেব অনুকম্পা বা কৰুণা থাকে তবে বুঝবেন, তাব সম্যক দৃষ্টি আছে। যদি কৰুণা না থাকে তবে সে মিথ্যাদৃষ্টি। কোন লোক সম্যক দৃষ্টি বা মিথ্যা দৃষ্টি কিনা তা জানাব এই হল কষ্টিপাথৰ। এই হল আমাদের ব্যবহাবেব সূত্র।

অধ্যাত্ম সাধনাৰ অহং বিসৰ্জন, প্রাণেব সাধনাৰ দীৰ্ঘশ্বাস ও সমতান্ন শ্বাসেব অভ্যাস, আব ব্যবহাবেব সাধনাৰ কৰুণাব অভ্যাস—এই তিন বকম সাধনাৰ প্রয়োগেব রূপ। এই তিন প্রয়োগ থেকে কলপ্রাপ্তি হৰে, সাফল্য লাভ হৰে। প্রথম প্রয়োগ থেকে অহং বোধ ত্যাগ হৰে, দ্বিতীয় থেকে লাভ হৰে বাসনা-বিজয়, তৃতীয় থেকে লাভ হৰে কৰুণাব অভ্যাস।

তবে এব সঙ্গৈ আব একটি বিষয় আছে। সেই বিষয়টি হল জপ। তিন তন্ত্ৰকে সৰল কৰতে জপ অত্যন্ত প্রয়োজন। কাবণ তাতে আমাদের সমস্ত শক্তিব পৰিবৰ্তন ঘটে। শক্তিব বিকাশ হয়। তা প্রাণ-শক্তি এবং আত্মশক্তি উভয়কেই প্রভাবিত কৰে। এর জন্ত আপনি' নবকাব মন্ত্ৰ জপ কৰেন, মালা ঘোবান। পৰ্যায়ক্রমে এই বকম চলতে

থাকে। এই নিয়মেব সামান্য একটু পবিবর্তন আপনাদের বুঝিয়ে দিই। কেউ হয়ত নবকাব মন্ত্ৰেব মালা একবাব স্তুবিষে জপ কবে। হয়ত আপনিও তাই কবেন। একটা পবিবর্তন ককন। আমি যে নিয়ম বলছি তদনুসাবে মালা ঘোবান। আপনি নমস্কাব মন্ত্ৰে এক চবণ নিন ‘গমো অর্হন্তাণং’। আপনাকে এই চবণ জপ কবতে হবে। শ্বাস নেওয়ার সময় মন্ত্ৰেব জপ কববেন না, উচ্চারণ কববেন না। শ্বাস ত্যাগ কবাব সমবেও মন্ত্ৰ জপ কববেন না। পূবকেব সমবেও এ মন্ত্ৰ জপ কববেন না, বেচকেব সমবেও এ মন্ত্ৰ জপ কববেন না। কুস্তকেব অবস্থাতে এই জপ কববেন। আপনি পূবক ককন, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নিশ্বাস গ্রহণ ককন, নিশ্বাস দেহেব মধ্যে আবদ্ধ বাধুন। এই হল কুস্তকেব অবস্থা। এই অবস্থায় স্থিতিকালে জপ ককন। ‘গমো অর্হন্তাণং’ এই মন্ত্ৰ উচ্চারণ ককন। এবাব নিশ্বাস ত্যাগ ককন, আবাব নিশ্বাস নিন। নিশ্বাস ত্যাগ কবাব সমবেও মন্ত্ৰ জপ কববেন না। আবাব শ্বাসকে দেহমধ্যে আবদ্ধ কবে কুস্তক ককন। তখন ‘গমো সিদ্ধাণং’ এই মন্ত্ৰ জপ ককন। বতঙ্গ কুস্তক কববেন ততঙ্গ জপ কববেন। পুরো মালা ঘিবানোব কোন প্রয়োজন নেই। নমস্কার মহামন্ত্ৰ বিধিসম্মতভাবে যদি দশবাবও জপ কবা বায় তবে তা প্রভূত ফলদায়ক এবং মূল্যবান হয়। যতটুকু আপনাব স্তুবিধে ততটুকু সমযই আপনি বিধিসম্মতভাবে জপ কববেন। তবে একটা পরামর্শ দিই। অন্তত একশবাব জপ কববেন। এক মালা সম্পূর্ণ বেবে তো খুব ভাল কথা। না হলেও অন্তত এই সংখ্যক জপ অবশ্য কববেন। আপনাব স্থিৰতা বৃদ্ধি পাবে, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাবে। জপ কবাব এই এক বিধি। কুস্তকেব স্থিতিকালে জপ কবতে হবে, অর্থাৎ পূবক এবং বেচকেব মাঝখানে স্থিতিকালে জপ কবতে হবে। এই এক জপেব বিবি। তাব সাথে সাথে বঙেব ধ্যান আবশ্যক, স্থানেব ধ্যানও অত্যন্ত প্রয়োজন। জপেব সঙ্গে চাব বস্ত্ৰ সংযুক্ত হয়েছ—পদ, বস্ত্ৰ, স্থান ও শ্বাসেব ত্ৰিটি।

আমবা ‘গমো অর্হন্তাণং’ মন্ত্ৰটি নিয়ে আলোচনা কবি। এই মন্ত্ৰেব

বৰ্ণ শ্বেত, তার স্থান মস্তিষ্কে, সহস্রাব চক্রে । এই মস্ত্বেৰ উচ্চারণকালে
মন সহস্রাব চক্রে স্থিত হয়, তাৰ সপ্তকে চিন্তা বা আভাসেৰ বৰ্ণ শ্বেত
হয় । সহস্রাব চক্ৰ বা ব্ৰহ্মবন্ধু হল তালুৰ ওপৰেৰ দিক । কুন্তকেৰ
স্থিতিকালে মস্ত্ৰ জপেৰ সময়ে আমাদেৰ মন সহস্রাবে নিবদ্ধ হবে ।
চাবটি বিষয়েৰ আলোচনা কৰা গেল—

পদ—গমো অৰ্হস্থাপং ।

বঙ—শ্বেত ।

স্থান—সহস্রাব চক্ৰ (ব্ৰহ্মবন্ধু, অৰ্থাৎ তালুৰ ওপৰকাৰ স্থান) ।

শ্বাসেৰ স্থিতি—কুন্তক । অন্তৰ কুন্তক ।

‘গমো সিদ্ধাপং’ এই হল দ্বিতীয় পদ । এব বৰ্ণ লাল । এব স্থান
ললাটেৰ মধ্যভাগে স্থিত আজ্ঞাচক্ৰ । শ্বাসেৰ স্থিতি হল কুন্তক ।

‘গমো আববিষাপং’—এই হল তৃতীয় পদ । এব বৰ্ণ পীত । এব স্থান
বিশুদ্ধি চক্ৰ বা গলদেশ । এ চক্ৰ পবিত্ৰতাৰ স্থান । তা আনাদেৰ
সমস্ত ভাবনা এব আবেগেৰ নিয়ন্ত্ৰণ স্থান । শ্বাসেৰ স্থিতি হবে—
অন্তৰ কুন্তক ।

‘গমো উবজ্জ্বাষাপং’—এটি চতুৰ্থ পদ । এব বৰ্ণ নীল । এব স্থান
হৃদযকমল । শ্বাসেৰ স্থিতি—কুন্তক ।

‘গমো লোএ নববসাহপং’—এই হল পঞ্চম পদ । এব বৰ্ণ কৃষ্ণ । এব
স্থান পাত্ৰেৰ বুড়ো আঙ্গুল । শ্বাসেৰ স্থিতি—কুন্তক ।

পাঁচটি পদেৰ বৰ্ণ ভিন্ন, স্থিতি ভিন্ন, শ্বাসেৰ স্থিতি পাঁচটি পদেৰই
সমান । প্রত্যেকটিৰ নাথে পদ, বৰ্ণ, স্থান এব শ্বাসেৰ স্থিতি—এই চাব
বস্তু সংযুক্ত হয়েছে । এখন এই নবেৰ সঙ্গে আনাদেৰ মনেৰ পূৰ্ণ সংযোগ
হওয়া প্রয়োজন । এই পাঁচ বস্তুৰ বিধিৰ সংযোগ হলে ছপ শক্তিশালী
হয় । একটিৰও ন্যূনতা হলে পৰিশােনেৰ ন্যূনতা ঘটে ।

আপনি অহং বিসৰ্জন কৰতে চান, বৰ্ণনাৰ বিকাশ কৰতে চান,
শ্বাসেৰ স্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰতে চান । এই তিনিই আমবা জপেৰ দ্বাৰা
সাধনা কৰছি । এব দ্বাৰা মস্ত্ৰ শক্তিশালী হব । আপনাবা ভাবতে

পাবেন এত নবকাব মস্ত্র জপ ববলাম, এত মালা ফেবালাম, বছবেব পব বছব জপ কবে চলেছি, বিস্ত দৃশ্যত কিছুই লাভ হল না। এ বকম অনুভূতি দু-এক জনেব নয়, অনেকবই হতে পাবে। ওপবে যে প্রেক্ষিয়া বর্ণনা কবলাম সেভাবে ছয় মাস কাল জপ ককন, তাব পবে আমাকে জানাবেন কিছু পবিবর্তন হযেছে কিনা। অবশ্যই পবিবর্তন হবে। আমি এই এক প্রযোগেব আলোচনা কবলাম। যাঁবা নানা প্রকাব প্রযোগেব মধ্যে যেতে চান না, যাঁদেব অনেক বকম প্রযোগ অভ্যাস কবাৰ ক্ষমতাও নেই, তাঁবা এই এক প্রযোগ জাঁকড়ে ধকন। একে হৃদযজ্ঞম ককন। একেই চাব বিষয়েব বল লাভ হবে।

প্রথম তত্ত্ব হল অহংকে বিসর্জন কবা। তাব অর্থ—বিনম্রতা। এও এক সমাধি। ভগবান মহাবীৰ চাব বকম সমাধিৰ কথা বলেছেন : বিনয সমাধি, ঋত সমাধি, তপ সমাধি এবং আচাৰ সমাধি। প্রথম হল বিনয সমাধি, তাব অর্থ অহং বিসর্জন। অহং স্বয়ং-উদ্দগুতা বা চণ্ডতা বা প্রকৃতিৰ ঔদ্ধত্যেব দ্বাবা পবিচিত। লোকে নিজেকে অনেক বড় মনে কবে। সেই হল অহং। বিনযেব অর্থ কি ? বিনযন—অৰ্থাৎ দূৰ কবা, হটানো। বিনযেব উদ্দেশ্য দূৰ কবা বা অপসাবিত কবা। আমাদের ভেতবে যে কবাযেৰ ভাব আছে, যে অহং ভাব আছে, তাকে দূৰ কবাৰ নাম হল বিনয বা বিনম্রতা। বিনম্রতা অন্ত্বেব প্রতি ব্যবহাবেব রূপ নয়। এ হল নিজেব ভেতবকাব গুণ। অহংকাৰ নিজেব ভেতবেব দোষ। বিনযেব অভ্যাস কবা, বিনয সমাধিতে, আত্ম-সমাধিতে অবস্থান কবা বাঞ্ছনীয়। ঐ সনাধি অহংকাৰেব বিসর্জন থেকে প্রাপ্তব্য হল। এতে স্বয়ং-অনুভূতিৰ সমাপ্তি ঘটে, একাগ্রতাৰ সিদ্ধি লাভ হয়।

দ্বিতীয় বিষয়—ককণা অভ্যাস কবা।

তৃতীয় বিষয়—প্রাণেব সাধনা।

চতুর্থ বিষয়—বিধিৰ মস্ত্র জপ কবা।

এই সব বিষয় একত্ৰ হলে প্রযোগ সম্পূৰ্ণ হয়। এই বকম প্রযোগে

সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। এতে আমাদের চতুর্মুখী বিকাশ হয়। কোন এক
 অংশেব নয়, সমস্ত অংশেব বিকাশ হয়। যদি কেবল আমাদের প্রাণ-
 কোষেব বিকাশ হয় কিন্তু স্বভাব না বদলায় তবে ঐ শক্তি আমাদের
 পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হয়, আমাদের পক্ষে দুঃখদায়ক হয়। আমবা
 আত্মাব বিকাশ কবতে চাই। কিন্তু যদি প্রাণেব বিকাশ না হয় তবে
 দুর্বল প্রাণ আত্মা পর্যন্ত পৌছতে পাবে না। উপনিষদে একটি সুন্দব
 উক্তি আছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন ভাভ্যঃ'—বলহীন বা বীর্যহীন ব্যক্তি
 আত্মাকে লাভ কবতে পাবে না, আত্মা পর্যন্ত পৌছতে পাবে না।
 বলহীন লোক কিছু কবতে পাবে না, কিছু পাওযাব অধিকারী নয়।
 কৰুণাব অভ্যাস, অহঙ্কাৰেব বিসৰ্জন নিজেব সঙ্কল্পেব ওপবে নির্ভব কবে,
 সঙ্কল্পেব সাথে সাথে চলে। কৰুণাব প্রয়োগ ব্যবহাবে, কিন্তু এখনও এই
 ভূমি প্রয়োগ কবাব উপযোগী নয়। আপনি কি এখন কাবও প্রতি
 দ্রুত আচৰণ কবছেন? কাবও প্রতি কৰুণা প্রদৰ্শন কবছেন? এ
 ব্যাপাব আপনাব ওপবে নির্ভব কবে। আপনাকে নিজেকেই ভেবেচিন্তে
 প্রয়োগ কবতে হবে। দীৰ্ঘশ্বাস, সমতাল শ্বাস আব নমস্কাব মন্ত্ৰ জপ—
 এব প্রয়োগ কবতে পাবেন, শিখতে পাবেন।

নিৰ্বিচাৰ ধ্যান

চীনেৰে সত্ৰাট এক ধ্যান-সাধককে আমন্ত্ৰণ কৰে বললেন, ‘আমি উপদেশ শুনেতে চাই, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।’ সাধক স্থিৰ হায়ে বসলেন, সত্ৰাটও তাঁৰ সামনে বসলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, সত্ৰাট সাধকেৰে মুখেৰে কথা শোনাৰ জন্তু প্ৰতীক্ষা কৰতে লাগলেন। সমস্ত পৰিবেশ নিস্তব্ধ হায়ে বহিল। আধ ঘণ্টা কেটে গেল—সত্ৰাট প্ৰতীক্ষাবত, সাধুও মৌনতায় অটল। শেষে বহন এক ঘণ্টা পাৰ হায়ে গেল, সত্ৰাট অধীৰ হায়ে বললেন, ‘ভ্ৰষ্টে। উপদেশ দেওয়াৰ জন্তু আপনাকে এখানে নিমন্ত্ৰণ কৰেছি। আপনাৰ উপদেশ শোনাৰ জন্তু আমি খুব উৎসুক। এবাৰ চৰ্চা কৰে কিছু বলুন।’ সত্ৰাটেৰে মন্ত্ৰী ধ্যানৰে মৰ্ম বুঝতেন। তিনি বললেন, ‘বাজন্। উপদেশ তো সন্ধান্ত হায়ে গেল। এবাৰ উনি বাঙলাৰ জন্তু তৈৰি।’ সাধু সত্যিই উঠে চলে গেলেন।

খুবই ভাল হতো যদি আমি ঐ বকম কৰতে পাবতাম—মৌন থেকে যেতাম, হাব মৌনতাই হতো উপদেশ। কথা না বলে, মৌন থেকে যতটা বোঝানো যেত, কথা বলে হযত ততটা বোঝাতে পাবব না। এ-ও আমাৰ পক্ষে এক সমস্যা। কথা না বলাৰ দ্বাৰা যে বিষয় বোঝানো সম্ভব,

কথা বলাব ছাড়া সে বিষয় বোঝানো সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে কখনও কখনও মৌনীয় পক্ষেও কথা বলাব দাব্য হইবে। যে ভাষাতে সংঘট, সে বার্দ সাবা দিন ধবে কথা বলে তাহলেও যেন কিছু বলে না। নিযুক্তিকাবেব এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বহিস্ত-সূত্র আছে—যে বিকল্পেব জালে ফেঁসে যায় নি, সে কথা বললেও তা না বলাব সামিল, আব যে বিকল্পেব ছাড়া প্রভাবিত, সে কথা না বললেও যেন অনেক কথা বলে।

মনেব ক্রিয়া সন্াপ্ত কবতে পাবলে তবেই আনবা নির্বিচাবেব স্তবে পৌছতে পাৰি। নির্বিচাবেব স্তবে পৌছতে হলে মনেব বিচৰণ বন্ধ কবতে হবে। বতঙ্গণ মন সক্রিয় থাকবে, বিচৰণশীল থাকবে, চাবদিকে ঘূৰবে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তবে বাবে, পবিত্রজন কববে, ততঙ্গণ নির্বিচাৰ ধ্যান হবে না। ঐ বকন ধ্যানেব জগ্ৰ মনেব সংক্ৰমণশীলতা একেবাবে বন্ধ কবা প্রয়োজন। এক শব্দ থেকে আব এক শব্দে, এক অৰ্থ থেকে আব এক অৰ্থে, এক চিন্তা থেকে আব এক চিন্তায়, মন সৰ্বদা বিচৰণ কৰছে। আনি মনকে একাগ্ৰ কবতে চেষ্টা কবছি, কিন্তু শব্দেব চক্ৰ চলছে, আব মন তাতে বিচৰণ কৰছে। মনেব চঞ্চলতাব আব শেষ হয় না। চঞ্চলতা একাগ্ৰতাব মধ্যেও থাকে, কিন্তু সেই চঞ্চলতা এত সীমিত হয়ে যায় যে আনবা সেই অবস্থাব মন স্থিৰ আছে বলেই মনে কবি। এব তাৎপৰ্য এই যে, সেই অবস্থাব মনেব চঞ্চলতা একই বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে, অৰ্থাৎ মন অল্প কোন বিষয়ে সংক্ৰমণ কবে না। সেজগ্ৰ তখন মনকে স্থিৰ বলেই মনে কবা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তা স্থিৰতা নয়—তা পূৰ্ণ স্থিৰতা নয়, আংশিক স্থিৰতা মাত্র বা চঞ্চলতাব বৰ্জন। চঞ্চলতাব বৰ্জন আছে বলেই আনবা ঐ মনকে স্থিৰ আব শান্ত বলে মেনে নিই। কিন্তু যেখানে বিচাৰ আছে, মনেব ক্রিয়াশীলতা আছে, চিন্তা আছে, সেখানে স্থিৰতা কি কবে থাকতে পারে? মনেব স্থিৰতা হলে নির্বিচাৰতার স্থিতি এসে যায়। সেবলজ্ঞানেব তাৎপৰ্য—শুদ্ধ জ্ঞান, অবিমিশ্র জ্ঞান, একক জ্ঞান—জ্ঞানেব অতিবিক্ত আব কিছুই নয়।

‘কেবল’ শব্দেব তিনটি অৰ্থ হতে পারে—একক, শুদ্ধ, পরিপূৰ্ণ।

‘কেবল’-এব এক অর্থ, একক। যখন আমবা জ্ঞানই কবি, তাব সঙ্গে কোন সংবেদন কবি না, তখন আমাদেব জ্ঞান একক জ্ঞান—কেবল-জ্ঞান।

‘কেবল’-এব দ্বিতীয় অর্থ, শুদ্ধ। যখন আমবা জ্ঞানই কবি, সংবেদন কবি না, জ্ঞানেব সঙ্গে সংবেদন জুড়ে দিই না, তখন আমাদেব জ্ঞান শুদ্ধ হয়, উপযোগ শুদ্ধ হয়। এবং সেই অর্থে আমবা কেবল-জ্ঞানী হয়ে যাই।

‘কেবল’-এব তৃতীয় অর্থ, পবিপূৰ্ণ। পবিপূৰ্ণতা আপনা আপনি এসে যায। যখন অবিমিশ্র জ্ঞান হয়, কেবলজ্ঞান হয়, তখন পবিপূৰ্ণতা আপনা আপনি আসবে। আমবা তাকে আনতে যাব না, আমন্ত্ৰণ কবব না—পবিপূৰ্ণতা স্বতই আসতে বাধ্য হবে। যখন আমাদেব জ্ঞান একক, আমাদেব জ্ঞান শুদ্ধ, তখন পবিপূৰ্ণতা আমাদেব কাছ থেকে সবে থাকতে পাববে না—তাকে আসতেই হবে।

যখন আমবা শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌছতে পাবব তখন আমবা নিৰ্বিচাবতাৰ স্থিতিও লাভ কবব। উপযোগেব অর্থ—চেতনাৰ প্ৰবৃত্তি, চৈতন্ত্ৰেব ব্যাপাৰ। যেখানে চৈতন্ত্ৰেব ব্যাপাৰ শুদ্ধ—অবিমিশ্র, নিৰ্ভেজাল—সেখানে উপযোগ শুদ্ধ। সেখানেই নিৰ্বিচাবেব স্থিতি। সেখানে সমস্ত সংবেদন সমাপ্ত হয়ে যায।

এক পৌৰাণিক কাহিনী আছে। এক প্ৰসিদ্ধ সাধু ছিলেন। তাঁৰ কাছে হাজাব হাজাব লোক আসত। তাদেব মধ্যে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু খাবাপ লোকও ছিল। কাবও তাঁব কাছে যাওয়া-আসাৰ, বা তাঁব কাছে থাকাব, বাধা ছিলনা। একদিন এক ছৰ্জন লোক সাধুৰ কাছে এসে বসে গেল। তাব মনে সতিহই কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। সে সাধুকে বিবস্ত কবাব জন্য নানা অবাস্তব প্ৰশ্ন কবতে লাগল। তাব মন ছিল দূষিত—কেবল ছবাগ্ৰহ ও কু-তৰ্কে ভবা। বোঝাব কোন ইচ্ছাই তাব ছিল না। সে সাধুকে প্ৰশ্ন কবল। সাধু শাস্তভাবে তাব উত্তৰ দিলেন, তাকে বোঝানোব জন্তু নানা বকম চেষ্টা কবলেন। কিন্তু

তাঁাব সমস্ত প্রয়াসই জলকে মছন কবাব মত বিফল হল। দধিকে মছন কবলে মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু জলকে মছন কবলে কি পাওয়া যাবে ? তবুও সে লোক তাব ছুবাগ্রহ ছাড়ল না। সাধু হযবাণ হয়ে গেলেন। ক্রোধকে আসতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু হযবাণি বলে সাধুব ক্রোধ প্রকট হয়ে গেল। তিনি সাধক ছিলেন, একেবাবে সিদ্ধ ছিলেন না। তিনি বললেন, ‘তুমি বড়ই ছষ্ট, এখান থেকে দূব হও।’ তাকে ধাক্কা দিযে বেব কবে দিলেন। এবপবে কাহিনীতে বলা হয়েছে, বাত্রে ঐ সাধকেব কাছে ভগবান প্রকট হয়ে বললেন, ‘তুমি বড়ই অত্যায কবেছ, ঐ ব্যক্তিকে ঘব থেকে বেব কবে দিলে ?’ সাধু বললেন, ‘ভগবন্, আব কি কবব ? ঐ লোক বড়ই ছষ্ট, ক্রোধী ও কু-তর্কিক ছিল, তাব বোঝাব কোন ইচ্ছাই ছিল না। সুতবান আমি আব কি কবতে পাবি ?’ ভগবান বললেন, ‘সাধু ! তুমি ভুলে যাচ্ছে যখন আমাব সৃষ্টিতে, আমাব জগতে, তাব জন্যও স্থান আছে, তখন তোমাব গুথানেও তাব জন্য স্থান থাকা উচিত ছিল।’ সাধু বললেন, ‘ভগবন্, আপনি পবম শুদ্ধ। আমি তো শুদ্ধ নই। আমি কি কবে তাকে স্থান দেব ?’

শুদ্ধতা লাভ কবলে আব কোন বিকাব থাকে না। যখন চেতনা শুদ্ধ হয় তখন সকলেব জন্যই স্থান দেওয়া সম্ভব হয় ; কিন্তু অশুদ্ধ চেতনা নিযে সকলকে স্থান দেওয়া যায় না। ভগবান পবম শুদ্ধ। শুদ্ধেব জগতে সব কিছুকেই সমান বোধ হয়। ভাল হোক, মন্দ হোক, নোবা হোক, পবিস্কাব হোক, স্বরূপ হোক, কুৎসিত হোক— সবই সমান। কিন্তু অশুদ্ধতায ক্ষেত্রে সব সমান হয় না। সেখানে সীমাব কথা ওঠে। এই পর্ষস্ত দেখ, এই পর্ষস্ত অনুভব কব—এসবই সীমাব কথা। শুদ্ধতাতে কোন সীমাবন্ধন থাকে না। সবই নিঃসীম হয়ে যায়। আমাদের চেতনা যখন শুদ্ধ হয়, তখন সেই স্থিতিতে সৃজন হোক, দুর্জন হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক—যা কিছু হোক, কেউই আব কোন সঙ্কটেব সৃষ্টি কবতে পাবে না।

শুদ্ধ চেতনা বা নির্বিকায ধ্যানেব কষ্টিপাথব—তায প্রকৃত তত্ত্ব

এই যে, সেই অবস্থায় সুখ-দুঃখ সমান হয়ে যায়। আচার্য-কুন্দকুন্দ বলেছেন, শুধু চেতনায় উপনীত হলে, সাধক সুখ-দুঃখেব প্রতি সমান হয়ে যান। তাঁব তখন সুখ বা দুঃখেব মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না, তাঁব তখন দুই-ই সমান বলে মনে হয়। কি কবে তা সম্ভব হয়? তিনি কি বকম মানুষ—যাঁব কাছে সুখেব অনুভূতি প্রিয় নয়, আব দুঃখেব অনুভূতিও অপ্ৰিয় নয়? এই দুয়েব প্রতি সমান ভাব পোষণ কবাব অবস্থা কি কবে ঘটেতে পাবে? কবে তা ঘটে, কেনই বা ঘটে? এই অবস্থা অশুদ্ধ চেতনায় কখনই ঘটে না। যখন আমাদের চেতনা শুদ্ধ হয়ে অবিশিষ্ট জ্ঞানেব স্থিতি প্রাপ্ত হয়, তখন কোন সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না। সুখ ও দুঃখ—এই দুই সংজ্ঞাই তখন লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময়ে শত্রুও থাকে না, মিত্রও থাকে না। শত্রু ও মিত্র—এই দুই সংজ্ঞাবই তখন অবসান ঘটে। তখন বেঁচে থাকাব জন্ত আকান্ধকাও থাকে না, মবে যাওযাব সম্ভাবনায় ভয়ও থাকে না। আকান্ধকা আব ভয়—দুই-ই শেষ হয়ে যায়। ‘গীতায’ ভগবান কৃষ্ণ এই স্থিতি এ ভাবে বর্ণনা কবেছেন—

‘সিদ্ধ্যসিক্ধোঃ সমো ভূষা, সমং যোগ উচ্যতে।’

সিদ্ধিব অর্থ—উপলব্ধি, সফলতা। অ-সিদ্ধিব অর্থ—অনুপলব্ধি, অসফলতা। যে সাধক সিদ্ধি আব অ-সিদ্ধিতে, উপলব্ধি আব অনুপলব্ধিতে, সমান থাকেন, তাঁব সেই সময়ে যোগ বলে। সময়েই নির্বিচাবতাব স্থিতি।

নির্বিচাব ধ্যানকে সামাযিক বলা যায়। ভগবান মহাবীর সামাযিকেব ওপব যতটা জোব দিয়েছেন, আব কিছুব ওপব ততটা দেন নি, কাবণ, সামাযিক ধ্যান থেকে আলাদা নয়। সামাযিকেব নামই ধ্যান। ধ্যান সামাযিক থেকে পৃথক বস্তু নয়। গোঁতম মহাবীরকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, ‘ভক্তে! সামাযিক কাকে বলে? সামাযিকেব অর্থ (বিষয়) কি?’ ভগবান মাত্র দু কথায় ছোট একটা উত্তব দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই উত্তব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, ‘আযা সমাইএ, সামাইযস্

হট্ঠে—আত্মা সামাযিক, আৰু আত্মাই সামাযিকেৰ অৰ্থ। যখন আমবা মূল চেতনায় থাকি, আত্মায় স্থিতিলাভ কৰি, তখন সেই স্থিতিৰ নাম সামাযিক। আপন আত্মায় থাকাই সামাযিক। সামাযিকেৰ বেশে থাকা বাস্তবিক সামাযিক নয়, নিজেৰ আত্মাতে থাকাই বাস্তবিক সামাযিক। আত্মাতে অবস্থানই সামাযিকেৰ অৰ্থ, সামাযিকেৰ বিষয়। আত্মা আৰু সামাযিক দুটি পৃথক বস্তু নয়, শব্দ দুটি হলেও বস্তু একই।

আত্মা আৰু ধ্যানও পৃথক পৃথক বস্তু নয়। নিৰ্বিচাৰ ধ্যানেৰ উদ্দেশ্য হল, আত্মাতে থাকা। সামাযিকেৰও ঐ একই উদ্দেশ্য। তিনিটি শব্দ আছে—ধ্যান, নিৰ্বিচাৰতা আৰু সামাযিক। আসলে কিন্তু ঐ তিনি একই। সামাযিকে থাকাব অৰ্থই নিৰ্বিচাৰ ধ্যানেৰ অবস্থায় থাকা, আৰু নিৰ্বিচাৰ ধ্যানেৰ অবস্থায় থাকাব অৰ্থই সামাযিকে থাকা। কথা দুটি একই। যখনই আমবা আত্মায় স্থিত হই—আমাদেৰ কেবল আত্মদৰ্শন হয়, মনে কোন সংকল্প-বিকল্প হয় না, মনেৰ কোন গতি বা বিচৰণ থাকে না, তখনই সেই অবস্থায় আমাদেৰ আত্ম-বৰ্ণন হয়, আৰু সেই অবস্থায় স্থিতিই সময়ে স্থিতি, সামাযিকেৰ স্থিতি। সব দিক থেকেই আমবা তখন সমান হবো বাই, কোন দিকেই আৰু বিষমতা থাকে না। তখন কেবল সমতা আৰু সমতা। এই হল, পূৰ্ণ জাগৰুকাৰ স্থিতি, চৈতন্যৰ স্থিতি। প্ৰথম যে নেশা, তা সত্যি মদেৰ নেশা নয়—বিচাবেৰ নেশা। আচ্ছা, মদেৰ নেশা কি বিচাবেৰ নেশা থেকে কম হতে পাৰে? মদেৰ নেশায় তো মানুহ পাগল হযে যায়, টলমল কৰে চলে, কখনও বা পড়েও যায়। আৰাব, কখনও কখনও হু-চাব ঘণ্টা মুছাই ঘোবেই থাকে। ঠিকই বটে, ভবে সে তো জ্ঞান কিবে পায়, সাবধানও হয়ে যায়। কিন্তু বিচাবেৰ নেশা বড়ই শক্তিশালী। বিচাবেৰ নেশায় লোকে ঘোবতব লড়াই কৰে যায়, বন্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। কত সংঘৰ্ষ, কত উন্মাদনা, কত ঝগড়া, কত পাগলামি যে বিচাবেৰ নেশায় উৎপন্ন হয়, তা বলে শেষ কৰা যায় না।

একদিন বাত্ৰি বেলাৰ একটি লোক তাৰ বাডি থেকৈ বেবিষে এক প্ৰসিদ্ধ দাৰ্শনিকেৰ বাডিতে উপস্থিত হযে তাঁৰ বন্ধ দবজাৰ আঘাত কৰল। দাৰ্শনিক নিচে এসে দবজা খুলিলেন। তিনি দেখিলেন—সামনে একটি লোক দাঁড়িয়ে, তাৰ মাথা কাঁপছে। তিনি ভাবলেন, ‘এ তো দেখছি নেশাৰ ঘোৰে আছে। যদি সজ্ঞানে থাকত, জাগৰক বা হুঁশিৰাব থাকত, তবে এমন মাথা কাঁকাৰে কেন?’ দাৰ্শনিক জিজ্ঞাসা কৰিলেন, ‘এত বাতে কেন এসেছ?’

‘আমাৰ এক জিজ্ঞাসা ছিল। আপনাকে একটা প্ৰশ্ন কৰতে এসেছি।’ ‘আবে। এই হল জিজ্ঞাসাৰ সময়? প্ৰশ্ন কৰাৰ সময় এই? এত বাত হযেছে—বাবটা বেজে গিযেছে, আৰু এখন তোমাৰ প্ৰশ্ন কৰতে আসাৰ সময় হল?’

‘এখনই জিজ্ঞাসাটা মনে উঠল, তাই এখনই আপনাৰ কাছে চলে এলাম। এই শহৰে আপনাৰ চেয়ে শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি তো আৰ পাৰ না। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমাৰ জিজ্ঞাসাৰ উত্তৰ দিন। আমাৰ প্ৰশ্ন, ঈশ্বৰ আছেন, কি নেই?’

‘বড় অদ্ভুত লোক দেখছি। এই কি প্ৰশ্ন কৰাৰ উপযুক্ত সময়? ঈশ্বৰ আছেন কিনা—এই প্ৰশ্নেৰ এত জলদি উত্তৰ দবকাবই বা কেন? এজন্ত তোমাৰ কোন কাজ তো এখন ঠেকে নেই। তোমাৰ ঘৰে তো আৰ আগুন লাগে নি যে এখনই উত্তৰ পেতে হবে। এত জলদি কেন? মনে হয়, নেশাৰ চুব হবে আছ, পাগল হয়ে আছ, তাই এখনই প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ চাইছ।’

‘মহাশয়! নেশাতেই তো এই প্ৰশ্ন উঠেছে। যখন জাগৰক থাকি, সতৰ্ক থাকি, তখন ঈশ্বৰ আছেন কিনা, এই প্ৰশ্ন ওঠে না। প্ৰশ্নটা তো নেশাৰ মध्येই উঠেছে, আৰু এই সময়েই তো এৰ উত্তৰ পাওবা চাই।’

‘যখন তোমাৰ হুঁশ কিবাবে তখন এসো।’

‘যখন আমাৰ হুঁশ হবে তখন কে আৰ আপনাকে প্ৰশ্ন কৰতে আসবে? আমি তো আৰ প্ৰশ্ন কৰব না।’

দেখুন, এখানে ছঁশে থাকাব কথা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবকে কে ছঁশে আছে? এটাই সম্ভব যে, যিনি প্রশ্ন কবছেন তিনি ছঁশে নেই, আব যিনি উত্তব দিচ্ছেন তিনিও ছঁশে নেই। বিচাবেৰ, ছুবাগ্রহেৰ, মাগুতাব নেশা এতই ভয়ঙ্কব যে, মন বখন চঞ্চল হৱে ঐ দিকে দৌড়ব তখন মনেব মাদবতা, মনেব চঞ্চলতা মানুষকে পাগল কবে দেব। কেবল পাগলামিব মাত্ৰাৰ তাৱতম্য থাকে। কেউ চাব আনা, কেউ আট আনা, কেউ বাব আনা, কেউ একেবাবে বোল আনা পাগল হব—সে তো কেবল মাত্ৰাব পাৰ্থক্য। অৰ্থাৎ কেউ কম পাগল, কেউ বেশি পাগল। প্ৰত্যেক লোকই পাগল, কিন্তু বখন কাবও পাগলামি সীমা লঙ্ঘন কবে তখন কেবল আমবা তাকে ‘পাগল’ বলে অভিহিত কবি। সব লোকই তাব থেকে বেশি কম বা অল্প কম পাগল। যে পাগলেব দৌবাখ্যা সীমা ছাড়িয়ে বাব তাব পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়া পবানো হয়—আব বলা হয়, লোকটা পাগল। বখন সে অনৰ্গল বক-বক কবে, অহংবদ্ধ ভাবা প্ৰয়োগ কবে, তখন সবাই বলে—লোকটা পাগল হৰে গেছে। নতুবা আমবা তাকে পাগল বলি না। কিন্তু বাস্তবে আমবা সবাই পাগল, আমি-আপনি, ইনি-উনি—সবাই পাগল। বাস্তবে মনেব চঞ্চলতাব জগ্ৰ এই অবস্থাৰ সৃষ্টি হচ্ছে। প্ৰকৃত প্ৰস্তাবে মনেব চঞ্চলতাই পাগলামি। পূৰ্ণ ছঁশেৰ স্থিতিতে কেউ নেই। নিৰ্বিচাবতাব দশাতেই সেই স্থিতি আসে। যেখানে বিচাব শেষ হয়, সেখানে সকল পাগলামিব অন্ত হব। তখন কেউ আব পাগল থাকে না, নিবন্তব পূৰ্ণ ছঁশেই থাকে। যেখানে বিচাব নেই সেখানে ছঁশ আছে, পবিপূৰ্ণ প্ৰকাশ আছে। সেখানে কোন অন্ধকাব নেই। যেখানে ছঁশ নেই, সেখানে অন্ধকাব ও আলো জড়িত হৰে আছে।

আপনি মনে কবছেন, এখন এখানে কোন অন্ধকাব নেই। তাই যদি মনে কবেন, বাইবে বোদে গিবে দেখুন। আপনি বুঝতে পাববেন, বোদে যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে প্ৰকাশ অৰ্থাৎ আলো বেশি, আব এখানে কম। কম প্ৰকাশেব অৰ্থই হল—অন্ধকাব। এটাই হল

আপেক্ষিক স্থিতি। অধিক প্রকাশের তুলনায় কম প্রকাশকে অন্ধকাৰ বলা যায়। কামবাব ভেতৰেব দিকে তাকান—আপনাৰ মনে হ'বে এখানে প্রকাশ বেশি, ওখানে প্রকাশ অপেক্ষাকৃত কম। সামনে যে বৌদ্ধ-বলমল দেখা আছে, সেখানকাৰ চেয়ে এই বাবান্দায় প্রকাশ কম, আৰু এই বাবান্দাব চেয়ে ভেতৰেব কামবায় প্রকাশ আৰু কম। তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমবা যেখানে কেবল প্রকাশ বলে মনে কৰেছি, সেখানে অন্ধকাৰও আছে। তবে, এমন এক বিন্দু আছে যেখানে পৌঁছলে অন্ধকাৰ শেষ হয়ে যাবে। তা না হলে, জ্ঞানই বলুন, দৰ্শনই বলুন, অমুভবই বলুন, বিকাশই বলুন—সৰ্বত্ৰই অন্ধকাৰ লুকিয়ে আছে। এই অন্ধকাৰেব পূৰ্ণ বিলোপ ততক্ষণ ঘটবে না, যতক্ষণ না আমাদেব চেতনা শুদ্ধ উপযোগেব স্তৰে উন্নীত হবে। অবিমিশ্র জ্ঞান আৰু অবিমিশ্র চেতনাৰ উপযোগ না হওবা পূৰ্বস্তু অন্ধকাৰ আমাদেব সঙ্গে সঙ্গেই চলবে। প্রকাশেব মাত্রা কম হলেই আমবা তা অন্ধকাৰ বলে মনে কৰি না। কিন্তু গভীৰভাবে বিচাৰ কবলে তা অন্ধকাৰ বলেই বোধ হবে।

এক ঘটনাৰ স্মৃতি আমাব মনে আসছে। আমি তখন মাজাজে। আমি একদিন এক জায়গায় বসে ছিলাম, সেখানে আলো ছিল। কিন্তু যখন লেখাব প্ৰস্ন এল, তখন মনে হল এখানে তো অন্ধকাৰ, এখানে লেখা যাবে না, কাৰণ লেখাব উপযুক্ত আলো এখানে নেই। আমি উঠে আৰু এক জায়গায় গিয়ে বসলাম, সেখানে আলো বেশি ছিল। লিখতে আৰম্ভ কৰলাম আৰু কিছু লিখলামও। কিছুক্ষণ পৰে সূক্ষ্ম লিপিতে লেখা একটা পাতা পডাব প্ৰয়োজন হল। অক্ষৰ খুবই সূক্ষ্ম ছিল, তা পডাব পক্ষে সেখানকাৰ আলো যথেষ্ট ছিল না। সুতৰাং সে জায়গা ছেড়ে আৰু এক জায়গায় যেতে হল। যেখানে আমি আলো মনে কৰেছিলাম, সেখানেই অন্ধকাৰ হয়ে গেল। লেখাব প্ৰস্ন আসায় যেখানে আলো ছিল সেখানেই অন্ধকাৰ হল। আমি ঐ আলোৰ তো লোককে চিনতে পাবছিলাম, কিন্তু লিখতে পাবছিলাম না। আৰাব যখন সূক্ষ্ম

অন্ধৰ পড়িব প্ৰয়োজন হ'ল, তখন লেখাৰ উপযুক্ত যে আলো ছিল তাও অন্ধকাৰ গেল। আমাকে আৰু একটা তৃতীয় জায়গা বেছে নিতে হ'ল।

এই বকম স্থিতিতে কি কৰে মানা যায় যে, যেখানে আলো থাকে, সেখানে অন্ধকাৰ থাকে না? আলো আৰু অন্ধকাৰ—হুই-ই এক সঙ্গৈ চলে। তৰে এমন এক বিন্দু আছে যেখানে আলো কেবল প্ৰকাশই—যেখানে অন্ধকাৰেৰ লেশমাত্ৰ থাকে না। সেই বিন্দু হল—নিৰ্বিচাৰতাৰ স্থিতি। সেই বিন্দুতে পৌছলেই সমস্ত অন্ধকাৰ শেষ হয় যায়। সেখানে পূৰ্ণ প্ৰকাশ বিৰাজ কৰে, অবিমিশ্ৰ প্ৰকাশই বিद्यমান থাকে। কেবল উজ্জলতা—অন্ধকাৰ কিছুমাত্ৰ নহে। যে দেখে, কেবল সত্যই দেখে। সেখানে বাস্তবিক সত্যেৰ দৰ্শন মেলে। ঐ আলোষ যথার্থ সত্যকেই দেখা যায়। ঐ আলোয় অসত্যেৰ বেখামাত্ৰ থাকে না। পূৰ্ণ প্ৰকাশ প্ৰকট হয়, নিৰ্বিচাৰতাৰ স্থিতি লাভ হয়।

আমবা ধ্যান কৰছি। এটাই আমাদেৰ প্ৰাথমিক অভ্যাস। প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াই হল, মনকে একাগ্ৰ কৰা, একই বিচাবেৰ ওপৰ মনকে মগ্ন কৰা, একই দিকে মনকে প্ৰবাহিত কৰা। এ বকম কৰা খুবই ভাল এবং প্ৰয়োজনও বটে। বস্তুত এ বকম না কৰে আমাদেৰ গতি নহে। প্ৰথম দফায় আমবা আৰু কি কৰব, আৰু কি-ই বা হবে? তৰে এ বকম কৰাকেই যেন অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে না কৰি। এব ফলে কিছু অবশ্য হয়—আমি মানছি, কিছু হয়-ই। ধ্যান কালে হয়ত আমবা কিছু দেখতে পাই। সেই দেখাই বাস্তবিক বলে আমবা মনে কৰতে পাৰি, কিন্তু প্ৰবৃত্তপক্ষে তা বাস্তবিক নহ, মনেৰ পৰিণতি মাত্ৰ। এমন সব জিনিষ দেখা যায়, এমন সব শব্দ শোনা যায়, যা বাস্তবিক নহ—ধ্যানেৰ সঙ্গৈ যাব কোন সম্ভৱই নহে। অৰ্থাৎ এই গুলিকেই বাস্তবিক বলে ধৰে নিলাম। এ যেন একটা চক্ৰ। এই চক্ৰে পড়লে ভ্ৰান্তি বা বিপৰ্যয় দূৰ হয় না, পূৰ্ণ সত্যেৰ দৰ্শন হয় না, আত্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ হয় না।

আত্মা নিৰ্বিচাৰ, বিচাবেৰ দ্বাৰা সেখানে পৌছনো যায় না। আত্মা অ-শব্দ, শব্দেৰ মাধ্যমে সেখানে পৌছনো যায় না। আত্মা নিৰ্বিকল্প,

বিকল্পেব সাহায্যে সেখানে পৌঁছনো যায় না। আত্মা অচিন্ত্য, চিন্তাব
 দ্বারা সেখানে পৌঁছনো যায় না। কেবল নির্বিচার, নিশ্চয়, নির্বিকল্প,
 নিশ্চিন্ত আর নির্মনস্ক স্থিতিব দ্বাবাই আত্মাতে পৌঁছনো যায়। ঐ
 স্থিতিব যে অনুভব হয়, সেই অনুভবই আমাদের সকল শাস্ত্রেব সার
 নির্ধাস।

ধর্মশাস্ত্র বলে, আত্মায় প্রকৃত অনন্ত সুখ আছে, বিষয়াতীত সুখ
 আছে, অবাধ সুখ আছে। অনন্ত সুখ তাকেই বলে যাব কখনও অন্ত
 হয় না। অবাধ সুখ তাকেই বলে যাতে কখনও বাধা বা বিঘ্ন হয় না।
 এমন হয় না যে, এখন যদি সুখ হল তো পরক্ষণেই দুঃখ এসে হাজিবি
 হবে। এই সুখ অক্ষয়, কখন তা ক্ষীণ হয় না। এই সুখ বিষয়াতীত,
 বিষয় থেকে তা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এখন আমরা বিষয়াতীত সুখ
 কি বস্ত্ত তা কল্পনা পর্যন্ত কবতে পাবি না। সামনে বিষয় নেই, বিষয়ের
 উপভোগ নেই, তবে সুখ কি কবে হয়? শব্দ নেই যে শুনতে পাব,
 তবে সুখ কি কবে হবে? রূপ নেই যে দেখতে পাব, তবে সুখ কি করে
 হবে, চোখেব তৃপ্তি কি কবে হবে? স্পর্শ নেই যে গ্রহণ করতে
 পাবব, তবে ভ্রাণেব সুখ কি কবে হবে? উৎকৃষ্ট বস নেই যে আন্বাদন
 কবতে পাবব, তবে জিহ্বাব সুখ কি কবে হবে, বসনার তৃপ্তি কি করে
 হবে? স্নুকোমল স্পর্শেব অভাবে সুখেব কল্পনা কি কবে কবা যেতে
 পাবে? আমাদের কল্পনা এইসব ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়সুখ ছেড়ে
 অন্ত্রে যেতেও চায় না। আমবা স্বীকার কবতে চাই না যে বিষয়াতীত
 সুখও আছে। কিন্তু এটা সত্য যে, বিষয়াতীত সুখ আছে। ইন্দ্রিয়েব
 বিষয়েব সঙ্গে সেই সুখেব কোন সম্বন্ধ নেই। ঐ সুখ বিষয় থেকে
 উৎপন্ন হয় না, বিষয় তাকে উৎপন্ন কবে না। আমবা ঐ সুখের বিষয়ে
 চিন্তা পর্যন্ত কবতে পাবি না। আমবা মনে কবি, যারা বিষয়াতীত
 সুখেব কথা বলে, তারা অতিবদ্বন্দন কবে, অতিশয়োক্তিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ
 কবে, অযথা বলে। এই হল আমাদের অনুবিধে। আমাদের এই
 রকম চিন্তাব যে দোষ আছে তাও বলতে পাবি না, কারণ আমবা

ইঙ্গিতের স্তবেই জীবন যাপন করি। ঐ স্তর থেকেই চিন্তা করি। আমবা মনেব স্তব থেকে চিন্তা করি, আব মনেব স্তব থেকে চিন্তা করলে এব বেশি কিছু ভাবা সম্ভব হয় না। আমাদের দোষ নেই— ভাবাব বা চিন্তা করার যে স্তবে আমবা আছি, সেই স্তব থেকে যা ভাবা সম্ভব তাই আমবা ভেবেছি, আর সেই ভাবনাকেই বাস্তবিক বলে বোধ করেছি। কিন্তু যখন আমাদের চেতনা সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষণে এসে পৌঁছয়, নির্বিচারতাব স্তর অনুভূতিতে প্রবেশ করে, তখন সেই ক্ষণে যে সহজ আনন্দ স্ফূর্ত হয়, যে সুখের অনুভব হয়, তাই হল সহজ সুখ— অবাধ সুখ। সেই সুখের ক্ষণিক দর্শন মিললেই অনুভব হয়, বিষয়জনিত সুখ আব সহজস্ফূর্ত বিশুদ্ধ সুখের মধ্যে কতই না পার্থক্য। সেই সহজ বিশুদ্ধ সুখ কত মহান। এই হল নির্বিচারতাব স্থিতি, আত্মাব স্থিতি—আত্মানুভবের স্থিতি, আত্ম-বরণের স্থিতি। বাইরে থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে আনাৰ স্থিতি। যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, তাকে অল্পের মধ্যে জড়ো করে বাখাব স্থিতি।

আমাদের মস্তিষ্কে অগণিত প্রকোষ্ঠ আছে। একটা লোকের মস্তিষ্কে যত প্রকোষ্ঠ থাকে তা যদি মাটির ওপৰ পৰ পৰ বিছিয়ে দেওয়া যায় তো কনাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত ভূভাগ ঢেকে যাবে, উপরন্তু কিছু প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ট থাকবে। আমাদের মস্তিষ্কে যখন থাকে তখন ঐ প্রকোষ্ঠগুলি অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু তাদের বাইরে বেললে এতটা ভূভাগ ঢেকে যাবে। আমাদের মস্তিষ্কে প্রকোষ্ঠ এত অসংখ্য।

যখন আমাদের চেতনাৰ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করে, চেতনাকে গুটিয়ে এনে, নিজের সমস্ত অনুভূতিকে একত্র করে এক কেন্দ্রে সংহত করা যায় তখন তার কত তীব্র যে অনুভব হবে তা কল্পনাও করা যায় না। তার শক্তি হবে অত্যন্ত প্রবল।

যখন আপনাবা ঘব ছেড়ে কোথাও যান—দেশের আব এক স্থানে, কি বিদেশে যান—তখন মনে হবে যাত্রা করছেন। যাত্রাব অনুভব

ভিন্ন বকমেব। আবার যখন বাত্ৰা থেকে ঘবে ফেবেন তখন মনে হবে আপনাদের মূল স্থানে এসে গেছেন। মনেব যে ছড়িয়ে পড়া, বৃত্তিব যে ছড়িয়ে পড়া, বিচাবেব যে ছড়িয়ে পড়া—তাও এই বকম। যখন তাদের ছড়িয়ে পড়া বন্ধ কবে তাদের গুটিয়ে এক কেন্দ্রে আনা যায়, তখন তাবা যেন আপন ঘবে ফিবে আসে। এই অনুভূতি অলৌকিক বোধ হয়।

আত্মা মনেব মাধ্যমে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বিচাবেব মাধ্যমে, স্মৃতিব মাধ্যমে, কল্পনাব মাধ্যমে চাব দিকে দৌড়ছে। তাব শক্তি ছড়িয়ে পড়ছে, কেন্দ্রিত হচ্ছে না। যখন আমবা ইন্দ্রিয়ের দবজা বন্ধ কবে, বিচাব বন্ধ কবে, স্মৃতি আব কল্পনা বন্ধ কবে—সব কিছু সংযত কবে, নিজের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত কবে তাব মূল স্থানে তাকে স্থাপিত কবি, তখন তাব ছড়িয়ে পড়া শক্তি কেন্দ্রিত হয়ে যাবে। সেই শক্তি হবে প্রাবল। সেই সময়ে বিলক্ষণ এক অনুভব হয়। এমন নয় যে, সেই অনুভব এখন আব আমাদের হতে পারে না। আমি আগেই বলেছি, আজও কেবলজ্ঞান অনুভব কবা যায়, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অনুভব কবা যায়, আত্মাব সহজ আনন্দ অনুভব কবা যায়। আমাদের কেবল এটুকু কবতে হবে যে, বিচাবেব ভূমি ছেড়ে নির্বিচাবেব ভূমিতে পৌছতে হবে, স্মৃতি, কল্পনা ইত্যাদি পবিহার কবে অবিমিশ্র জ্ঞানেব, শুদ্ধ চেতনাব আব শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌছতে হবে, আব সেই স্থিতিব অনুভব কবতে হবে।

জাগরকতাব সঙ্গে দেখতে হবে, মনেব কোন ব্যাপাব যেন না ঘটে, আব মন যেন শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিতে কোন বাধাব সৃষ্টি না কবে। আমবা যদি এতটা জাগরকতাব সঙ্গে দেখতে পাবি, আব অবিমিশ্র জ্ঞানেব স্থিতি অনুভব কবতে পাবি, তবে আজও আমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। অনেক কিছু অসম্ভব বলে ধাবণা কবে বসে আছি, আব সেই ধাবণা এই ভাষায় প্রকাশ কবছি—এখন কলিকাল, ঘোব কলিযুগ, ঐ সব এখন পাওয়া যায় না, মোক্ষ মেলে না, কেবলজ্ঞান

হয় না, ইত্যাদি। এই বকম ধাবণাব কলে মন নিবাশা ও কুষ্ঠায় ভবে যায়, আগে এগোবাব জন্ত যে পা তুলেছি তা পিছিয়ে পড়ে। আমাদের এগিয়ে যাওয়াব আবুলতা নষ্ট হয়ে যায়, কাবল যদি আমরা মেনে নিই অমুক স্থিতি এখন প্রাপ্য নয়, তবে তার জন্ত প্রচেষ্টা কে কববে, আব কেনই বা কববে? আমরা কোন বিশেষ স্থিতি এখন প্রাপ্ত হতে পাবি না—এই ধাবণা আমাদের দূব কবতে হবে। কি পাওয়া সম্ভব, কি পাওয়া সম্ভব নয়, সে চিন্তা আমাব অধিকাব-ক্ষেত্রেব মধ্যে নয়। আমাদের অধিকাব কেবল চলাব, কেবল চলতে থাকাব, কেবল পা আগে বাড়িবে দেওয়াব। চৰ্বেবেতি, চৰ্বেবেতি—এই আমাদের কর্তব্য। আমাদের গতিশীল হওয়াব অধিকাব আছে, কোন এক নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাওয়াব অধিকাব আছে।

আমরা নির্বিচাব চেতনাব স্থিতিব দিকে এগিয়ে যাওয়াব জন্ত পা বাড়াব। যা ঘটাব, তা অবশ্যই ঘটবে। যে উপলব্ধি প্রাপ্তব্য হয়, তা আমরা পেয়ে যাব। যা ঘটাব নয়, তা ঘটবে না। যা প্রাপ্তব্য নয়, তা পাওয়া যাবে না। প্রথমেই কেন চিন্তাব বোবা মাথাব তুলে নেব? কেন চিন্তাব ভারে হুবে পড়ব?

যে ব্যক্তি শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিব—শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিব—যথেষ্ট দৃঢ় অভ্যাস কবেছে, সে নিশ্চিত সেই স্থিতিতে পৌঁছে যাবে, যে স্থিতিতে পৌঁছলে মোক্ষ আছে কি নেই, পবমাত্মা আছেন কি নেই, পবমাত্মাব স্থিতিতে শ্রুত আছে কি নেই—এ সব প্রশ্নই শেষ হয়ে যাবে, নীমাংসিত হয়ে যাবে।

চেতনার দিক পরিবর্তন

অনেক দিন আগেকার কথা। এক পথিক পথ চলছিল। পথেব মাঝখানে এক জঙ্গল পড়ল। সে জঙ্গলে প্রবেশ কবল। জঙ্গলেব পথ খানিকটা পাব হল। তাব পবণে সাদা কাগড ছিল। হঠাৎ তাব সামনে চাবটি মানুষ এসে দাঁডাল। তাবা ডাকাত। পথিক একলা, তাবা চাবজন। তাবা হেঁকে বলল—‘খাম’। পথিক থেমে গেল। তাবা তাকে চেপে ধবতে চেষ্টা কবল। পথিকেবও গায়ে বেশ জোব ছিল। হাতাহাতি শুক হল। পথিক কিছুক্ষণ লড়াই কবল। কিন্তু সে একা, লুটেবাবা চাবজন। কতক্ষণ আব তাদেব ঠেকিয়ে বাখতে পারবে? ডাকাতবা তাকে জাপটে ফেলল। তাব শবীব তল্লাসী কবল। কিন্তু তাবা শুধুই হযবাণ হল। তাব কাছে একটি পযসা ছাডা আব কিছুই পাওযা গেল না। ডাকাতবা আশ্চর্য হযে তাকে জিজ্ঞাসা কবল—‘গ্রহে! এক পযসাব জন্ত এত লড়াই কবলে? প্রথমেই যদি এ কথা বলতে, তাহলে আমবা তোমাব ওপবে হামলা কবতাম না।’ পথিক বলল—‘প্রশ্ন তো এক পযসাব নয, প্রশ্ন আকর্ষণেব। এক পযসাই হোক আব হাজাব টাঁকাই হোক, আমাব খনেব ওপবে আকর্ষণ। হাজার টাঁকা থাকলে আমাব যতটা আকর্ষণ থাকত ঐ এক পযসাব

ওপৰও আমাৰ সেই আকৰ্ষণ । প্ৰশ্ন সখ্যাব নয়, প্ৰশ্ন আকৰ্ষণেৰ ।’

মূল কথা হল আমাদেব আকৰ্ষণ কোন্ দিকে যাচ্ছে । আমাদেব আকৰ্ষণ এক বিশেষ দিক-অভিমুখী হলে আমাদেব প্ৰবৃত্তি, চিন্তা এবং ক্ৰিয়া এক বকম হবে, আব যদি আমাদেব আকৰ্ষণ অন্য আব এক দিক-অভিমুখী হয় তো আমাদেব প্ৰবৃত্তি, চিন্তা ও ক্ৰিয়া অন্য বকম হবে । আকৰ্ষণই প্ৰধান কথা । তা সব কিছুব মথ্যেই পবিবৰ্তন এনে দেয় ।

প্ৰশ্ন হচ্ছে—অ-ব্ৰত কি ? ব্ৰত কি ? এক দিক অভিমুখী আকৰ্ষণ অ-ব্ৰত, আর অন্য আব এক দিক অভিমুখী আকৰ্ষণ ব্ৰত । ছুটি ছ বকম জিনিস নয় । ছুটি একই জিনিস । কেবল দিকেব পবিবৰ্তন । ব্ৰত ও অ-ব্ৰত দুই বিপবীত দিক-অভিমুখী পক্ষিক ।

যে আকৰ্ষণ আত্মা থেকে নিৰ্গত হবে বাইবেব দিকে যায় সেই আকৰ্ষণেব নাম অ-ব্ৰত । আব যে আকৰ্ষণ বাইবে থেকে যিবে আত্মাব অভিমুখে প্ৰবাহিত হয় তাকে বলা হয় ব্ৰত । ব্ৰত কোন নতুন জিনিস নয় । আকৰ্ষণেব দিক পবিবৰ্তনেব নাম ব্ৰত । ইন্দ্ৰিয়েব মাধ্যমে আমাদেব আকৰ্ষণ বহিমুখী । এক আছে আমাদেব মূল চেতনা । এই চেতনাকে যিবে এক কষায়-বলয় দিকে আছে । কষায়-বলয়েব পবে আছে প্ৰবৃত্তিব বলয় । কষায়-আত্মা ও যোগ আত্মা এই দুটি দ্ৰব্য আত্মাব সঙ্গে যুক্ত হয়েছ । মূল-চেতনা, কষায়-বলয়, যোগ-বলয় আব প্ৰবৃত্তি-বলয় । আমাদেব জ্ঞান থেকে নিঃসৃত বশ্মি কষাবেব সঙ্গে মিশ্ৰিত হলে স্বকীয় জ্ঞানৰূপ হাবিয়ে ধেলে এবং সংবেদনেব রূপ নেয় । জ্ঞান সংবেদনে পবিণত হয় । যতক্ষণ পৰ্যন্ত জ্ঞানধাবাব সঙ্গে কষায়েব মিশ্ৰণ না হয় ততক্ষণ জ্ঞান জ্ঞানই থাকে । বিপুল জ্ঞান রূপে থাকে । যখন কষায় জ্ঞানধাবাব সঙ্গে মিশ্ৰিত হয় তখন জ্ঞান সংবেদনে পবিণত হয় । তাব আব বিপুল জ্ঞান রূপ থাকে না । সংবেদন থেকে আকৰ্ষণ উৎপন্ন হয় । বাগেব আকৰ্ষণেব উদ্ভব হয়, ধ্বেবেব আকৰ্ষণেব জন্ম হয় । সমস্ত আকৰ্ষণেব উদ্ভব হয় সংবেদন থেকে । বিষয়েব প্ৰতি আকৰ্ষণ হয়, তাব তাব মূল কাৰণ সংবেদন । খাচ্ছ শুস্বাচ্ছ মনে হয়, কাৰণ জিহ্বাব নিজস্ব

সংবেদন আছে। সুগন্ধ বস্তু স্পর্শকালে ভাল লাগে, তাব কাবণ নাকের নিজস্ব একটা সংবেদন আছে। মন ঐ সবেব দিকে আকৃষ্ট হয়। কাউকে গালাগালি কবলে গালাগালিব প্রতি আকর্ষণ হয়, তাব কাবণ তখন আমবা জ্ঞানেব জগতে বাস কবি না, সংবেদনেব জগতে বাস কবি। সংবেদনেব জীবন প্রতিক্রিয়াব জীবন। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুষ ক্রিয়া কবে। সংবেদনে প্রতিক্রিয়াব সৃষ্টি হয়। জ্ঞান স্বতন্ত্র, সংবেদন পবতন্ত্র। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুষ নিজস্ব ভঙ্গিতে ক্রিয়া সম্পাদন কবে। সংবেদনে নিজস্ব কোনও ক্রিয়া হয় না, প্রতিক্রিয়া হয়। সামনেব লোক যে বকম ক্রিয়া কবে, সেই বকম ক্রিয়া কবায। কেউ পাথব ছুঁ'ডছে দেখলে সে-ও পাথব ছোঁ'ডে। কেউ প্রশংসা কবলে সে-ও প্রশংসা কবে। অর্থাৎ ক্রিয়াব প্রতিক্রিয়া হয়। প্রতিবিশ্ব হয়। স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়া হয় না। সে লোকেব নিজস্ব কোন ক্রিয়া সম্পাদন কবায ক্ষমতা থাকে না। ব্যক্তিস্বাভাব্য, চিন্তন, মনন এবং ক্রিয়াব স্বাভাব্য—এ সবই জ্ঞানেব অবস্থায় সম্ভবপব, সংবেদনেব অবস্থাতে নয। খালাতে কবে খাবাব এসেছে। যদি কচিকব এবং মনোবম খাণ্ড হয় তবে প্রশংসা কবা হয়, অপ্রিয় এবং অকচিকব হলে অখাণ্ড বলে গালি দেওয়া হয়। এ সবই প্রতিক্রিয়াব জীবন। ‘যে যেমন তাব সঙ্গে তেমন ব্যবহাব’, ‘শঠেব সঙ্গে শাঠ্য আচবণ কব’—এ সবই সংবেদনেব ক্ষেত্রে প্রচলিত সিদ্ধান্ত, প্রতিক্রিয়াব ক্ষেত্রে প্রচলিত মতবাদ। ‘শঠে শাঠ্যেব’ অর্থ—প্রতিক্রিয়া, ক্রিয়া নয।

সংবেদনেব জগতে যে জীবন বাপন কবে সে ক্রিয়াব জগতে বাস কবতে পাবে না। সে নিজস্ব ক্রিয়া সম্পাদন কবতে অসমর্থ। সে যা কিছু কবে সবই প্রতিক্রিয়া। আপনি নিজেব কার্যকলাপ লক্ষ্য করে দেখুন। একশটা কাজেব মধ্যে একশটাই প্রতিক্রিয়া-প্রবিত মনে হবে। ঐ লোক আমাব উপকাব কবেছে, আমিও তাব উপকাব কবব। ঐ লোকটি আমাব নিন্দা কবে অনিষ্ট কবেছে, আমিও তাব অনিষ্টকব নিন্দা কবব। ঐ লোকটি আমাকে অপমানিত কবেছে, আমিও তাকে

অপমান কবব। এ সবই প্রতিক্রিয়া। আমাদের মনে অনেক বিজ্ঞার্ভেশন বা ভাবগুপ্তি, অনেক অববোধের প্রক্রিয়া হয়। তা মানুষকে প্রতিক্রিয়ার জীবন বাপন কবতে বাধ্য করে। কাবণ তার ভেতবে জ্ঞান নেই, সংবেদন আছে। সংবেদন মানুষকে অ-ব্রতের দিকে নিয়ে যায়। হিংসা, অসত্য, চুরি, অ-ব্রহ্মচার্য এবং মমত্ব—এ সবই সংবেদনের প্রতিক্রিয়ন, প্রতিক্রিয়ার পবিণাম।

লোকে অনেক কিছু সংগ্রহ কবে। প্রশ্ন হচ্ছে—কেন ? ঐ বকম সংগ্রহ কবাব কি কোন প্রযোজন আছে ? তা কি ঐতই উপযোগী ? প্রযোজন নেই, উপকাবও নেই, তবুও লোকে সংগ্রহ কবে। ঐব মূল কাবণ প্রতিক্রিয়া। সে ভাবে—‘অমুক লোক ধন অর্জন করেছে, বিস্ত্র সংগ্রহ কবচ্ছে এবং আজ সে সমাজে সমাদৃত। লোকে তাকে সম্মান দেয়, পূজা কবে। তাকে সামনের পংক্তিতে বসানো হয়। ঐই বকম পবিস্থিতিতে আমিও কেন ধনোপার্জন কবব না ? ধন সংগ্রহ কব্বাতে কি আপত্তি থাকতে পাবে ?’ ঐই প্রতিক্রিয়া দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে সে ধন সংগ্রহ কবে। তাব পক্ষে অত ধনের কোন প্রযোজন নেই, তবু সে ধন সংগ্রহ কবে। সে ঐই বকম চিন্তা কবে : ‘ঐই বকম কবলে যদি ঐই বকম ফল হয় তবে আমাবও ঐ বকম কবা উচিত।’ এ সবই হল সংবেদনের জীবন, সংবেদনের চিন্তাধাবা। যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানের ধাবাব সঙ্গে কবায়ের ধাবাব সমিঞ্জণ হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমবা ঐই বকম জীবন থেকে নিজেদের বাঁচাতে পাবব না।

অজ্ঞানে হিংসা হয় না। কোন অজ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানশূন্য জীব, বা জড় পদার্থ কখনও হিংসা কবতে পাবে না। প্রাণী বা জীবই শুধু হিংসা কবে। যে জীবের জ্ঞান আছে সে-ই শুধু হিংসা কবতে পাবে। হিংসা সজ্ঞানে সম্পাদিত হয়। অসত্যাবণ সজ্ঞানে সাধিত হয়। চোর চুবি কবে সজ্ঞানে। বাসনা ঐক কামনা জ্ঞানের সীমার মধ্যে ঘটে। মমত্বের সংগ্রহও জ্ঞানের সীমার মধ্যে হয়ে থাকে। অচেতন পদার্থ দ্বাবা হিংসা বা কোন কিছু হতে পাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে—এ বকম কেন

হয় ? চেতনা কি এই বকম জিনিস চায় ? তা কি আত্মাৰ ধৰ্ম ? তা কি আত্মস্বভাব ? ঐ সমস্ত ক্ৰিয়া আত্মাৰ স্বভাব নহয়। কৰায বিহীন জ্ঞানেৰ দিক খেৰে এই সমস্ত ক্ৰিয়া সম্পাদিত হয়। যখন জ্ঞান কৰাযেৰ দ্বাৰা জ্ঞাপিত হয়, বিহীন হয়, তখন এই সব কাজ হয়। যখন কৰাযেৰ বসায়ন জ্ঞানেৰ বাবাব সঙ্গে মিশে যায় তখন অসদাচৰণকে সদাচৰণ বলে, প্ৰিয় বলে মনে হতে থাকে। এই সব বস্তুৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বেড়ে যায়।

এক জনকে গালি দিয়েছে। বতৰ্জন গালিব প্ৰতিশোধ গালি দ্বাৰা না হয় ততৰ্জন সে ভাবে—‘ওহো। এ আমি কি কবলাম ? গালিব উত্তৰে গালি দিলাম না। লোকে কি ভাবে ? তাৰা বলবে—‘ও তো মাটি দিয়ে তৈৰি। ওৰ মথো কোন কৰ্ত্ত্বই নেই। এত বড় অপমান। তাও ও নয় গেল। ও তো কেবল মাটিৰ পুতুল।’ মনেৰ ওপৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হয়। যখন সে ঐ বকম পালটা আচৰণ কৰতে পাবে, গালিব বদলে গালি দিতে পাবে, তিবন্ধাবেৰ জবাব তিবন্ধাবে দিতে পাবে, তখন তাৰ সন্তোষ হয়। এ হল আকৰ্ষণেৰ ব্যাপাব, সন্তোষেৰ ব্যাপাব। ও সবই কৰায—বসায়নেৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰ মিশ্ৰণ হলে মানুষেৰ চিন্তাৰ দ্বাৰা বদলে যায়। সে ভাবে—‘এব চেবে বড় কোন সন্তোষ নেই, কোন আনন্দ নেই। কোন তৃপ্তি নেই।’ সাপে কামড়েছে, নিম খাওয়ানো হচ্ছে। নিম তেতো, কিন্তু মিষ্টি লাগছে। নিম তো মিষ্টি নয়, তেতো। কিন্তু তা মিষ্টি মনে হচ্ছে। কেন ? তাৰ কাৰণ বস্তুত এমনি একটা বনায়ন অৰ্থাৎ সাপেৰ বিৰ প্ৰবেশ কৰোছে যে নিমেৰ কাৰবাইড তাতে লীন হৈ য়ায়, নিম মিষ্টি লাগে। সেই বকম মনে যতটা কৰাযেৰ পৰিণাম বা বল প্ৰবেশ কৰবে আমাদেৰ অনুভূতি, চিন্তা অথবা তৃপ্তিকে ততটা বদলে দেবে, সন্তোষ এবং অসন্তোষকে নতুন কপ দেবে।

একটি পৌৰাণিক কাহিনী বলি। একদাৰ ইন্দু এবং ইন্দ্রাণী দুজন মনুষ্যলোকে এলেন। তাৰা ঘূৰ বেঙাতে বেঙাতে এক গ্ৰামে এসে

পৌছিলেন। নেখানকাৰ সব লোকই খুব গৰীব। তাৰা সকলোই দুঃস্থ। ইন্দ্রাণীৰ মন কবগাৰ ভৱে উঠল। তিনি ইন্দ্রকে বললেন—‘দেব। আপনি যখন এ গ্রামে এসেছেন তখন একে সম্পদশালী কৰে দিন। ঐ লোকখুলি কেন গৰীব থাকবে? এদেব মনে সন্তোষ নেই। আপনি কৃপা কৰে এদেব সমৃদ্ধ কৰে দিন বাবে এৰা সন্তোষেৰ সঙ্গ জীৱন বাপন কৰতে পাৱে।’ ইন্দ্র বললেন—‘তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এদেব সমৃদ্ধ কৰে দেব, কিন্তু তাৰেব সমৃদ্ধ কৰে এ দায়িত্ব আমি নিতে পাব না। তুমি কি সে দায়িত্ব নিতে পাবৰে?’ ইন্দ্রাণী বললেন—‘আপনি এদেব সমৃদ্ধ কৰে দিন। এদেব দাবিত্য দূৰ হোক। দাবিত্য দূৰ হলে অসন্তোষ আপনা থেকেই মিটে বাবে, তাৰা নিজে নিজাই চুপ্ত হৰে। আমাৰ কোনও দায়িত্ব নিতে হৰে না।’ ইন্দ্র বললেন—‘দেবি। তুমি জ্ঞান না, এ বকম কখনও হয় না। আমি জানি, ও বকম হৰে না। সম্পদ লাভ হলেই যে সন্তোষ হৰে তাৰ কোন নিশ্চয়তা নেই।’ ইন্দ্রাণী জেদ কবলেন। ইন্দ্র গাঁয়েৰ বাহিৰে একটা সোনাৰ খনি কৰে দিলেন। গাঁয়েৰ লোক তাৰ খোঁজ পেল। তাৰা জানতে পাবল যে গাঁয়েৰ বাহিৰে ভাল ভাল সোনা পড়ে আছে। যে বত চায়, নিৰে আসতে পাৰে। তাৰেব সোনাৰ মূল্য জানা ছিল। তাৰা জানত, সোনা কত মূল্যবান। গাঁয়েৰ সব লোক এসে নেই সোনা নেওয়াৰ জন্তু ঝুঁকে পড়ল। সকলেৰ আকৰ্ষণ একই দিকে চালিত হল। সবাই এল। যে বত পাবল সোনা নিৰে গেল। গ্রামে এমন একজনও অবশিষ্ট বইল না যে সোনা নেৰ নি। সাৰা গাঁ এক দিনে ধনবান হৰে গেল। সবাই সম্পদশালী হল। এক দিন আগে সবাই দৰিদ্ৰ ছিল। আজ সদাই ধনবান হৰে গেল। পুৰ চমৎকাৰ ব্যাপাৰ হল।

ৰাত কাটল, সকাল হল। ইন্দ্র এৰ ইন্দ্রাণী নেখানে ছিলেন। গ্রামে আলোচনা হতে থাকে। কেউ বলল, ‘এ কি ব্যাপাৰ? কেমন কৰে হল? কোন দেবতা এই অদ্ভুত কাজ কৰেছেন। আৰাৰ এ-ও মনে হছে, যে এ বকম কৰেছে সে নিতান্ত দুৰ্গ।’ সবাই ললে উঠল,

‘সে কি ? মুখ’ হল কি কবে ?’ যে আমাদের এত ধন দিয়েছে তাকে মুখ’ বলছ কেন ?’ সে বলল, ‘সে যদি বুদ্ধিমান লোক হতো তবে কখনই সবাইকে সে সোনা দিত না। কবেক জনকে সোনা দিলে তাব একটা অর্থ হতো। সবাকে সোনা দেওয়াতে সোনার আব কোন অর্থ বা মূল্য বইল না। এখন সবাই ধনবান হয়ে গেল। কেউ আব সেবক বইল না। এখন আব ভৃত্য বা সেবক থাকবে না। এখন কাজ চলবে কি করে ? আমাদের কাছে ধন আছে, অথচ আমাদের ভৃত্য-পরিজন নেই, তবে ধন লাভের অর্থ কি ? ছোট-বড় সব সমান হয়ে গেল।’ ইন্দ্র শুনলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে বললেন—‘শুনলে তো ? এদের সন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে, না অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে ? ধন দেওয়া আমাদের হাতেব মধ্যে ছিল, কিন্তু সন্তোষ দেওয়া আমাদের হাতেব মধ্যে ছিল না।’

এটা কাহিনী মাত্র। কিন্তু আমরা এত ভিত্তিতে একটু চিন্তা কবলে দেখি অসন্তোষ কোন বস্তুব আধাবে ঘটে না। কষায়জড়িত চেতনাব আধাবে অসন্তোষ উৎপন্ন হয়। কষায়গ্রস্ত চেতনাব ধাবাব একটি লক্ষণ যে, মানুষ অগ্রবে চেয়ে বড় হতে চায়। যত তাব লোভেব পূরণ হয় তত তাব আত্মাভিমান বাড়ে, তত সে সবাব চেয়ে বড় হতে চায়। যখন আশেপাশে সবাই ছোট এবং অসম্মানীয় হয় তখন সে নিজেব শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব কবে। একবাব চোখ তুলে ভ্রুকুটি কবলে দশ-বিশ জন লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে, তবে তো বড় হওয়ার মজা, শ্রেষ্ঠত্বেব আনন্দ পাওয়া যাবে। ধনবান হওয়ার, ক্ষমতাব অধিকারী হওয়ার আনন্দ তখনই পাওয়া যাবে। তা না হলে সবই বার্থ। ধনবান হওয়ার ব্যাপাব যেমন, অল্প অল্প জিনিসেব ক্ষেত্রেও ব্যাপাব তেমনি। এতে কি লাভ ? লোকেব সন্তোষ হয় না। যখন লোকে অগ্রণী হয় তখন তাব সন্তোষ হয়। তাব পেছনে এক লম্বা সেবকেব সারি চলতে হবে। কষায়-চেতনাব ফলে এ সব প্রতিক্রিয়া হয়। যখন চেতনাব কষায়-আবরণ বিচ্ছিন্ন হয়ে চেতনাব বিস্তৃত ধাবা

প্রবাহিত থাকে তখন সমস্ত আকর্ষণেব সমাপ্তি ঘটে এক মানুষেব মধ্যে অহিংসা প্রভৃতি সদাচার বিকশিত হয় ।

ভগবান মহাবীৰ একদা কাবোৎসৰ্গ মুজায় এক শূন্য গৃহে ধ্যানস্থ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিলেন । কতকগুলি লোক সেখানে এল । তাৰা তাঁকে গালি দিল, তাৰ পৰে তাঁকে প্রহাৰ কবল । কিন্তু কোন পৰিবৰ্তন হল না । শুকতে যে ধ্যানেব প্রবাহ চলছিল তা গালি দেওযাব সময়ও চলতে থাকে, প্রহাৰকালেও চলতে থাকে । কোন পৰিবৰ্তন ঘটল না । ধ্যানেব ধাৰা খণ্ডিত হল না । তা অখণ্ডিত ভাবে লক্ষ্যে নিবদ্ধ বইল । আমবা ভাবি—এ বকম ক্ষেত্রে মানুষেব তো পৰিবৰ্তন আসা উচিত । ভগবান মহাবীৰ কি শূন্যবৎ হয়ে গিয়েছিলেন, কিংবা তাঁৰ মধ্যে পৰিবৰ্তন হয়েছিল কিন্তু লক্ষিত হয় নি ? এব কাৰণ কি ? এব মূল কাৰণ—দিক পৰিবৰ্তন । তাঁৰ চেতনাৰ পৰিবৰ্তন ঘটেছিল । তাঁৰ প্রবাহেব দিক পৰিবৰ্তন হয়েছিল । তাঁৰ চেতনা নিজেব দিকে প্রবাহিত হয়েছিল । গালাগালি তাকে ভেদ কবতে পাৰে নি । কাৰণ তাঁৰ চেতনা অ-শব্দ বা শব্দেব অতীত দশায় উপনীত হয়েছিল । সেখানে সমস্ত শব্দেব সমাপ্তি ঘটেছিল । তা শব্দার্থেব অতীত অবস্থা ।

একদা ভগবান ধ্যানে স্থিত ছিলেন । কতকগুলি কপসী যুবৰ্তী এসে তাঁকে প্রার্থনাৰ সূৰে বলল—‘প্রভু, এ আপনি কবেছেন ? আপনি অসময়ে যোগ আচৰণ কবেছেন কেন ? আপনি আমাদেব কেন ত্যাগ কবেছেন ? আপনি একবাব ঘৰে চলুন, আমাদেব সঙ্গে বাস কৰুন । আমাদেব অনুবোধ বক্ষা কৰুন । আমাদেব কৃতার্থ কৰুন ।’ মহাবীৰেব ধ্যানেব ধাৰা অবিচলিত বইল । কোন পৰিবৰ্তন ঘটল না । তাঁৰ মধ্যে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । তাঁৰ কাৰণ, ভগবান মহাবীৰেব আকর্ষণেব দিক পৰিবৰ্তন হয়ে গিয়েছিল । যিনি ক্ষণমাত্র আগে বাজচক্ৰবৰ্তীৰ মত বৈভবশালী ছিলেন, পৰ মুহূৰ্তে সব কিছু ছেড়ে অকিঞ্চন হয়ে গৃহত্যাগ কবেছিলেন—এ কেমন কবে সম্ভব হয়েছিল ? আকর্ষণেব দিক পৰিবৰ্তন হওয়াতেই তা সম্ভব হয়েছিল ।

দিক পৰিবৰ্তনেৰ নামঃ ব্ৰত, প্ৰব্ৰজ্যা, সন্ন্যাস ।

অহিংসা ক্ৰিয়া, হিংসা প্ৰতিক্ৰিয়া । সত্য ক্ৰিয়া, অসত্য প্ৰতিক্ৰিয়া । অকিঞ্চনতা ক্ৰিয়া, সংগ্ৰহ প্ৰতিক্ৰিয়া । বাব মध्ये আকৰ্ষণেৰ দিক পৰিবৰ্তন ঘটছে তাৰ পক্ষে অহিংসা, সত্য, অসংগ্ৰহ প্ৰভৃতি সহজ হ'ষে যায, স্বভাবে পৰিণত হয় । তাৰ পৰে তাৰ পক্ষে হিংসা ক'বা সম্ভব হয় না, অসত্য ভাষণ বা চুৰি ক'বা সম্ভব হয় না, সংগ্ৰহ ক'বা বা আসক্ত হওঁয়া সম্ভব হয় না । এসব হল আকৰ্ষণেৰ দিক পৰিবৰ্তনেৰ প্ৰতিফলন । তখন তাৰ গতি আত্মাভিমুখী হয় । চেতনা আত্মাব দিকে প্ৰবাহিত হ'তে আৰম্ভ কৰে । তা ব্ৰত, শুমহং সমাধি ।

গৌতম ভগবান মহাবীৰকে জিজ্ঞাসা কৰেছিলে—‘ভগ্নে । কোন লোক ঘুমায়, কেউ কেউ জেগে থাকে, কেউ কেউ নিদ্ৰিত অবস্থায় জেগে থাকে । এ কথা কি ঠিক ?’

মহাবীৰ বলিলে—‘গৌতম । ও কথা ঠিক । বাব আকৰ্ষণ বিষয়েৰ প্ৰতি, বাব আকৰ্ষণ বাইবেৰ দিকে ধাবিত হয়, সে লোক ঘুমিয়ে থাকে । বাব চেতনা নিবন্ধ আত্মাব দিকে প্ৰবাহিত হয়, বাব আকৰ্ষণ শেষ হ'যেছে, সে জেগে আছে, সে সৰ্বদা জাগ্ৰত থাকে । বাব চেতনা কখনও বাইবেৰ দিকে ধাবিত হয়, আৰাব কখনও কখনও খেমে গিয়ে ভেতৰেৰ দিকে প্ৰবাহিত হয় সে ঘুমিয়ে জাগে । ঘুমিয়েও থাকে, আৰাব জেগেও থাকে ।

ব্ৰত জাগৰণ । চেতনাৰ জাগ্ৰত অবস্থাকে ব্ৰত বলে । তাবই নাম সমাধি । এই অবস্থায় পৌছলে মানুহেৰ সব সমস্তাব সমাধান হ'ষে যায বলে এই অবস্থাকে সমাধি বলে ।

কষাথকে ঘিৰে চাব ছুৰাব আছে—অনন্তানুবন্ধী, অপ্ৰত্যাখ্যানী, প্ৰত্যাখ্যানী এক সংজ্ঞন । প্ৰথম ছুৰাব অনন্তানুবন্ধী । যে এব ওপৰে আঘাত কৰে, প্ৰহাৰ কৰে তাৰ দৃষ্টিকোণ সন্ধ্যক হ'ষে যায । তাৰ দৃষ্টি সীমীটান হয় । সে সত্যেৰ দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ কৰে । যে লোক দ্বিতীয় দবজায়, অপ্ৰত্যাখ্যানী কষাথেৰ ওপৰে আঘাত কৰে, ঐ ছুৰাব ভেঙ্গে

কেলে, সে ব্রতী হতে পাবে, সে ব্রতের ভূমিতে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।
 যে তৃতীয় ছায়াব প্রত্যাখ্যানী, কষায়েব ওপবে আঘাত কবে, সে মহাব্রতী
 হয়, দীক্ষিত হয়, প্রব্রজ্য লাভ কবে। যে চতুর্থ ছায়াব সংজ্ঞান কষায়ে
 আঘাত করে, সে বাঁতবাগ, বাগ, ঘেব প্রভৃতি সব কিছুব, অতীত
 হয়ে যায়।

কষায় চেতনাব ওপবে আঘাত কবলে তবে ব্রত এবং মহাব্রত প্রাপ্তি
 হয়। যতদিন পর্যন্ত কষায়েব বলয়ে আঘাত কবে তাকে ভেঙ্গে ফেলা
 না যায় ততদিন পর্যন্ত মানুষ ব্রতীতে পবিত্র হতে পাবে না। ব্রত
 অতি উচ্চ স্তরের সমাধি বা সমাধান। তাতে চেতনাব পবিবর্তনের
 ক্ষমতা এসে যায়। তাব সমাধান হয়ে যায়, তাব সমাধি মিলে যায়।
 তাকে আব কেউ সম্ভাপ দিতে পাবে না। ক্রোধ, অভিমান, মায়া বা
 লোভ—কিছুই তাকে সম্ভপ্ত বা বিচলিত কবতে পাবে না। বাগ বা
 ঘেব তাকে ক্রেশ দিতে পাবে না। তাব সব কিছু সমাহিত হয়ে যায়।
 সব সমস্তাব সমাধান হয়ে যায়। আব কোন বন্ধন হয় না।

লোকে ব্রতী হতে চায়। কিন্তু আবদ্ধ হওয়াব বলে ব্রতীতে
 পবিত্র হতে পাবে না। বন্ধন কি? এক বন্ধন, মানুষেব কষায়েব
 চেতনাব প্রবলতা। সে এখন পর্যন্ত কষায় চেতনাব ওপবে আঘাত
 কবতে পাবে নি। সে এখনও অব্যবস্থিত, সংশয়ে দোহুলামান। সাধনাব
 পথ তাব ভাল লাগে, কিন্তু সে পথে সে পৌছতে পাবে না। সে চিন্তা
 কবে—‘আমি একলাই চলব। ছুনিমা তো আমাব সাথে চলবে না।’
 সঙ্কল্প দুর্বল হয়ে যায়, বিশ্বাস তৈরি হয় না, পথ মেলে না। কষায়েব
 ওপবে আঘাত না কবলে সে কাজ পুৰো হবে না। কষায় চেতনাব
 ওপবে আঘাত পড়লে বিবতি উৎপন্ন হয়। ‘বতি’ শব্দেব অর্থ বমণ
 কবা। তাব অর্থ, আনন্দ কবা। আনন্দ গ্রহণে বত হওয়া। ‘বিবতি’
 কথাটিব অর্থ সাংসারিক আনন্দ থেকে দিক পবিবর্তন কবে বিপবীত
 দিকে মনকে নিয়ে যাওয়া। বিরতি বতিব সম্পূর্ণ বিপবীত মার্গ।

ছুই ভাই ছিল। তাবা বয়েব ব্যবসা কবত। বড ভাই তাব স্ত্রী

এবং পুত্ৰকে ত্যাগ কৰে সংসাৰ ছেড়ে চলে গেল। ছেলে বঁড় হল। একদিন তাৰ মা তাকে বলল—‘বাছা। তোৰ বাবা আমাৰ কাছে এক পুঁটলি বেখে গিয়েছেন। তাতে বস্ত্ৰ আছে। কাকাব কাছে নিয়ে গিয়ে ওগুলি বাজাবে বেচে আয়। এখন দৰ উচু। অনেক টাকা পাওযা যাবে।’ সে কাকাব কাছে এল। কাকা পুঁটলি খুলল না, সেটা আবাব বেখে দিয়ে বলল—‘এটি তোমাৰ মাকে দিয়ে দিও। বাজাব এখন মন্দা চলছে। এগুলি চড়া দৰে বিক্ৰি হবে না। দৰ কমতি হবে।’ ছেলে মাৰ কাছে এসে সব কথা বলল।

কয়েক মাস গেল। বছৰ গেল। ছেলেটি কাকাব কাছে বস্ত্ৰ পৰীক্ষা শিখতে লাগল। অনুভব বাড়তে লাগল। একদিন কাকা বলল—‘বাছা। বাজাব এখন তেজী চলছে। যাও, সেই পুঁটলিটি নিয়ে এস, বস্ত্ৰগুলি বেচে দেব।’ ছেলেটি দৌড়তে দৌড়তে মাৰ কাছে গেল। পুঁটলিটি দোকানে নিয়ে এল। কাকা গদিতে বসে ছিলেন। তাঁদ কাছে দু-এক জন লোকও ছিল। ছেলেটি পুঁটলিটি খুলল। তাৰ চোখ ঝলসে গেল। সে স্তব্ধ হয়ে গেল। বলে উঠল—‘আবে। এ কি। বস্ত্ৰ কোথায়? হীবা কোথায়? এ সব তো কাচেৰ টুকবো। সবগুলিই কাচ। এ কেমন কবে হল? হীবা কি পালটে কাচ হয়ে গেল, না আসলেই এগুলো কাচেৰ টুকবো?’ সে পুঁটলিটি গলিতে ছুঁড়ে বেলে দিল। কাকা বলল—‘ওহে। এ তুমি কি কবলে? আমি কি বলব?’ ছেলেটি বলল—কাকা। আমি বুঝতে পোবেছি, এ সবই কাচেৰ টুকবো ছিল। হীবা ছিল না, বস্ত্ৰ ছিল না।’

ধাৰণাৰ পৰিবৰ্তন হয়েছিল। আসলেৰ পৰীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক পৰিস্থিতি সামনে এসে গিয়েছিল।

পৰিবৰ্তন কেন আসে?

যাঁবা ত্যাগীতে বা মহাব্ৰতীতে পৰিণত হন তাঁদেৰ নতুন জন্ম হয় না। তাঁদেৰ মধ্যে কেবল চেতনাৰ প্ৰবাহেৰ দিক পৰিবৰ্তন হয়, আকৰ্ষণেৰ পৰিবৰ্তন হয়। যে জিনিস আগে ভাল লাগত, যে জিনিস

কষাষ চেতনাব প্ৰভাবে মনোজ্ঞ মনে হতো, আজ দিক পৰিবৰ্তন হওযাব
ফলে তা একেবাবে বিপৰীত লাগে, অৰ্থাৎ মোটেই চিন্তাকৰ্ষক মনে
হয় না।

সম্ৰাট অশোকৰ মনে এক ভাবনা জেগেছিল, ‘আমি সংসাবেৰ
সবাব ওপৰে আমাৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰব।’ ঐ ভাবনা একদিন তীব্ৰ
ছিল। ভাবনাব পৰিবৰ্তন হল, তাৰ আকৰ্ষণেৰ গতি বদলে গেল—
‘আবে! যুদ্ধ কৰা তো পাগলামো। নবহত্যা নিচ কাজ।’ তাৰ
আকৰ্ষণ বদলে গেল। তিনি শিলালিপি উৎকীৰ্ণ কৰালেন—‘কাবোৰ
সঙ্গে লড়াই কোবো না। কলহ কোবো না। যুদ্ধ কোবো না।’ কলিঙ্গ-
যুদ্ধে যে সম্ৰাট লক্ষ মানুহ হত্যা কৰেছিলেন, তিনি সকলকে ভালবাসাব
কথা বললেন। এটা কেমন কৰে সম্ভব হল? চেতনাব দিক
পৰিবৰ্তনেৰ ফলে এটা সম্ভব হযেছিল। যে লোক নিজেৰ চেতনাব
সঙ্গে কষাষ-চেতনাব সংযোগ হতে দেখ না, সে নিজেৰ চেতনা-প্ৰবাহেৰ
মোড কেবাতে সমৰ্থ হয়, তাৰ পৰিবৰ্তন আনতে সমৰ্থ হয়। তাৰ
আকৰ্ষণ মিটে যায। পুৰনো মূল্যবোধেৰ দৃষ্টি বদলে যায। নতুন
মূল্যবোধেৰ প্ৰতিষ্ঠা হয়। যে সমস্ত জিনিস অৰ্থপূৰ্ণ বলে মনে হতো
সেগুলি এখন অৰ্থহীন, অসাব মনে হতে আবস্ত কৰে। এই মনোভূমিব,
এই চেতনাব দিনেৰ নাম ব্ৰত। ব্ৰত এক। উপযোগেৰ দৃষ্টিতে তা
পাঁচ, বাব, বা অসংখ্য হতে পাবে। ব্ৰতই বলুন, বা বিবতিই বলুন, তা
চেতনাব দিক পৰিবৰ্তন—সবই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম।

